বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় শিকার-সাহিত্য

পিএইচ.ডি. উপাধি লাভের জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

অনিন্দিতা মণ্ডল

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক গোপা দত্ত

অধ্যাপক রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা

বাংলা বিভাগ

কলা অনুষদ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০২৩

Certified that the Thesis entitled

"বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় শিকার-সাহিত্য"

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Gopa Datta, Retired Professor, Department of Bengali, Jadavpur University and Dr. Rajyeswar Sinha, Professor, Department of Bengali, Jadavpur University. And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor :

Prof. Gopa Datta Gopa Datta
Rtd Professor
Jadavpur University

Candidate :

Anindita Mandal
Anindita Mandal

Date : 22.10.2023

Prof. Rajyeswar Sinha

Professor
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Date : 22.10.2023

স্বীকৃতি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভের উচ্চাশায় লেখা হয়েছে ''বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় শিকার-সাহিত্য''—এই গবেষণা সন্দর্ভটি। আমার এই গবেষণা কর্মটির পেছনে আছে অনেকের সাহায্য ও উৎসাহ। নামোল্লেখেই তাঁদের কাছে আমার ঋণ কখনও শেষ হবার নয়।

গবেষণা বিষয়টি শুনে অধ্যাপক গোপা দত্ত অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁকে গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক রূপে প্রাপ্তি আমার কাছে বিশেষ সৌভাগ্যের। গবেষণা ও আলোচনা ক্ষেত্রে তিনি আমাকে যেরূপ নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ও মুক্ত পরিসর দিয়েছেন তা সত্যিই দুর্লভ। তাঁর সস্নেহ ভরসাকে আমি কতদূর রাখতে পেরেছি জানি না। গবেষণা সন্দর্ভটি পড়ে তিনি যেসব সুচিন্তিত মতামত ও উপদেশ দিয়েছেন তা আমাকে বারংবার ঋদ্ধ করেছে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

উনিশ-বিশ শতকের বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশেষত স্বদেশ সমকালের প্রেক্ষিতে বাঙালির শিশু-কিশোর সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে স্নাতক স্তর থেকে আমার কৌতূহল ও আগ্রহ উত্তরোত্তর পুষ্ট হয়েছে অধ্যাপক রাজ্যেশ্বর সিন্‌হার উৎসাহে। বর্তমান গবেষণা কর্মটিতেও আমার ভাবনা-চিন্তার প্রাথমিক স্তর থেকে গবেষণা সন্দর্ভটি চূড়ান্ত রূপলাভ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে সহ-তত্ত্বাবধায়ক রূপে তাঁর ভূমিকা অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দুষ্প্রাপ্য কিছু শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকা প্রাপ্তির হদিশ যেমন তিনি আমাকে দিয়েছেন, তেমনি আমার গবেষণা বিষয় সংক্রান্ত দেশ-বিদেশের হাল আমলের নানা গবেষণা, লেখাপত্র সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল করেছেন। কোভিড পরিস্থিতিতে ও পরবর্তী কালে আকস্মিক পারিবারিক বিপর্যয়ে আমার গবেষণাকর্মটি যখন বেশ বিপন্ন হয়ে পড়ে, সেসময়ও তিনি সর্বদা পাশে থেকে অভয় দিয়েছেন। গবেষণা সন্দর্ভটি পড়ে তিনি যে টুকরো-টুকরো তর্ক-প্রতর্কগুলি তোলেন তা থেকে আমার চিন্তা-ভাবনাগুলি আমি পুনরায় যাচাই করে নিতে পেরেছি। তাঁর সাহায্য, সপ্রশ্রয় সমালোচনা, নানা পরামর্শ ও প্রেরণা—আমার কাছে অমূল্য প্রাপ্তি। এ ঋণ নিঃসন্দেহেই অপরিশোধ্য। তাঁর প্রতি থাকল গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

এখানে যাঁর কথা না বললেই নয়, যিনি না থাকলে আমার এই গবেষণাকর্মটি হয়তো

আদৌ সম্ভব হত না, তিনি আমাদের শিক্ষক আব্দুল কাফি। বিশ শতকের ধূলিমলিন শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলির পাতায় বিভিন্ন স্বাদ বৈচিত্র্যের হরেক রকম গদ্য পদ্যের সুবিশাল মহাফেজখানার সম্মুখীন হয়ে আমি যখন প্রায় দিশেহারা, তখন আমার গবেষণার অভিমুখটিকে শেষ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট দিশা দিতে পারি কাফিদার কথাসূত্রেই। প্রায় সম্পূর্ণ অবহেলিত বাংলা শিকার-সাহিত্য বর্গটিও যে গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যায়তনিক গবেষণার দাবি রাখে—তা তাঁর মারফতই প্রথম বুঝতে পারি। বাংলা শিকার-সাহিত্য ও তার রাজনীতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে যেমন আলাপ-আলোচনার সৌভাগ্য হয়েছে, তেমনি শিকার-সাহিত্যের জনপ্রিয়তার কারণ নিয়েও তাঁর বিশ্লেষণ আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রবল ব্যস্ততার মাঝেও তিনি ছাত্রের নাছোড় অত্যাচার সহ্য করেছেন; ছাত্রের সাহিত্যবোধকে উজ্জীবিত করতে, তার যুক্তিক্রমকে স্বচ্ছ করে তুলতে করেছেন অকুণ্ঠ সহায়তা; জুগিয়েছেন সাহস ও প্রেরণা। তাঁর ঋণ ভাষায় প্রকাশের ক্ষমতা আমার নেই। তাঁকে জানাই আমার প্রণতি, আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সুন্দরবনের শিকারি, বাউলেদের কথা জানার সুযোগ হয়েছে অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডলের থেকে। গবেষণা সন্দর্ভটি রচনার পদ্ধতি-প্রকরণ সম্পর্কে তিনি কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে কয়েকটি বানান সংশোধন করে দিয়েও বাধিত করেছেন। তাঁর সহৃদয় সাহচর্য ও আশ্বাস আমার যাদবপুরের ছাত্রজীবনে এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা।

গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষালের *শিকারের ণত্ব-ষত্ব* ও *বঙ্গবাসীর শিকার কথা* বই দুটির ঋণ স্বীকার করি। তাঁর অন্যান্য লেখাগুলি থেকেও আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। চমৎকার গদ্যে সমৃদ্ধ তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখালেখির সঙ্গে ছাত্রবয়সে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে অধ্যাপক জয়দীপ ঘোষের দৌলতে। নানা দরকারি-অদরকারি বইপত্রের জন্য জয়দীপদা চিরকালই আমার এক মস্ত বড়ো আশ্রয়।

বিভাগীয় সমস্ত অধ্যাপক বিশেষত উদয়কুমার চক্রবর্তী, শেখর সমাদ্দার, শম্পা চৌধুরী, শাশ্বত ভট্টাচার্য, সুতপা সেনগুপ্ত, অনন্যা বড়ুয়া, ব্রতী গায়েন ও সুমিত বড়ুয়ার কাছে পেয়েছি নিরন্তর উৎসাহ। অন্যরাও দিয়েছেন সহাস্য তাগাদা।

শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আমায় শুধুমাত্র দুর্লভ কিছু শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকার সুলুকসন্ধানই দেননি, তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকেও পত্রপত্রিকা, বই পড়ার ঢালাও অনুমতি দিয়েছেন। শিশু-কিশোর সাহিত্যের নানা অজানা তথ্য সরবরাহে তিনি সর্বদাই অকৃপণ ও অক্লান্ত। প্রিসাবমিশনের পূর্ব মুহূর্তে দূরভাষে অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক নির্মাল্য কুমার ঘোষের (গৌরমোহন শচীন মণ্ডল মহাবিদ্যালয়) সাহায্য ও অনুপ্রেরণাও অবশ্য স্মর্তব্য। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক অভিজিৎ গুপ্ত

আমাকে সুকুমার রায়ের ‘হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী’র প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বহুবিস্তৃত ব্যস্ততার ফাঁকেও সময় দিয়েছেন কথা বলার।

এঁরা সকলেই আমার শিক্ষক বা শিক্ষক স্থানীয়। আমার গবেষণা সন্দর্ভটিতে আমার গোচরে বা অগোচরে মিশে আছে তাঁদের কাছে বিভিন্ন সময়ে শেখা নানা ভাবনাসূত্র। এই অবসরে তাঁদের প্রত্যেককেই জানাই আমার বিনম্র প্রণাম।

JU RUSA 2.0 Doctoral Scholarship (2019-20)-টিতে আমার গবেষণা কাজে খানিক আর্থিক সহায়তা হওয়ায় কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সেকশন ও পিএইচ.ডি. সেলের আধিকারিক ও কর্মীদেরও। বিশেষত মেহুলিদি (মেহুলি ঘোষ) অফিসিয়াল কাজকর্মে আমাকে যেভাবে সদাসর্বদা হাসিমুখে সাহায্য করেছেন সেজন্য তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আমার গবেষণা কাজটির মূল উৎস যে শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলি তা বেশ দুষ্প্রাপ্য। আকর ও সহায়ক বই, পত্রপত্রিকার জন্য নির্ভর করতে হয়েছে জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, চৈতন্য লাইব্রেরি, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা), উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি (হুগলি) ও বিভিন্ন ডিজিটাল আর্কাইভ, ওপেন সোর্সগুলির উপর। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারকর্মী ও কর্তৃপক্ষদের জানাই ধন্যবাদ। ‘ধুলোখেলা’, ‘মলাট’ গ্রুপ (ফেসবুক) থেকেও প্রয়োজনীয় নানা হারানো পত্রপত্রিকা, বইপত্র পড়ার সুযোগ পেয়েছি যার ঋণ স্বীকার না করলে অন্যায় হবে।

এবার আসি বন্ধু ঋণের কথায়। অন্তর্জাল ঘেঁটে নানা বইপত্র কিনে হাতের কাছে এনে দেওয়ায় রাকিবের জুড়ি মেলা ভার। সময়ে অসময়ে সর্বদা পাশে থেকে সাহায্য করেছে রাকিব ও হাসনারা। তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের গবেষক রাজদীপ দত্তের সঙ্গে কথাবার্তা-আড্ডায় নিজের চিন্তা-ভাবনাকে পরিশীলিত করার সুযোগ পেয়েছি। প্রুফ দেখায় সাহায্য করেছে রাকিব ও রাজদীপ। বিভাগীয় গবেষক স্বপন বর্মণ ও সাহেব হেমব্রম সহায়তা করেছে বইপত্র সংগ্রহে। নিবেদিতা মণ্ডল, প্রিয়াঙ্কা দে, অভিজিৎ ব্যানার্জি, অঙ্কনা বেতাল, শ্রাবন্তী রায়, ভূতনাথ, কাহ্না-ভাই, অদ্রিসা ও আরুষ মাঝেমাঝেই খোঁজখবর নিয়েছে। এই সব বন্ধু, শুভার্থীদের সহযোগিতা ও সান্নিধ্য ভোলার নয়। তাদের সঙ্গে সম্পর্কও আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতার নয়। সকল বন্ধু, পরিবার-পরিজনকে জানাই ভালোবাসা ও অকপট শুভেচ্ছা।

মুদ্রণের কাজে সহায়তা করেছেন সুশান্ত দা (সুশান্ত রায়)। তাঁর ধৈর্য বিস্ময়কর। গবেষণা সন্দর্ভটিতে নানা যোগ বিয়োগ করলেও তিনি হাসিমুখে সেসব ঝক্কি সুষ্ঠুভাবে

সামলে দিয়েছেন। চিত্রগুলির সজ্জাও সুশান্তদার নিপুণ এডিটিং থেকে বাদ পড়েনি। তাঁকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

গবেষণা কর্মটিতে আদৌ যদি কিছু করে উঠতে পেরেছি, তার কৃতিত্ব দিতে চাই শিক্ষকদের সঙ্গে আমার মা-কেও। তাঁর কাছেই ছোটোবেলায় প্রথম পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতি-গাছপালা-মানুষজন-পশুপাখির প্রতি ভালোবাসার পাঠ। অরণ্য ও অরণ্যপ্রাণীদের প্রতি বিস্ময়-মুগ্ধতা ও তাদের বিলুপ্তি নিয়ে অসহায় আক্ষেপ—এ দুয়ের অভিঘাতেই আমার শিকার-সাহিত্যের দিকে ফিরে তাকানো। দেশ ও কালের সাপেক্ষে বিশ শতকের বাঙালির শিকার ও শিকার-সাহিত্য চর্চার প্রয়াসকে বোঝার চেষ্টা। বহুদূরে বসেও আমার লেখার প্রথম পাঠক ও সমালোচক মা-ই। তিনি অবশ্য সব কৃতজ্ঞতার ঊর্ধ্বে।

পরিশেষে সবিনয়ে জানিয়ে রাখি, অনিচ্ছাসত্ত্বেও গবেষণা সন্দর্ভটিতে থেকে যাওয়া ভুলভ্রান্তি, বানান ও মুদ্রণ প্রমাদের দায়ভার একান্তভাবেই আমার একার।

অনিন্দিতা মণ্ডল

সূচি

স্বীকৃতি

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায় — ভারতে শিকারের ইতিহাস, ইতিহাসে শিকার প্রসঙ্গ ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায় — বাঙালির শিকার বিষয়ক ধ্যানধারণা ও বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় শিকার-সাহিত্য ৩৬

তৃতীয় অধ্যায় — বাঙালির জাতীয়তাবাদ, বীরপুরুষের সন্ধান ও শিকার-শিকারি ৮৪

চতুর্থ অধ্যায় — শিকার-সাহিত্যের সমান্তরাল বয়ান ও মেয়েরা ১১৬

পঞ্চম অধ্যায় — বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় শিকার-সাহিত্যের বিষয় বৈচিত্র্য ১৪৬

ষষ্ঠ অধ্যায় — শিকার-সাহিত্য ও বাঙালি কিশোরের নতুন চৈতন্য ২০৫

সপ্তম অধ্যায় — শিকার-সাহিত্য : বিকল্প বয়ানের সন্ধানে ২৭০

উপসংহার ৩০৯

চিত্রমালা ৩১৬

পরিশিষ্ট ৩৪২

গ্রন্থপঞ্জি ৩৬৫

ভূমিকা

ভোর; আকাশ কোমল নীল। চারিদিকে সবুজ গাছগাছালি। আকাশে এখনও রয়েছে একটি তারা। হিমের রাতে শরীর উষ্ণ রাখার জন্য দেশোয়ালীদের জ্বালা আগুন মাঠে সারারাত জ্বলে এখনও শুকনো পাতা দুমড়ে জ্বলছে। তবে সূর্যের আলোয় আগুন কুঙ্কুম রঙ হারিয়ে হয়েছে বিবর্ণ। সকালের আলোয় টলমল শিশিরে ঝিলমিল সবুজ-নীল বন ও আকাশ। মায়াময় সৌন্দর্যে ভরা প্রকৃতির শান্ত, প্রসন্ন এই ভোরাই দৃশ্য থেকে এবার যাত্রা দৃশ্যান্তরে। সেই ভিন্ন দৃশ্যটিতেও—ভোর; বহু প্রতীক্ষিত ভোর। সুন্দর এক বাদামি হরিণ সারারাত ধরে চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে নক্ষত্রহীন গাঢ় অন্ধকারে বন-বনান্তরে ঘুরে ঘুরে এই ভোরের অপেক্ষা করেছে। এখন ভোরের আলোয় সে নেমে এসেছে। মৃত্যুমুখ থেকে নবজীবনে ফিরতে পারা সেই হরিণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে সবুজ সুগন্ধি ঘাস। ঘুমহীন ক্লান্ত শরীরটাকে আরাম বা একটা আবেগ দিতে নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে করেছে অবগাহন; মুক্তির উল্লাসে হয়েছে স্বপ্নচারী—জলসিক্ত হরিণটি নীল আকাশের নিচে সূর্যালোকে ঝলমলে হয়ে উঠে যেন তার সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দিতে চেয়েছে। আর এই স্বপ্নবিহ্বল মুহূর্তে হঠাৎই দৃশ্যবদল। একটা অদ্ভুত শব্দ। নদীর জল হয়েছে মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল। আবার আগুন জ্বলেছে। কিন্তু এ আগুনে এবার তৈরি হয়েছে হরিণের উষ্ণ লাল মাংস। নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে চলছে পুরনো শিশির ভেজা গল্প। সিগারেটের ধোঁয়া। কয়েকটা টেরিকাটা মাথা। এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—নিঃস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

এইটে, তিনটি দৃশ্যে গাঁথা একটি কবিতার গল্প। খুবই বিখ্যাত এ কবিতাটি জীবনানন্দ দাশ-এর 'শিকার'। *কবিতা* পত্রিকায় আশ্বিন, ১৩৪৩-এ প্রকাশিত এ কবিতার নামটি খুবই ব্যঞ্জনাময়। তৃতীয় দৃশ্যে নদীর জলের রঙ বদলে, পাঠক ধীরে ধীরে বুঝতে পারে স্নানরত হরিণটি শিকারে পরিণত হয়েছে। 'অদ্ভুত' শব্দটি আসলে বন্দুকের। পূর্ববর্তী দুটি দৃশ্যের পাশে বন্দুকের শব্দটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, বেমানান; তাই শব্দটি 'অদ্ভুত'। অরণ্যের খাদ্য-খাদক নীতিতে চিতাবাঘিনীর হরিণ শিকার স্বাভাবিক। কিন্তু সারা রাত ধরে চিতাবাঘিনীর শিকারে পরিণত হতে হতেও হরিণটি আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়। তবে শেষরক্ষা হয় না। ভোরের আলোর নিরাপত্তায় প্রকৃতির আশ্রয়ে হরিণটি যখন বাঁচার উল্লাসে মগ্ন, স্বপ্নবিভোর—সেই মুহূর্তে এসেছে অবাঞ্ছিত আঘাত। কিছু বুঝে ওঠার পূর্বেই, সতর্ক হবার সুযোগটুকুও না পেয়ে মানুষ শিকারির বন্দুকে অকারণেই নিহত হয়েছে সে। শিকারে এখানে শুধু হরিণটিরই মৃত্যু ঘটেনি, অরণ্যের সুন্দর স্নিগ্ধ

ভোরটিরও ঘটেছে অপমৃত্যু। একই সঙ্গে অরণ্যজীবনের সারল্য-বিশ্বাস-প্রেম-স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষারও হত্যা ঘটেছে। তাই অরণ্যের জীবজন্তু, অরণ্যের শব্দ-গন্ধ-বর্ণময় প্রকৃতি, অরণ্যের রহস্য-সৌন্দর্য, অরণ্যের নিজস্ব সহজ স্বাভাবিক নিয়মনীতি সব কিছুই এখানে মানুষের শিকারে পরিণত হয়েছে। কবিতাটির নাম 'শিকার', কবিতাতে বলা আখ্যানটিও শিকারের। কিন্তু কবিতাটি আশ্চর্যভাবেই আসলে শিকারের পক্ষে নয়। হরিণটির আকস্মিক করুণ পরিণতি পাঠককে বিষাদ ভারাতুর করে তোলে। শেষ পঙ্‌ক্তির 'নিরপরাধ ঘুম' শব্দ দুটি নিঃসন্দেহেই ইঙ্গিতময় বই কি। বনের নিরপরাধ নিরীহ হরিণকে অকারণে মৃত্যু ঘুমে পাঠায় যারা, তারা হয়তো হরিণের মাংসে রসনাতৃপ্ত করে নিরপরাধ ঘুমে মগ্ন হয়। এখন প্রশ্ন জাগে, কতটা নিরপরাধ তারা? বিশ শতকে যে শহুরে কেতাদুরস্ত শখের বাবু-শিকারিদের উত্থান হয়েছিল, যারা অবসর বিনোদনের জন্য বা নিছক আমোদ রূপে—বন্য নিরীহ পশুপাখি শিকারের ক্রীড়ায় মত্ত হত, তাদের প্রতি কবি যেন বিদ্রুপই করতে চেয়েছেন। মানুষের লোভ-লালসা, হিংসা-নিষ্ঠুরতা, প্রকৃতির প্রতি নাগরিক সভ্য সমাজের দায়িত্বহীনতা বা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা, সর্বোপরি খেয়ালি নেশার বশবর্তী হয়ে অহেতুক শিকার বিলাস—এর বিরুদ্ধে এ কবিতা পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে শেষতক।

জীবনানন্দ দাশের এই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কবিতাটি আজ একবিংশ শতাব্দীর (২০১৩ থেকে) উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়া কিশোর-কিশোরীদের বাংলা বিষয়ের পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত।[১] কিন্তু কবিতাটির রচনাকাল ও প্রথম প্রকাশকাল যে বিশ শতকের তিনের দশকে, সেই সময়কার শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলির দিকে তাকালে 'শিকার' কবিতাটির বক্তব্যের উলটো চিত্রই অধিক চোখে পড়ে। *মৌচাক, শিশুসাথী, রামধনু, রংমশাল* ইত্যাদি শিশু-কিশোর পত্রিকাগুলিতে রোমহর্ষক শিহরণ জাগানো নানা শিকার কাহিনি, অনেক সময় শিকারকেন্দ্রিক জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির অত্যধিক রমরমা দেখা যায়। শিকার সম্পর্কে আমাদের আজকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অবশ্য সেকালে তফাৎ ছিল অনেকটা। বনজঙ্গল ঘেরা গ্রামগঞ্জে, পথেঘাটে হিংস্র জন্তুর বিপদ, এমনকি খাস কলকাতার বুকেও (১৯৫০ সালে) বাঘ বেরনো—বিচিত্র ছিল না।[২] ফলে শিকার ছিল বীরত্ব ও মর্যাদার পরিচায়ক। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে শিকার আইনত নিষিদ্ধও ছিল না। কিন্তু তবুও শিকারের মতো নিষ্ঠুর, হিংস্র রক্তাক্ত হত্যা-খেলা কেন্দ্রিক সাহিত্য কেন বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে (১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত) এত প্রাধান্য পাচ্ছে? এই পত্রপত্রিকাগুলির সম্পাদক ও সাহিত্যিকরা কেন শিশু-কিশোরদের বিনোদনের অন্যতম উপকরণ রূপে শিকার-সাহিত্যবর্গটিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন? গড়ে তুলছেন বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার (বা জঙ্গল) সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ, স্বতন্ত্র ধারা? কেনই বা বাঙালি নবীন পাঠক বা তরুণ প্রজন্মও এইসব শিকার

বা জঙ্গল সাহিত্যগুলির রোমাঞ্চ মাদকতায় বুঁদ হয়ে থাকছে? দুর্ধর্ষ পাকা শিকারি হবার স্বপ্নে বিভোর হচ্ছে? তাহলে এর পেছনে কি ছিল সময়ের কোনও গূঢ় প্রভাব?

বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত শিকার-সাহিত্য বর্গটি আমাদের বর্তমান গবেষণার বিষয়। শিশু-কিশোরপাঠ্য এই শিকার-সাহিত্যগুলি বাংলা বিদ্যায়তনিক গবেষণাক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত (সম্ভবত) সম্পূর্ণ অবহেলিত, অনালোচিত।

তবে ভারতে শিকার, শিকার-সংস্কৃতি ও ভারতের বনজঙ্গলে শিকারের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ শিকার-সাহিত্য (বিশেষত ইংরেজি শিকার ন্যারেটিভগুলি) নিয়ে ইংরেজি ভাষায় কয়েকটি বই, গবেষণাপত্র ইতিমধ্যে রচিত হয়েছে। ভারতে বন্যপ্রাণীর ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী মাত্রই মহেশ রঙ্গরাজনের *India's Wildlife History* (2001) বইটির কথা জানেন। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভারতের বন্যপ্রাণীর ইতিহাস রচনার সূত্রে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কালপর্বে ভারতের বনজঙ্গল, বন্য জীবজন্তুর নানা প্রজাতি, বন্যপ্রাণী ও মানুষের জটিল সম্পর্ক, বন্যপ্রাণীর বিনষ্টি, বিলুপ্তি এমনকি সংরক্ষণের পরও নানা সংকট ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য রঙ্গরাজন প্রাচীন ভারত, মোগল ভারত, ব্রিটিশ ভারত ও স্বাধীন ভারতের শিকার সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তুলে ধরেছেন ভারতীয় রাজা-নবাব-অভিজাতবর্গ, ভারতে আগত ব্রিটিশ রাজপুরুষ-অফিসার, ভারতীয় স্থানীয় শিকারিদের শিকারের কথা। শিকার সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমশ বদলটিও ধরা আছে বইটিতে। রণথম্ভোর ফাউন্ডেশনের সহায়তায় রচিত গবেষণাধর্মী এই বইটি আকৃতিতে বিশালদেহী না হলেও ভারতের ইকোলজি ও জীবতত্ত্বের ইতিহাসে যেমন উল্লেখযোগ্য সংযোজন, তেমনি ভারতের শিকার ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনাতেও বিশাল তাৎপর্যপূর্ণ।

এখানে আরেকটি বই অবশ্যই উল্লেখযোগ্য— John M. MacKenzie-র *The Empire of Nature* (1988)। এই বইটি অবশ্য শুধুমাত্র ভারতের শিকারকে নিয়ে নয়। উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমে ঔপনিবেশিক আফ্রিকা ও ভারতে শিকারের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিগূঢ় সম্পর্কটি ম্যাকেঞ্জি এখানে উন্মোচন করে দেখান। ইউরোপীয় ও দেশীয় শিকারিদের মধ্যে বিদ্যমান জাতিগত বৈষম্যের ব্যাপারটিও তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। ম্যাকেঞ্জির এই বইটি ভারী গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর ভারতের বিশেষত ঔপনিবেশিক ভারতের শিকার সম্পর্কে গবেষকদের আকর্ষণ, কৌতূহল উত্তরোত্তর ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা, ভারতে শিকার সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত হলেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কালপর্বেই তার ঘটাপটা, কদর অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; গড়ে ওঠে শিকারের নানা কায়দা কানুন; নির্মিত হয় অরণ্য-আইন; যুক্ত হয় নানা নতুন মাত্রা। ফলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে শিকার ও সংরক্ষণের নানা দিক নিয়ে গবেষণার পরিসরটি ক্রমশ প্রশস্ত হয়ে চলেছে। বাঘের মতো ভয়ঙ্কর ও

বিপজ্জনক প্রাণীর শিকার উপনিবেশবাদী শিকারিদের কাছে ঔপনিবেশিক শাসকের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা ও অতিপৌরুষের প্রতীক রূপে কীরূপ মান্যতা পায় তা নিয়ে Joseph Sramek "Face Him like a Briton": Tiger Hunting, Imperialism, and British Masculinity in Colonial India, 1800-1875 প্রবন্ধটিতে (2006) তাৎপর্যবাহী আলোচনা করেন। ভারতে বাঘের (big cat) সংখ্যা হ্রাসে সাম্রাজ্যবাদী শিকারিদের ভূমিকাটিও তিনি ব্যাখ্যা করেন। Julie E. Hughes তাঁর *Animal Kingdoms: Hunting, the Environment, and Power in the Indian Princely States* বইটিতে (2012) দেখিয়েছেন উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমে ভারতের দেশীয় রাজন্য বিশেষত রাজপুত রাজপরিবারগুলির কাছে অতীতের ক্ষত্রিয়-ক্রিয়া বা বিলাস-ক্রীড়া 'শিকার' কীভাবে হয়ে ওঠে তাদের ঐতিহ্য, রাজকীয় আভিজাত্য, মর্যাদার—পরিচায়ক ও ক্ষমতাকে বজায় বা বৃদ্ধি করার হাতিয়ার। *Shooting A Tiger* বইটিতে (2019) ঔপনিবেশিক ভারতে শিকার ও সংরক্ষণের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসকের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটি বিচার করাই বিজয় রামদাস মাণ্ডালার মূল উপজীব্য। তিনি বিভিন্ন ভৌগোলিক (সমতল, পাহাড়), রাজনৈতিক (ব্রিটিশ আধিপত্য যুক্ত কিংবা দেশীয় রাজন্যর আধিপত্য যুক্ত স্থান) প্রতিবেশ এবং নানা সামাজিক ও জাতিগত দৃষ্টিকোণ থেকেও ঔপনিবেশিক শিকার ও সংরক্ষণকে পরীক্ষা করেছেন।

রঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর *Climate Calamity and The Wild* বইয়ের (2022) 'Rifle and Romance in the Jungle: The Imperial Hunt or Shikar' প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক ভারত ও বাংলার শিকার ও সংরক্ষণের ইতিহাস, সমাজতত্ত্বকে তুলে ধরেছেন। এরই প্রেক্ষিতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, পরিবেশ ম্যানেজম্যান্ট সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক বিতর্কের নানা জটিলতাকে বুঝতে চেয়েছেন।

এগুলি ছাড়াও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে শিকার ও তার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক নানা দিক নিয়ে বিভিন্ন গবেষণাকর্ম সাম্প্রতিককালে হয়েছে বা হচ্ছে :

- Swati Shresth, "Sahibs and Shikar: Colonial Hunting and Wild-life in British India, 1800-1935", Department of History, Duke University, 2009.
- Fiona Mani, "Guns and Shikaris: The rise of the sahib's hunting ethos and the fall of the subaltern poacher in British India, 1750-1947", West Virginia University, 2012.
- Kakoli Sinha Ray, "Ordering the Wild: Shikar, Wildlife and Conservation in Colonial Bengal (1850-1947)", History Department, Jadavpur University, 2016.

ঔপনিবেশিক ভারতের শিকারের সামাজিক ইতিহাস সংক্রান্ত এই সব

আলোচনাগুলির জন্য গবেষকরা সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন নথি, রেকর্ড ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে মূলত ইংরেজিতে লেখা শিকার-সাহিত্য অর্থাৎ ভারতাগত ইউরোপীয় ও এদেশীয় রাজন্য বা শিক্ষিত ভদ্রলোকদের রচিত শিকার ন্যারেটিভ, স্মৃতিকথাগুলির উপর নির্ভর করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যের গবেষকদেরও এই ইংরেজি শিকার ন্যারেটিভগুলি গবেষণায় উদ্দীপ্ত করেছে। ব্রিটিশদের রচিত শিকার ন্যারেটিভগুলি নিয়ে সুদেব প্রতিম বসুর গবেষণার শিরোনামটি হল : "Taming India: British Hunting Narratives and the Politics of White Dominance, 1800-1947" (Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, 2006-08)। সোলাঙ্কি দত্ত (পাল) তাঁর গবেষণা সন্দর্ভ "Romance of the Jungle: The 'Shikar' Tales of India" (Department of English, Jadavpur University, 2012)-এ উপনিবেশ ও উপনিবেশোত্তর কালপর্বে লেখা ভারতীয় বনজঙ্গলে শিকারের উল্লেখযোগ্য ইংরেজি ন্যারেটিভগুলির সামাজিক - রাজনৈতিক বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছেন।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম থেকেই বাংলা ভাষাতেও রচিত হয়েছে বেশ কিছু শিকার-সাহিত্য। বাঙালি বরাবরই, এমনকি শিকার ভারতে আইনত নিষিদ্ধ হবার (১৯৭২ খ্রি.) পরও, শিকার-সাহিত্যে (বিশেষত জিম করবেটে) মজে। কিন্তু তবুও বাংলা ভাষায় শিকার, শিকার-সংস্কৃতি, শিকার-সাহিত্য নিয়ে তেমন কোনও বিদ্যায়তনিক গবেষণাকর্ম এখনও আমাদের নজরে পড়েনি। বাংলা ভাষায় শিকারের গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক আলোচনারও বিশেষ অভাব। শিকার নিয়ে বাংলা ভাষায় হাতেগোনা কয়েকটি মাত্র আলোচনামূলক লেখার সন্ধান মেলে। ২০০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয় দীপঙ্কর ঘোষের *আদিবাসী শিকার সংস্কৃতি* বইটি। মুখ্যত ক্ষেত্রানুসন্ধান ভিত্তিক এই ক্ষীণতনু বইটিতে সাঁওতাল সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত শিকার, প্রাগৈতিহাসিক পরম্পরায় তাদের শিকারের প্রাসঙ্গিকতা, শিকারের নানা আয়ুধ, নিজস্ব শিকার-সংস্কৃতি—শিকার সংক্রান্ত তাদের নানা রীতিনীতি, লোকাচার, পূজা-পার্বণ-মন্ত্র, শিকার-উৎসব, শিকারের বিলি-ব্যবস্থা, নৃত্য ও কয়েকটি লোককাহিনি, লোকগান তুলে ধরা হয়েছে। বইটির অভিমুখ মানব সমাজের মুখ্যত বঙ্গের আদিবাসী সমাজের বিবর্তন ও সাংস্কৃতিক রূপবৈচিত্র্যের অনুসন্ধান। তাই খুব সঙ্গত কারণেই সার্বিকভাবে বঙ্গবাসীর শিকারের কথা, শিকার সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা, বাংলা (লিখিত) শিকার-সাহিত্যগুলি নিয়ে কোনও আলোচনা বইটিতে নেই।

শিকার ও শিকার-সাহিত্য নিয়ে বাংলা ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক লেখা আমরা পেয়েছি (এখনও পর্যন্ত একমাত্র) চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষালের কলমে। বিগত শতাব্দীর নয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে *প্রমা, ঐতিহাসিক, বারোমাস,*

অনুষ্টুপ ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর শিকার বিষয়ক লেখালেখিগুলি দু-মলাটের বই আকারে হাজির হয় ২০১০ সালে। *শিকারের ণত্ব-ষত্ব*—বইটির ভরকেন্দ্রে আছেন অবশ্য জিম করবেট। জিম করবেট নামের এক বিশ্ববিখ্যাত শিকারি, শিকার-সাহিত্যিক, এক স্বতন্ত্র জীবনধারার মানুষকে তাঁর সমস্ত সফলতা-ব্যর্থতা, তাঁর ব্যক্তিসত্তার মধ্যে বিদ্যমান নানা স্ববিরোধী সংবেদ সহই চণ্ডিকাপ্রসাদ সামাজিক প্রেক্ষিতে চিনে নিতে ও চেনাতে চেয়েছেন। করবেট ও তার ভারতপ্রেমকে যেমন আরেক জাঁদরেল শিকারি ও বিখ্যাত শিকার লিখিয়ে কেনেথ অ্যান্ডারসনের সঙ্গে তিনি তুলনা-প্রতিতুলনা করেছেন, তেমনি আবার দুই অরণ্যপ্রেমী—করবেট ও বাঙালি সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের—মধ্যে খুঁজেছেন সাযুজ্য। স্থানীয় শিকারিদের অরণ্য অভিজ্ঞান, বাস্তবের ও সাহিত্যের শিকারি-নায়কের প্রেমকথা নিয়েও চমৎকার দুটি লেখা বইটিতে স্থান পেয়েছে। সেই সঙ্গে বাঘের বর্তমান সংকট ও তার সঙ্গে যুক্ত সুপরিকল্পিত রাজনীতির নানা জটিলতার প্রসঙ্গটিও চণ্ডিকাপ্রসাদ তাঁর বইয়ে এড়িয়ে যাননি। তবে এই বইটিতে বাংলা শিকার-সাহিত্য এমনকি বাঙালি শিকারিদের প্রসঙ্গও তাঁর আলোচনায় স্থান পায়নি। আমাদের গবেষণার শেষ পর্যায়ে ২০২১ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরেকটি মনোজ্ঞ বই—*বঙ্গবাসীর শিকার কথা*। উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবর্গীয় এই তিন ধরনের বাঙালি শিকারিদের একটি ত্রি-মাত্রিক আখ্যান নির্মাণে তিনি এখানে প্রয়াসী হয়েছেন। তারই সূত্রে ব্রিটিশ উপনিবেশ ও উপনিবেশোত্তর ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই সব বঙ্গীয় শিকারিদের ভূমিকা, অবস্থান ও প্রাসঙ্গিকতাকেও তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করতে চেয়েছেন। এখানে তাঁর আলোচনার মূল ভিত্তি বাঙালি শিকারিদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ শিকার-কথা বা স্মৃতি-আলেখ্যগুলি।

উপরোক্ত এই সব বই ও গবেষণাকর্মগুলি ভারতে শিকার ও সংরক্ষণ সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনাকে সুস্পষ্ট করে তুলতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে ঠিকই। কিন্তু আমাদের বর্তমান গবেষণাকর্মটি এগুলির থেকে অনেকটা আলাদা। ''বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় শিকার-সাহিত্য''—গবেষণা শিরোনামটিতেই সুস্পষ্ট যে আমাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলি; যেগুলির মধ্যে স্বয়ং শিকারির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ শিকারের সত্য কাহিনি, স্মৃতিকথা, ডায়েরি বা দিনলিপি যেমন আছে, তেমনি রয়েছে সাহিত্যিকদের লেখা শিকার-সাহিত্যগুলিও অর্থাৎ কল্প-শিকার কাহিনি বা শিকার-ফিকশনও।

বাঙালির শিকার বা বাঙালি শিকারিদের নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসচর্চা বা আলোচনায় আগ্রহীদের কাছে এই শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলি নেহাৎ-ই 'নাবালক'দের জন্য লেখা, এবং অনেক ক্ষেত্রেই 'কল্প-কাহিনি' হওয়ায় 'মনগড়া' 'অসত্য' 'অতিরঞ্জিত' হবার দায়ে হয়তো বর্জিত, উপেক্ষিত হতে পারে। কিন্তু বাংলা সাহিত্য

ও সংস্কৃতির ছাত্ররূপে আমাদের কাছে এই বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য সত্য ও কল্প উভয় শিকার-সাহিত্যগুলিই বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

শিকার-সাহিত্যগুলি সব বয়সি পাঠকের কাছে উপভোগ্য হলেও, সাধারণত তার উদ্দিষ্ট পাঠক— মূলত তরুণরাই। ইংরেজি, বাংলা যে কোনও ভাষার শিকার-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। বাংলা শিশুসাহিত্যের একটি অন্যতম ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যই হল—তা সুনির্দিষ্ট বয়ঃ অঙ্ক মেনে মেপে রচিত বা পরিবেশিত হয়নি। 'পরিণত বয়স্ক চিহ্নিত'-সাহিত্য ও 'অপরিণত বয়স্ক চিহ্নিত'-সাহিত্য—এ দুয়ের মধ্যেকার অলঙ্ঘনীয় ভেদাভেদ প্রাচীরটি বাংলা শিশুসাহিত্যের আঙিনায় অত্যন্ত ক্ষীণ, ভঙ্গুর। তাছাড়া বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলি নিজেদের 'Children Magazine'', 'Children Journal', 'ছেলেমেয়েদের পত্রিকা', 'শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র', 'Magazine for Young Readers', 'ছোটদের পত্রিকা' ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করলেও সেগুলির উদ্দিষ্ট পাঠক ছিল মূলত কিশোর-কিশোরীরা। নিতান্তই শিশু বা ছোট্ট খোকাখুকির বদলে এগুলিতে মূলত কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী নানা বিষয়ের প্রাধান্য দেখা যায়। ফলে এই পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত শিকার-সাহিত্যগুলি মূলত কিশোর বা সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যেই লেখা। তাই শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বলে এগুলিকে নিছকই খাটো করে দেখা অনুচিত। বড়োদের কাছেও এই শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলি অনায়াসে হয়ে উঠতে পারে উপভোগ্য।

বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে স্বয়ং শিকারিদের বাস্তব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ শিকার-কাহিনি যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি শিশুসাহিত্যে নিবেদিতপ্রাণ সাহিত্যিকরা তো বটেই, এমনকি বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাবান বহু সাহিত্যিকও এখানে শিকার-কেন্দ্রিক নানা গল্প-উপন্যাস-ধারাবাহিক-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি রচনা করেছেন, তাঁদের শক্তিশালী কলমে। ফলে এই কল্প-শিকার কাহিনিগুলিরও শৈল্পিক আবেদন, সাহিত্যিক মূল্য উপেক্ষা করা অসম্ভব। তাছাড়া আমরা জানি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত বা স্মৃতি আলেখ্যগুলিকেও সম্পূর্ণ 'প্রামাণিক সত্য' বলা যায় না। কারণ তার মধ্যেও জ্ঞানত বা সম্পূর্ণ অজানিত ভাবেই কাজ করে যায় ইতিবৃত্তকার বা স্মৃতিকথকের ব্যক্তিগত নির্মাণ কৌশল—তার দেখনভঙ্গি, জানা-শোনা নানা তথ্যের গ্রহণ-বর্জন প্রবণতা ইত্যাদি। তার উপর আখ্যানকাল ও রচনাকালের ব্যবধানেও যুক্ত হয় স্মৃতি-বিস্মৃতির খেলা। স্মৃতির ফাঁকগুলো ভরাট করে কল্পনা ও ধারণা। ফলে যুক্ত হয়ে যায় রচনাকারের বর্তমান কালের বা পরিণত বয়সের নানা চিন্তাভাবনা ধারণাও। তাই শিকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত বা স্মৃতি-আলেখ্যগুলোও ঠিক 'ইতিহাস' রূপে নয়, 'আখ্যান' রূপে পড়াই নিরাপদ। ঠিক তেমনি আবার শিকারের কল্প-কাহিনিগুলিতেও নানা মাত্রায় ধরা

আছে এক বিশেষ সময়ের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত বাঙালির শিকার ও শিকার-সাহিত্য সম্পর্কিত নানা ধ্যানধারণা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় অরণ্যে শিকার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ঘটেছে নানা নিয়মকানুন, নানা রদবদল। ঠিক তেমনি অরণ্য-অরণ্যপ্রাণী-শিকার-শিকারি-সংরক্ষণ নিয়ে বাঙালি মানসে গড়ে ওঠা ধারণাগুলোতেও এসেছে নানা ভাঙাগড়া। এই সত্য ও কল্প উভয় শিকার-সাহিত্যগুলোতেই তা প্রতিফলিত হয়েছে। তাই শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলির সাহিত্যিক মূল্যের পাশাপাশি শিকার-শিকারি-অরণ্য-অরণ্যপ্রাণী-সংরক্ষণ প্রসঙ্গে বাঙালি মননের ধাত বিচারেও এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের পূর্ববর্তী বিশিষ্ট সমালোচক, গবেষকদের (বুদ্ধদেব বসু, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, আশা গঙ্গোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু সেন, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখদের) লেখালেখি বা বইপত্রে বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলি নিয়ে কোনও আলোচনা আমরা পাইনি। তবে ভিক্টোরীয় যুগের বিভিন্ন জনপ্রিয় ইংরেজি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে গল্পের ছলে সাম্রাজ্যবাদের যে পাঠ দেওয়া হত, তারই অনুসরণ উপনিবেশ ও উপনিবেশোত্তর কালের বাংলা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলিতেও কীভাবে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে—সেটি বিশ্লেষণ করে আমাদের চিনিয়ে দেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য* (প্রথম প্রকাশ ১৯৯১, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ২০০৩) বইয়ের 'শাদা মানুষের দায় ও কালো মানুষের দায়িত্ব' অধ্যায়টিতে। উদ্‌ঘাটন করে তিনি দেখান উপনিবেশবাদী শাদা শাসকের চোখ দিয়ে পাওয়া অভিজ্ঞতা উপনিবেশবাসী বাংলা অ্যাডভেঞ্চার-লেখকদের চিন্তাচেতনাকেও গোচরে-অগোচরে এতটাই প্রভাবিত করে, গ্রস্ত করে রাখে যে তাঁদের কলমেও আফ্রিকা হয়ে দাঁড়ায় ভয়াল ভয়ঙ্কর হিংস্র অন্ধকার জগৎ; এবং আফ্রিকাবাসী বা বলা ভালো দূরবর্তী যে কোনও অন্য জাতি বা স্বজাতীয় নিম্নবর্গীয়রা মাত্রই হয়ে ওঠে নিঃসন্দেহে 'অসভ্য' 'জংলি' 'বর্বর' 'রাক্ষস' 'নরখাদক'। আর এই আলোচনার প্রসঙ্গেই ব্যালেন্টাইনের *দি গেরিলা হান্টার্স* অবলম্বনে লেখা খগেন্দ্রনাথ মিত্রের (শিকার-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি) *আফ্রিকার জঙ্গলের* কথা শিবাজী উল্লেখ করেছেন। মূলত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি নিয়েই তাঁর এই পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনা। পৃথকভাবে শিকার-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি নিয়ে তিনি কিছু বলেননি।

ভারতে শিকার আইনত নিষিদ্ধ হবার (১৯৭২ খ্রি.) পর আজ একবিংশ শতাব্দীতে বাংলা শিকার-সাহিত্য একটি বিলুপ্ত সাহিত্য-বর্গ। অথচ আজও শিকার-সাহিত্যের পাঠকপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি; ঘটেনি জনপ্রিয়তার কোনও ঘাটতি। তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ—অধুনালুপ্ত কোনও বাংলা শিকার-সাহিত্য বা শিকার-সাহিত্য সংকলনগ্রন্থ

পুনর্মুদ্রণের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিঃশেষ ও অল্পসময়ের মধ্যেই বারংবার নতুন সংস্করণ প্রকাশ।[৩] হারানো দিনের শিকার-সাহিত্যগুলিকে ঘিরে আজও রয়েছে বাঙালির অদ্ভুত নস্ট্যালজিয়া ও রোমাঞ্চ। কিন্তু তবুও বাংলা জনপ্রিয় সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা—গোয়েন্দা কাহিনি, অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি, কল্পবিজ্ঞান কাহিনি, ভূতের গল্প, ডাকাতের গল্প ইত্যাদি—নিয়ে নানা গবেষণাধর্মী কাজ হলেও বাংলা শিকার-সাহিত্যগুলি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাধর্মী কাজের একান্তই আকাল। তার উপর শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলি তো একেবারেই ব্রাত্য, উপেক্ষিত।

তাই এই অনাদৃত, অনালোচিত সাহিত্যবর্গটিই বর্তমানে আমাদের গবেষণার বিষয়। শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যের বহুমুখী বৈচিত্র্যকে দেখার ও বাঙালির শিকার-সাহিত্য চর্চার প্রয়াসটিকে ভালো ভাবে বোঝার জন্য আমরা দু-চারজন বাঙালি শিকারি বা শিকার-সাহিত্য লিখিয়ের রচনার বদলে বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখকদের লেখা শিকার-সাহিত্যগুলিকেই বর্তমান গবেষণার বিষয়রূপে বেছেছি। বিশ শতকের অসংখ্য বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকাগুলি অর্থাৎ *সন্দেশ* (১৯১৩ খ্রি.), *মৌচাক* (১৯২০খ্রি.), *শিশুসাথী* (১৯২২ খ্রি.), *রামধনু* (১৯২৭খ্রি.), *মাস পয়লা* (১৯২৯ খ্রি.) *রংমশাল* (১৯৩৭ খ্রি.), *শুকতারা* (১৯৪৭ খ্রি.), *কিশোর ভারতী* (১৯৬৮ খ্রি.) ও *আনন্দমেলা* (১৯৭৫ খ্রি.) এবং দেব সাহিত্য কুটীর ও শরৎ সাহিত্য ভবনের বার্ষিকীগুলি আমাদের গবেষণার আকর বা প্রাথমিক উৎস। বলাইবাহুল্য প্রকাশিত শিকার-সাহিত্যগুলি থেকে আলোচনার জন্য প্রতিনিধিস্থানীয় রচনাগুলি আমরা নির্বাচন করেছি। এখানে আরও একটা কথা বলে রাখা জরুরি, অনেক পত্রপত্রিকাই দুষ্প্রাপ্য ও অত্যন্ত জরাজীর্ণ হওয়ায় আমাদের কখনো-কখনো পত্রিকাপাঠের বদলে পুনর্মুদ্রিত পত্রিকা, নানা সংকলন গ্রন্থ, লেখকের বই থেকেও দরকারি রচনাটি উদ্ধার করে পড়তে হয়েছে। ফলে সেসব ক্ষেত্রে মূল পত্রিকাপাঠ ও পরবর্তী কালে পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থপাঠে কোনও পাঠান্তর থাকলেও তা আমরা দেখতে পারিনি।

শিশু-কিশোরদের জন্য শিকারের গল্প আমরা প্রথম পাই (যতদূর সম্ভব) *মুকুল* পত্রিকায় (১৮৯৫ খ্রি.)। আবার ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে শিকার ভারতে আইনত নিষিদ্ধ হবার পরও *সন্দেশ, শুকতারা, কিশোর ভারতী, আনন্দমেলা* ইত্যাদি পত্রপত্রিকার পাতায় নানা স্বাদ, বৈচিত্র্যের শিকার-সাহিত্য বা জঙ্গল-সাহিত্য প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এজন্য আমরা আমাদের গবেষণার সময়সীমাকে ১৯৭২ খ্রি. পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না করে সমস্ত বিশ শতককেই ধরেছি। ফলে সময়ের সুতীব্র দাবিতে শিকার-সাহিত্যবর্গটিতে কী ধরনের রদবদল অপরিহার্য হয়ে উঠেছে তাও আমাদের বিচার্য হয়েছে।

এই সন্দর্ভে আমাদের মুখ্য জিজ্ঞাসা : এক, বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর

পত্রপত্রিকায় শিকার-সাহিত্যবর্গটির এত প্রাচুর্য ও জনপ্রিয়তা কেন? এর পেছনে কি ক্রিয়াশীল সময়ের প্রবর্তনা? দেশ-কাল-সমাজের প্রভাব?

দুই, বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় শিকার-সাহিত্য ধারাটির উদ্ভব, বিকাশ ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার বিবর্তনের অভিমুখটি কীরূপ?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে শিশু-কিশোরপাঠ্য এই শিকার-সাহিত্য বর্গটির স্বরূপ-বৈচিত্র্য-ব্যাপ্তি, তার মুখ্য প্রবণতাগুলি, তার ভয়-উত্তেজনা-রোমাঞ্চ শিহরণ মিশ্রিত আবেদন, বাঙালি স্মৃতিতে তার অনিমেষ স্থিতি—নিয়েও এখানে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

আলোচনার সুবিধার্থে গবেষণা সন্দর্ভটিকে মোট সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি।

ভারতে শিকারের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। আছে ভারতীয় সুসমৃদ্ধ শিকার-সংস্কৃতিও। তাই সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে সুপ্রাচীন কাল থেকে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে শিকার আইনত নিষিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত ভারতে শিকারের সুদীর্ঘ ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত রূপরেখাকে হাজির করা হয়েছে। প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বের বিলাস-ব্যসন মৃগয়া বা শিকার ঔপনিবেশিক পর্বে এসে কীভাবে হয়ে ওঠে বহুমাত্রিক সংস্কৃতি, কীভাবে শিকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় উপনিবেশের প্রভু ও উপনিবেশবাসী উভয়েরই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক নানা গূঢ় ঈপ্সা—তাও এই অধ্যায়ে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই প্রাগাধুনিক ভারতীয় বা বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত শিকার প্রসঙ্গগুলির স্বরূপ ও তাৎপর্যকে খতিয়ে দেখা হয়েছে। এতে ভারতীয় বা বঙ্গীয় সমাজে শিকার সম্পর্কিত ধ্যানধারণাগুলির যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি বাংলা আধুনিক শিকার-সাহিত্যের পূর্ববর্তী পরম্পরা সম্পর্কেও হদিশ মেলে। তবে আধুনিক বাংলা শিকার-সাহিত্য বলতে আমরা শিকার অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক যে স্বতন্ত্র সাহিত্যবর্গটিকে বুঝি তা মূলত ঔপনিবেশিকতারই ফসল। কোন্ আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাঙালি শিকার ও শিকার-সাহিত্য সম্পর্কে প্রবল আগ্রহী হয়ে ওঠে, শুধু তাই নয় নিজেরাও শিকার-সাহিত্য রচনাতে এমনকি শিশু-কিশোরদের জন্যও শিকার-সাহিত্য রচনাতে আগ্রহী হয়? এর পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল কীসের প্রেরণা? কোন্ অভিঘাত? — তা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে এখানে।

বিশ শতকের এক বিশেষ কালপর্বে উদ্ভূত এই জনপ্রিয় শিকার-সাহিত্যবর্গটিতে দেশ-কাল-সমাজের প্রভাব, বাঙালির এষণাগুলি বিশেষত বাঙালির জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার নানা টানাপোড়েনগুলি কীভাবে ধরা পড়েছে—তা খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ে দেখা হয়েছে বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য এই শিকার-সাহিত্যগুলিতে মেয়েদের ভূমিকাকে। শিকার 'পুরুষালি' ক্রিয়া বলে মেয়েরা কি এখানে সম্পূর্ণ গরহাজির? না, কদাচিৎ উপস্থিত থাকলেও তাদের ভূমিকা নেহাৎই 'গৌণ' কিংবা 'victim' রূপে?

নাকি তারাও হাজির হয়েছে বিশেষ কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়?—অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলির বিষয় বৈচিত্র্য আমাদের পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য। স্থলজ ও জলজ যেসব প্রাণীর অসংখ্য শিকার কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি রচনার কারণ, উদ্দেশ্য ও তাতে উঠে আসা প্রবণতাগুলি এ অধ্যায়ে আমাদের বিশ্লেষণ ও আলোচনার চৌহদ্দির মধ্যে এসেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা নজর দিতে চেয়েছি শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলিতে উঠে আসা নানা উপাদান-উপকরণগুলিতে—বন্য পশুপাখি-গাছপালার বর্ণনা, শিকারির চাকরবাকর, অরণ্যলগ্ন মানুষ ও তাদের শিকারপদ্ধতি-জীবন সংগ্রাম-সংস্কার কুসংস্কার-অরণ্য জ্ঞানের কথায়। সেইসঙ্গে বারেবারে উঠে আসা মুখ্য ভাব প্রবণতাগুলিও (বন্ধুত্ব, শিকারির মন পরিবর্তন বা আত্মসমালোচনা ইত্যাদি) আমাদের বিচার্য হয়েছে। এইসব উপাদান ও মুখ্য প্রবণতাগুলিকে, তাদের উপস্থাপন কৌশলকে বিশ্লেষণ করে আমরা এই অধ্যায়ে দেখতে চেয়েছি এগুলির মাধ্যমে শিশু-কিশোর শিকার-সাহিত্য লিখিয়েরা কীভাবে ভাবীপ্রজন্মের চৈতন্যকে নতুন করে গড়েপিঠে নিতে চাইছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে আমাদের বিষয় শিকার-সাহিত্যগুলিতে বিকল্প বয়ানের সন্ধান। এখানে প্রথমেই বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য এই শিকার-সাহিত্যগুলিতে শিকারির শিকার ক্রিয়ার চেয়েও কীভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে অরণ্যপ্রেম, অরণ্যানুভূতি, অরণ্যকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা। এরপর আমাদের বিচার্য হয়েছে শিকারকেন্দ্রিক হাসির গল্প বা ছদ্ম-শিকারের গল্পগুলি। এসেছে শিকার কাহিনির সঙ্গে গোয়েন্দা কাহিনি, অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি, কল্পবিজ্ঞান কাহিনির মিশ্রণে গড়ে ওঠা মিশ্র-সাহিত্য সংরূপের আলোচনাও। শিকার-সাহিত্যগুলিতে ক্রমশ সংরক্ষণের সুরটি কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, উঠে আসছে নানা তর্কবিতর্ক, জরুরি প্রশ্ন—তাও বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

গবেষণা সন্দর্ভটিকে আরও যথাযথ ও সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য আমাদের আলোচনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আনুষঙ্গিক কিছু চিত্রও (মূলত ইন্টারনেট ও আমাদের আলোচ্য পত্রপত্রিকাগুলির পাতা থেকে) হাজির করা হয়েছে। শিশু-কিশোর সাহিত্য মাত্রই ছবি ও অলংকরণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বহু না বলা কথা, বহুমাত্রিক নানা ব্যঞ্জনা আজও ধরা আছে দুষ্প্রাপ্য, জরাজীর্ণ বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকার এইসব শিকার-সাহিত্যগুলির সঙ্গে প্রকাশিত মনোগ্রাহী ও রোমাঞ্চকর বিভিন্ন চিত্র, অলঙ্করণে। তার কিছু নমুনা আমাদের গবেষণা সন্দর্ভটিতে তুলে আনা হয়েছে।

বাংলা শিকার-সাহিত্যবর্গটি আজ যেমন একটি বিলুপ্ত সাহিত্যবর্গ তেমনি বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিও যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে দ্রুত এগিয়ে চলেছে

বিলুপ্তির পথে। তাই বাঙালির শিকার ও শিকার-সাহিত্য চর্চার প্রয়াসটিকে বুঝতে আমরা পরিশিষ্টে উনিশ-বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত শিকার-সাহিত্য (বা অরণ্যকেন্দ্রিক সাহিত্যের) একটি কালানুক্রমিক তালিকা নির্মাণেরও চেষ্টা করেছি। এই তালিকাটি বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলির বৈচিত্র্য ও বিবর্তনের-অভিমুখটি বুঝতেও সহায়ক হবে।

গ্রন্থপঞ্জি ও টীকার ক্ষেত্রে Chicago Manual of Style 16th Edition: Notes-Bibliography Style অনুসরণ করেছি। সন্দর্ভটির বানানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বানান বিধি মেনে চলার চেষ্টা করা হয়েছে; তবে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

আমার এই গবেষণা যদি এ বিষয়ে পরবর্তী গবেষণা বা আলোচনার পথকে সামান্যতমও প্রশস্ত করে তাহলেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক।

তথ্যসূত্র :

১. বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ, *সাহিত্যচর্চা বাংলা ক দ্বাদশ শ্রেণি* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, ২০১৭), ২৪-২৫।

২. পশু ব্যবসায়ীদের আনা বাঘ ও চিতাবাঘ বেরিয়ে যাবার দুর্ঘটনা ঘটে। 'নিউ মার্কেটে বাঘ', 'পার্ক সার্কাস অঞ্চলে চিতা বাঘ নিহত', 'বেলঘরিয়ায় কুমিরের উপদ্রব ও এস কে ঘোষের কুমির শিকার', 'চিড়িয়াখানা থেকে বাঁদরের মহানিষ্ক্রমণ ও আক্রমণে একজনের মৃত্যুর মর্মান্তিক কাহিনী' —১৯৫০ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এই খবরগুলির জন্য দ্রষ্টব্য *সাত দশক সমকাল ও আনন্দবাজার* (কলকাতা : আনন্দ, ২০১৩), ৬৩।

৩. বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *বিখ্যাত শিকার কাহিনী* (১৯৬৩ খ্রি.) — অধুনালুপ্ত এই সংকলনটির সঙ্গে আরও কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য শিকার কাহিনি, তথ্যপঞ্জি ও অলংকরণ যুক্ত করে বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে বুক ফার্ম থেকে প্রকাশিত হয় *বাঙালির দুষ্প্রাপ্য শিকার অভিযান।* প্রকাশের প্রথম মাসেই প্রথম সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই প্রকাশিত হয়। আজ একবিংশ শতাব্দীতেও বাঙালি পাঠক সমাজে শিকার-সাহিত্যগুলির জনপ্রিয়তা অটুট। ফলে যথেষ্ট বাজার চাহিদা থাকায় বিখ্যাত ইংরেজি শিকার-সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ যেমন আজও প্রকাশিত বা পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে তেমনি অধুনালুপ্ত বাংলা শিকার-সহিত্য গ্রন্থ বা শিকার-সাহিত্য সংকলন গ্রন্থগুলিও পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ উভয় বাংলা বইপত্রের জগতেই একের পর এক পুনঃপ্রকাশিত হতে দেখা যাচ্ছে। যেমন— মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের *কোচবিহার ডুয়ার্স ও আসামে শিকারের সাঁইত্রিশ বছর* (অনুবাদ. অনিরুদ্ধ পালিত, কলকাতা : পার্চমেন্ট, ২০২০), কুমুদনাথ চৌধুরী দেবশর্মার *ঝিলে জঙ্গলে শিকার* (অনুবাদ. প্রিয়ম্বদা দেবী, কলকাতা : পার্চমেন্ট, ২০১৮), মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্যর *শিকার কাহিনি* (বাংলাদেশ : নটিলাস প্রকাশনী, ২০২৩), বিজয়কান্ত সেনের *আমার শিকার স্মৃতি* (কলকাতা : বিচিত্রপত্র, ২০২৩), গৌরব বিশ্বাস সম্পাদিত *বাঙালির শিকার স্মৃতি* (কলকাতা : সুপ্রকাশ, ২০২৩) ইত্যাদি।

প্রথম অধ্যায়

ভারতে শিকারের ইতিহাস, ইতিহাসে শিকার প্রসঙ্গ

আদিকাল থেকেই মানুষ বাঁচার তাগিদে অর্থাৎ আত্মরক্ষা ও খাদ্যের জন্য জীবজন্তু বধ বা শিকার করে আসছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত গুহাচিত্র, হাতিয়ার, বন্যপ্রাণীর খুলি, হাড় ইত্যাদির ভিত্তিতে বিজ্ঞানীদের মারফত প্রাচীন মানুষের রোমহর্ষক নানা শিকারের কথা আজ আমাদের জানা।[১] মানুষের খাদ্যোৎপাদক হয়ে ওঠা বা কৃষিনির্ভর জীবন যাপনের পূর্বে শিকারই ছিল জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণের অন্যতম মুখ্য উপায়। ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপের লিয়াংবুলু গুহাচিত্রে (আনুমানিক ৪৩৯০০ বছরের পুরনো) [চিত্র ১] ও ফ্রান্সের লাসকাক্স গুহাচিত্রে (আনুমানিক ১৭০০০-১৯০০০ বছরের পুরনো) [চিত্র ২] অতিপ্রাচীন শিকার-চিত্রের নিদর্শন মেলে। ভারতের মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকার (১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত) গুহাচিত্রগুলিতেও রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক সময়ের প্রাচীন প্রস্তর যুগ, মধ্য প্রস্তর যুগ থেকে ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যযুগ তথা ব্রোঞ্জ যুগ পর্যন্ত নানা শিকার চিত্র [চিত্র ৩]। ভীমবেটকার গুহাচিত্রগুলিতে বাইসন, বাঘ, গন্ডার, হাতি, বরাশিঙা হরিণ, ময়ূর, সাপ ইত্যাদি পশুপাখির চিত্র থেকে সেইসব সময়ের পশুপাখির অস্তিত্ব যেমন জানা যায়, তেমনি ক্রমশ উন্নত শিকার অস্ত্র (ছুঁচলো লাঠি, বর্শা, ধনুর্বাণ, তির, তরোয়াল, ঢাল) সহযোগে মানুষের পশুশিকারের চিত্রগুলি থেকে ধারাবাহিক শিকার-সংস্কৃতির পরিচয় মেলে।[২] শিকার দৃশ্য অঙ্কনের পেছনে গুহাবাসী মানুষের শিকার সাফল্যের আশায় জাদুবিদ্যার আশ্রয়ের সম্ভাবনা থাকতে পারে। সরাইনহর রাই, মহাদহার সমাধি, নর্মদা উপত্যকার আদমগড়, রাজস্থানের বাগোড়, উত্তরপ্রদেশের বেলান উপত্যকার মহাগড়া ও কোলদিহাওয়া প্রভৃতি স্থান থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন বন্য ও পালিত পশুর অস্থি, অস্থিতে আঘাত বা নিধনের চিহ্ন, পাথর ও হাড়ের তৈরি আয়ুধ—মানুষের শিকার নির্ভরতা থেকে ক্রমশ পশুপালন নির্ভর সমাজে রূপান্তরের সাক্ষ্য বহন করে।[৩] ক্রমশ গৃহপালিত পশুর সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, শিকারে নিহত পশুর সংখ্যা কমতে থাকে।

হরপ্পা সভ্যতা (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০০ - খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০) মূলত কৃষিভিত্তিক হলেও সিলমোহর ও মাটি-পাথর-ধাতব ভাস্কর্যে গৃহপালিত পশু (বৃষ, মহিষ, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি)-র পাশাপাশি বাঘ, হাতি, গন্ডারের উপস্থিতি থেকে বোঝা যায়,

হরপ্পাবাসী এইসব বন্যজন্তুর সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিল এবং শিকারও প্রচলিত ছিল। কোনো কোনো সিলমোহরে উৎকীর্ণ রয়েছে মানুষ ও পশুর সংগ্রাম দৃশ্য। একটি সিলমোহরে যেমন একজন পুরুষকে এক জোড়া বাঘের সঙ্গে যুদ্ধরত দেখা যায় [চিত্র ৪], তেমনি আবার আরেকটি সিলমোহরে পাওয়া যায় বৃষের ন্যায় পুচ্ছযুক্ত দ্বিপদ এক মনুষ্যমূর্তি (অনেকটা মেসোপটেমিয় মহাকাব্য *গিলগামেশের* এনকিডুর মতো মূর্তি) ও বাঘের লড়াইয়ের দৃশ্য [চিত্র ৫]। আবার বহু সিলমোহরে প্রাপ্ত বৃষ, একশৃঙ্গী চতুষ্পদ (কাল্পনিক Unicorn), বৃক্ষ বিশেষত অশ্বত্থ গাছ ও পাতার প্রতিকৃতি, একটি সিলমোহরে খোদিত শৃঙ্গযুক্ত বাঘের উপর সশৃঙ্গ নারী মূর্তি কিংবা মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত একটি সিলমোহরে জোড়াসনে উপবিষ্ট তিন মুখ বিশিষ্ট পুরুষমূর্তির (যা 'পশুপতি' রূপে বহু আলোচিত) চারপাশে নানা বন্যপ্রাণীদের উপস্থিতি—দেখে বোঝা যায় হরপ্পাবাসীর ধর্মীয় ধ্যানধারণায় বিভিন্ন প্রাণীর উপাসনা ও বৃক্ষপূজারও বিশেষ তাৎপর্য ছিল [চিত্র ৬]। কুকুরকে শিকার সহযোগী রূপে ব্যবহারের নিদর্শন মেলে হরপ্পা সভ্যতারই সমকালে কাশ্মীরের বুরজাহোমে। হরপ্পা সভ্যতার তাম্র-প্রস্তর সংস্কৃতির সমকালেই কিন্তু বুরজাহোমে তখনও নব্য-প্রস্তর সংস্কৃতি বজায় ছিল; এবং বাসিন্দারা ছিল মূলত পশুপালক, সেই সঙ্গে শিকারিও। একটি প্রস্তরখণ্ডে চিত্রিত দুই শিকারির বর্শা ও তির ধনুক নিয়ে হরিণ শিকারের দৃশ্যে শিকার-সঙ্গী রূপে কুকুরের উপস্থিতি দেখা যায় [চিত্র ৭]।

নগরাশ্রয়ী হরপ্পা সভ্যতার বাড়িঘর অনেকটাই পাকা ইটে তৈরি হওয়ায় অনুমান করা যায়, ইট পোড়ানোর জন্য জ্বালানি কাঠের প্রয়োজনে বন ছেদন স্বাভাবিক ছিল। ঠিক তেমনি পরবর্তী বৈদিক যুগেও পাঞ্জাব থেকে গাঙ্গেয় অববাহিকায় কৃষিপ্রধান বসতি প্রতিষ্ঠিত হয় সম্ভবত অরণ্য পরিষ্কার করেই। *শতপথ ব্রাহ্মণের* বিদেঘ মাঠবের পবিত্র অগ্নি হাতে সরস্বতী তীর—হরিয়ানা অঞ্চল—থেকে উত্তর বিহারের বিদেহ পর্যন্ত যাত্রার কাহিনিতে সম্ভবত অগ্নি সংযোগে বন পুড়িয়ে বসতি বিস্তারের ব্যঞ্জনা আছে।[৪] বৈদিক যুগের শেষের দিকে (খ্রিস্টপূর্ব ৮০০-৭৫০-এ বা তারও কিছু পরে) সম্ভবত লোহার ('কৃষ্ণায়াস' বা 'শ্যামায়াস') নির্মিত কুড়ুল, কুঠারের ব্যবহারে ঘন অরণ্য ছেদনও সহজ হয়ে ওঠে।[৫] ফলে পশুচারণ, শিকার, যাযাবর বৃত্তির বদলে ক্রমশ কৃষিসমৃদ্ধ স্থায়ী সমাজের বিকাশ ঘটে। তবে **বৈদিক যুগে** (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ - খ্রিস্টপূর্ব ৬০০) খাদ্যের জন্য হরিণ শিকার ছিল নিয়মিত। এছাড়া যাগযজ্ঞে পশু উৎসর্গ করা হত। অশ্বমেধ যজ্ঞে ঘোড়া ছাড়াও যে ১৭টি পশু উৎসর্গ করা হত, তার মধ্যে ভয়াল

বন্যপ্রাণীও থাকত।[৬] ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে, বসন-অলংকারে পশুচর্ম, পশুপাখির দেহাংশ ব্যবহৃত হত। যজ্ঞকারী শাসক ব্যাঘ্রচর্মের উপর পদচারণা করলে স্পর্শের মাধ্যমে তিনি ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রম ও ক্ষমতার অধিকারী হবেন—এরূপ জাদুবিশ্বাসও প্রচলিত ছিল।[৭] আস্তে আস্তে শিকারের উদ্দেশ্য খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিনোদনও হয়ে উঠতে থাকে। শিকার বা মৃগয়া রাজা, অভিজাতদের কাছে বিলাস বিনোদন এবং নিম্ন বা প্রান্তিক মানুষের কাছে পেশা হয়ে উঠছে। *বাজসনেয়ী সংহিতা* (অধ্যায়-৩০)-এ ইষুকার (তির নির্মাতা), ধনুকার (ধনুক নির্মাতা), জ্যাকার (ধনুকের ছিলা প্রস্তুতকারী), চর্মন্ন (চর্মকার), হস্তিপ (হস্তীপালক), অশ্বপ (অশ্বপালক) ইত্যাদির সঙ্গে 'মৃগায়ুমন্তক' (ব্যাধ/শিকারি) পেশার উল্লেখ আছে।[৮] শিকারি, ব্যাধ বা পশুবধকারী বোঝাতে বৈদিক সাহিত্যে 'মৃগয়ু', 'মৃগাজীব', 'মৃগাবিৎ', 'মৃগবেধক', 'তরক্ষু', 'কিরাত' ইত্যাদি শব্দগুলি পাওয়া যায়। পরবর্তী *মনুস্মৃতি* বা *মনুসংহিতাতে* (বিবর্তনকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দ) 'কিরাত', 'নিষাদ', 'চণ্ডাল', 'সৈরিন্ধ্র', 'মেদ', 'অন্ধ্র', 'চুঞ্চু', 'মদ্গু', 'ক্ষত্তা', 'উগ্র', 'পুক্কস'-রা বিভিন্ন পশুপাখির বধকারী বা বধ-ব্যবসায়ী রূপে বর্ণিত হয়েছে;[৯] তবে তাদের বৃত্তি প্রায় একই রকম হলেও তাদের মধ্যে জাতিতত্ত্ব ও বর্ণসংকরতত্ত্বের নানা জটিলতা, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদাভেদ উল্লিখিত হয়েছে। পালি সাহিত্যে (রচনাকাল যোড়শ মহাজনপদের আমলে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক) চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার ভিত্তিতে সামাজিক স্তরভেদ না করে কুল, কম্ম (পেশা) ও সিপ্প (শিল্প/বৃত্তি)—এই তিনের নিরিখে সমাজকে 'উক্কট্‌ঠ' ও 'হীন' দুটি স্তরে ভাগ করা হলেও 'নিষাদ', 'পুক্কুস', 'চণ্ডালরা' স্থান পায় 'হীন' কুলে।[১০] *চরক ও সুশ্রুত সংহিতা* থেকে জানা যায়, সুস্বাস্থ্যের জন্য ও নানা ওষুধে বিভিন্ন পশুপাখির মাংস, দেহাংশ ব্যবহৃত হত। *মনুসংহিতাতে* পশুবধ ও বিভিন্ন পশুপাখির মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) অনুযায়ী নানা নিয়মকানুন বিধিবিধান নিষেধ যেমন উল্লেখ করা হচ্ছে, তেমনি পশুবধের বা শিকারের সঙ্গেও দোষ, পাপ-পুণ্যের ধারণা যুক্ত করা হচ্ছে। নির্বিচারে শিকারকে *মনুসংহিতা* স্বীকৃতি দেয়নি। স্পষ্টই বলা হচ্ছে, 'যজ্ঞাদি উপলক্ষ্য ব্যতীত যে পশু বধ করা হয়, সেই পশুর যত সংখ্যক লোম আছে, বৃথা পশুঘাতী মৃত্যুর পরে তত জন্মে মারিত হয়'(৫/৩৮) কিংবা 'যে নিজের সুখের ইচ্ছায় অহিংসক প্রাণীকে হিংসা করে, সে জীবৎ কালে ও মৃত্যুর পরে কোথাও সুখ পায় না।' (৫/৪৫)।[১১] এছাড়াও *মনুসংহিতা* পরিণামে ক্লেশজনক দশটি কামজ ব্যসনের ভিতরে সর্বাপেক্ষা কষ্টকর চারটির মধ্যেই 'মৃগয়া'কে স্থান

দিয়েছে— 'কামজ ব্যসনবর্গে মদ্যপান, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রী সম্ভোগ, মৃগয়া যথাক্রমে এই চারটিকে সর্বাপেক্ষা কষ্টকর জানবে' (৭/৫০)।[১২] সকল রাজাতে বিদ্যমান এই ব্যসনগুলির মধ্যে পূর্ব পূর্বটিকে গুরুতর ব্যসন বলে চিহ্নিত করেছে (৭/৫২) এবং রাজাদের এগুলি সযত্নে বর্জন করারও পরামর্শ দিয়েছে (৭/৪৫)। কেননা, কামজ ব্যসনে অত্যাসক্ত রাজা 'অর্থ' ও 'ধর্ম' থেকে বিচ্যুত হন (৭/৪৬)। আর ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি ক্রমে অধোগতিও প্রাপ্ত হয় (৭/৫৩)।

মৌর্যযুগে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ - খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫) বন, বনজ সম্পদ রাষ্ট্রের অধীন হয়। জীবজন্তু, চর্ম, কাঠ, বল্কল ইত্যাদিতে শুল্ক নির্দিষ্ট ছিল। *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে* 'বনরক্ষী', 'কুপাধ্যক্ষ' (বন সম্পদের অধিকারী অর্থাৎ বনরক্ষীদের সাহায্যে বিভিন্ন বনজ সম্পদ, পশুপাখি ও তাদের দেহাংশ সংগ্রহকারী এবং কুপ্য দ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারীদের সাহায্যকারী), 'সূনাধ্যক্ষ' (পশু বধ্যস্থানাধিকারিক বা শিকারোপযুক্ত প্রাণী ও অভয়ারণ্যের তত্ত্বাবধায়ক) পদ ও কার্যের নির্দেশ আছে।[১৩] বিনা অনুমতিতে বৃক্ষাদি ছেদন, অবধ্য বলে ঘোষিত প্রাণী, অভয়ারণ্য ও ঋষিদের তপোবনের প্রাণী, হস্তী অশ্ব বৃষ মৃগ সমুদ্রঘোটক মাছ তোতা হাঁস চক্রবাক চকোর ভৃঙ্গরাজ মত্তকোকিল ময়ূর ইত্যাদি যেসব প্রাণী রক্ষা করার জন্য রাজঘোষিত—তাদের হত্যা করলে 'সাহস' দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। আক্রমণ না করা পশুপাখি বধ করলে, রাজঘোষিত পশু বিদেশে পাচার করলে, কোনও পশুকে ক্লেশ দিয়ে হত্যা করলে যেমন নির্দিষ্ট পণ দণ্ড দিতে হত, তেমনি অরক্ষিত বনের ঘাতক পশু থেকে মৎস্য, পাখি, মৃগ হত্যা করলেও তার নির্দিষ্ট অংশ রাজদেয় রূপে নির্ধারিত ছিল। অরক্ষিত অরণ্য থেকে জীবন্ত পাখি, মৃগ ধরলে তার ১/৬ অংশ অভয়ারণ্যে ছেড়ে দিতে হত। বাচ্চা পশু, বীর্যসেচনকারী পশু, ধেনু হত্যা নিষিদ্ধ ছিল। মাতৃস্তন্যপায়ী, দাঁত নিষ্ক্রান্ত হয়নি এমন বাচ্চা হস্তী, ব্যাধিগ্রস্ত হস্তী, গর্ভিনী হস্তীনি ধরাও অনুচিত কর্ম ছিল। তবে কোনও বাঘ, সিংহ, জলজ প্রাণী, মৃগাদি অভয়ারণ্য থেকে বাইরে বেরিয়ে হিংস্র হয়ে উঠলে তা হত্যা বা বন্ধন অপরাধ বিবেচিত হত না।[১৪] গ্রীক বিবরণ ও *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র* অনুযায়ী পশুপালক, শিকারি গোষ্ঠীর মানুষরা কৃষিপ্রধান এলাকার সীমায় বাস করত ও প্রান্তীয় গোষ্ঠীর বেশি মর্যাদা পেত না। অশোকের ত্রয়োদশ গিরি অনুশাসনে আটবিক (অরণ্যবাসী)-দের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী কার্যত তাদের সামাজিক অবনয়নের পরিচায়ক।[১৫] 'মৃগয়া' বা 'শিকার'কে ব্যসন (বিষয়ানুরক্তি) রূপে চিহ্নিত করা হত। তবে পূর্বোক্ত মনু, আচার্য পিশুন প্রমুখের বক্তব্যের সঙ্গে সূক্ষ্ম পার্থক্য ছিল। পুরুষের কামজ চতুর্বর্গ ব্যসনের মধ্যে মৃগয়াতে 'হিংস্র জন্তু, দাবানল, পাদস্খলন, দিগভ্রম,

দস্যু, শত্রুপক্ষ, নানা ভয়, ক্ষুধা-তৃষ্ণাজনিত কষ্ট' থাকায় আচার্য পিশুন দ্যূতক্রীড়ার চেয়ে মৃগয়াকে ক্ষতিকারক বলেন।[১৬] কিন্তু কৌটিল্যের বিচারে মৃগয়াই শ্রেয়। কেননা, মৃগয়াতে ব্যায়ামের জন্য কফ পিত্তের নাশ, মেদঘাটতি, লক্ষ্যভেদ শিক্ষা ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয়।[১৭] বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম-ধ্যানধারণার প্রভাবে অহিংসার আদর্শ শিকারের উপরও পড়ে। এর উজ্জ্বল প্রতিফলন দেখা যায় প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বন্যপ্রাণী রক্ষার জন্য সম্রাট অশোকের (রাজত্বকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩-খ্রিস্টপূর্ব ২৩২) প্রচেষ্টায়। কলিঙ্গ যুদ্ধের (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৬০) ভয়াবহ ধ্বংসে অনুতপ্ত সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্মান্তরিত হন। মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ না করলেও, তিনি যথেচ্ছ পশুবধ, অতিরিক্ত রাজকীয় শিকার, বেপরোয়া ও অবৈধ শিকার, পশুবলি, যাগযজ্ঞে মাংস উৎসর্গ—নিষিদ্ধ জারি করেন। তাঁর পঞ্চম স্তম্ভ (দিল্লি-টোপরা স্তম্ভ) অনুশাসনে [চিত্র ৮] অবধ্য প্রাণীদের এক বিশাল তালিকা যেমন প্রদত্ত হয়, তেমনি কোন্ কোন্ দিন কী কী প্রাণী নির্দিষ্ট কত সংখ্যায় বধ করা যেতে পারে তারও বিশদ তালিকা ঘোষিত হয়। দেখে অবাক লাগে, টিয়া ময়না রাজহাঁস সজারু গন্ডার থেকে অদরকারি অভোজ্য সব চতুষ্পদ প্রাণীদের সঙ্গে বাদুড়, রানি পিঁপড়ে, মাছ, কচ্ছপরাও অবধ্য তালিকাভুক্ত। গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী স্ত্রী ছাগল-ভেড়া-শূকরী এবং স্তন্যপায়ী ৬ মাসের কমবয়সী প্রাণী—বধ, কুক্কুট খাসিকরণ, তুষ পোড়ানো, অপ্রয়োজনে ও বন্যপ্রাণ ধ্বংসে বনদাহন, এক জীবন্ত প্রাণীর আহার্যরূপে অন্য জীবন্ত প্রাণীর ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়।[১৮] অশোক স্তম্ভ ও স্তম্ভশীর্ষে সিংহ (রাজকীয় প্রতাপের স্বাক্ষর রূপে), হাতি, অশ্ব, বৃষ মূর্তির গুরুত্ব দেখা যায়। মানুষ ও পশুপাখির বিশ্রাম লাভের জন্য পথের ধারে ধারে বটগাছ রোপণ এবং জলপানের জন্য বহু জলছত্রও তিনি স্থাপন করেন। পৃথিবীর 'flora' ও 'fauna' জগতের ভারসাম্য বা ইকোসিস্টেম রক্ষার ক্ষেত্রে সে যুগে অশোকের সহৃদয় প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহেই প্রশংসনীয়।

গুপ্ত মুদ্রায় [চিত্র ৯] প্রাপ্ত শিকার চিত্রে গুপ্তরাজের পশু-মানুষ-পৃথিবীর উপর বিজয় কর্তৃত্ব/আধিপত্য ও প্রতিপক্ষকে নিয়ন্ত্রণের ব্যঞ্জনাই ধরা পড়ে। গুপ্তযুগ (আনুমানিক ২৮০-৫৫০ খ্রিস্টাব্দ) ও বিশেষত গুপ্তপরবর্তী যুগে অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে নিম্নগামী হওয়ায় ভূমি ও বনজ সম্পদের উপর চাপ বাড়ে। ফলে অরণ্য ও অরণ্য প্রাণীদের রক্ষার গুরুত্ব কমে যায়। তবে গবেষকদের (ইরফান হাবিব প্রমুখদের) মতে হর্ষবর্ধনের কালে কৃষি ও বনজসম্পদ যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল।[১৯] হিউয়েন সাঙের বিবরণে অন্ধ, চোল, মুণ্ডহের অরণ্য, কোসাম্বি ও কলিঙ্গের অরণ্যের বুনো

হাতিদের, মালয় পর্বতে প্রাপ্ত চন্দন কাঠ, কর্পূরের কথা আছে।[২০]

দিল্লির সুলতানী আমলে (১২০৬-১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বন পরিষ্কার করে কৃষিজমি নির্মাণের, বসতি বিস্তারের ও বনের কাঠ (ঘরবাড়ি, সেতু, নৌকাদি নির্মাণে), ফল, মাংস, জ্বালানি, গবাদি খাদ্য ইত্যাদি বনজ সম্পদের—চাহিদা বাড়ে। তাই এসময় থেকেই অভিজাতদের জন্য শিকার সংরক্ষণের ভাবনা শুরু হয়। কোনো কোনো অরণ্য শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত শিকারের জন্য সংরক্ষিত ঘোষিত হয়।[২১] ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩০৯-১৩৮৮ খ্রি.) চিতা ধরে প্রশিক্ষণ দিয়ে চিতা দ্বারা শিকার ধরার প্রথাটি নিজের শিকারে ব্যবহার করেন। অবশ্য ফিরোজ শাহেরও পূর্বে দ্বাদশ শতাব্দীতে কল্যাণীর (অধুনা কর্ণাটকের) চালুক্য-রাজ তৃতীয় সোমেশ্বর রচিত *মানসোল্লাস* বা *অভিলষিতার্থ চিন্তামণি* নামক বিশ্বকোষ ধরনের সংস্কৃত কাব্যটিতে প্রশিক্ষিত চিতাদের দ্বারা মৃগয়া ক্রীড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।[২২] ফিরোজ শাহের পরবর্তী কালে মোগলরা চিতা সহযোগে শিকারের এই পদ্ধতিটি ব্যাপক জনপ্রিয় করে তোলেন। সম্রাট আকবরের এক হাজার চিতা ('yuz') ছিল; জাহাঙ্গীরের আমলে বন্দিদশাতে চিতার প্রজনন সফলতা পায় (১৬১৩ খ্রি.); ঔরঙ্গজেবের কালে প্রদেশ কর্তৃপক্ষ ছাড়া কেউ চিতা ধরতে পারত না।

মোগল যুগে (১৫২৬-১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ) শিকার সম্রাটদের অতিপ্রিয় অবসর বিনোদন হয়ে ওঠে।[২৩] মোগল চিত্র, পর্যটকদের বিবরণ, ঐতিহাসিক লেখাপত্র থেকে মোগল সম্রাটদের প্রচুর সৈন্য-অমাত্য-অভিজাত ব্যক্তি-লোকজন-বিশাল তাঁবু-হাতি-ঘোড়া এমনকি হারেম সহ অত্যন্ত সাড়ম্বর রাজকীয় শিকার যাত্রার পরিচয় মেলে। মোগল পাকশালে প্রতিদিন ৩৫-৪০ রকম মাংস রান্না হত যার অনেকগুলি মূল্যবান বন্যপ্রাণীর (হরিণ, কোয়েল, তিতির ইত্যাদির) মাংসও। তবে নিছকই মাংসের জন্য কিংবা শুধুমাত্র অবসর বিনোদনের জন্য মোগলরা শিকার অনুষ্ঠানে উৎসাহী ছিলেন এমন নয়। শিকার ক্রীড়াটির সঙ্গে মোগলদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক জীবনও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সিংহ, বাঘ ইত্যাদি ভয়াল বন্যজন্তুর শিকার বিশেষত সিংহ শিকার হয়ে ওঠে মোগলদের শৌর্যবীর্য মর্যাদার প্রতীক। সম্রাটের অনুমতি ছাড়া অন্যদের সিংহ শিকার নিষিদ্ধ হয়। মোগল পতাকাতেও সিংহের প্রতিকৃতি স্থান পায় [চিত্র ১০]। যুদ্ধশিক্ষা, ওৎ পেতে থাকা লুকনো শত্রুর মোকাবিলায় পারদর্শিতা লাভ, অশ্বচালন শিক্ষা, নিশানা ভেদে দক্ষতা অর্জন ও শারীরিক শক্তি বৃদ্ধিতে শিকার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রাজকীয় শিকারে যোগ দিতে অভিজাত ও রাজরাজড়াদের আমন্ত্রণে যেমন

একদিকে সুসম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ থাকত, তেমনি তাদের সামনে প্রকৃতির অপ্রতিরোধ্য ভয়ানক প্রাণীকে দমন বা বশীভূত করার মাধ্যমে মোগল শাসকের পদমর্যাদা, ক্ষমতা, দম্ভ-অহঙ্কার জাহির করাও সম্ভব হত। শিকারের ছদ্ম আবরণে—বিশাল সশস্ত্র সৈন্য জমায়েত করে যাত্রা করাও যেত। কুমায়ুনের রুদ্রদেব যেমন বন্যজন্তুর রাজকীয় শিকারকে শত্রুনিধনেরই সমান বলেছেন (*Śyainikaśāstram*), তেমনি আবুল ফজলও জানিয়েছেন রাষ্ট্রের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানবৃদ্ধিতে মোগলদের শিকার যাত্রা ছিল গুরুত্বপূর্ণ (*আইন-ই-আকবরী*)। *বাবরনামা*তে বাবরের (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি.) এদেশে প্রথম দেখা পশুপাখি গাছপালা ফুলফলের নিখুঁত বর্ণনা যেমন আছে, তেমনি হিংস্র বুনো মোষ, গন্ডার শিকারের কথাও আছে। আকবরের (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.) ঘোড়ায় চেপে ও মাটিতে দাঁড়িয়ে তির, বর্শা দিয়ে সিংহ, বাঘ শিকারের ঘটনা *আকবরনামা*, *আইন-ই-আকবরী* থেকে জানা যায়। আকবরের আমলেই শিকারে বন্দুক ব্যবহার দেখা যায়। মোগল যুগে হাতি ও চিতা ধরাও বৃদ্ধি পায়। আকবর চিতা ধরার পদ্ধতিটি খানিক 'উন্নত' ও 'মানবিক' করেন। গর্তে পড়ে চিতাদের আঘাত না লাগার জন্য অগভীর গর্ত ও গর্ত থেকে পালাতে না পারার জন্য গর্তমুখে স্বয়ংক্রিয় দরজা পদ্ধতি (অনুরূপ ফাঁদ আফগানিস্তানে চালু ছিল) ব্যবহার করেন। চিতাদের প্রশিক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণে তিনি যেমন যত্নশীল ছিলেন তেমনি তাঁর আমলে সেরা শিকারি-চিতারা ('Citr Najaj', 'Samand Manik', 'Fatebaz') রাজকীয় সাজসজ্জা ও সম্মানও লাভ করত। শিকার অভিযানে গিয়ে ধর্মীয় বা ঐশ্বরিক উপলব্ধি (jazbaz) হওয়ায় আকবর শিকার স্থগিত রাখেন বলেও কথিত আছে। উদ্ভিদ, প্রাণী জগতের সঙ্গে সঙ্গে শিকারেও জাহাঙ্গীরের (১৫৬৯-১৬২৭ খ্রি.) প্রভূত আগ্রহ ছিল। রাজত্বের প্রথম বারো বছরেই জাহাঙ্গীর বাঘ, সিংহ, নীলগাই, হরিণ ইত্যাদি ১৭০০০ প্রাণী শিকার করেন। শিকার নিয়ে তাঁর কিছু কুসংস্কারও ছিল। রবি ও মঙ্গল বার তিনি সাধারণত বন্দুক দিয়ে শিকার করতেন না। একবার জাহাঙ্গীরকে খালি হাতে সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে রক্ষা করার জন্য রাজপুত অনুপ রাই 'সিংহদলন' খেতাব পান। ঘটনাটিতে মোগল ও রাজপুত সৌহার্দ্য সম্পর্কই প্রতিফলিত হয়। 'qamargha' পদ্ধতিতে জাহাঙ্গীরের নীলগাই শিকারের কথা পাওয়া যায়। মোগলরা মূলত শিকারে 'qamargha'ও 'shakhbandh' পদ্ধতি ব্যবহার করত। মোগল চিত্রগুলোতে দেখা যায় শিকারে শিকারি কুকুর ও চিতার মতো পোষা বাজ, ঈগলপাখি দিয়েও শিকার (falconry পদ্ধতি, আকবরের কালেই চালু হয়) করা হত। বার্নিয়ারের বিবরণানুযায়ী টোপ রূপে ব্যবহৃত পশুরা যাতে বেশিদূর যেতে না পারে এজন্য তাদের

আফিম খাওয়ানো হত। মোগলরা ভারতের রাজা, অভিজাত ও স্থানীয়দের মৃগয়া/শিকার পদ্ধতির সঙ্গে পারস্য-আফগানিস্তানের শিকার পদ্ধতির যেমন মিশ্রণ ঘটান তেমনি নতুন কিছু পদ্ধতির উদ্ভাবনও করেন। জাহাঙ্গীরের কাল থেকেই মৃত শিকারের ওজন, দৈর্ঘ্য, দাঁত, চামড়ার উৎকর্ষ পরীক্ষা করে বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন রূপে রেকর্ড রাখা মোগলদের প্রথা হয়ে ওঠে। এছাড়া মোগল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পীরা চিত্রে শিকারের ঘটনাগুলি [চিত্র ১১, ১২, ১৪-১৯] খুঁটিনাটি সহ ধরে রাখার চেষ্টা করতেন। সম্রাটকে দুষ্প্রাপ্য বা বিদেশি প্রাণী (জেব্রা, আফ্রিকান হাতি, ডোডো, টার্কি, 'জানোয়ার-ই-শিকার'/animal for chasing) উপহার ('পেশকাশ') দেওয়ার চল ছিল। বিভিন্ন 'সুবায়' (প্রদেশে) মোগলদের রাজকীয় শিকার ক্ষেত্র ছিল। স্থানীয়রা সেখানে বা আশেপাশে হরিণ বা ছোটোখাটো শিকার করতে পারত। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ছিল। মোগল মেয়েরাও শিকারে অংশগ্রহণ করত। জাহাঙ্গীরপত্নী নূরজাহান শুধু স্বামীর শিকারসঙ্গীই হতেন না, সাহসিকতা ও শিকারে লক্ষ্যভেদে তাঁর খ্যাতি ছিল। এক শিকারে ছয়টি বুলেটে তিনি চারটি সিংহ শিকার করেন। ১৭ শতকে শাহজাহানের 'খুসবান', 'খুরবান' বন্দুকে শিকারের বর্ণনা মেলে (*পাদশাহনামা*)। শাহজাহান (১৫৯২-১৬৬৬ খ্রি.), ঔরঙ্গজেব (১৬১৮-১৭০৭ খ্রি.) প্রধান বা মীর-শিকারি ও তার অধীনস্থ অভিজ্ঞ স্থানীয় শিকারি, বিটার প্রমুখদের নিয়ে তৈরি বিশাল শিকারদল সহ হাতি ঘোড়ায় চেপে নানা পশুপাখি শিকার করতেন। শাহজাহানের দাক্ষিণাত্যে সিংহ শিকারের কালে সিংহদের কোণঠাসা করে তোলার কাজে যোগ দিতে কৃষকদের চাপ দেওয়া হয়। শিকার প্রাণীটিকে ফাঁদে ফেলতে প্রলুব্ধকারী প্রাণী বা কুনকি (decoy animal) ব্যবহার (যেমন— হরিণ দিয়ে হরিণ ধরা) দেখা যায় দারা শিকোহর (১৬১৫-১৬৫৯ খ্রি.) শিকারে।[২৪] মোগলদের কাছে সিংহ শিকার কতটা গভীর তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে তার প্রমাণ মেলে—পুত্র সুলতান মুয়াজজমের আনুগত্য ও সাহস পরীক্ষার জন্য ঔরঙ্গজেবের তাকে জাল ছাড়া সিংহ শিকারের আদেশ দানের ঘটনায়। সিংহ শিকারের সফলতা ব্যর্থতাকে শুভাশুভের ভাবী ইঙ্গিতবাহীও মনে করা হত। বার্নিয়ার ঔরঙ্গজেবের একবার সিংহ শিকারে ব্যর্থ হওয়াকে পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেবের নীতির অর্থাৎ মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনার ইঙ্গিতবাহী রূপে বর্ণনা করেছেন। ঔরঙ্গজেব পরে শিকারত্যাগ করেন। ছেলেকেও তার উপদেশ দেন। তবে তার শিকার ত্যাগের পেছনের যুক্তি ধর্মীয়—শিকার অলস লোকের কর্ম, ধর্মীয় বিষয় অবজ্ঞা করে এরকম পার্থিব বিষয়ে মগ্ন হওয়া খুবই নিন্দনীয়। মোগল আমলে বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যে বনজ সম্পদের (কাঠ, ফল,

বাকল, ভেষজ, রজন, তুঁত, রেশম ইত্যাদির) চাহিদা খুব বাড়ে।[২৫] মৌর্য আমলের মতো অরণ্য ও অরণ্য-প্রাণীরা রাজার পৃষ্ঠপোষকতা পায় না, তবু এসময় অরণ্য মোটামোটি নিয়ন্ত্রণে ছিল। কারণ ভূমি ও মানুষের অনুপাত অনুকূল থাকায়, বিস্তৃত অরণ্যকে কৃষিজমিতে রূপান্তর ততটা জোরালো হয়নি।[২৬]

বনজ সম্পদ ও নানা পশুপাখিতে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের অরণ্য **ব্রিটিশ যুগে** (১৮৫৮-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) ঔপনিবেশিক প্রভুদের অন্যতম আকর্ষণের বিষয় হয়ে ওঠে। আগ্রহের লক্ষ্য মূলত আর্থিক লাভ। ইউরোপের শিল্পের কাঁচামাল যোগানের অন্যতম উৎস তখন ভারত উপনিবেশ। বাণিজ্যিক রপ্তানি দ্রব্য রূপে কৃষি ও বনজ সম্পদের চাহিদাও ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। ব্রিটেনের রাজকীয় নৌবাহিনীর রণতরী নির্মাণ থেকে শুরু করে ভারতে রেলপথ পাতার কাজে, সেতু ও রেলের স্লিপার তৈরিতে, কয়লা চালিত বাষ্পীয় ইঞ্জিনের পূর্বে রেলগাড়ির জ্বালানি রূপে, সেনা ছাউনি-শৈল নিবাসগুলিতে ও নয়ামুদ্রণ যুগে কাগজ কলগুলোতে কাঠের (বিশেষত শাল, টিক, দেবদারুর) চাহিদা প্রভূত বেড়ে যায়। ফলে অরণ্য ও অরণ্যসম্পদ নিষ্কাশনের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস দেখা যায়।[২৭] এর সূচনা ঘটে ১৮৬৪ সালে সর্বভারতীয় স্তরে 'অরণ্য বিভাগ' স্থাপনে। শিথিলভাবে সংজ্ঞায়িত বন জঙ্গলময় এলাকাগুলি অরণ্য বিভাগ এবার 'অরণ্য' নামে চিহ্নিত করে এবং তাতে নিজের তথা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও উত্তরোত্তর বাড়াতে চায়। ১৮৬৫ সালে প্রণীত অরণ্য আইন ১৮৭৮ সালের আইনে আরও 'সুনির্দিষ্ট ও মাপা' হয়ে ওঠে। 'সংরক্ষিত' অরণ্যের ব্যবস্থাপনায় ও সম্পদে রাষ্ট্রের অধিকার একচ্ছত্র হয়। 'সুরক্ষিত' অরণ্যে স্থানীয়দের জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, পশুচারণ, অন্য সম্পদ আহরণে অনুমতি প্রদত্ত অধিকার বজায় থাকলেও বিশেষ বিশেষ গাছ কাটা নিষিদ্ধ হয়। সর্বোপরি 'সুরক্ষিত' অরণ্যকে 'সংরক্ষিত' অরণ্যে রূপান্তরের ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে থাকে। ফলে অচিরেই ব্রিটিশ ভারতের অরণ্য বিভাগটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ অরণ্য বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে এই উপমহাদেশের সবচেয়ে বড়ো ভূমি ব্যবস্থাপক সংস্থা হয়ে ওঠে। সংরক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক পন্থায় অরণ্যপালনের উদ্দেশ্যে অরণ্যবিভাগ, অরণ্য আইন গঠিত হলেও, ব্যবহারিক পরিণামে অর্থাৎ বাস্তবে দেখা যায় সংরক্ষণের চেয়ে মুনাফা বৃদ্ধিরই আসলে প্রাধান্য। অরণ্যবিভাগ ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ ভারতের মোট ভূমি এলাকার পাঁচ ভাগের এক ভাগে নিয়ন্ত্রণ জারি করে। বেআইনি ভাবে গাছ কোপানো, কাঠ কাটা, ফলমূল ভেষজ ইত্যাদি বনজ সম্পদ সংগ্রহ, কাঠ ছাড়া অন্যান্য (নন টিম্বার) গৌণ উৎপাদন, ঝুম চাষ, শিকার—'অরণ্য অপরাধ' রূপে চিহ্নিত করে নিষিদ্ধ হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির

কঠিন শাসনে খাবার কুড়নোও 'চুরি' বা 'ডাকাতি' বলে গণ্য হয়। অরণ্য আইনের ধাক্কায় অরণ্যচারী, যাযাবর, শিকারি, পশুচারক গোষ্ঠীগুলির জীবনধারণ, অবাধ চলাচল, লুটপাট ব্যাহত হচ্ছিলই, এখন সুনিয়মিত কৃষিজীবনে স্থিত হতে রাজি না হলে তাদের 'ভবঘুরে', 'আদিম', 'পশ্চাদপদ' রূপে এমনকি কয়েকটি বর্গকে পুরুষানুক্রমে অপরাধী উপজাতি বলেও দেগে দেওয়া হয়। ফলে এই সব কারণে অরণ্যনির্ভর উপজাতি, স্থানীয় শিকারি ও খাদ্য সংগ্রাহকগোষ্ঠীদের জীবনধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অরণ্যচারী বা পশুচারক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কৃষিজীবীদের পারস্পরিক যে সহজীবী (সিম্বায়োটিক) সম্পর্ক ছিল তা ভেঙে পড়ে। অরণ্য, চারণভূমি ও সুস্থিত কৃষিব্যবস্থার মধ্যেকার পারস্পরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। তবে সমাজের উপর দিকের কিছু গোষ্ঠী—দেশি রাজন্য, জমিদার, ধনী কৃষক, ধনী সর্দার-পশুপালক, ব্যাপারী, কুসীদজীবীরা—অরণ্য নির্ভর নতুন লাভের সুযোগ পায়। দেশি রাজন্য, জমিদাররা ব্যক্তিগত অরণ্যে অরণ্যবিভাগকে প্রবেশের অনুমতি বা কাঠ কাটার ইজারা দিয়ে অরণ্য রাজস্বের ভাগ বা মোটা টাকা পায়। তবে অরণ্য বিভাগের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করাও কিন্তু খুব সহজ সরল একরৈখিক ভাবে হয়নি; মাঝেমাঝেই নানা তর্কবিতর্ক, ক্ষোভ, প্রতিরোধ, বিদ্রোহ, সমঝোতা, ব্যর্থতার সম্মুখীনও হতে হয়। জমিদারির অন্তর্গত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জঙ্গলগুলোর ক্ষেত্রে এই জটিলতা ছিল আরও বেশি।

অন্যদিকে আবার রাজস্ব বৃদ্ধি, খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও কৃষিপণ্যের রপ্তানি উদ্বৃত্ত বাড়ানোর জন্য আবাদি কৃষি জমি প্রসারণের প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে বনজঙ্গল কাটা হতে থাকে। এছাড়া রেলপথ নির্মাণ, সড়কপথে যোগাযোগ বৃদ্ধি, বড়ো বড়ো শহর নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ, শৈলনিবাসগুলি গড়ে ওঠা, ব্যাপক পাট চাষ, চা কফি রবার বাগান তৈরি ইত্যাদি সভ্যতামুখী কর্মকাণ্ডগুলির সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য ও চারণভূমি ধ্বংসের প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত হয়।

এই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে শিকার এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে 'ভারতের ইকোলজির ইতিহাসে রাজকীয় মৃগয়া আর ঔপনিবেশিক শিকারের ঘটাপটা, কদর আর নিয়মকানুন নিয়ে একটা আস্ত উপবিষয়ই গড়ে উঠেছে।'[২৮] সাগর পারের সাহেবরা শিকার নামে কোনও নতুন ব্যাপার বা মতাদর্শ আমদানি করলেন, এমন না। কিন্তু তাদের বদান্যতায় শিকারের 'ব্যাপ্তি ও কার্যকারিতা' বহুগুণ গেল বেড়ে। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের বিলাস-ব্যসন 'শিকার' এর সঙ্গে এখন যুক্ত হল সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্রায়; জড়িয়ে গেল সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির নানা কূটকৌশল। ভারতীয় শিকার

ঐতিহ্যের সঙ্গে ইউরোপীয় শিকার ঐতিহ্যের মিশ্রণে গড়ে উঠল এক মিশ্র শিকার সংস্কৃতি। ব্রিটিশ রাজপুরুষ ও আর্মি অফিসারদের একঘেয়ে অবসর যাপনের মধ্যে অন্যতম প্রিয় বিনোদনক্রীড়া হয়ে উঠল শিকার। মাংস ছাড়াও শিকারে মূল্যবান চামড়া, দাঁত, শিং লাভ হত ঠিকই কিন্তু মুনাফা লাভের থেকে শিকারের আসল তাড়না ছিল 'এক বিরাট রকমের আমোদ'।[২৯] অনেক সময়ই নিষ্ঠুরভাবে নিরীহ পশুপাখিকে যথেচ্ছ বধ করে তারা পৌরুষের আত্মশ্লাঘা বোধ করতেন। সপ্তাহান্তে কলকাতার আশেপাশে মফস্‌সল-গ্রামাঞ্চলে, মীরাট-মথুরার জঙ্গলে, গঙ্গার শুষ্ক পাড়ে কিংবা দাক্ষিণাত্য ও নাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে তরুণ ব্রিটিশ অফিসারদের ঘোড়ায় চড়ে বর্শা দিয়ে বুনো শুয়োর-শিকার (Pig-sticking / Hog hunting) হয়ে উঠল অন্যতম জনপ্রিয় বিনোদন[৩০] ও 'finest sport'[৩১] / 'very first sport in the world'[৩২]। আর বাঘ শিকার ছিল অন্যতম পৌরুষোচিত 'dangerous sport'।

শিকারির বীরত্বকে বিশাল মহিমান্বিত করে চলত প্রচার। শিকারের মাধ্যমে বন্যপ্রাণ তথা প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব যেন ঔপনিবেশিক ভারতের উপরই প্রভুত্বের নামান্তর হয়ে উঠল। পূর্বেই আমরা দেখেছি, অরণ্যবিভাগ (১৮৬৪ খ্রি.), অরণ্য আইন (১৮৬৫ খ্রি., ১৮৭৮ খ্রি.) এর মাধ্যমে কীভাবে অরণ্যচারীগোষ্ঠী, স্থানীয় গ্রামবাসীদের অবাধে অরণ্যে প্রবেশ, শিকার ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়; অস্ত্র আইন (১৮৭৭ খ্রি.) অনুসারে নিরস্ত্রীকৃতও করা হয়। শিকার নিষিদ্ধকরণ বা পারমিট নিয়ে শিকারের অনুমতি ব্যবস্থার মাধ্যমে বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বদলে আসলে সাহেব ও তাদের অনুগ্রহপ্রাপ্ত দেশীয় রাজন্য অভিজাতবর্গের শিকার নামক 'ফূর্তি'টিকে একচেটিয়া করা হয়। প্রমাণ—ব্রিটিশ আমলে ভারতের চিতা, সিংহদের প্রায় বিলুপ্তি বা বাঘের দ্রুত সংখ্যা হ্রাস। ১৮৭৫-১৯২৫ খ্রি.—এই পঞ্চাশ বছরেই ৮০০০০ বাঘ, ১৫০০০০-এরও বেশি লেপার্ড ও ২০০০০০ নেকড়ে শিকারের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।[৩৩]

অরণ্যচারী গোষ্ঠী, স্থানীয় শিকারিদের শিকার ও অরণ্য অধিকার কেড়ে নেওয়া বা নিজভূম থেকে বিতাড়িত করা হলেও, সাহেবদের ভারতের অপরিচিত অরণ্যে শিকারে সফলতা লাভের জন্য এই স্থানীয়দেরই অরণ্য-অভিজ্ঞানের সহায়তার একান্ত প্রয়োজন হয়। ফলে ঔপনিবেশিক প্রভুরা তাদেরকে শিকারের 'ট্র্যাকার' ও 'বিটার' রূপে ব্যবহার করতেন; এমনকি জীবনের ঝুঁকি নিতেও তাদেরকে কখনো-কখনো বাধ্য করা হত; কিন্তু তাদের কৃতিত্বকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহেব ও দেশীয় অভিজাত শিকারিরা নির্দ্বিধায় উপেক্ষা করতেন। স্থানীয় গ্রামবাসীদেরও শিকার অভিযানে মালবাহক কুলি,

চাকর, বেগার খাটা, 'বর্দাইশ' বা বিনা পয়সায় খাদ্যের জোগানদার রূপে ইচ্ছেমত ব্যবহার করা হত। নেটিভদের 'মেয়েলি', 'দুর্বল' ভাবার ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিটি শিকারের ক্ষেত্রেও পুরোদস্তুর ক্রিয়াশীল। ফলে সাহেব শিকারিদের পৌরুষদীপ্ত অসাধারণ সাহসের বিপ্রতীপে দেশীয় শিকারিরা চিহ্নিত হত নেহাৎই 'মেয়েলি', 'ভীরু', 'কাপুরুষ'। তাই শিকার 'Sports'এর মান্যতা পেলেও এবং অন্যান্য 'Sports'-এর মতোই এই 'Blood Sports' টিরও রীতিনীতি (Protocols), আচরণবিধি, নিয়ম কানুনের বিকাশ ও বিবর্তন ঘটল; কিন্তু 'Sportsman'-এর মর্যাদা পেলেন শুধুমাত্র সাহেব শিকারিরা ও তাদের দাক্ষিণ্যধন্য সৌভাগ্যবান রাজন্য ক'জন। নেটিভ শিকারিরা 'Sportsmanship' বা 'fair play hunting'-এর অধিকারী হতে পারে না! তাদের ভাগ্যে জোটে 'Poachers' উপাধি। তবে ভারতে ব্রিটিশদের শিকার অভিজ্ঞতা ও শিকার-ক্রীড়ার প্রথম পর্বে অর্থাৎ কোম্পানির শাসনকালের তুলনায় পরবর্তী পর্বে বিশেষত সিপাহি বিদ্রোহের (১৮৫৭ খ্রি.) পর ব্রিটিশরাজ ক্ষমতাগ্রহণের পরবর্তীকালেই ইংরেজ শিকারিদের কাছে এই ঔপনিবেশিক আত্ম-অপর বিভাজন নীতিটি বা জাতিবৈষম্যগত উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টর ছকটি ক্রমশ বেশ প্রবল হয়ে ওঠে।[৩৪] ঔপনিবেশিক প্রভুদের ভাবনায় শিকারকে কেন্দ্র করে 'আমরা' 'ওরা' বিভাজন কতটা গভীর হয়ে উঠেছিল তার একটা আশ্চর্য দৃষ্টান্ত — 'ইলবার্ট বিল' (১৮৮৩ খ্রি.)-এর ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচারে ভারতীয় রাজকর্মচারীদের হাতে সীমিত ক্ষমতা দেবার প্রস্তাব নিয়ে বিতর্কেও সাহেবদের প্রদত্ত অদ্ভুত যুক্তি—ভারতীয় রাজকর্মচারীদের বিচার ক্ষমতা যথাযথ সঠিক না হবার সম্ভাবনা, কেননা তারা শিকার ক্রীড়ায় অনভ্যস্ত বা অদক্ষ।[৩৫]

শিকার ঔপনিবেশিক প্রভুদের অসাধারণ শক্তি, কর্তৃত্ব ও মর্যাদা প্রকাশের পরিচায়কও হয়ে ওঠে। খরগোশ, হরিণ, পাখি ইত্যাদি নিরীহ পশুপাখি শিকারের চেয়ে ক্রমে 'Big Game' অর্থাৎ বৃহৎ কিংবা হিংস্র, ভয়াল প্রাণীদের শিকার বেশি আগ্রহের হয়ে উঠল। জীবনের ঝুঁকি থাকায় 'Big Game' স্বাভাবিকভাবেই অধিক বীরত্ব, দুর্জয় সাহস ও পুরুষত্বের পরিচায়ক। এর মধ্যেও আবার সবচেয়ে বেশি বীরত্ব, বেপরোয়া দুঃসাহস ও মর্যাদার স্থান দখল করল নিঃসন্দেহেই বাঘ শিকার। জয়ের স্মৃতিচিহ্ন (মাথা, শিং, দাঁত, চামড়া) প্রদর্শনমূলক শিকার 'Trophy Hunting'-এর প্রাধান্য বাড়ে। শিকার অস্ত্রের ক্ষেত্রে যেমন ক্রমশ প্রযুক্তি উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রের আমদানি হচ্ছে তেমনি আশ্চর্যজনক বিকাশ ঘটছে 'Taxidermy' শিল্পেরও। ড্রয়িংরুমের শোপিস রূপে শিকারের স্মৃতি স্মারকগুলি হয়ে উঠছে শাসক শ্রেণির সংস্কৃতি ও আভিজাত্যের প্রকাশক।

অনেক সময় আবার অনিষ্টকারী পশুপাখি, বিষধর সাপ, আক্রমণাত্মক মানুষখেকো নিকেশের জন্য সরকারিভাবে নগদ পুরস্কার ঘোষণা করা হত।[৩৬] বাঘকে জঘন্য ক্ষতিকারক রূপে নির্মূলকরণে (vermin eradication) ঔপনিবেশিক সরকার সচেষ্ট হয়। ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনাপর্বে বাঘের আতঙ্ক ছিল প্রবল; তেমনি আবার উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমে ব্যাপক অরণ্যবিনষ্টি, জনবসতি বৃদ্ধি ও হরিণ, মহিষ, শুয়োর ইত্যাদি বন্য প্রাণীর মাত্রাতিরিক্ত শিকারের ফলে প্রাকৃতিক খাদ্যের খানিক অভাবেও সম্ভবত মানুষখেকো বাঘ বা মানুষের ধন প্রাণ গবাদি নষ্টকারী হিংস্র প্রাণীর আক্রমণের ঘটনাও বৃদ্ধি পায়।[৩৭] ফলে উপনিবেশের প্রজাদের সম্পত্তি ও প্রাণের নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের নিজেকে আদর্শ প্রজাবৎসল শাসক (Benevolent Patriarchy) রূপে প্রমাণের তাগিদ থাকত। কেননা প্রজাদের নিরাপত্তার আশ্বাস ও সুখী জীবনের স্বস্তি দিয়ে নৈতিকভাবে তাদের মন জয় করে অনুরাগ, আনুগত্য লাভ করতে পারলে ব্রিটিশ উপনিবেশের ভিত দীর্ঘস্থায়ী হবে। শস্য ও গবাদি নষ্টকারী পশুপাখি সর্বোপরি অনেক দিন ধরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ত্রাস সৃষ্টিকারী মানুষখেকো বাঘ, চিতাদের সংহার করে বিপন্ন গ্রামবাসীদের রক্ষাকর্তা রূপে আবির্ভূত হলেন যে সাহেব শিকারিরা, অচিরেই তারা হয়ে উঠলেন প্রায় দেবতা বা কিংবদন্তির নায়ক (Super Hero)। ফলে ব্রিটিশ রাজশক্তির 'পিতৃসুলভ অভিভাবক', 'বিপন্নের ত্রাতা', 'প্রজামঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শাসক' ভাবমূর্তিগুলি জনমানসে গড়ে ওঠার সহায়ক হওয়ায় শিকার হয়ে উঠল উপনিবেশের প্রভুদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আগ্রহের বিষয়। শিকারের সঙ্গে ভেতরে ভেতরে যুক্ত হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী গূঢ় অভিপ্রায়। শিকার সফলতায় নিঃসন্দেহেই শিকারির গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেত। শিকারে দক্ষতা ও সাফল্য ব্রিটিশ অফিসারদের শুধু ভারতেই নয়, ইংল্যান্ডেও তাদের যশ-খ্যাতি-মান মর্যাদা বৃদ্ধি করে।[৩৮] তাদের ভারতে শিকারের স্মৃতিচিহ্নগুলি (বাঘের চামড়া, হাতির দাঁত, হরিণের মাথা ইত্যাদি), লেখা শিকার স্মৃতিকথা বা শিকার ন্যারেটিভগুলি, শিকারের প্রতিকৃতি (portraits) বা ফটো— ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডের শিক্ষিত মহলেও প্রবল উত্তেজনা ও গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি করে। আবার ভারতে 'Poor Whites' (গরীব সাহেব) বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান শিকারিদের ক্ষেত্রে, তাদের প্রতি ইউরোপীয়দের অবজ্ঞা দূর করার ও তাদের সামাজিক মান মর্যাদা সম্ভ্রম বৃদ্ধি করার জীবনব্যাপী সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাটিও হয়তো অনেক সময় সচেতন বা অসচেতন ভাবে তাদের শিকার কৃতিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকত।[৩৯]

ব্রিটিশ সিভিলিয়ান ও আর্মি অফিসারদের কাছে শিকার-ক্রীড়ার ছিল

উপযোগবাদী (utilitarian) উদ্দেশ্য। ব্রিটিশ তরুণ প্রজন্মকে বিশেষত সেনাদের শরীর সক্রিয় (fit) রাখা, গুলির নিশানায় (Shooting) দক্ষতা বৃদ্ধি, চরিত্র গঠন, দাঙ্গা বিদ্রোহ দমনের পারদর্শিতা লাভের জন্য অন্যতম জরুরি কর্তব্যরূপে শিকার ক্রীড়া অনুশীলনে (exercise) উৎসাহিত করা হত। শিকার অভিযানের মাধ্যমে কোনও অঞ্চল ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে খুব গভীর ভাবে খুঁটিনাটি জানা সম্ভব হয় বলে, জঙ্গলে ডাকাতের গোপন আস্তানা ভাঙা, ঠগী, পিণ্ডারিদের ধরা ও অপরাধ বিদ্রোহ দমন ইত্যাদি প্রশাসনিক কাজে সুবিধা হতে পারে বলে বিবেচিত হত। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের অরণ্যগুলোতে সেনারা ক্যাম্প করলে, গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং রূপে মিলিটারি দক্ষতা বৃদ্ধি ও একঘেয়ে সময় কাটাতে সেনারা শিকার অভ্যাস করত। ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ মহিলাদের পৌরুষোচিত শিকার অভিযানে উৎসাহী সঙ্গী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরকেও অনেক সময় শিকার করতে দেখা যায়।

শিকার অভিযানে ব্রিটিশ রাজপুরুষ, ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট, ফরেস্ট অফিসার, অভিজাত রাজন্যবর্গ প্রমুখের পারস্পরিক আমন্ত্রণে পারস্পরিক সৌহার্দ্য সম্পর্ক বাড়ার সম্ভাবনা থাকত। ব্রিটিশ রাজ বা রাজন্যদের [The Duke of Edinburgh (royal tour, 1868-69), The Prince of Wales (future King) Edward VII (1875-76), Prince of Wales (future King) George V & Princess Merry (1905-06, 1911-12)] ভারত সফরকালে রাজকীয় শিকার-পার্টির আয়োজন করা হত। উদ্দেশ্য ঔপনিবেশিক শাসকের একচ্ছত্র অধিকার ও কর্তৃত্বের প্রদর্শন। এর সঙ্গে অবশ্য ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকত ব্রিটিশরাজ ও ভারতীয় রাজন্যবর্গ উভয়েরই গূঢ় রাজনৈতিক ঈপ্সা ও প্রোপাগন্ডা। উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠত ক্ষমতা বা মর্যাদার সম্পর্কও। ব্রিটিশরাজের ভারত সফর কালে সঙ্গদানকারী ভারতীয় রাজন্যদের অনেককেই তাই পরবর্তীকালে দেখা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতে বা সহায়তা করতে।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমে এদেশীয় রাজরাজড়ারা নিজেরাও ব্রিটিশ রাজপুরুষ, ভাইসরয় প্রমুখদের জন্য রাজকীয় জাঁকজমকপূর্ণ শিকারের আয়োজন করতেন। মূল উদ্দেশ্য ব্রিটিশ রাজের অনুগ্রহ লাভ। সঙ্গে নিজেদের পূর্ববর্তী রাজকীয় জীবনশৈলী বজায় রাখা ও সাহস-আভিজাত্য-দর্প জানান দেওয়া। ব্রিটিশ রাজকে 'ভূখণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি' (Paramount power) রূপে মেনে নিয়ে নতিস্বীকার বা আত্মসমর্পণকালে ভারতীয় রাজরাজড়ারা যুদ্ধবিগ্রহ পরিহারেও চুক্তিবদ্ধ ছিলেন।[৪০] ফলে

ব্রিটিশ রাজের সেবা ছাড়া অন্যকারণে যুদ্ধ ময়দানে অস্ত্রধারণ থেকে বিরত হতে হওয়ায় এই সব রাজা নবাবরা অনেকেই হয়তো নিজেদের অস্ত্রদক্ষতা, যুদ্ধলিপ্সা, সময় ও প্রজাশ্রমকে প্রয়োগ করতে থাকেন বন ও বন্যপ্রাণীদের বিরুদ্ধে। তাদের কাছে তাই শিকার ও তাদের শিকারক্ষেত্রগুলি নতুন করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার ব্রিটিশ রাজের আনুগত্য স্বীকার ও কৃপা প্রার্থনায় বাধ্য হওয়া দেশীয় রাজন্য, নবাব, সম্ভ্রান্তরা নিজেদের ক্ষমতাহারা নিরুপায় অবস্থার গ্লানি ভুলে 'রাজকীয় ইগো'কে চাঙ্গা করে তুলতেও হয়তো কখনো-কখনো আশ্রয় নিতেন জাঁকালো শিকার আয়োজনের।[৪১] ফলে তাদের কাছে শিকার সেক্ষেত্রে হয়ে উঠত সাহস ও পৌরুষকে পুনরায় ঝালিয়ে নেবার প্রচেষ্টা, প্রাচুর্য ও ক্ষমতা প্রদর্শনের উৎসব। ভারতীয় রাজপরিবারগুলিতে অনেক সময় 'শিকার' বা 'শিকারের সাফল্য'কে সাবালকত্ব প্রাপ্তির ছাড়পত্র রূপে বিবেচনা করা হত। উদয়পুর, গোরিপুর, টঙ্কের মহারাজাদের, বিকানেরের মহারাজা সাদুল সিং-এর কিংবা সুরগুজার রাজা রামানুজসরণ সিং দেও-এর শিকার করা পশুপাখি, বাঘ ও চিতার সংখ্যা দেখলে নিঃসন্দেহেই আজকে বিস্মিত হতে হয়। অনেক সময়ই তাদের শিকারের ঝুলি ব্রিটিশদেরকেও ছাপিয়ে গেছে।[৪২] সাহেব ও দেশীয় রাজা, সম্ভ্রান্ত বাবুদের মধ্য থেকে উত্থান ঘটে একদল শিক্ষিত ভদ্রলোক (Gentleman) শিকারির। গড়ে ওঠে ভদ্রলোক শিকারিদের ক্লাব। শিকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত হতে থাকে শিকার-সাহিত্য। মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয় শিকার নিয়ে জার্নাল, পত্রিকা। বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতি, চিড়িয়াখানায় প্রদর্শন, সার্কাসের পশুপাখির খেলার জনপ্রিয়তার কারণেও বন্যপ্রাণীদের ধরা হত।

বিশ শতকের প্রথম থেকেই শিকার সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিগত বদল দেখা যেতে থাকে। জিম করবেটের মতো বিবেকবান শিকারিদের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা সুদক্ষ শিকারি হয়েও নির্বিচারে যথেচ্ছ শিকার বা নিছক আমোদের জন্য শিকারের পক্ষপাতী নন; উপদ্রুত, বিপন্ন মানুষকে পরিত্রাণের জন্য তাঁরা হিংস্র মানুষখেকোদের শিকারের কর্তব্য পালন করেন। মানুষখেকো বাঘ বা চিতা শিকারে বাধ্য হলেও কুখ্যাত প্রাণঘাতী প্রাণীটির প্রতিও তাঁদের সম্ভ্রম দেখা যায়। অরণ্য ও অরণ্যের আসল সৌন্দর্য বন্য প্রাণীগুলির প্রতি তাঁদের মুগ্ধতা, ভালোবাসা, সহমর্মিতার পরিচয় মেলে—যা পূর্ববর্তী উপনিবেশবাদী শিকারিদের থেকে অনেকটাই আলাদা। এঁরা ক্রমশ অরণ্যের প্রাণীজগতের সংরক্ষণের জন্যও সরব হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে বন্দুকের বদলে হাতে তুলে নেন ক্যামেরা।[৪৩] দেশীয় রাজন্যদেরও কেউ কেউ তাঁদের রাজ্যে বা ব্যক্তিগত অরণ্যে প্রাণী বিশেষত বিরল

প্রজাতির প্রাণীদের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। কচ্ছের রাও খেঙ্গারজি কানঠুটি পাখি (flamingo) [১৮৯০ খ্রি. থেকেই] ও মর্ভির ঠাকুররা পশ্চিম মরুভূমিতে বিরল বুনো গাধা [১৯৩০ খ্রি. থেকে] রক্ষার উদ্যোগ নেন। জুনাগড়ের নবাব তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত গির অরণ্যে এশিয়ার সিংহদের বিলুপ্তি রদ করতে ব্রিটিশ ভাইসরয়ের সাহায্যে সিংহ শিকার নিষিদ্ধ করেন। বিপন্ন প্রজাতি রূপে গন্ডারকে সংরক্ষণের জন্য স্ত্রী মেরি কার্জনের অনুরোধে লর্ড কার্জনের উদ্যোগে 'কাজিরাঙা প্রস্তাবিত সংরক্ষণ বনাঞ্চল' (১৯০৫ খ্রি.) গঠিত হয়। ১৯৩৮ সালে 'কাজিরাঙা অভয়ারণ্য'তে শিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ঔপনিবেশিক সরকারও ক্রমশ বোঝে শিকারে বিধিনিষেধ বা বিশেষত বাঘ ও Big Game-এর প্রাণীদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ভারতের অরণ্যগুলি আর বেশি দিন 'Trophy Game'-এর স্বর্গভূমি থাকবে না। আধুনিক বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আন্দোলন যথাযথভাবে শুরু হয় 'International Conference for the Protection of Nature' (Paris, 1931), 'International Conference of African Fauna' (London, 1933)-এর মাধ্যমে। ভারতেও এর প্রভাব পড়ে। পরিবেশবিদ, বিবেকবান বা মানবিক শিকারি, আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিতরা অরণ্য ও বন্যপ্রাণ রক্ষার জন্য সওয়াল করতে থাকেন। বন্য পাখিদের সংরক্ষণ ও শিকারের ক্ষেত্রে ১৯১২-এর আইন, ১৯৩৫-এর আইনেও এক রাখা হয়; যদিও বাস্তবে সমস্ত দেশে তা যথার্থ মানা হত না। ব্রিটিশ অফিসার Major Ramsay নৈনিতাল গাড়োয়াল অঞ্চলের অরণ্য রক্ষার জন্য উনিশ শতকে যে দাবি তোলেন, বিশ শতকের প্রথমে E.R. Stevans, E. A. Smythies পরিবেশবিদরা তাতে জাতীয় উদ্যানের পরামর্শ দিলে ব্রিটিশ সরকার তা 'Game Reserve' রূপে ঘোষণা করে। ত্রিশের দশকে জিম করবেটরা পুনরায় অরণ্য ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে সরকারের দারস্থ হন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সেখানে গড়ে ওঠে এশিয়ার প্রথম জাতীয় উদ্যান Hailey National Park (যা বর্তমানে 'জিম করবেট জাতীয় উদ্যান' নামে পরিচিত)।

স্বাধীনতার (১৯৪৭ খ্রি.) পর অরণ্যগুলি সবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেলে মূল্যবান গাছপালা, পশুপাখি ব্রিটিশ আমলে আর যা অবশিষ্ট ছিল তাও এবার দ্রুত নিঃশেষের দিকে অগ্রসর হয়। দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য বাসস্থানের চাহিদা মেটানো, উন্নয়ন প্রকল্প, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদির ফলে অরণ্য ও অরণ্যের পশুপাখিরা বিনষ্ট হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে মেশিনগান, জিপ সহজলভ্য হয়ে যাওয়ায় শহুরে শিকারি বাবুরা শিকার শখ মেটাতে জিপে চেপে, মেশিনগান রাইফেল স্পটলাইট

ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্রপাতি সহযোগে বন্যপ্রাণী নিধনযজ্ঞ তথা অরণ্যের ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে। শিকারের ethics পুরোপুরিই ভেঙে পড়ে। প্রাক্তন রাজরাজড়ারাও কাঠ ও শিকার ব্যবসায় (hunting trade) নেমে পড়েন। দেশি-বিদেশি সদস্য নিয়ে শিকার এজেন্সি গড়ে ওঠে। মোটা অর্থের বিনিময়ে এক পক্ষকালের মধ্যে বাঘ শিকারের কৃতিত্ব অর্জনের নিশ্চিত সুযোগের প্রস্তাব দিয়ে শিকার কোম্পানিগুলো ধনী বিদেশি পর্যটক (dollar tourists)-দের আকৃষ্ট করতে থাকে। বাঘ সিংহ হরিণ গন্ডার হাতি কুমিরের—চামড়া, দাঁত, শিং, খড়্গ, দেহাংশের মূল্য পাঁচ থেকে ছয়ের দশকের মধ্যেই বহু বহু গুণ বেড়ে গেলে, অবৈধ শিকার ও চোরাচালানের বাড়বাড়ন্তে এইসব প্রাণীদের জীবন চূড়ান্ত বিপর্যস্ত হয়। শস্য নষ্টকারী প্রাণী শিকারের সরকারি অনুমতি থাকায় প্রচুর পরিমাণে নীলগাই, বুনো শুয়োর শিকার চলতে থাকে। আধুনিক বিষ প্রয়োগেও বাঘ চিতা মারা হতে থাকে। বানর ইত্যাদি প্রাণী বিদেশে প্রচুর পরিমাণে পাচার হতে থাকে। Richard Burton, R. C. Morris প্রমুখরা ও *Bombay Natural History Journal* (১৯৪৮ সাল থেকে) বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের জন্য প্রচার চালাতে থাকে। ফলে ভারত সরকার 'Wild life commite' (১৯৫১ খ্রি.), 'Indian Board of wild life' (Mysore, ১৯৫২ খ্রি.) স্থাপন করে। ১৮৯৪ সালের ঔপনিবেশিক কালের অরণ্য আইনের ভালো আইডিয়াগুলির সঙ্গে উত্তর-ঔপনিবেশিক কালের চিন্তাভাবনা যোগ করে ১৯৫২ সালে জাতীয় অরণ্য আইন ঘোষিত হয়। নতুন আইন প্রবর্তিত হলেও অবশ্য বহু মানুষ তা অগ্রাহ্য করে শিকার করতে থাকে। অরণ্য ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের জন্য বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদ, ফরেস্ট অফিসার প্রমুখরা (E. P. Gee, George Schaller, Guy Mount Fort, John Seidenstickers, Fedrick Walter Champion, A. A. Dunbar Brander, সেলিম আলি, এম. কৃষ্ণান, বিল্লি অর্জন সিং, কৈলাস সংখল) দাবি, লেখালেখি, আলোচনা চালিয়ে যান। সংরক্ষণের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (নিউদিল্লি, ১৯৬৯ খ্রি.) তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী শুধু বক্তব্যই রাখেন না, সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও বিশেষ উদ্যোগী হন। বাঘ চিতার চামড়া রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৭২ সালে নতুন 'বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন' [Wildlife (Protection) Act] প্রণয়ন করে যে কোনও Wild Animal বা বন্য প্রাণী (উভচর, পাখি, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ) শিকার নিষিদ্ধ হয় (Section 9)। 'hunting' বলতে শিকার ছাড়াও বন্দি করা, ফাঁদে আটকান, হত্যা করা, বিষ প্রয়োগ, আঘাত দেওয়া, নষ্ট করা, পাখি সরীসৃপদের বাসা ও ডিম নষ্ট করাও—নিষিদ্ধ হয়। কোন্ কোন্ প্রজাতির প্রাণী

সংরক্ষণ আওতাভুক্ত তার তালিকা (অমান্য করলে—কঠোর শাস্তিযোগ্য ও তুলনামূলকভাবে কম শাস্তিযোগ্য), ইঁদুর ছুঁচো কাক বাদুড় ইত্যাদি কোন্ কোন্ প্রাণীর শিকার বৈধ এবং কোন্ কোন্ উদ্ভিদ রোপণ ও চাষ নিষিদ্ধ—তা নির্দিষ্ট করা হয়। নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত কোনও বন্যপ্রাণী কেবলমাত্র যদি মানবজীবনের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে কিংবা আরোগ্য অক্ষম এরকম রোগাক্রান্ত বা অসমর্থ হয়ে পড়ে, তাহলে মুখ্য বন্যপ্রাণ তত্ত্বাবধায়ক বা প্রশাসন বিবেচনা করে তা শিকারের পারমিট বা অনুমতি দিতে পারে।[৪৪] ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্রপ্রকল্পের সূচনা ঘটে। জীববৈচিত্র্য (biodiversity) অক্ষুণ্ণ রাখতে ভারত সরকার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাতি, গন্ডার, কুমির, সামুদ্রিক কচ্ছপ, শকুন ইত্যাদি ক্রমহ্রাসমান প্রজাতির ক্ষেত্রেও প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

আমাদের গবেষণার মূল আলোচ্য বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় শিকার-সাহিত্যগুলিকে সঠিক ভাবে বুঝতে হলে বাংলা তথা ভারতের শিকারের এই ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। বিশেষত বাংলা এই শিকার-সাহিত্যগুলির উদ্ভব ও বিকাশের কাল অর্থাৎ উনিশ-বিশ শতকের বাংলা বা ভারতের শিকার-সংস্কৃতি সম্পর্কে এই জানাটা একান্তই জরুরি।

তথ্যসূত্র :

১. বর্তমানে নৃতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক ও বিজ্ঞানীদের ধারণা—প্রাচীন মানুষ শিকার ক্রিয়াটির সঙ্গে যুক্ত হয় 'হোমো স্যাপিয়েন্স' অর্থাৎ 'অঙ্গ সংস্থানগত ভাবে আধুনিক মানুষে'র উদ্ভবেরও পূর্বে; এমনকি তা 'হোমো' গণ (genus)-টির উদ্ভবের পূর্বেও হতে পারে। 'হোমো ইরেক্টাসে'র শিকার করার সুনিশ্চিত প্রমাণ মেলে। কিন্তু 'হোমো ইরেক্টাসে'রও পূর্বের মানব প্রজাতি অর্থাৎ 'অস্ট্রালোপিথেকাস' কিংবা প্রারম্ভিক 'হোমিনিড'দের মধ্যে শিকারের প্রত্যক্ষ কোনও প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে ১৯৯০-এর দশকে 'অস্ট্রালোপিথেসিন'দের মাংস ভক্ষণের প্রমাণ পাওয়া গেলে অনুমান করা হতে থাকে তাদের মধ্যে অন্তত মাঝেমাঝে শিকার আচরণটি সংঘটিত হত। যেমন মানুষের নিকটতম বর্তমান আত্মীয় শিম্পাঞ্জি, বনোবোদেরও মাঝেমাঝে শিকার করতে দেখা যায়। দক্ষিণ পশ্চিম কেনিয়ায় প্রাপ্ত 'oldowan site'-এর (পাথরের হাতিয়ার, প্রত্নতাত্ত্বিক শৈলী) ভিত্তিতে T.W. Plummer প্রমুখরা শেষপর্বের 'অস্ট্রালোপিথেকাস' বা প্রারম্ভিক পর্বের 'হোমো'দের শিকার করার— পরোক্ষ প্রমাণের কথা বলেন (২০০৯ খ্রি. ও ২০১২ খ্রি.)। তবে Louis Binford প্রমুখরা মনে করেন প্রাথমিক হোমিনিড বা আদিম মানব প্রজাতিরা ছিল মূলত সংগ্রাহক (scavengers), শিকারি নয়। অন্যান্য শিকারি প্রাণীদের দ্বারা বধ্য-প্রাণীর মাংস তারা সংগ্রহ করত; কখনও হয়তো বা শিকারি প্রাণীটিকে ভয় দেখিয়ে বা চ্যালেঞ্জ করেও (Blumenschine-এর মতে

'confrontational scavenging' পদ্ধতিতে) মাংস সংগ্রহ করত। প্রারম্ভিক 'হোমো'দের শিকার নিয়ে এরূপ বিতর্ক থাকলেও, নিঃসন্দেহেই 'হোমো ইরেক্টাস'রা রীতিমতো শিকার করত। তারা ছিল শিকারি-সংগ্রাহক, উচ্ছিষ্টভোজী ও সর্বভুক। প্রথম দিকে নুড়ি পাথর, সামান্য ধারালো করে নেওয়া পাথর টুকরো তাদের ব্যবহৃত অস্ত্র থাকলেও পরের দিকে এই প্রজাতি পাথরের হাতকুড়ুল, পাতলা ধারালো ফলক ব্যবহার করত। ফলে সিংহ, হায়েনা ইত্যাদি হিংস্র পশুর আগমনের পূর্বেই তারা মৃত পশুর চামড়া কেটে মাংসের টুকরো কেটে নিতে পারত। খাদ্যাভ্যাসে মাংস আসায় তাদের পুষ্টি ও মস্তিষ্কের বিকাশও সাধিত হয়। 'হোমো ইরেক্টাস'রা (উদ্ভব সম্ভবত ২০ লক্ষ বছর আগে ও বিলুপ্তি ৫০ হাজার বছর আগে) তাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কোনও এক সময় যেমন আগুনের ব্যবহার শেখে তেমনি এক সময় শেখে আগুনে মাংস পুড়িয়ে খেতে। 'হোমো ইরেক্টাসে'র উত্তরসূরি 'হোমো হাইডেলবার্গেনসিস'রাই সম্ভবত প্রথম কোনও মানব প্রজাতি যারা বল্লম দ্বারা পশু শিকার করত। আবার এদের উত্তরসূরি এবং 'ডেনিসোভান' ও আধুনিক মানুষ বা 'হোমো স্যাপিয়েন্সে'র অত্যন্ত নিকট আত্মীয় প্রজাতি—'নিয়েণ্ডারথাল'রা যেমন দক্ষ হাতিয়ার (বর্শা, হাতকুড়ুল) নির্মাতা বা অস্ত্র নির্মাণে 'levallois technique'-র উদ্ভাবক ছিল, তেমনি তারা ছিল দক্ষ ও বুদ্ধিমান শিকারিও। পরিকল্পনা করে দলবদ্ধভাবে তারা ম্যামথ, বাইসন, বলগা হরিণ ইত্যাদি শিকার করত। শিকারলব্ধ বা মৃত পশুর মাংস খাদ্যরূপে গ্রহণ করা ছাড়াও 'নিয়েণ্ডারথাল'রা পশুচর্ম গায়ে জড়াত; তবে তারা 'হোমো স্যাপিয়েন্সে'র মতো পশুচর্ম সেলাই করতে পারত না। প্রাচীন মানব প্রজাতিগুলির শিকার ক্রিয়া সম্পর্কে জানতে https://en.wikipedia.org/wiki/Hunting-এর সঙ্গে দেখা যেতে পারে জয়ন্ত দাস, *বিবর্তন আদি যুদ্ধ আদি প্রেম* (কলকাতা : গাঙচিল), ২০২২ ও মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগিতিহাস* (কলকাতা : গাঙচিল), ২০২২—বই দুটি।

২. Srinivas Sistla, ''A Treasure Trove of Rock Art in Bhimbetka'', accessed Jan 31, 2022, https://www.newindianexpress.com/opinions/2021/dec/28.

৩. রণবীর চক্রবর্তী, *ভারত ইতিহাসের আদি পর্ব ১ম খণ্ড* (কলকাতা : ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১৪), ৩৭-৩৯।

৪. রামশরণ শর্মা, রোমিলা থাপার, রণবীর চক্রবর্তী প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতানুযায়ী। দ্রষ্টব্য রণবীর চক্রবর্তী, *ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব ১ম খণ্ড*, ৯৭।

৫. রণবীর চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, ১১১।

যদিও কেউ কেউ মনে করেন এই পর্বে কৃষি জমি ও বসতির বেশিটাই নির্মিত হয়েছে নদী, জলাশয়ের কাছাকাছি ফাঁকা জমিতে; সুগভীর বনজঙ্গলকে সেভাবে কেটে নয়। অত্যন্ত প্রয়োজন না পড়লে সুগভীর অরণ্য ধ্বংস করা হয়নি। দ্রষ্টব্য Makkhan Lal, ''Iron Tools, Forest Clearance and Urbanization in the Gangetic Plains'', Mahesh Rangarajan (ed.), *Environmental Issues in India* A Reader (New Delhi : Pearson Longman, 2007), 18-32.

৬. Kavya Chimalgi, ''A History of Hunting in the Indian Subcontinent'', accessed Jan 31, 2022, https://thelastwilderness.org.
৭. রণবীর চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, ১০২।
৮. রণবীর চক্রবর্তী, *ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব ১ম খণ্ড*, ১১২-১১৩।
৯. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অনু.), *মনুসংহিতা*, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ (কলকাতা : আনন্দ, ২০১৩), ২৮৯-২৯১।
১০. রণবীর চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, ১৬৮-১৬৯।
১১. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অনু.), *মনুসংহিতা*, ১৫০-১৫১।
১২. তদেব, ১৮১।
১৩. সুকুমার সিকদার (অনু.), *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র*, তৃতীয় সং. (কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০১০), ১০১-১০২, ১১৪।
১৪. তদেব, ১০৭, ১০৮, ১১৪।
১৫. রণবীর চক্রবর্তী, *ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব ১ম খণ্ড*, ২১২।
১৬. *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র*, ২৪৫।
১৭. তদেব, ২৪৫।
১৮. চারুচন্দ্র বসু ও ললিতমোহন কর (সম্পা.), *অশোক অনুশাসন* (কলকাতা : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস মেট্‌কাফ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩২২ব.), ৭৯-৮০।
১৯. IGNOU, ''Unit-13 Forest Resources'', Block-4 Appropriation of Environment-Other Forms, P.29, accessed Jan 31, 2022, http://hdl.handle.net/123456789/22431.
২০. ibid, 29-30.
২১. ibid, 30.
২২. Raghu Malhotra, ''Explained : How cheetahs went extinct in India, and the plan to reintroduce them into the wild'', accessed Jan 31, 2022, https : //indianexpress.com/article/2022/june/10.

তবে এই প্রাণীটি চিতা কিনা সুনিশ্চিত বলা মুশকিল। রোমিলা থাপার দেখিয়েছেন *মানসোল্লাস*-এ শিকার করার জন্য ব্যবহৃত প্রাণীটির প্রশিক্ষণ চিতার প্রশিক্ষণের অনুরূপ হলেও প্রাণীটিকে উল্লেখ করা হয়েছে 'চিত্রক', 'ভয়াল', 'ভয়াগ্র', 'দ্বীপী' বলে। দ্রষ্টব্য Valmik Thapar, Romila Thapar and Yusuf Ansari, eds. *exotic Aliens : The Lion & The Cheetah in India* (New Delhi : Aleph, 2013), 46.

২৩. মোগল যুগের শিকার সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশদ জানতে দ্রষ্টব্য Mahesh Rangarajan, *India's Wildlife History* (New Delhi : Permanent Black, 2001), 11-21; Divyabhanusinh, ''The Great Mughals Go Hunting Lions'', Mahesh

Rangarajan (ed.), *Environmental Issues in India* (Delhi : Pearson Longman, 2007), 49-69 ; Valmik Thapar, Romila Thapar and Yusuf Ansari, Exotic Aliens (New Delhi : Aleph, 2013).

২৪. Ebba Koch, ''Dara-Shikoh Shooting Nilgais : Hunt and Landscape in Mughal Painting'', Occasional Papers 1998 / Vol. I (Washington DC : Arthur M. Sackler Gallery), 21.

২৫. মোগল যুগের অরণ্য ও অরণ্যসম্পদ সম্পর্কে বিশদ তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য Irfan Habib, *An Atlas of the Mughal Empire* (New Delhi : Oxford University Press, 1982).

২৬. IGNOU, ''Unit-13 Forest Resources'', p. 31.

২৭. ঔপনিবেশিক ভারতের অরণ্য, অরণ্য সম্পদ সংগ্রহ, অরণ্যের পশুপাখির শিকার ইত্যাদি সম্পর্কে ব্রিটিশ শাসকদের নিয়মবিধি প্রণয়ন, তার উদ্দেশ্য ও ঘাত প্রতিঘাতগুলির জন্য দ্রষ্টব্য সুমিত সরকার, *মডার্ন টাইম্স : ভারত*, ভাষান্তর আশীষ লাহিড়ী (কলকাতা : কে.পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ২০১৯), ৯০-১১৬।

২৮. মহেশ রঙ্গরাজনের এই বক্তব্যকে (*India's Wildlife History)* ঐতিহাসিক সুমিত সরকারও সমর্থন করেছেন। দ্রষ্টব্য *মডার্ন টাইমস্*, ৯৭।

২৯. সুমিত সরকার, *মডার্ন টাইমস*, ৯৭।

৩০. Pigsticking (চিত্র - ২১) অত্যন্ত জনপ্রিয় Sport হয়ে ওঠে, তা দেখার জন্য ও তরুণ ব্রিটিশ অশ্বারোহী অফিসারদের উৎসাহ দানে বিশাল সংখ্যায় হাতিতে চড়ে ইউরোপীয়ান নারী ও বিশিষ্ট অভিজাত দর্শকরা ভিড় করতেন। ভারতে সুপ্রাচীন কাল থেকেই শুয়োর শিকার প্রচলিত ছিল (*রামায়ণ, মহাভারত*)। কিন্তু সেসব শিকার সংঘটিত হত গভীর অরণ্যে; ইংরেজদের মতো দর্শকদের সামনে হত না কিংবা সংগঠিত প্রতিযোগিতা রূপেও নয়। মোগল আমলে বুনো শুয়োর অভিজাত শিকারিদের প্রিয় টার্গেট থাকেনি, ছিল (চিতল) হরিণ। ১৬৯০ সালের একটি চিত্রে (চিত্র - ১৩) এক রাজপুত্র যোদ্ধার শুয়োর শিকারের দৃশ্য পাওয়া যায় (লাহোর মিউজিয়ামে)। ১৯ শতকে শুয়োর শিকারকে আবার জনপ্রিয় করে তোলে ব্রিটিশরাই। দ্রষ্টব্য Ranjan Chakrabarti, *Climate Calamity and The Wild* (Delhi : Primus Books), 160-162.

৩১. W. O. Horne, *Work and Sport in the Old ICS* (Edinburgh : William Blackwood & Son, 1928), 125.

৩২. Henry Shakespear, The Wild Sports of India (London : Smith, Elder, 1860), 11.

৩৩. Mahesh Rangarajan, *India's Wildlife History*, 32.

৩৪. ভারতে ব্রিটিশদের শিকার অভিজ্ঞতা ও ট্রফির জন্য ক্রমবর্ধমান উন্মাদনাকে ঐতিহাসিক রঞ্জন চক্রবর্তী কালানুক্রমিকভাবে চারটি পর্বে ভাগ করেছেন। (১) ১৭৮০-১৮০০ : ভারতীয়

শাসক ও রাজরাজড়াদের দ্বারা আয়োজিত ও নিয়ন্ত্রিত শিকারে ব্রিটিশরা দর্শক ও অংশগ্রহণকারী। (২) ১৮০০-৭০ : ব্রিটিশ ও ভারতীয়রা শিকারে অংশ নিচ্ছে সহযোগী (collaborators) হিসেবে ও প্রায় সমান পদে। (৩) ১৮৭০-১৮১৪ : এটি মূলত হাতিতে চড়ে সাম্রাজ্যবাদী শিকারের সমৃদ্ধ সময়। ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে সামাজিক ও বর্ণবাদী দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিকার হয়ে উঠছে জাতিগত বৈষম্যের আরেক জায়গা। (৪) ১৯১৪-৪৭ : স্পোর্টস সংরক্ষণ ও শিকারে বিধিনিষেধ গড়ে উঠছে; সমসাময়িক সংরক্ষণবাদী উদ্যোগের স্বর থেকে নতুন আইন প্রণীত হচ্ছে। দ্রষ্টব্য Ranjan Chakrabarti, *Climate Calamity and The Wild,* 153.

৩৫. চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল, *শিকারের গত্ব-ষত্ব* (কলকাতা : সূত্রধর, ২০১০), ৩৩।

৩৬. ১৮৮৩ সালে একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘের শিকারের জন্য সরকারি পুরস্কার ছিল ৫০ টাকা ও প্রতিটি শাবকের জন্য ১০ টাকা। সময়ে সময়ে প্রয়োজন মতো পুরস্কারের মূল্য বাড়ত। দ্রষ্টব্য Ranjan Chakrabarti, *Climate Calamity and The Wild,* 174.

৩৭. Ranjan Chakrabarti, *Climate Calamity and The Wild,* 179-180.

৩৮. Captain B. Rogers তাঁর ভারতে ব্রিটিশ আর্মি অফিসার থাকাকালীন শিকারের অভিজ্ঞতার জন্যই লন্ডনের Society of Arts-এ বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তাঁর আবিষ্কৃত বাঘমারার ফাঁদের মডেলটি South Kensington Museum-এ প্রদর্শিত হয় যা ব্রিটিশ তরুণদের ভারত সম্পর্কেও কৌতূহলী করে তোলে। দ্রষ্টব্য Vijaya Ramadas Mandala, *Shooting A Tiger* (New Delhi : Oxford University Press, 2019), introduction 5.

৩৯. জিম করবেটের সূত্রে এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করেছেন চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল। দ্রষ্টব্য *শিকারের গত্ব-ষত্ব,* ১৭-৫৩।

৪০. Mahesh Rangarajan, *India's Wild Life History*, 36.

৪১. চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল, পূর্বোক্ত, ১২-১৩।

৪২. সাদুল সিং পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি পশু ও ছেচল্লিশ হাজারেরও বেশি পাখি শিকার করেন। এর মধ্যে ৩টি বাঘ, ১টি সিংহ, ৩০টি ভারতীয় বাস্টার্ড (great indian bustards), ২১০০০-এরও বেশি মেঠো মোরগ (grouse) ছিল। রামানুজ শরণ সিং দেও জীবদ্দশায় ১১০০টি বাঘ ও ২০০০ প্যান্থার লেপার্ড শিকার করেন। দ্রষ্টব্য Mahesh Rangarajan, *India's Wild Life History,* 36-38.

৪৩. বন্দুক থেকে ক্রমশ ক্যামেরার দিকে যাত্রাপথ ও স্বাধীনোত্তর পর্বের শিকার ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিশদ জানতে দ্রষ্টব্য Mahesh Rangarajan, 68-93.

৪৪. The Wild life (Protection) Act., 1972 (Act. No 53 of 1972), accessed Jan 31, 2022, https://legislative.gov.in>files (A 1972-53-0. pdf).

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাঙালির শিকার বিষয়ক ধ্যানধারণা ও
বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় শিকার-সাহিত্য

‘শিকার’ প্রসঙ্গটি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। ‘মৃগয়া’ [সংস্কৃত শব্দ, অর্থ—মৃগ (বন্য জন্তুর) অনুসন্ধানে যাত্রা বা বন অন্বেষণ করে পশুপাখি বধ] বা ‘শিকার’ [ফারসি শব্দ, অর্থ—পশুপাখির বধ] শব্দের শুধুমাত্র উৎস সন্ধান কিংবা বেদ পুরাণাদির অন্ধিসন্ধিতে লুকিয়ে থাকা ‘শিকার প্রসঙ্গে’র খানাতল্লাশি চালানো—এখানে আমাদের ঠিক অভীষ্ট নয়। তবে বিশ শতকে ছোটোদের জন্য রচিত বাংলা শিকার-সাহিত্য বর্গটির আলোচনার ক্ষেত্রে, আমরা পূর্ববর্তী ভারতীয় সাহিত্য বিশেষত বাংলা সাহিত্যের খুবই চেনাজানা কয়েকটি শিকার প্রসঙ্গ এক ঝলক দেখে নেব; এতে ‘শিকার’ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব অর্থাৎ সমাজ ও সাহিত্যে শিকার-সংস্কৃতি, তার পরম্পরা ও রদবদল সম্পর্কে পরিচয় পাওয়া সম্ভব হবে; একই সঙ্গে—‘সাহিত্যে শিকার প্রসঙ্গ’ থেকে ‘শিকার-সাহিত্য’ চর্চার সুদীর্ঘ গতিপথটি সম্পর্কেও সহজে একটি মোটামোটি সামগ্রিক ধারণা গড়ে তোলা যাবে।

প্রাগাধুনিক ভারতীয়-সাহিত্যে শিকার-প্রসঙ্গ

রামায়ণ রচনার প্রস্তুতি পর্বেই আছে একটি শিকার ঘটনা। নিষাদের তিরে ক্রৌঞ্চের মৃত্যুতে ক্রৌঞ্চীর মর্মন্তুদ বিরহবেদনা বাল্মীকির হৃদয়কে করুণ রসসিক্ত করে নিঃসরণ ঘটায় শ্লোকের (বালখণ্ড, সর্গ ২)। শিকারের ক্ষেত্রে উনিশ-বিশ শতকে ভারতীয় শিকারিরা অনেক সময়ই কোনও নিয়মকানুন নৈতিকতার ধার ধারতেন না; বন্যপ্রাণীকে দেখামাত্রই নির্বিচারে গুলি চালানোই শুধু নয়, শিকারের ক্ষেত্রে বন্যপ্রাণীর স্ত্রী-পুরুষ বা শিশু-প্রাপ্তবয়স্ক ভেদাভেদ না করে শিকারের কৃতিত্ব অর্জন, নিদ্রিত প্রাণী বা নুন চাটতে আসা প্রাণী অথবা পিপাসার্ত প্রাণীকে জলপানরত অবস্থায় শিকার করে নির্মম উল্লাস, প্রজনন ঋতুতেও শিকার এমনকি বাঘিনী বা হরিণীর ডাক নকল করে পুরুষ বাঘ বা হরিণকে আকৃষ্ট করে শিকার, গুলিবিদ্ধ প্রাণীকে তল্লাশি চালিয়ে সম্পূর্ণ নিকেশ না করেই ওই যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থাতে তাকে অরণ্যে ত্যাগ করে শিকারির প্রত্যাবর্তন—এসব ঘটনা আখছার ঘটত। ফলে ইউরোপীয় Sportsman শিকারিরা বা দেশিবিদেশি বিবেকবান শিকারি ও শিকার-সাহিত্য সমালোচকরা ভারতীয় শিকার খেলার এইসব ত্রুটি বা রীতিনীতি-শূন্যতাকে নিন্দা করেছেন। কিন্তু *মনুসংহিতা*, *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র*,

সর্বোপরি *অশোকের অনুশাসনে* সে যুগে ভারতেও শিকারের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মকানুন যে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, তা আমরা পূর্বের অধ্যায়ে দেখেছি। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যগুলির দিকে তাকালেও দেখতে পাই, শিকারের সঙ্গে জনমানসে পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, নীতি-নৈতিকতার নানা রকম ধারণা যথেষ্ট বর্তমান ছিল। নিষাদ বৃত্তিগতভাবে পশুপাখির শিকারি। কিন্তু তবু সেও যখন 'সুখে বিহাররত' ক্রোঞ্চমিথুনের ক্রোঞ্চকে বধ করে, তপস্বী বাল্মীকি কিন্তু নিষাদেরও এই কর্মটি 'ঘোর অধর্ম' বা 'ভয়ানক পাপকর্ম' বলেই বিবেচনা করেন।[১] ফলে মহর্ষির আবেগমথিত কণ্ঠ থেকে ব্যাধপুরুষের প্রতি উচ্চারিত হয় অভিশাপ বাণী। *মহাভারতেও* মহারাজ পাণ্ডু মৃগ ও মৃগীকে ক্রীড়ারসে প্রমত্ত দেখেও উপর্য্যুপরি পাঁচ বাণ নিক্ষেপে বধ করেন। ফলে মৃগরূপী কিন্দম মুনি পাণ্ডুকে এরূপ 'নৃশংস, লোকবিগর্হিত, অস্বর্গ্য, অযশস্কর, অধর্মিষ্ঠ' দুষ্কর্মের বা পাপের জন্য ফলভোগের অভিশাপ দেন (আদিপর্ব, ১১৮ অধ্যায়)।[২]

মৃগয়া সফল হলেও অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে যেত এরূপ মারাত্মক নানা বিপর্যয়। *রামায়ণে* যেমন এক রমণীয় বর্ষাকালে মৃগয়ায় গিয়ে রাজা দশরথ রাত্রির ঘোর অন্ধকারে সরযূ নদীতে জলপূরণের শব্দ শোনেন; হাতিতে জলপান করছে ভেবে তিনি শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করায়, এক ঋষিপুত্রের মৃত্যু হয়। ফলে পুত্রের মৃত্যুতে অন্ধমুণি রাজা দশরথকেও পুত্রশোকে মৃত্যুর অভিশাপ দেন (অযোধ্যা কাণ্ড, সর্গ ৬৪)। অভিশাপটি অপুত্রক রাজার কাছে খানিক আশীর্বাদ হয়ে ওঠে; তাঁর পুত্রলাভ হয়। কিন্তু অচিরেই অভিশাপের দুঃখজনক ফল ভোগ করতে হয়। *মহাভারতেও* মৃগয়াপ্রিয় ও মৃগ-বরাহ-তরক্ষু (বাঘ)-মহিষ ও অন্যান্য বন্যজন্তুর মৃগয়ায় প্রসিদ্ধ মহারাজ পরীক্ষিৎ একবার মৃগয়ায় বাণবিদ্ধ মৃগের অনুসরণ করতে করতে অতিদূর দেশে উপস্থিত হন; মৌনব্রতাবলম্বী শমীক ঋষির কাছে জলের সন্ধান চেয়ে উত্তর না পেয়ে পিপাসার্ত পরিশ্রান্ত রাজা ধনুর অগ্রভাগে মৃত সাপ তুলে মহর্ষির স্কন্ধদেশে অর্পণ করেন। এই ঘটনার ফলস্বরূপ মহর্ষির তরুণ পুত্র শৃঙ্গী পিতার অবমাননার জন্য তীক্ষ্ণ বিষধর তক্ষকের কামড়ে সাত রাত্রির মধ্যে 'ব্রাহ্মণের অপমানকারী পাপাত্মা' পরীক্ষিৎ-কে মৃত্যুর অভিশাপ দেন (আদি পর্ব, ৪০-৪১ অধ্যায়)।[৩]

মৃগয়ায় গিয়ে ঘটিয়ে ফেলা কোনও অন্যায় কর্মের ফলে বনবাসী মুনিঋষিদের প্রদত্ত অভিশাপে যেমন এঁরা মৃত্যু ডেকে এনেছেন, তেমনি আবার বনের বন্যপ্রাণীর হাতে মৃত্যুর ঘটনা বা কোনও দুর্ঘটনা ঘটাও বিরল ছিল না। কালিদাসের *রঘুবংশম্-এ* দেখি রঘুরাজ ধ্রুবসিন্ধু মৃগয়ায় গিয়ে নিজেই সিংহের মুখে মারা যান (অষ্টাদশ সর্গ)।

ফলে প্রজারা অনাথ ও ভাগ্যহীন হয়ে পড়ায় অমাত্যরা পরামর্শ করে ধ্রুবসিন্ধু-পুত্র মাত্র ছয় বছরের শিশু সুদর্শনকেই অযোধ্যার রাজা রূপে অভিষিক্ত করতে বাধ্য হন।

আবার মৃগয়া বা অদ্ভুত সুন্দর জীবজন্তু লাভের অতিরিক্ত প্রলোভন কিংবা বিবেচনাশূন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার কবলে পড়েও ঘটে যেত চরম বিপর্যয়। *রামায়ণের* অরণ্যকাণ্ডে অতিসুন্দর অদ্ভুত স্বর্ণমৃগরূপী মারীচকে দেখে সীতা প্রলুব্ধ হন (সর্গ ৪২-৪৩); সীতার অনুরোধে রাম ঐ মায়ামৃগটিকে জীবন্ত বা মৃত লাভের জন্য বন থেকে বনান্তরে যান (সর্গ ৪৩-৪৪)। ফলে ঘটে যায় সীতাহরণের ঘটনা। শূর্পনখার দুর্দশার, খর-দূষণের মৃত্যুর—প্রতিশোধ নিতে ও সীতাহরণের জন্য রাবণ সীতা বা রামকে প্রলুব্ধ করতে প্রতারণা করেন মায়ামৃগ দ্বারা। ঠিক তেমনি ভাসের *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্* নাটকেও দেখি বৎসরাজ উদয়নকে বন্দি করার জন্য অবন্তিরাজ প্রদ্যোৎ 'মৃগয়ায় প্রলুব্ধ করার প্রতারণা কৌশল'টি ব্যবহার করেন।[৪] উদ্দেশ্য—রূপে-গুণে-ক্ষাত্রতেজে অনন্যসাধারণ উদয়নকে বশীভূত করে তার সাহায্যপুষ্ট হয়ে একচ্ছত্র রাজা হওয়া। এজন্য বিন্ধ্য অরণ্যের নাগবনে হাতি শিকারে যাওয়া উদয়নকে প্রলুব্ধ করতে প্রদ্যোৎ আগে থেকেই একদল হাতির সঙ্গে একটি কৃত্রিম নীল হাতি লুকিয়ে রাখেন। বীণাবাদ্যে গজ-বশীকরণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী উদয়ন অসাধারণ সুন্দর হাতিটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ঘোষবতী-বীণা হাতে অগ্রসর হতেই লুকানো সেনারা অতর্কিতে উদয়নকে আক্রমণ করে পরাস্ত ও বন্দি করে। হাতি শিকারে গিয়ে উদয়ন ছলনার শিকার হয়ে শত্রুর হাতে বন্দি হলেও শেষপর্যন্ত অবশ্য মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কূটকৌশলে উদ্ধার পান; সঙ্গে লাভ করেন প্রদ্যোৎ-কন্যা বাসবদত্তাকেও।

সুতরাং মহাকাব্য বা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে শিকার প্রসঙ্গটি অনেক সময়ই ব্যবহৃত হয়েছে পরবর্তী ভাবী ঘটনা বা ভবিতব্যের ইঙ্গিতবাহী রূপে; শিকার ঘটনাটি কাহিনির মোড় বদল বা অগ্রগতিতে হয়ে উঠেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। তবে মৃগয়াকালে কোনও মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বা বিপর্যয় ঘটার কিংবা অজান্তে কোনও অন্যায়, পাপকর্ম (যার প্রভাবে ভাবী জীবনে অনিবার্য ফলভোগ করতে হবে এমন কর্ম) সম্পাদিত হয়ে যাবার চিত্রই সাহিত্যে শুধুমাত্র অঙ্কিত হয়নি। সাহিত্যে মৃগয়া কেবলমাত্র অশুভ, অমঙ্গল বা বিপদই ডেকে আনত না। মৃগয়ায় গিয়ে নায়কদের অনেক ক্ষেত্রেই সুযোগ ঘটত প্রেম-প্রণয়েরও। উদাহরণস্বরূপ মহাভারতের আদিপর্বে 'দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনি' (৬৮ অধ্যায়), 'দেবযানী-যযাতির কাহিনি' (৮১ অধ্যায়), 'সম্বরণ-তপতীর কাহিনি' (১৭১-১৭৩ অধ্যায়), কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটক কিংবা ভাসের

(পূর্বোক্ত) *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্* নাটকের কথা বলা যায়। নায়ক বা রাজাদের মৃগয়ায় গিয়ে প্রেমপ্রণয়ের সুযোগ, স্ত্রীলাভ ও শেষপর্যন্ত রাজ্যের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী লাভ [যেমন মহাভারতের আদিপর্বে ভরতের জন্ম (৭৪ ও ৯৫ অধ্যায়), মৎস্যরাজ ও মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর জন্ম (৬৩ অধ্যায়)]—একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় মোটিফ। শুধু ভারতীয় মহাকাব্য বা লিখিত সাহিত্যেই নয় লোককথাতেও এর ভুরিভুরি নিদর্শন মেলে।

মৃগয়ায় সফলতা লাভ—নিঃসন্দেহেই ছিল বীরত্বব্যঞ্জক কীর্তি। ফলে কৃতিত্বটির দাবি নিয়ে মৃগয়া-কলহেরও নজির বর্তমান । মৃগয়া বা শিকারে 'কে' পূর্বে বধ্য প্রাণীটিকে দেখেছে ও প্রথম শর নিঃক্ষেপে বধ করেছে, 'কে'ই বা অন্যের লক্ষিত শিকার জেনেও শর নিঃক্ষেপ করে 'মৃগয়া ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ' করেছে—এ নিয়ে দুই শিকারির একটি বিরোধের ঘটনা আছে *মহাভারতের* বনপর্বে। অর্জুনকে সংহারে উদ্যত বরাহরূপী মূক দানবের শিকারকে কেন্দ্র করে অর্জুন ও কিরাতবেশী মহাদেব পরস্পর ঘোর দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পরাজিত অর্জুন অবশ্য শেষপর্যন্ত কিরাতরূপী মহাদেবের কাছ থেকে লাভ করেন পাশুপত অস্ত্র। মহাভারতে বর্ণিত এই 'মৃগয়া-কলহ'র ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই—অর্থাৎ প্রাণীবধের কৃতিত্বটি প্রকৃতপক্ষে কার, কে সেই কীর্তিটি আত্মসাৎ, অপহরণে সচেষ্ট এ নিয়ে অর্জুন ও শিবের মধ্যেকার তুমুল সংগ্রামটিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে ভারবিও লেখেন *কিরাতার্জুনীয়ম্* কাব্য। ব্যক্তিজীবনে ভারবি শিকার-ক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কথিত আছে, স্থানীয় শাসক বিষ্ণুবর্ধনের সঙ্গে শিকারে গিয়ে 'মাংস আহার' করার জন্য 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত' রূপে তাঁকে তীর্থভ্রমণ করতে হয়।[৫] ফলে *কিরাতার্জুনীয়ম্* কাব্যটিতে তৎকালীন শিকার-শিকারি সম্পর্কিত কিছু তথ্যও ধরা আছে। বেগবান বলশালী বরাহটি ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করে অর্থাৎ মূর্তিমান বিঘ্ন হয়ে ওঠে। এজন্যই তপস্যারত অর্জুন নিজ ব্রত রক্ষার্থে তাকে বধের বিবেচনা করেন। 'বনবাসী পশু কারও নিজস্ব ধন নয়, যে বধ করে মৃগ (শিকার প্রাণীটি) তারই'— কিরাতদূতের কাছে এই ছিল অর্জুনের যুক্তি।[৬] এছাড়াও তাদের কথোপকথনে বর্ণাশ্রমপ্রথা সমন্বিত সমাজে 'বর্ণাশ্রমরক্ষক বিশুদ্ধবৃত্তি রাজা' ও 'জাতিহীন হিংসাজীবী ব্যাধে'র অবস্থানটিও উঠে এসেছে।[৭] শেষ পর্যন্ত অবশ্য 'নিজ কুলশীল সম্পর্কে অভিমানী' অর্জুন তাঁর 'প্রাণের চেয়েও প্রিয়তম কীর্তি' অর্থাৎ জয় হস্তচ্যুত হবার পর সেই কিরাতপতিই 'স্বয়ং শঙ্কর' জানতে পেরে তাঁর স্তুতি-বন্দনা করেন।[৮] শিবও অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্রশিক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের পরাক্রম ও বীরত্বের স্বীকৃতি দেন।

মহাভারত কিংবা *কিরাতার্জুনীয়ম্* কাব্যে অর্জুন তাঁর বীরত্বের স্বীকৃতি

পেলেও, এই *মহাভারতেই* মৃগয়াকে কেন্দ্র করে হাজির আরেক অসামান্য বীর কিন্তু তাঁর বীরত্ব বা সুনিপুণ ধনুর্বিদ্যার সুযোগ্য সম্মান পান না। বরং মহা-সম্ভাবনাময় এই বীরের স্বশিক্ষিত দক্ষতাকে কৌশলে খর্ব করা হয়। তিনি—নিষাদরাজ হিরণ্যধনু-পুত্র একলব্য। বিনোদনের সঙ্গে অস্ত্রশিক্ষার উৎকর্ষের জন্যও সেকালে রাজপুত্রদের মৃগয়ায় যেতে দেখা যায় (*রামায়ণ, মহাভারত*)। অস্ত্রগুরু দ্রোণের নির্দেশে কৌরব-পাণ্ডবরা একবার রাজধানীর কাছের বনে মৃগয়ায় যায়। তাদের মৃগয়া সহযোগী কুকুরটি অরণ্যের মধ্যে দ্রোণের মৃত্তিকা মূর্তির সামনে একান্তে স্বশিক্ষারত 'মলিনকলেবর, কৃষ্ণাজিন-জটাধারী' একলব্যকে দেখে শুরু করে চিৎকার। চিৎকার থামাতে ও নিজের অস্ত্রপ্রয়োগের লঘুতার পরীক্ষার জন্য একলব্য কুকুরের মুখবিবরে এককালে সাতটি শরনিক্ষেপ করেন। প্রত্যাগত কুকুরের মুখের বাণ দেখে শরের লঘুত্ব ও শব্দভেদিত্বে বিস্মিত পাণ্ডবরা অনুসন্ধান করে একলব্যের পরিচয় পান। মৃগয়া প্রত্যাগত পাণ্ডবদের মুখে 'নিজেকে দ্রোণের শিষ্য' বলে পরিচয় দেওয়া একলব্যের কথা শুনে গুরু দ্রোণও হন বিস্মিত। অর্জুন অপেক্ষা তাঁর কোনও শিষ্যই উৎকৃষ্ট হবে না— দ্রোণের এই অঙ্গীকারটি ঈর্ষান্বিত, শঙ্কিত অর্জুন সাভিমানে দ্রোণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এরপরই ঘটে সেই অদ্ভুত ঘটনাটি। যে একলব্যকে একদা দ্রোণ 'অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছজাতির, সাধারণের সতীর্থ ও সমতুল্য হওয়া অনভিপ্রেত' বিবেচনা করে ধনুর্বেদ দীক্ষা না দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, এখন দ্রোণ নিজেই সেই একলব্যের কাছে যান। কিন্তু গুরুদক্ষিণারূপে করে বসেন এক নিদারুণ, নির্মম দাবি— 'দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ'।[৯] সত্যবাক একলব্য 'প্রফুল্লমনে হৃষ্টবদনে অসঙ্কুচিত চিত্তে' তৎক্ষণাৎই সেই গুরুদক্ষিণা দেন। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠহীন একলব্যের শরের লঘুতা পূর্বের চেয়ে হ্রাস পায়। কৌরব-পাণ্ডবের মৃগয়াকে কেন্দ্র করেই *মহাভারতে* একলব্যের ক্ষণিক উপস্থিতি। কিন্তু তাঁর অসামান্য ধনুর্বাণ নিপুণতা, তাঁর প্রতি হওয়া চরম অন্যায়-তঞ্চকতা, তাঁর অসাধারণ গুরুভক্তি-ত্যাগ-সত্যবাদিতা— তাঁকে *মহাভারতের* অসংখ্য নায়ক, প্রতিনায়কদের ভিড়েও হারিয়ে যেতে দেয় না। পাঠক হৃদয়ে বনবাসী নিষাদ একলব্য চির-উজ্জ্বল হয়ে থাকেন এক 'আশ্চর্য মহাবীর' রূপেই।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকেরও প্রথমেই নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হয়েছে একটি টানটান উত্তেজনাপূর্ণ রোমাঞ্চকর মৃগয়া দৃশ্য— অতিবেগবান এক হরিণকে অনুসরণ করতে করতে মহারাজ দুষ্যন্তের রথ সঙ্গীসাথী-বিদূষক সবাইকে পেছনে ফেলে ছুটে চলেছে; রথ ও হরিণের ব্যবধান ক্রমশ কমায়, রাজা ধনুতে বাণ যোজনা করে কৃষ্ণসার হরিণটি শিকারে উদ্যত; আর ঠিক সে মুহূর্তেই নেপথ্যে ধ্বনিত হয়েছে না মারার

নির্দেশ; কেননা এ হরিণ আশ্রমের; তাছাড়া রাজার অস্ত্র বিপন্নের রক্ষার্থে, তা নিরপরাধকে মারার জন্য নয়; তাপস বৈখানসের এরূপ নির্দেশে রাজাকে বাণসংবরণ করতে হয়েছে। রাজার মৃগয়া ব্যর্থ হয়েছে ঠিকই কিন্তু এসেছে কণ্বমুনির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ; যার ভাবী ফল— পুরুবংশীয় মহারাজ দুষ্যন্ত ও কণ্বমুনির পালিতা তপোবন-কন্যা শকুন্তলার সাক্ষাৎ, প্রণয় ও গন্ধর্ববিবাহ। কালিদাসের কালের মৃগয়া সংক্রান্ত আরও নানা খুঁটিনাটি বিষয় ধরা আছে নাটকটিতে। তপোবনে পালিত পশুপাখিরা যেমন ছিল অবধ্য (১.১০), তেমনি তপোবন প্রাণীদের মৃগয়াবিহারী রাজা ও সৈন্যদের থেকে রক্ষার জন্য তপস্বীরাও সচেষ্ট হতেন (১.৩০)। রাজাও তপোবনের শান্তি বিঘ্নিত করতেন না। মূল *মহাভারতের* কাহিনিতে রাজা দুষ্মন্ত শত শত হাতি ঘোড়া, মন্ত্রী, পুরোহিত, বিবিধ শস্ত্রধারী সেনাদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে মৃগয়া যাত্রা করেন। হাতি-ঘোড়া-রথ-সেনা-শঙ্খ-অস্ত্রের ধ্বনিতে ঘোর কোলাহল সহ মৃগয়ার্থে যাত্রাকারী সসৈন্য রাজাকে নগরের নারীরা অট্টালিকা-শিখর থেকে পুষ্পবৃষ্টি করে; চার বর্ণেরই প্রজারা আশীর্বাদ ও জয়ধ্বনি করতে করতে রাজাকে মহাবনের পথে এগিয়ে দিয়ে যায় (আদিপর্ব)। স্পষ্ট বোঝা যায়, সে যুগেও রাজাদের সসৈন্য মৃগয়া যাত্রা ছিল যথেষ্ট জাঁকজমক ও আড়ম্বর পূর্ণ। এর মাধ্যমে প্রজাদের সামনে রাজার যশ ও পরাক্রম প্রতিফলিত হত। *অভিজ্ঞান শকুন্তলমেও* রাজা দুষ্যন্ত সৈন্য, সেনাপতি, পাত্রমিত্র, বিদূষক, দৌবারিক, শিকার বেশপরিহিতা ধনুর্বাণধারী যবনী পরিচারিকা সহ মৃগয়ায় আসেন। অর্থাৎ রাজাদের কাছে শিকার ছিল অত্যন্ত বিলাসবহুল বিনোদন। মৃগয়াকে দশবিধ কামজ ব্যসন বা দোষের মধ্যে একটি রূপে চিহ্নিত করা হলেও কালিদাসের কালে মৃগয়া সম্পর্কে নিন্দা ও প্রশংসা—পরস্পর বিরুদ্ধ মত যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। রাজা দুষ্যন্তের বিদূষক মাধব্য ও সেনাপতির মুখে কালিদাস যথাক্রমে মৃগয়ার দোষ ও গুণগুলি বর্ণনা করেছেন। বিদূষক মৃগয়ার দোষ বা নিন্দারূপে আহার নিদ্রার ক্লেশ, শারীরিক কষ্ট, রাজকার্য পরিত্যাগ করে সাংঘাতিক স্থানে বনচরবৃত্তি গ্রহণের কথা বলেন (২.১ ও ২.৩), বিপ্রতীপে সেনাপতি মৃগয়াকে ব্যসন (দোষ) রূপে জানলেও রাজার সামনে তুলে ধরেন মৃগয়ার গুণগুলি (২.৫ ও ২.৬)— মৃগয়ার পরিশ্রমে মেদবর্জিত-ঘর্মহীন-সূর্যতেজ সহনীয়-প্রাণোচ্ছল-উদ্যমপূর্ণ-দৃঢ়-বলবান শরীর লাভ হয়; ভীত বা ক্রুদ্ধ পশুর আচরণের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়; ছুটন্ত পশুকে বাণবিদ্ধ করে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরের দক্ষতা অর্জিত হয়; সর্বোপরি মৃগয়ার মতো আনন্দ আর কোথাও নেই।[১০]

পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ (সংস্কৃত গল্প-সাহিত্য), *জাতক* (পালি গল্প-সংগ্রহ)

ইত্যাদিতেও বেশ কিছু ছোটো ছোটো শিকারের গল্প বিশেষত ব্যাধের ফাঁদে পশুপাখির পড়ার গল্প বর্ণিত হয়েছে। অধিক শিকারের লোভে ভৈরব ব্যাধের করুণ পরিণতি বা কাঁকনের লোভে পথিকের বুড়ো বাঘের কপটতায় ভুলে শিকারে পরিণত হওয়ার (*হিতোপদেশ*) মতোন কিছু গল্প থাকলেও এই সব গল্পের অধিকাংশতেই মূল কুশীলব পশুপাখিরা। বনের পশুপাখিদের কাছে ব্যাধ ও মৃগয়াগত বা দ্বিগ্বিজয়ে বেরনো শিবির স্থাপনকারী রাজা নিঃসন্দেহেই মূর্তিমান বিপদ বা সাক্ষাৎ অমঙ্গল। প্রকৃত বন্ধুত্বের জোরে পারস্পরিক সহায়তায় ব্যাধের হাত থেকে রক্ষা প্রাপ্তির (*পঞ্চতন্ত্র*, *হিতোপদেশের* 'লঘু পতনক কাক-হিরণ্যক মূষিক-মন্থর কূর্ম্ম ও চিত্রাঙ্গ মৃগর কথা', 'কুরঙ্গ-মৃগ-জাতক') কিংবা একতার শক্তিতে ব্যাধের জাল ছিঁড়ে পালাতে সক্ষম হলেও বিবাদে সর্বনাশ ঘটার (*হিতোপদেশের* 'কপোতরাজ চিত্রগ্রীবের কথা', 'সম্মোদমান-জাতক') মতো গল্প বর্ণিত হয়েছে। বহু জাতক কহিনিতেই দেখা যায় পাশবদ্ধ পশু বা পাখিটিকে ছেড়ে তার অনুচররা সবাই চলে গেলেও কখনও তার সঙ্গী বা সঙ্গিনী, কখনও সহোদর-সহোদরা, কখনও বা অনুগত বন্ধু কিছুতেই যায় না। পশুপাখিদের মধ্যেও এরূপ গভীর মৈত্রীভাব দেখে বিস্ময়াবিষ্ট ব্যাধ বা পাশবন্ধনকারী তখন পশু বা পাখিটিকে পাশমুক্ত করে দেয়। পশু বা পাখিটিও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ব্যাধকে কখনও নিজেই ধন উপহার দেয়, কখনও রাজাকে ধর্ম্মকথা শুনিয়ে ব্যাধকে ধন পাইয়ে দেয় ('সুবর্ণ মৃগ-জাতক', 'রোহন্ত মৃগ-জাতক', 'খুল্লহংস-জাতক', 'মহাহংস-জাতক')। *জাতক* কাহিনির এই জনপ্রিয় মোটিফটি আমরা পরবর্তী বাংলা *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যেও (বণিক খণ্ডে ব্যাধ ও শুকের ক্ষুদ্র বিবরণে) অনুসৃত হতে দেখব। ফাঁদে পড়া পশুপাখির মুখে ধর্মকথা বা সদুপদেশ শুনে ব্যাধ বা রাজার মন পরিবর্তনও *জাতক* কাহিনির একটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ ('মহাময়ূর-জাতক', 'ভল্লাটিকা-জাতক')। অনেক কাহিনিতে পশুপাখিরা (বিশেষত হাতি) মানুষের উপকার করলেও অকৃতজ্ঞ মানুষটি তার মূল্যবান দাঁত বা দেহাংশের লোভে তাকে বন্দির ব্যবস্থা করে ('মাতৃপোষক-জাতক', 'শীলবন্নাগ-জাতক'); পশুপাখিরা নিজেদের চরিত্রগুণে বা প্রজ্ঞাবলে বন্দিদশা মুক্তও হয় ('মাতৃপোষক-জাতক', 'গৃধ্র-জাতক')। বনে বাঘ, সিংহের মতো হিংস্র মাংসাশী জন্তু থাকে বলে তাদের ভয়ে যে মানুষের হাত বা কুঠার থেকে বনরক্ষা পায় তা বোঝা যায় 'ব্যাঘ্র-জাতকে'। বৃক্ষদেবতা ভীষণরূপ ধরে সিংহ, বাঘকে বন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেই বিপন্ন হয়ে পড়েন। আগুনে পোড়া মাংস ভক্ষণের জন্যও রাজাদের কাছে মৃগয়া বিলাস-ব্যসনটি সেযুগে প্রিয় ছিল। পঞ্চবিধ অস্ত্রে সজ্জিত রাজাকে সুশিক্ষিত, উৎকৃষ্ট কুকুর সহযোগে মৃগয়া

করতে দেখা যায় (‘ভল্লাটিকা-জাতক’)। ছলনার আশ্রয়ে পশুপাখিকে ফাঁদে ফেলা। বা শিকার করাও বেশ প্রচলিত ছিল। রাজা সরোবর খনন ও পক্ষি আহার্যের সুবন্দোবস্ত করে রানির জন্য হংসরাজকে পাশবদ্ধ করেন (‘মহাহংস-জাতক’); হাতির দাঁত সংগ্রহ করে বিক্রির জন্য তপস্বীর বেশ ধারণ করে এক ব্যক্তি হাতি শিকার করত ‘কষায়-জাতকে’; আবার ময়ূরকে ময়ূরী দ্বারা কামমোহিত করে পাশবদ্ধ করাও প্রচলিত ছিল (‘মহাময়ূর-জাতক’)। শিকার প্রসঙ্গ বা শিকারের কথা *পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, জাতক* কাহিনিগুলিতে এলেও মূল উদ্দেশ্য গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা বা উপদেশ দান।

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে শিকার-প্রসঙ্গ

নীহাররঞ্জন রায় *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব* গ্রন্থের সংস্কৃতি অংশে বাঙালির ‘শিকার ও অন্যান্য শারীর-ক্রীড়া, গৃহক্রীড়া’র পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছেন, ‘রাজা মহারাজ-সামন্ত-মহাসামন্ত প্রভৃতিদের প্রধান বিহারই ছিল শিকার বা মৃগয়া। আর অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি অরণ্যচারী কোমদের শিকারই ছিল প্রধান উপজীব্য ও বিহার দুইই’।[১১] প্রাচীন বাঙলায় প্রচলিত শিকারের কিছু নিদর্শন ধরা আছে পাহাড়পুর ও ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলিতে। (শবর) পুরুষ হরিণ শিকার করে কাঁধে ফেলে বাড়ি ফিরছে—এরূপ দৃশ্যও তাতে বর্তমান। নদনদী খালবিলে ভরা বাঙলায় স্বাভাবিক ভাবেই মাছ অন্যতম প্রধান খাদ্য ছিল। সমসাময়িক (দশম থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে মূলত বাঙলাদেশে রচিত) সংস্কৃত ও প্রাকৃত অপভ্রংশ সাহিত্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা তথ্যের ভিত্তিতে বোঝা যায়, সেকালে বাঙালির মৎস্যপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গে মাংসের প্রতিও বিরাগ ছিল না। মাংসের মধ্যে হরিণ মাংস খুবই প্রিয় ছিল, বিশেষত শবর, পুলিন্দ ইত্যাদি শিকারিজীবীদের মধ্যে ও সমাজের অভিজাত স্তরে। শ্রীহর্ষের *নৈষধচরিতে* দময়ন্তীর বিবাহভোজে হরিণ, ছাগ ও পক্ষী মাংসের নানা রকমের ব্যঞ্জনেরও উল্লেখ আছে।[১২] নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, আর্য-ব্রাহ্মণ্য ভারতে বিশেষত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক থেকেই খাদ্যের জন্য প্রাণী হত্যার প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্মে (বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে তো বটেই) একটা নৈতিক আপত্তি ক্রমশ দানা বাঁধছিল এবং আর্য-ব্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষ ক্রমশ নিরামিষ আহার্যের প্রতি পক্ষপাতী হয়ে ওঠে। বাংলাদেশেও নিঃসন্দেহে এই আপত্তি বিস্তৃত হয়। কিন্তু চিরাচরিত ও বহু অভ্যস্ত প্রথার বিরুদ্ধে তা যথেষ্ট কার্যকরী হতে পারেনি। মাংস ও মৎস্য আহার বাংলাদেশে এতটাই ‘সুপ্রচলিত ও গভীরাভ্যস্ত’ ছিল যে বাংলার স্মৃতিকারগণের (ভট্ট ভবদেব,

শ্রীনাথাচার্য প্রমুখদের) প্রাচীন নানা স্মৃতিকারদের মতামত, পুরাণাদির শ্লোক উদ্ধার করে বিশেষ কয়েকটি বার, তিথি বা পর্ব দিবস ছাড়া বাঙালির মাছ মাংস ভক্ষণের অভ্যাসকে সমর্থন করা ছাড়া উপায় থাকেনি।[১৩] ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাসিত সমাজে শামুক, কাঁকড়া, মোরগ, সারস, বক, হাঁস, দাত্যুহ পাখি (ডাক বা চাতক পাখি), উট, গরু, শুয়োর মাংস অভ্যক্ষ থাকলেও বাঙালির নিম্নতর সমাজস্তরে ও আদিবাসী কোমের মধ্যে শামুক, কাঁকড়া, মোরগ ইত্যাদির মাংস, নানা রকম আঁশ ছাড়া মাছ, সর্পাকৃতি বাণ মাছ, গর্তে কাদাবাসী নানা অকুলীন মাছ, নানা রকম পাখির মাংস সবই ভক্ষ্য ছিল। পঞ্চনখ প্রাণীর মধ্যে গোধা, শশক, সজারু, কচ্ছপ খাওয়াতেও কারো বিধিনিষেধ ছিল না। মৎস্যজীবীদের যেমন বৃত্তি ছিল মাছ শিকার তেমনি শবর, পুলিন্দ, নিষাদ জাতীয় ব্যাধদেরও বৃত্তি ছিল বনের পশুপাখি শিকার করা। তারাই হরিণ ও অন্যান্য পশুপাখির মাংস হাটে সরবরাহ বা বিক্রি করত। লোকনাথের 'ত্রিপুরা পট্টোলী'তে গহন বন কেটে নতুন গ্রাম পত্তনকালে বনবাসী হরিণ, মহিষ, বরাহ, বাঘ, সাপ ইত্যাদি জীবজন্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৪] বনজঙ্গলময়, বৃষ্টিবহুল ও গ্রীষ্মপ্রধান বাঙলায় স্বাভাবিকভাবেই বাঘ ও সাপের ভয় ছিল যথেষ্ট। এই ভয় থেকেই তাদের পূজা চালু হয়। পরে মধ্যযুগে মনসা পূজা ও দক্ষিণ রায় বা ব্যাঘ্র পূজায় তা আরও বিস্তৃত হয়। গাছপূজারও বিশেষ চল ছিল। মহিষের শৃঙ্গের তাড়নার জন্য মূর্খ গ্রাম্যলোকের কুঠারাঘাত থেকে বটগাছের রক্ষা পাবার কথা পাওয়া যায় গোবর্ধন আচার্যের একটি শ্লোকে।[১৫] গ্রীক বিবরণ, মেগাস্থিনিসের বর্ণনা, য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণ, *রাজতরঙ্গিনী, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র* থেকে জানা যায় প্রাচ্য দেশ ও পূর্বদেশীয় অঞ্চল (গঙ্গা রাষ্ট্র, কামরূপের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, গৌড় দেশ, কলিঙ্গ, অঙ্গ, করূষ ইত্যাদি স্থান) হাতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বাঙলায় পাল ও সেন রাজাদের সামরিক শক্তিতে হাতির স্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজরাজড়া, সামন্ত-ভূস্বামীদের যাতায়াতের অন্যতম প্রধান বাহনও ছিল হাতি। খেদা পেতে হাতি ও করভ (হাতিশিশু) ধরা হত। বাঙলাদেশে যে হাতি ধরার ও হস্তী-আয়ুর্বেদ বা গজ-চিকিৎসা নামে বিশেষ বিদ্যা/শাস্ত্রের উদ্ভব ও প্রসিদ্ধি ঘটে তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমাণ করে দেখান।[১৬]

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যেও শিকারের নানা প্রসঙ্গ, শিকারের বিবরণ স্থান পেয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন যে *চর্যাগীতি*, তাতে ভুসুকুপাদের দুটি (৬নং ও খণ্ডিত ২৩ নং) চর্যাগানে আছে শিকারের চিত্র। চারদিক বেষ্টন করে হাঁক পড়ছে। 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী। খনহ না ছাড়অ ভুসুকু অহেরী।।' (৬নং)[১৭];

হরিণ নিজের মাংসে নিজেরই শত্রু; ভুসুকু ক্ষণিকের জন্যও শিকার না ছাড়ায় হরিণ ঘাস, জল খায় না; হরিণীর নিলয়ও জানে না। হরিণীর কথায় হরিণ বন ছেড়ে পালায়; ভয়ে অতি দ্রুত পালানোয় তার খুর দেখা যায় না। ৬নং চর্যার হরিণ পালালেও ২৩ নং (খণ্ডিত) চর্যার মায়াহরিণী কিন্তু মায়াজালে বাঁধা পড়েছে। সেখানে শিকারে গেলে ভুসুকুকে পাঁচ জনকে মারার, নলিনী বনে একমনা হয়ে প্রবেশ করার ও মাংস ত্যাগ না করে তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ না করার— নির্দেশও দেওয়া হচ্ছে। চর্যা দুটি থেকে বোঝা যায়, সে সময় সমাজে নিম্নবর্ণীয়দের জীবিকা রূপে শিকার প্রচলিত ছিল। তবে চর্যাগীতি দুটিতে শিকারের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হলেও শিকার এখানে কিন্তু আসলে রূপক। সহজযান বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ভুসুকুপাদ শিকার-শিকারি-জাল-হরিণ-হরিণির রূপকে তাদের ধর্মতত্ত্ব ও গূঢ় সাধন পদ্ধতি (চিত্তকে সাংবৃত্তিক অবস্থা থেকে পরমার্থিক অবস্থায় পরিণত করার, অবিদ্যা হনন করে সহজসুখ লাভ করার কথা)-কেই সাংকেতিকভাবে বর্ণনা করেছেন।

চণ্ডীমঙ্গলের আখেটিক খণ্ডের নায়ক কালকেতু বৃত্তিতে ব্যাধ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এসেছে কালকেতুর মৃগয়া বা শিকারের প্রসঙ্গ। মুকুন্দের বর্ণনায় :

অনুদিন পশু বধে বীর মহাবল
কুরুরণে সেনা জেন বধে বৃহন্নল।
শুণ্ডে ধরি মাতঙ্গ গজ আছড়িয়া মারে
দন্ত উপাড়িয়া বীর আনে বোঝাভারে। (৭৪নং পালা)[১৮]

শুধু হাতি নয় কালকেতু চামরি, ভালুক, মহিষ, বাঘ, শরভ, গন্ডার, শশারু (পাঠান্তরে সিংহ, কপি, বরাহ, শিবা, নকুল, করঙ্গ) শিকার করে। সে যেমন যন্ত্র পেতে বাঘ মারে, তাড়িয়ে মহিষ ধরে, তেমনি বন বেড়ে জাল পেতে রেখে ঝোপে বাড়ি মেরে বনের ছোটো ছোটো পশুদের ধরতেও ছাড়ে না। কালকেতুর শিকারলব্ধ পশুদের দাঁত, লেজ, শিঙ, নখ, ছাল, খড়্গা—ফুল্লরা নগরচাতারে (হাটে) বিক্রি করে। এই দ্রব্যগুলির বাজার চাহিদার কারণ ও সেগুলির বাজার মূল্যও মুকুন্দ চমৎকারভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে শিকারের ক্ষেত্রে কালকেতু অবশ্য সেভাবে কোনও নিয়মকানুন ন্যায়নীতি মানে না : 'জাহারে সমুখে দেখে মারে বীর জাকে তাকে'।[১৯] কালকেতুর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত পশুদের গোহারিতে দেবি চণ্ডী পশুদের আজ থেকে 'না বধিবে মহাবীর কহিনু নিশ্চয়' অভয় দান করে নিজে স্বর্ণগোধিকা রূপে কালকেতুর যাত্রাপথে অবস্থান করেন। যাত্রাপথে সুমঙ্গল অমঙ্গল চিহ্ন সংক্রান্ত সংস্কার শিকারিদের মধ্যে যুগে যুগেই যে

বিদ্যমান, তার প্রমাণ মেলে কালকেতুর 'অযাত্রিক পাপ' সুবর্ণগোধিকা দর্শনের প্রতিজ্ঞায় : 'যদি মৃগ পাই আমি জানিব দেবতা তুমি/নহে তোমা পোড়াব অনলে'(৮৬)।[২০] এরপর রয়েছে মায়ামৃগীরূপে দেবীর সারাদিন বনে কালকেতুকে নাজেহাল করার বর্ণনা :

মৃগ অনুপদী বীর ধায় লঘুগতি। ক্ষেণে ক্ষেণে ধূলায় লুকান ভগবতী।।
রহিয়া রহিয়া যান দীঘল তরঙ্গ। তার পাছে ধায় ব্যাধ যেমন পতঙ্গ।।[২১]

শেষ পর্যন্ত মৃগবধে ব্যর্থ হয়ে কালকেতুর বীর অভিমান খর্ব হয়ে উপলব্ধি ঘটে : 'মৃগ নহে জেন দেবমায়া' (৮৮)।[২২]

পূর্বেও মৃগয়ার (tracking-এর) অনুরূপ একটি অত্যন্ত জীবন্ত দৃশ্য আখেটিক খণ্ডেই অঙ্কিত আছে। সেখানেও মৃগ বা 'শিকার' হল রূপসী হরিণীবেশী দেবী চণ্ডী স্বয়ং, তবে শিকারি ধর্ম্মকেতু; আর শিকার-দ্রষ্টা বিজুবনে পুষ্পচয়নে আসা ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর; উদ্দেশ্য—নীলাম্বরকে শাপগ্রস্ত করে কালকেতু রূপে মর্ত্যে প্রেরণের জন্য ব্যাধ-জীবনের প্রতি তার মনে লিপ্সা জাগানো।

ধনপ্রাপ্তির পর দেবীনির্দেশে কালকেতুর বন কেটে গুজরাট নগর পত্তনকালে, দেবীর আশ্বাসপ্রাপ্ত বন্যপশুদের কী হল তার কোনও হদিশ মুকুন্দ দেন না। তবে ঐ বনে বাসকারী এক ভয়ানক বাঘের কথা শুধু জানা যায়। বাঘের ভয়ে বেরুণিয়ারা বিদায় নিতে চাইলে কালকেতু দেবীর কাছে প্রাণী না বধের সত্য-অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও সূর্যকে সাক্ষী করে প্রয়োজনের স্বার্থে বাঘ শিকারে নামে। ফলে বাঘে-মানুষে শুরু হয় দুর্দ্ধর্ষ লড়াই। বাঘ নিহত হলে 'মহাবীর হাতে গাণ্ডী ফিরয়ে কানন। বন কাটে মহানন্দে বেরুনিয়া জন'।[২৩] তবে অরণ্যের সব গাছপালাই নিশ্চিহ্ন করে নগর পত্তন হয়নি; দরকারি গাছদের রেখে অদরকারি ও অন্যান্য গাছ কেটে ফেলা হয়।

চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখণ্ডেও আছে 'উজবনি' নগরবাসী দু-ভাই খগান্তক মৃগান্তকের জাল, ধনুশর দিয়ে পাখি শিকারের এক ক্ষুদ্র বিবরণ (২১৩)। ফাঁদে পড়া শুকের মুখে প্রাণরক্ষার্থে এখানে বর্ণিত হয় ব্যাধবৃত্তির নিন্দা— জীববধ পাপের জন্য পরলোকে ফলপ্রাপ্তির কথা ও প্রাণীবধ ত্যাগ করে 'প্রমথস্বামী' ভজনার নির্দেশও। শিকার ঘটনার সূত্রে গৃহে আনা স্বর্ণগোধিকা দেবী চণ্ডীতে রূপান্তরিত হয়ে দরিদ্র ব্যাধ কালকেতুকে স্বেচ্ছায় কৃপা করেছিলেন; দেবপ্রদত্ত ধন ও নির্দেশেই কালকেতু ব্যাধ থেকে পরিণত হয়েছিল রাজায়। এখানেও শিকারে প্রাপ্ত শুকের বচনে ব্যাধ শুককেই গুরু বলে মেনে প্রাণিবধবৃত্তি ত্যাগ করে ভক্তিমান হয়ে উঠে বলে—'বৈষ্ণব জনের

সনে নিস্তারিব জীব'[২৪] (২১৫); সেই সঙ্গে শুকের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত পরামর্শ মেনেই ব্যাধ শুকসারিকে রাজার কাছে ভেট দিয়ে লাভ করে 'অনেক কাঞ্চন' ধন। প্রহেলিকা (যোগ সাধনার ব্যাখ্যা) ও পুরাণ-ইতিহাস বলা শুকের জন্য বিস্ময়মুগ্ধ রাজা স্বর্ণপিঞ্জরের খোঁজ করাতেই, রাজনির্দেশে বণিক ধনপতি সদাগরকে নৈরাশ্য সত্ত্বেও গৌড়ে পাটন-যাত্রা করতে হয়। সুতরাং *চণ্ডীমঙ্গলের* আখেটিক ও বণিক উভয় খণ্ডেই বর্ণিত শিকার প্রসঙ্গগুলি কাহিনির অগ্রগতিতে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। *চণ্ডীমঙ্গলের* শিকার ঘটনাগুলি গল্পরসে পরিপূর্ণ হলেও মূল উদ্দেশ্য দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচার— বিপদ থেকে রক্ষা (প্রতিকার) ও সুখ সমৃদ্ধি সম্পদ লাভ (অভ্যুদয়)-এর জন্য দেবী চণ্ডীর মঙ্গল গান। পূর্ববর্তী *বৌদ্ধ চর্যাগীতি, নাথগুরুবাণী গানে* 'শিকার'কে রূপক রূপে ব্যবহারের পরম্পরাটি মনে রাখলে বোঝা যায় *চণ্ডীমণ্ডলের* মৃগয়া image বা শিকার প্রসঙ্গগুলির মধ্যেও আসলে নিহিত আছে নিগূঢ় সাধনপ্রণালী ও ধর্মতত্ত্বের ইঙ্গিত।[২৫]

ধর্মমঙ্গলেও রয়েছে নায়ক লাউসেনের বাঘ ও কুমির বধের কাহিনি। কুমির বধের ঘটনাটি বৈচিত্র্যহীন ও সংক্ষিপ্ত হলেও 'বাঘ বধের পালা'টি আকর্ষক ও বেশ দীর্ঘও। লাউসেন গৌড় যাত্রাকালে কর্পূরধবলের মুখে জালন্দার গড়ের রাজা 'বাঘ কামদলে'র কথা শোনে। জালন্দার রাজা জাল্লালশিখর বা জল্লাদশিখর শিকারে এসে এক 'মাতৃহীন বাঘশাবক'কে পেয়ে পুত্রস্নেহে বড়ো করেছিলেন। কিন্তু একবার বাঘকে মাংস খাওয়ালে মাংসের স্বাদ পেয়ে স্বভাবজ হিংস্রতায় বাঘ পালককেই আক্রমণ করে বসে। রাজা পালিয়ে দ্বাররুদ্ধ করে প্রাণ বাঁচান। বাঘও সেখান থেকে উধাও হয়ে ক্রমে নরখাদক হয়ে ওঠে। খাঁচায় ছাগল-গাড়রের টোপ দিয়ে বাঘকে খাঁচাবন্দি করা গেলেও রাজার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসে অপমানিত হরপার্বতী বাঘকে খাঁচামুক্ত করে দিয়ে যান; সঙ্গে দেন বরও। ফলে অচিরেই বাঘ জালন্দার ত্রাস হয়ে ওঠে; নগর জনশূন্য হয়ে যায়। বাঘের এরূপ অত্যাচারের কথা শুনে লাউসেন বাঘ শিকারে বিশেষ আগ্রহী হয়—বাহুবলে বাঘকে মেরে 'ঘুচাব দেশে ভয়।'[২৬] তাছাড়া জালন্দার পথে গেলে যেমন গৌড়েশ্বরের রাজসভায় পৌঁছতে তাদের কম সময় লাগবে তেমনি 'বাঘকে বধিলে যশ ভূপতির ঠাঞি।/ক্ষেত্রী হয়্যা ক্ষীণ হলে ক্ষেত্র মাত্র নাঞি'।[২৭] কামদলকে মেরে তার লেজ কান কেটে নিয়ে গিয়ে গৌড়েশ্বরকে দিলে 'প্রভুত্ব হবেক বড় পাইব ইনাম।/দেশে দেশে দশ গাঁয় বাড়িবেক নাম।'[২৮] ভীত কর্পূরধবল যেতে রাজি না হওয়ায় তাকে গাছের উপর নিরাপদে বেঁধে রেখে তাই লাউসেন একাকিই জয়খড়্গ হাতে বাঘ শিকারে যায়। লাউসেন অবশ্য *চণ্ডীমঙ্গলে* ব্যাধ-কালকেতুর মতো দেখামাত্রই নির্বিচারে প্রাণীবধে

উদ্যত হয় না। মহাভারত-ভাগবত-গীতা-পুরাণ থেকে সে জানে নিদ্রাগত জনকে মারলে পাপ হয়। এজন্য নিদ্রারত বাঘকে ডেকে, মুষ্টিক মেরেও কিছুতেই নিদ্রাভঙ্গ করতে না পেরে সে 'তিনবার সূর্য সাক্ষী' করে বাঘের লেজ ধরে 'চাকসম পাক দিয়ে ঘুরিয়ে' আগে বাঘকে জাগায়। উভয়ের ঘোর রণে লাউসেন (বেশ কয়েকবার) বাঘের শির কেটে নিলেও হরপার্বতীর আশীর্বাদপুষ্ট বাঘের কাটা মাথা (বারবার) জোড়া লেগে যায়। শেষে লাউসেন ধর্মের স্তুতি করে কাতর প্রার্থনা জানালে ধর্মের অনুরোধে হনুমান এসে লাউসেনকে বাঘ মারার পদ্ধতি জানিয়ে দেয় ও নিজে লাউসেনের অঙ্গে ভর করে। ফলে এবার ধর্মের কৃপায় লাউসেন মল্লবেশ ধরে বাঘ বধে সমর্থ হয় :

উপর গগনে ঘর ঘুরাইয়া পাক
পাষাণে আছাড় মারি বলে ধর্ম্ম রাখ।।
খসিয়া পড়িল যেন পর্ব্বতের চূড়া
ভাঙ্গিল মাথার খুলি হাড় হল-গুঁড়া।।[২৯]

বাঘ বধের পর তৃষ্ণার্ত লাউসেনরা তারাদিঘিতে যায়। সেখানে পদ্ম তুলে ধর্মের উপাসনাকালে এক বিশাল কুমির লাউসেনের পা ধরে জোর করে জলে টেনে নিয়ে যেতে চাইলে লাউসেন আত্মরক্ষার্থে কুমিরটিকে হত্যা করে :

পাইল প্রবল শক্তি প্রভুর কৃপায়।
বীরদাপে কুম্ভীর সহিত উঠে রায়।।
আড়ায় আছাড় মারি বেগে ফেলে ছুড়ে।
হতমান হয়ে পড়ে কত দূর যুড়ে।।
খড়্গে খণ্ড খণ্ড করি বা'র করে আঁত।
যত্নে নিল নক্রের নিশান নখ দাঁত।।[৩০]

ধর্মমঙ্গলে যেমন সেকালের রাজা-ভূস্বামীদের হাতিতে চড়ে সৈন্য-চাকরবাকর সহ জাল দিয়ে বন ঘিরে 'হাঁকোয়া' শিকার পদ্ধতির বাস্তবোচিত বিবরণ আছে (শিমুল নগরের সন্নিকটস্থ বিপিনে কালি বাঘিনীকে শিকার, জাল্লালশিখরের বা গৌড়েশ্বরের শিকারযাত্রা) তেমনি আবার শিকার ও শিকারজন্তুটিকে ঘিরে সেযুগের নানা লোকায়ত চিন্তা ভাবনাও ধরা পড়েছে। পিতৃসম্পত্তির লোভে ভাইকে শিকার যাত্রায় নিয়ে গিয়ে বন্যজন্তুর মুখে ফেলে আসাও হয়তো বিরল ছিল না—তা কর্পূরধবলের বারবার করা সন্দেহ, আশঙ্কা থেকে বোঝা যায়। বাঘের মানুষে রূপান্তরের অতিপ্রাকৃত ধারণাটিও সেযুগে লোকায়ত বিশ্বাসে সম্ভবত বেশ পাকা ছিল। লাউসেন বাঘ বধ করে এসে ভাইকে গাছ থেকে

নামতে বললে ভীত কর্পূর তা বাঘের ছলনা ভেবে পরীক্ষা করতে লাউসেনের বংশপরিচয় জানতে চায়, মায়ের নামে দিব্য করতে বলে।

জীবজন্তু বিশেষত ভয়ানক হিংস্র বন্যপ্রাণীরা মানুষের লোকায়ত বিশ্বাস, কল্পনায় প্রায়ই স্থান পায় দেবদেবীর কৃপাধন্য রূপে। *ধর্মমঙ্গলেও* দুর্দান্ত বাঘটির—রক্ষক দেবী অভয়া দুর্গা, বরদাতা স্বয়ং শিব। বাঘ বা কুমির বধের সত্য বা বাস্তব কাহিনির সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের কবিরা মিশিয়েছেন নানা অলৌকিক উপাদান, প্রচলিত পশুকথা, রূপকথার নানা বৈশিষ্ট্যও। লাউসেনের দ্বারা বধ্য বাঘ ও কুমির উভয়ের সঙ্গেই যোগ করেছেন শাপগ্রস্ত স্বর্গভ্রষ্টের আখ্যান (‘ব্যাঘ্র-তত্ত্ব’, ‘নক্র-তত্ত্ব’)। কামদল বাঘ আসলে শাপগ্রস্ত ইন্দ্রপুত্র/ইন্দ্রের নর্তক ও কুমির হল সুরপুরের নর্তক হীরাধর। ব্যাঘ্রবাহিনী দুর্গাকে দেখে—কটূবাক্য প্রয়োগ, অপমান করা কিংবা ভয়ে তাল ভঙ্গ করার অপরাধে দুর্গার শাপেই তাদের মর্ত্যে মানবেতর জন্মলাভ; পরে ধর্মের বরপুত্র লাউসেনের হাতে শিকার হয়ে ঘটেছে শাপমুক্তি। শিবদুর্গার কৃপাপুষ্ট বাঘ জালন্দারের ত্রাস হয়ে উঠলে ধর্মের সেবক লাউসেন ধর্মের কৃপায় বাঘ শিকার করে বিপন্ন পুরীকে ‘নির্ভয়, পরম মঙ্গল’ করে; বাঘও শাপমুক্ত হয়। বাঘ শিকারের উত্তেজনাপূর্ণ উপকাহিনিটির মারফত এখানে ধর্মঠাকুরের শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও ভক্তবাৎসল্যকেই ধর্মমঙ্গলকাররা সুকৌশলে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। বাঘ শিকারে লাউসেনকে সাহায্য করতে আসা হনুমানের উক্তিতেও তা সুস্পষ্ট :

শিব শুক সনাতন সয়ম্ভু নারদ
ভক্তি ভাবে ভবানী ভাবেন যার পদ।।
তোমা হেতু হেন প্রভু হলো ব্যস্তচিত
অতেব এখানে আসি আমি উপস্থিত।।[৩১]

বাঘকে শিকারে জাল্লালশিখর এমনকি সসৈন্য গৌড়েশ্বরও যেখানে ব্যর্থ হয়ে ভীত পলাতক, সেখানে কর্পূরধবলের নিষেধ সত্ত্বেও লাউসেন একাকিই বাঘ শিকারে গেছে ও ধর্মের কৃপায় সফলও হয়েছে। এরকম বীরের পক্ষেই তো একমাত্র সম্ভব পরবর্তীকালে গৌড়েশ্বর ও বিদ্রোহী সামন্ত ইছাই ঘোষের দ্বন্দ্বে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ। তাই গৌড় যাত্রাকালে লাউসেনের বাঘ ও কুমির শিকার পালার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য— লাউসেনের মধ্যেকার নায়কোচিত ক্ষাত্রবীর্যকে তুলে ধরা; তার অসামান্য বীরত্ব, অমিত সাহস, শারীরিক বল বা মল্লবিদ্যার অদ্ভুত নৈপুণ্যকে চিত্রিত করা। সেই সঙ্গে ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচার।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে শিকার যেমন প্রচলিত ছিল, প্রাগাধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেও তেমনি শিকার প্রসঙ্গ যথেষ্টই হাজির। অভিজাত, রাজরাজড়াদের কাছে শিকার ছিল বিনোদন; আর অরণ্যলগ্ন বা অরণ্যচারী মানুষ, উপজাতি গোষ্ঠী ও সমাজের নিম্নবর্ণদের কাছে শিকার ছিল অন্যতম জীবিকা। প্রাচীন 'সামাজিক ও প্রায়োগিক শাস্ত্র', 'রাজনীতিশাস্ত্র'গুলি মৃগয়া বা শিকারকে 'ব্যসন' রূপে চিহ্নিত করলেও, শিকারের দোষগুণ নিয়ে পরস্পর বিরোধী মত যুগে যুগে প্রবল ছিল। একদিকে শিকারে ছিল প্রভূত আমোদ, রক্তের নেশা, বীরত্ব ও যশাকাঙ্ক্ষা; অন্যদিকে প্রাণীবধজনিত অপরাধবোধও। ফলে শিকারের সঙ্গে পাপপুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্মবোধও ভারতীয়মানসে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। শিকারের প্রতি ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দৃষ্টিভঙ্গিই বারেবারে ধরা পড়েছে প্রাগাধুনিক ভারতীয় ও বাংলা সাহিত্যে। শিকার অভিযানে গিয়ে বিশেষ কিছু প্রাপ্তির 'motif' টি বারবার ঘুরেফিরে ব্যবহৃত হয়েছে। মৃগয়া সূত্রে ধন, প্রণয়াস্পদ বা স্ত্রী, অস্ত্র, বীরের মর্যাদা, দেবদেবীর কৃপা—লাভ ইত্যাদি শুভ প্রাপ্তির ঘটনা যেমন আছে, তেমনি অভিশাপ লাভ, দুর্ঘটনা, জীবন বিপর্যয় ইত্যাদি অশুভ প্রাপ্তিযোগও অনেকক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। শিকার প্রসঙ্গ কখনও সাহিত্যে এসেছে কাহিনির গূঢ় সূত্র মেনে, কখনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক রূপে। আবার শিকারের গল্পচ্ছলে কখনও শোনানো হয়েছে নীতিবাক্য, দরকারি উপদেশ; কখনো বা শিকার রূপক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে রচনাকারের গূঢ় উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্য। বাংলা ধর্মাশ্রয়ী প্রাগাধুনিক সাহিত্যে ধর্মদর্শন ও সাধনোপলব্ধিকে আভাসিত করতে পদকার, কাব্যকাররা প্রায়ই 'শিকার' বা 'মৃগয়া'কে রূপক রূপে ব্যবহার করেছেন। শিকারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বীরত্ব, শৌর্য, সাহস, প্রাণরক্ষার আপ্রাণ প্রচেষ্টা, উত্তেজনা, রোমাঞ্চ। ফলে শিকারের গল্প শোনা ও বলা সম্ভবত সর্বকালেই লোকপ্রিয়। তাই শুধু লিখিত সাহিত্যে নয়, শিকার নিয়ে মৌখিক সাহিত্যেও নানা টুকরোটাকরা গল্প, লোককথা, লোকগান, আঞ্চলিক কাহিনি, কিংবদন্তি, অদিবাসীকথার নিদর্শন মেলে।

বাংলা আধুনিক শিকার-সাহিত্যের উদ্ভব

ভারতীয় তথা বাংলা প্রাগাধুনিক লিখিত ও মৌখিক সাহিত্যে শিকারের টুকরো টুকরো কাহিনি বা শিকার প্রসঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও, আজ আমরা 'শিকার-সাহিত্য' বলতে যা বুঝি তা মূলত ঔপনিবেশিকতারই ফসল। ব্রিটিশ উপনিবেশকালে ভারতে শিকার নিছক বিলাস বা শুধুমাত্র জীবিকার বদলে অত্যন্ত জরুরি ক্রীড়ার

(Sports) মান্যতা পায়। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক কারণে শিকারের বহুমাত্রিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। শিকারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িয়ে যায় ঔপনিবেশিক প্রভু ও উপনিবেশবাসী উভয়েরই নানা অভিপ্রায়, জটিল নানা কূটকৌশল, শৌর্যবীর্য-পৌরুষের ধারণা। উনিশ শতকের প্রথম থেকেই ব্রিটিশ রাজপুরুষ ও আর্মি অফিসাররা অনেকেই তাদের এদেশে শিকারের অভিজ্ঞতাকে ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন।

শিকার লিখিয়েদের নাম	বইয়ের নাম
Captain Thomas Williamson	*Oriental Field Sports; Wild Sports of the East* (1808)
Surgeon Daniel Johnson	*Sketches of Indian Field Sports : With Observations on the Animals* (1827)
Walter Cambell (Jungle wallah)	*The Old Forest Ranger : Or, Wild Sports of India on the Neilgherry Hills, in the Jungles, and on the Plains* (1842)
Major General William Rice	*Tiger Shooting in India* (1857)
Major Henry Shakespear	*The Wild Sports of India* (1857)
RHW Dunlop	*Hunting in the Himalaya* (1860)
William Gordon Cumming	*Wild Men and Wild Beasts : Scenes in Camp and Jungle* (1861)
Lt.Col. Augustus Henry Irby	*The Diary of A Hunter : From the Punjab to the Karakorum Mountains* (1863)
Sir Joseph Fayrer	*The Royal Tiger of Bengal : His Life and Death* (1875)
Captain J Forsyth	*The Highlands of Central India* (1871)
Captain John Henry Baldwin	*The Large and Small Game of Bengal and the North-western Provinces of India* (1877)

শিকার লিখিয়েদের নাম	বইয়ের নাম
G.P. Sanderson (Elephant King)	*Thirteen Years among the Wild Beasts of India : Their Haunts and Habits from Personal Observation, with an Account of the Modes of Capturing and Taming Elephants* (1882)
Alexander Kinloch	*Travel, Exploration and Sports in Himalayas : Tales of Large Game Shooting* (1885)
Col, Cuthbert Larking	*Bandobast and Khabar : Reminiscences of India* (1888)
Sir Edward Braddon	*Thirty Years of Shikar* (1895)
Lt. Col. William Thomas Pollok	*Fifty Years' Reminiscences of India : A Retrospect of Travel, Adventure and Shikar* (1896)
Charles Edward Mackintosh Russell	*Bullet and Shot in Indian Forest, Plain and Hill : With Hints to Beginners in Indian Shooting* (1900)
Col. Alexander I.R. Glasfurd	*Rifle and Romance in the Indian Jungle : A Record of Thirteen Years* (1905)
C.E. Gouldsbury	*Tiger Land: Reminiscences of Forty Years Sport and Adventure in Bengal* (1913)

এখানে আমরা মাত্র কয়েকটি বিখ্যাত রচনাকেই হাজির করলাম, তালিকাটি অনায়াসেই সুবৃহৎ করে তোলা যায়। তালিকাটির দিকে তাকালেই বোঝা যায়, কর্ম্মসূত্রে ভারতাগত ব্রিটিশরা—আর্মি অফিসার, ডাক্তার, রাজপুরুষ, প্রশাসনিক আধিকারিক, ফরেস্ট অফিসার প্রমুখরা—ভারত উপমহাদেশের বিশেষত হিমালয়ের পাদদেশ, নীলগিরি, বাঙলা, মধ্যভারত, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের অজানা অরণ্যে তাদের শিকারের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে একের পর এক ডায়েরি, স্মৃতিকথা রচনা করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশদের শিকারে

প্রাপ্ত ট্রফি বা শিকার-স্মৃতিগুলি (বাঘের চামড়া, হাতির দাঁত, হরিণের শিং ইত্যাদি) যেমন মূল ভূখণ্ডের অর্থাৎ ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল তেমনি এই শিকার-সাহিত্যগুলিও তাদের মধ্যে তীব্র আলোড়ন জাগায়। কেননা, এই শিকার-সাহিত্যগুলির মাধ্যমে তারা সুদূর ব্রিটিশ-উপনিবেশ রহস্যময় ভারত ও সেখানকার অজানা নানা পশুপাখি সমৃদ্ধ অরণ্য, মানুষজন সম্পর্কে জানতে পারে; তাদের কৌতূহলকে খানিক তৃপ্ত করতে পারে।

প্রথম পর্বের এই ইউরোপীয় শিকার-লিখিয়েরা মূলত জোর দিয়েছেন শিকারি রূপে নিজেদের অসামান্য দক্ষতা ও বীরত্বকে মহিমান্বিত (glorify) করায়। অজানা, অচেনা ভারতীয় উপমহাদেশের বিপদসঙ্কুল অরণ্যে শিকারের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণার মাধ্যমে তারা নিজেদের শিকার নৈপুণ্য-শৌর্যবীর্য-পৌরুষ-সাহসের রোমন্থন করে আত্মশ্লাঘা বোধ করতেন। সেই সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিভূ বা ঔপনিবেশিক সরকারের একনিষ্ঠ সেবকরূপে নিজেদের ভূমিকাকে মহিমান্বিত করেও চালাতেন প্রচার। ব্রিটিশ যুবাদের আকৃষ্ট করতে অনেক সময় শিকারের প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণে বেশ রংদার ভাবে পরিবেশিত হতে থাকে শিকার-ফিকশন। 'নিজেকে বা নিজের জাতি'কে একমাত্র শ্রেষ্ঠতম ভাবার (superior self) কল্প-ধারণাটির ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক শিকার লিখিয়েরা নির্মাণ করেন অতি-পৌরুষের তত্ত্ব। ফলে তাদের বর্ণনায় সাহেব শিকারিরাই 'super-masculine'। বিপ্রতীপে ভারতীয় শিকারিরা সাধারণত দুর্বল, মেয়েলি, ভীতু, কাপুরুষ।

উপনিবেশের শিকার সংস্কৃতির অঙ্গরূপে—শিকারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রোমান্টিক আবেদনও। শিকারের মতো রক্তাক্ত হত্যার নির্মমতা, নিষ্ঠুরতাকে এই শিকার-লিখিয়েরা অনেক সময়ই ঢেকে দিয়েছেন আশ্চর্য রোমান্টিকতার মোহ মোড়কে। ফলে শিকার নেশা রক্ততৃষ্ণার বদলে তাদের বর্ণনার জাদুতে হয়ে উঠেছে 'উচ্চতর, মহত্তর অনুভূতি', 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উদ্যম', 'বিপদ কাটিয়ে ওঠার অদম্য জেদ ও আনন্দ'।[৩২] এমনকি 'শত্রু' অর্থাৎ শিকার বন্যজন্তুটির শান্ত হয়ে চার পা উপর দিকে তুলে মরে পড়ে থাকার দৃশ্যকে কেউ বর্ণনা করেছেন শিকারির কাছে অবর্ণনীয়, অনির্বচনীয় আনন্দানুভূতি রূপে;[৩৩] কেউবা রাইফেল গর্জনের পর শিকার পতনের 'নরম ধপাস' শব্দকে বলেছেন শিকারির কানে 'যেন প্রেয়সী কণ্ঠের মধুর মূর্ছনা'।[৩৪] অরণ্য-অরণ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-নানা প্রজাতির পশুপাখি ও সর্বোপরি শিকারকে ঘিরেই শিকারির যাবতীয় রোমান্টিকতা। কখনো-কখনো অবশ্য শিকারির মনে দুঃসাহসী শিকার সফলতার

মাধ্যমে প্রিয় মানুষীর হৃদয় জয়ের আকাঙ্ক্ষাও বর্তমান। আর শিকারির বীরত্ব-বেপরোয়া দুঃসাহস-বিপন্ন জনপদকে রক্ষার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ, তার বলিষ্ঠ রুক্ষ পৌরুষ (sexual conquest), উদাসী নিঃসঙ্গতা—মিলেমিশে যে রোমান্টিক আবেদন, তার দুর্নিবার আকর্ষণে নারীরাই শুধু স্বেচ্ছায় আকৃষ্ট হয়নি। তাতে বারে বারে মোহমুগ্ধ হয়েছে শিকার-সাহিত্যের পাঠকরাও, বিশেষত রোমান্টিক স্বপ্নবিভোর তরুণ পাঠকরা। আর নবীন প্রজন্ম (rising generation)-কে মন্ত্রমুগ্ধ করে শিকার ক্রীড়ায় উৎসাহিত করা তো উপনিবেশবাদী এই শিকার লেখকদের অন্যতম অন্বিষ্ট।

William Rice, Henry Shakespear, Major Walter Cambell, Captain John Henry Baldwin, G. P. Sanderson, William Thomas Pollok, Sir E. Braddon, Charles Edward Mackintosh Russell প্রমুখদের কলমে ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা এই শিকার-সাহিত্য ধারাটি দ্রুত ব্রিটিশদের মধ্যে ও ভারতীয় বিশেষত বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোক পাঠকদের কাছেও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়।

শিকার উচ্চবর্গের বিলাস ব্যসন ও নিম্নবর্গের জীবিকা-আত্মরক্ষার তাগিদ, কখনো বা আমোদ উৎসব রূপে ভারতে বহুযুগ ধরে প্রচলিত ছিল ঠিকই; কিন্তু ভারতে আগত ব্রিটিশদের শিকার প্রীতি, তাদের সৌজন্যে গড়ে ওঠা ইন্দো-ইউরোপীয় মিশ্র শিকার সংস্কৃতি ও এই শিকার-সাহিত্যগুলিতে প্রচারিত শিকার সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিগুলি ভারতীয় বিশেষত বাঙালিদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সম্ভ্রান্ত ধনী থেকে সরকারি চাকুরে, শিক্ষিত ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত বাঙালিদের কাছেও 'elite sports' শিকার হয়ে ওঠে আগ্রহের; পাশ্চাত্য শিক্ষা-সাহিত্য-সাজসজ্জা-সংস্কৃতির মতোই সাহেবদের ক্রীড়া-বিনোদনগুলিও বাঙালি সমাজ আত্মীকরণ করতে চাইত। ফলে সাহেবদের অনুকরণে শিকার ক্রীড়ার মাধ্যমে সাহেবি ও দেশি উভয় সমাজেই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য, আভিজাত্য, মর্যাদা প্রকাশে তারা তৎপর হয়ে ওঠে। ভারতীয় তথা বাঙালি রাজন্য, জমিদাররা ব্রিটিশ রাজপুরুষ, আমলা, অফিসারদের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ শিকারযাত্রার এলাহি ব্যবস্থা ও শিকারে সহায়তা করে যেমন একদিকে শাসকের অনুগ্রহ ও বিশেষ রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভের চেষ্টা করত, তেমনি কখনো-কখনো নিজেদের হৃত গৌরব, বীরত্ব, পৌরুষ বা 'রাজকীয় ইগো'কেও শিকারের মাধ্যমে ঝালিয়ে নিতে চাইত। উচ্চ ও মধ্যবর্গের সরকারি চাকুরে বাঙালিদেরও ঊর্ধ্বতন ব্রিটিশ অফিসারদের জন্য শিকারের আয়োজন করতে হত, হতে হত শিকারসঙ্গী। কিন্তু শিকারি এবার আর শুধু বাঙালি অভিজাত রাজন্য, জমিদারবর্গ, উচ্চ-মধ্যবর্গের সরকারি চাকুরে, অরণ্যজীবী উপজাতিগোষ্ঠী

বা অরণ্যলগ্ন গ্রামের মানুষরাই নয়; এ সময় একদল শিক্ষিত ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত বাঙালি শখের শিকারিরও উত্থান ঘটে। শিকারি রূপে বাঙলায় কয়েক ঘর রাজা, জমিদার বংশ—গোবরডাঙার জমিদার মুখোপাধ্যায় বংশ (জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, যতীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়), ময়মনসিংহের জমিদার আচার্য্য-চৌধুরী বংশ, কোচবিহারের মহারাজা, লালগোলার মহারাজাদের পাশাপাশি কুমুদনাথ চৌধুরী (পাবনার জমিদার বংশের সন্তান পেশায় উকিল), অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (ময়ূরভঞ্জের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও হাইকোর্টের জজ), বিজয়কান্ত সেন (সেটেলম্যান্ট অফিসার), হীরালাল দাশগুপ্ত (বিপ্লবী, রাজনীতিক), দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (ভাস্কর, চিত্রশিল্পী) প্রমুখদের আবির্ভাব ঘটে।

শিকারের গুণ ও দোষ, প্রশংসা ও নিন্দা, আনন্দানুভূতি ও অপরাধবোধ নিয়ে ভারতীয় তথা বাঙালি মানসে যুগ যুগ ধরে যে বিরুদ্ধমত একই সঙ্গে চলে আসছিল, ব্রিটিশদের শিকার বিলাস ও প্রচারিত শিকার-সাহিত্যের বদান্যতায় শিকারের গুণ বা বলা ভালো ‘সদ গুণগুলি’ই এবার বাঙালি মানসে অধিক প্রাধান্য পেতে থাকে। ব্রিটিশরা যে শিকারকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার বা ঔপনিবেশিক প্রকল্পের অনুকূল অঙ্গরূপে, সেই শিকারকেই বাঙালিও এবার তার জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলল। সাহেব শিকারি তথা শিকার-লিখিয়েরা ভারতীয় শিকারিদের ক্ষেত্রে প্রায়ই যে লিঙ্গভেদী ভাষা অর্থাৎ ‘মেয়েলি’ ‘দুর্বল’ ‘ভীতু’ ‘কাপুরুষ’ বিশেষণগুলি প্রয়োগ করত, সেগুলি বহুপূর্ব থেকে শুধু শিকারি নয়, আলগাভাবে (loosely) সমগ্র বাঙালি জাতিকে ও পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক (বিশেষত হিন্দু) বাঙালি সম্প্রদায়কে চিহ্নিতকরণেও ইংরেজপ্রভুরা ব্যবহার করে আসছিল।[৩৫] ঔপনিবেশিক শাসকদের বাঙালি সম্পর্কে এরূপ স্টিরিওটাইপ ধারণাকে আরও জোরদার করে তোলে Herbert Hope Risley(১৮৫১-১৯১১)প্রমুখ ব্রিটিশ জাতিতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদদের গবেষণা—অন্যান্য ভারতীয় জাতির চেয়ে বাঙালি জাতির দৈহিক কৃশতা, দুর্বল খর্বাকৃতি গঠন, মানসিক ভাবে মেয়েলি অতিললিত ও অলস স্বভাবের কারণ রূপে শরীরবিজ্ঞানসম্মত বা আর্থ-সামাজিক নানা যুক্তি ও ব্যাখ্যা দান। কোনও ভৌগোলিক অঞ্চলের জলবায়ু, মৃত্তিকা কীভাবে কোনও জনগোষ্ঠীর বৌদ্ধিক মর্জিকে নিয়ন্ত্রণ করে, কোনও জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাস কীভাবে সেই জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ইতিহাসেও প্রভাব ফেলে—ইতিহাসবিদ Henry Thomas Buckle-র (১৮২১-১৮৬২) জনপ্রিয় আলোচনাগুলিও এসময়কার বাঙালি সমালোচক, বুদ্ধিজীবীদের তাদের শারীরিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক পরাভবের কারণ অনুসন্ধানে তৎপর করে তোলে।[৩৬] লিঙ্গগত হীনমন্যতা,

শারীরিক দুর্বলতা, আলস্য, অকর্মণ্যতাবোধের ধারণাটি এসময়কার শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যেও এতটাই চারিয়ে যায় যে তাদের নিজেদের লেখাতেও তা বারেবারে উঠে আসতে থাকে; এনিয়ে কখনও আত্মসমালোচনায়, কখনো বা বাঙালির এরূপ অধঃপতনের কার্যকারণ নির্ণয়ে তারা সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, সরলা দেবী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখদের বিভিন্ন লেখালেখি, কথাবার্তায় বারেবারে এটি দেখা যায়। উনিশ শতকের শেষ বিশেষত বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের বিকাশের সময় ১৮৬০-৭০ খ্রি. থেকে বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে বাঙালির 'মেয়েলি' 'দুর্বল' এই তকমাগুলি দূরীকরণের জন্য যেসব সমাধানের পথ খোঁজা হয় তার মধ্যে অন্যতম ছিল বাঙালির শারীরিক ও চারিত্রিক বলবর্ধন। শরীরচর্চা জাতীয় সাংস্কৃতিক কাজকর্ম (Physical culture) ব্যাপক আকর্ষক হয়ে ওঠে। বাঙালির লুপ্তপ্রায় দেশজ ক্রীড়া কুস্তি, ব্যায়ামচর্চা, লাঠি-ছোরা-তরোয়াল খেলা ইত্যাদিকে পুনরুদ্ধার করা হতে থাকে। আর শিকার ক্রীড়ায় দৈহিক শক্তি বর্ধনের সঙ্গে ইস্পাতদৃঢ় স্নায়ুর বিকাশও ঘটে। তার উপর দেশীয় অভিজাতবর্গের বিনোদন-ক্রীড়া রূপে প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত শিকার-ক্রীড়াটি এযুগে সাহেবদের কাছেও অন্যতম বিনোদন, 'sports' ও শারীরিক-মানসিক উৎকর্ষবর্ধক রূপে মান্যতা পেয়েছে। ফলে বাঙালির জাতীয়তাবাদের বিকাশের কালে বিশেষত সংগ্রামশালী জাতীয়তাবাদের কালপর্বে বাঙালি শিকার ক্রীড়ার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হয়। যে শিকারকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয়রা বীরত্ব-পৌরুষে আত্মশ্রেষ্ঠতা প্রচার করত বা আত্ম-অপর বিভাজনের নীতি প্রয়োগ করে আত্মশ্লাঘাবোধ করত, সেই শিকারকেই বাঙালির একাংশও ব্রিটিশ সৃষ্ট ঐ আত্ম-অপর নীতির বিরোধিতার অন্যতম হাতিয়ার করে তুলতে চায়। নিজেদের আত্মপরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে বাঙালির পুরুষত্বের পুনরুদ্ধার বা সাহস-বীরত্ব-পুরুষত্বের প্রমাণদানের জন্য তারা ঐ শিকার-ক্রিয়াকেই অন্যতম মাধ্যম (মানদণ্ড) রূপে বেছে নিতে চায়। তাদের কাছে শিকার ক্রীড়া হয়ে উঠল 'পৃথিবীর সমস্ত ক্রীড়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ', 'সব খেলার রাজা', 'শারীরিক মানসিক উৎকর্ষবর্ধক', 'শিক্ষার আধার'।

ব্রিটিশদের শিকারপ্রীতি ও তাদের শিকার-সাহিত্যগুলি বাঙালিকে শুধুমাত্র শিকারেই আকৃষ্ট করেনি, শিকার-সাহিত্য রচনাতেও উদ্বুদ্ধ করে। ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালির শিকার-সাহিত্য রচনায় প্রবল উৎসাহ দেখা যায়। কোচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, কুমুদনাথ চৌধুরী যেমন ইংরেজিতে শিকার-সাহিত্য চর্চায় অগ্রসর হন, তেমনি সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, ব্রজেন্দ্রনারায়ণ

আচার্য্য চৌধুরী, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, বিজয়কান্ত সেন, জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী প্রমুখরা বাংলায় শিকার-সাহিত্য রচনায় উৎসাহী হন। শিকার প্রসঙ্গ এবার আর কাহিনির অংশমাত্র বা গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক বা বিশেষ রূপক কিংবা তাৎপর্যবাহী কোনও ব্যঞ্জনা রূপেই থাকে না, হয়ে উঠে মূল বিষয়। শিকার ক্রিয়া বা শিকার অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয় সাহিত্য। বাংলা শিকার-সাহিত্যের এই ধারাটি ক্রমশ পুষ্ট হয়ে একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ধারা হয়ে ওঠে।

বাঙালি শিকারি ও তাঁদের শিকার-সাহিত্য
● নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর (ব্রিটিশ করদ-মিত্র রাজ্য কোচবিহারের মহারাজা)—*Thirty Seven Years of Big Game Shooting in CoochBehar, The Duars and Assams* (1908) মহারাজের মতে নিদারুণ স্যাঁতস্যাঁতে কোচবিহার অঞ্চলের আবহাওয়ায় বহিরাগতরা দুর্বলবোধ করায়, মানসিক ক্লান্তি দূরের একমাত্র উপায় শিকার রূপ 'শরীরচর্চা'। ব্রিটিশ অভিভাবকদের সহায়তায় মহারাজের মাত্র দশ বছর বয়সে যে শিকার করার সূচনা তা থেকে সুদীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে তাঁর জীবনে ঘটা বড়ো বড়ো শিকারের ঘটনা, সফল ও ব্যর্থ নানা শিকার কাহিনি, বিদেশি-দেশি মহামান্য অতিথিদের সঙ্গে শিকার-পার্টি, শিকারকৃত জীবজন্তুর পরিসংখ্যান (যার কয়েকটি রোনাল্ড ওয়ার্ডস বুক-এ রেকর্ড রূপে উল্লিখিত) বইটিতে বর্ণিত হয়েছে। অবতরণিকায় আছে শিকারক্ষেত্রের ভৌগোলিক প্রাকৃতিক পরিচয়, শিকারের নানা পদ্ধতি ও প্রস্তুতির কথা। বর্ষা বাদে মহারাজ সারা বছরই শিকারে যেতেন ও স্ত্রী-পুরুষ, বয়স্ক-শাবক নির্বিশেষেই বন্যজন্তুকে একাধিক গুলিবর্ষণে শিকার করতেন। শিকারের স্মৃতিচারণায় মহারাজ অতীতের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলিকে পুনরায় স্পর্শ করতে পেরে আনন্দ অনুভব করেছেন। তবে বইটি ঠিক সাহিত্যধর্মী নয়, ডায়েরি আকারে শিকারের ঐতিহাসিক দলিল।
● কুমুদনাথ চৌধুরী দেবশর্মা (পাবনার জমিদার বংশের সন্তান, পেশায় উকিল ও আধুনিকমনস্ক বাঙালি স্পোর্টসম্যান-শিকারিদের অগ্রদূত)—*Sports in Jheel and Jungle* (1918) [ভাগ্নি প্রিয়ংবদা দেবীকৃত বঙ্গানুবাদ *ঝিলে জঙ্গলে শিকার* (১৯১৮ খ্রি.)] পরিবারের দুটি ছোটো ছেলেমেয়েকে ১৯১৭-১৮ সালে চিঠির আকারে লেখা বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রদেশ ও মধ্যভারতে পায়ে হেঁটে ও হাতিতে চড়ে কুমুদনাথের শিকারের অভিজ্ঞতা। তাঁর মতে শিকার চিত্ত বিনোদনের উপায়মাত্র নয়, শিক্ষাক্ষেত্রও।

শিকারে অর্জিত ‘লক্ষ্য করার ক্ষমতা ও অভিনিবেশ শক্তি’ জীবনযাত্রার বহুবিষয়েও সহায়ক। ‘Trophy Hunting’-এর দিকে ঝোঁক থাকলেও তিনি শিকার চর্চায় জহ্লাদ-সুলভ নির্বিচারে হত্যালীলার বদলে জোর দেন স্পোর্টসম্যান-সুলভ মার্জিত দৃষ্টিভঙ্গি, শিকারির দায়িত্ব ও নৈতিকতাবোধকে। শিকারের রোমাঞ্চের সঙ্গে বন্যপ্রাণীর সম্যক পরিচয়, অরণ্যের মোহময় প্রাকৃতিক বর্ণনা মিলেমিশে তাঁর বইটি নিঃসন্দেহেই একটি উৎকৃষ্ট শিকার-সাহিত্য।

● সূর্য্যকান্ত আচার্য্য (ময়মনসিংহের জমিদার, ঐ অঞ্চলে শিকারি রূপে প্রথম পথপ্রদর্শক ও মাতৃভাষা বাংলায় শিকার-সাহিত্য পুস্তকের প্রথম রচয়িতা)—*শিকার-কাহিনী* (১৩১৩ বঙ্গাব্দ)

বন্দুক চালাতে না জানলেও তিনি বন্দুক কেনেন, শখের বশে শিকারেও যান। নিজের বন্দুক ধরার ও নিশানা পদ্ধতির ‘ভুল’ স্বীকারও করেছেন। নিজেকে ‘শিকারের শিক্ষানবীশ’ বলেছেন। তাঁর মতে ‘শিকার ব্যসন’ নির্দোষ আমোদ ও পৌরুষ ক্রীড়া। বন্দুকের ঘনঘন গর্জন, রক্তাক্ত প্রাণীর মৃত্যুকাতরতা, শিকারের বর্ণনার পাশাপাশি অরণ্য-প্রকৃতি, অরণ্যে দেখা ভগ্নপ্রাসাদ, রূপগিরি সন্ন্যাসীর বাড়ি কিংবা ফরাজী মিঞার মুখে শোনা কেচ্ছা ইত্যাদি নানা অভিজ্ঞতাকেও তাঁর *শিকার-কাহিনী*-তে তুলে ধরেছেন।

● জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী (ময়মনসিংহের জমিদার)—*শিকার স্মৃতি* (১৩৩১ বঙ্গাব্দ)

ভারতে প্রাচীনকাল থেকে শিকারের নিদর্শন থাকলেও এবং বর্তমানে দেশের সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের শিকারের শখ থাকলেও, ইউরোপীয় ও মার্কিন সাহিত্যের অসংখ্য শিকার পুস্তকের মতো শিকার-সাহিত্য বঙ্গসাহিত্যে নেই বলে—ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ লিখলেও ইংরেজি ভাষায় হওয়ায় তাঁর মতে সেগুলি সাধারণ পাঠকপাঠিকার কৌতূহল মেটাতে অক্ষম। তাঁর *শিকার স্মৃতিতে* শিকারের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে হাস্যরসও।

● ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী (ময়মনসিংহের জমিদার)—*শিকার ও শিকারী* (১৩৩২ বঙ্গাব্দ)

শিকারের সঙ্গে শিক্ষার যোগের কথা বলে শিকারকে চিহ্নিত করা হয়েছে সব খেলার রাজা রূপে। তাঁর মতে শিকার ‘পশুহনন’ থেকে আলাদা। শিকার হল শিল্প। তাসপাশা খেলে অবসর সময়ে দু-চারটি চাঁদমারি করলেই শিকারি হওয়া যায় না। এ জন্য লাগে অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও সাধনা। শিকারের খুঁটিনাটি—বন্দুক ব্যবহার, শিকারের

পোশাক, কোন্ শিকার কোথায় পাওয়া যায়, শিকারের নানা পদ্ধতি তিনি বর্ণনা করেছেন।
এছাড়াও বাংলা শিকার-সাহিত্য ধারাটি ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়েছে যাঁদের লেখালেখিতে— ● অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (ময়ূরভঞ্জের ভূতপূর্ব ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও হাইকোর্টের জজ)—*শিকারের কথা* (১৯৪১ খ্রি.) ● সুধাংশুকান্ত আচার্য্য চৌধুরী (ময়মনসিংহের জমিদার)—*আসামের জঙ্গলে* (১৩৫২ বঙ্গাব্দ) ● হীরালাল দাশগুপ্ত (বিপ্লবী)—*বাঘের জঙ্গলে* (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ) ● বিজয়কান্ত সেন (সরকারি চাকুরে)—*আমার শিকার স্মৃতি* (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) ● হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় (বার্ণপুরের ইসকোর ইঞ্জিনিয়ার, 'দাড়ি ব্যানার্জি' বা 'দাড়ি বাবা' বা কিশোর-কিশোরীদের 'হিরো কাকু' বলে পরিচিত)—*শিকার* (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) ● জগমোহন মুখোপাধ্যায়—*শিকার কাহিনী* (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ)

ব্রিটিশদের রচিত শিকার-সাহিত্যগুলির মতোই এই বাংলা শিকার-সাহিত্যগুলিরও অন্যতম উদ্দিষ্ট পাঠক (target reader) ছিল তরুণরা। ব্রিটিশদের রচিত শিকার-সাহিত্যগুলির অন্যতম লক্ষ্য ছিল—শিকারে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব-বীরত্ব -অতিপৌরুষ ও ক্ষমতা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ ভাগ্যান্বেষী যুবকদের পশুপাখি সমৃদ্ধ ভারতীয় অরণ্যে শিকার অ্যাডভেঞ্চারে প্রলুব্ধ করে ভারতমুখী করা এবং ভারতাগত ব্রিটিশ যুবাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থেই শিকারে উৎসাহিত করা। অন্যদিকে বাংলা শিকার-সাহিত্যগুলিরও অন্যতম একটি প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে—শিকারে বাঙালির নৈপুণ্য-বীরত্ব তুলে ধরে ও বাঙালি যুবাদের (বিশেষত জাতীয়তাবাদী কালপর্বে) শিকারে উৎসাহিত করে বাঙালির 'মেয়েলি' 'ভীরু' 'কাপুরুষ' অপবাদগুলি মোচন। বাঙালি শিকারি তথা শিকার লিখিয়েরা অনেকেই শিকারকে দেশি বিদেশি সমস্ত ক্রীড়ার মধ্যে 'সর্বশ্রেষ্ঠ' রূপে চিহ্নিত করে বাঙালি যুবকদের শিকারক্রীড়া পটু হতে উৎসাহিত করেছেন; কিন্তু এখানে একটা খটকা লাগে—তাঁরা হাওদা-শিকারে প্রশিক্ষিত হাতি বা মাচান-শিকারে মাচা বাঁধা, শিকারের টোপ, লোকলস্কর-গাইড-বিটার, দামি দামি আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহযোগে নিজেদের শিকারক্রীড়ার

যেরূপ বিবরণ দিয়েছেন, তাতে তাদের শিকারক্রীড়া এতটাই ব্যয়বহুল যে সেরকম শিকারক্রীড়া ধনী বাঙালি যুবকদের পক্ষে সম্ভবপর হলেও সাধারণ মধ্যবিত্ত বা আমবাঙালি যুবকদের পক্ষে কি আদৌ সহজসাধ্য ছিল? এছাড়া, বাংলা এই শিকার-সাহিত্যগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিকারের কারণ রূপে বা বাঙালি তরুণদের শিকারস্পৃহা জাগ্রত করতে, শিকারের সঙ্গে 'দেশের স্বার্থ', 'পরাধীন দেশের দুর্দশা মুক্তি', 'স্বদেশ প্রেম', 'বাঙালির যথার্থ উন্নতি' ইত্যাদি উপনিবেশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী প্রয়াসগুলিকে অকাট্য যুক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, এই সব শিকার-সাহিত্যগুলির রচয়িতা মহারাজা-জমিদার-উচ্চ বা মধ্য পদাধিকারী সরকারি চাকুরে প্রমুখ বাঙালি শিকারিরা অনেকেই বাস্তবে যাপিত জীবনে নিজেদের স্বার্থেই ঔপনিবেশিক প্রভুদের প্রতি বংশবদতা বা আনুগত্য প্রকাশ করছেন; সাহেবিয়ানাকে অনুকরণ ও অনুসরণ করছেন। অর্থাৎ সে যুগের এই সব বাঙালি শিকার লিখিয়েদের মধ্যে কাজ করছে অদ্ভুত এক স্ববিরোধ। এজন্যই শিকার সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল শিকারের কারণ রূপে তাদের দেওয়া জাতীয়তাবাদী যুক্তিকে 'ছদ্ম জাতীয়তাবাদী যুক্তি' বলেছেন।[৩৭] বাঙালি জাতির রুগ্ন দুর্বল শরীর, মেয়েলি ভীরু স্বভাবের কলঙ্ক মোচনের জাতীয়তাবাদী প্রয়াস শুরু হবার পর, শিকারমনস্ক বাঙালিরা কীভাবে নিজেদের ব্যক্তিগত শিকার প্রীতির সপক্ষে জবরদস্ত কৈফিয়ত রূপে ঐ একই জাতীয়তাবাদী যুক্তিকে অবলম্বন করছেন, কীভাবে নিজেদের শিকার আমোদকে এবং শিকারের মাধ্যমে দেশীয় ও সাহেবি উভয় সমাজে নিজেদের গৌরব-পৌরুষ-সামাজিক মর্যাদা-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাকে শিকার-সাহিত্যে ছদ্ম জাতীয়তাবাদ বা মেকি স্বদেশ প্রেমের মোড়কে পরিবেশন করছেন— বাঙালি শিকারি তথা শিকার লেখকদের অনেকেরই মধ্যে বিদ্যমান এই 'আত্মবঞ্চনা'টি চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল তাঁর সুলিখিত *বঙ্গবাসীর শিকারকথায়* দৃষ্টান্ত সহ যথার্থই তুলে ধরেছেন।[৩৮]

তবে শুধু বাঙালি-শিকারিরাই নন, উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙালি বিশেষত শিক্ষিত ভদ্রলোক বাঙালিরা শিকার বা বলা ভালো শিকারের চেয়েও অনেক সময় 'শিকার-সাহিত্য' সম্পর্কে প্রবল আগ্রহী হয়ে ওঠেন; এদের মধ্যে হয়তো অনেকে নিজেরা শিকারি ছিলেন না, এমনকি শিকারের প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করেননি বা তার সুযোগও পাননি। শিকার-সাহিত্যের প্রতি বাঙালির এই আকর্ষণের প্রমাণ ধরা আছে তৎকালীন বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতেও। শিকারে হিংস্রতা-নিষ্ঠুরতা-রক্ত-হত্যা থাকলেও শিকারকে বিষয়

করে বাংলায় সাহিত্যচর্চা শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক বা সাবালক সাহিত্যেই গণ্ডিবদ্ধ থাকেনি; শিকার-সাহিত্যের উদ্দিষ্ট পাঠক মূলত তরুণরা। তাই এই কালপর্বের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রিকাগুলির সম্পাদকদের কাছেও পত্রিকার কিশোর, সদ্যতরুণ পাঠকদের জন্য শিকার-সাহিত্য বিশেষ মান্যতা পেয়েছে। দেশি-বিদেশি শিকারিদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিকারের 'সত্য কাহিনি', 'স্মৃতিচারণ' যেমন এই সব পত্রিকার পাতায় স্থান পাচ্ছে তেমনি বিখ্যাত-অখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখা অসংখ্য শিকার-প্রবন্ধ, শিকার ফিকশন, শিকার অভিযান বা জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চারভিত্তিক ধারাবাহিক উপন্যাস, গল্প ইত্যাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। ইংরেজি Young Adult Magazine-গুলিতে বর্ণিত শিকার অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি, জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলি ও রুডইয়ার্ড কিপলিং প্রমুখের ভারতীয় অরণ্য ও অরণ্যের জীবজন্তু সংক্রান্ত লেখালেখিগুলিরও এক্ষেত্রে প্রভাব ছিল।

ভারতের জাতীয়তাবাদী কালপর্বে বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে এই শিকার-সাহিত্যবর্গটির চর্চায় ব্যাপক রমরমা দেখা যাচ্ছে। বাঙালি রাজরাজড়া-জমিদার-উচ্চপদস্থ চাকুরে-অভিজাতরা না হয় নিজেদের স্বার্থে (ছদ্ম)জাতীয়তাবাদী মোড়কে শিকার-সাহিত্য পরিবেশন করতে সচেষ্ট, কিন্তু লক্ষণীয় এই কালপর্বের অন্যান্য শিকার-লিখিয়েরা এমনকি ছোটোদের শিকার-সাহিত্য রচয়িতারাও অনেকেই শিকারকে জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের অঙ্গ রূপে দেখানোর প্রবণতার বাইরে বেরতে পারেননি। বাঙালির জাতীয়তাবাদী পর্বে বিশেষত সশস্ত্র বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের বিকাশের কালে (১৮৬০-৭০ খ্রি. থেকে বিশ শতকের প্রথম কয়েকটি দশকে) প্রয়োজন অনুভূত হয় এমন বাঙালি তরুণদের যারা দেশের কাজে নির্দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়তে সক্ষম, বলিষ্ঠ, নির্ভীক, দুঃসাহসী, মৃত্যুভয়শূন্য। ফলে পরাধীন দেশে জাতীয়চেতনার উন্মেষের লক্ষ্যে তৎকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা, সাহিত্যিক প্রমুখরা তাদের কথাবার্তা-লেখালেখিতে বারবার বাঙালি তরুণ সম্প্রদায়কে শরীর-মন-চরিত্রে আত্মবলীয়ান হয়ে ওঠার জন্য নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। কুস্তি, লাঠিখেলা ইত্যাদি প্রায় লুপ্ত হতে বসা দেশীয় ক্রীড়াগুলি পুনরায় গুরুত্ব পায়; গড়ে ওঠে প্রচুর আখড়া, ব্যায়ামাগার। 'যুগান্তর', 'অনুশীলন সমিতি'র মতো বিপ্লবী সংগঠনগুলিও এই দেশীয় ক্রীড়াগুলিতে অর্থাৎ শরীরচর্চায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়। অন্যদিকে শিকার ক্রীড়ায় শারীরিক ও মানসিক বিকাশ লাভের ধারণাটি শিকারের গুণ রূপে বহুযুগ ধরেই ভারতীয় তথা বাঙালির জানা; কিন্তু এই ধারণাটি ব্রিটিশ যুগে ব্যাপক মান্যতা পায় ব্রিটিশদের শিকার প্রীতি, তাদের শিকার-সাহিত্য ও *The Pioneer* ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় শিকারের গুণাগুণ প্রচারের মাধ্যমে। আবার

ভারতীয় তথা বাঙালি শিকারিদের দ্বারা সদ্য শুরু হওয়া শিকার-সাহিত্যচর্চাতেও শিকারের সপক্ষে অন্যতম যুক্তি রূপে শারীরিক মানসিক উৎকর্ষ লাভকেই জোরালোভাবে উপস্থাপিত করা হচ্ছিল। ফলে শিকার যে শরীর, মন ও চরিত্র গঠনে অত্যন্ত উপযোগী একটি অনুশীলন—তা প্রায় সর্বজনসম্মত হয়ে ওঠে। শিকারে অস্ত্রচালনার দক্ষতা, বন্দুক বা এয়ারগানের ব্যবহার, লক্ষ্যভেদ নৈপুণ্য ও সামরিক কলাকৌশলও আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। ফলে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী বিশেষত চরমপন্থী সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাসী বা গুপ্ত সমিতির সদস্যদেরও বন্দুক নিশানায় পারদর্শিতা বৃদ্ধির জন্য বনজঙ্গলে লুকিয়ে শিকারচর্চা করতে দেখা যায়। এসব কারণে সশস্ত্র জাতীয়তাবাদ বা বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের কালে বাঙালিরা শিকার সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠে। আর এই কালপর্বে শুধু অভিজাত বা রাজন্য বাঙালি শিকারিরাই নন, বাঙালি সাহিত্যিকরাও শিকার নিয়ে তরুণ প্রজন্মের জন্য সাহিত্যচর্চায় বিশেষ উৎসাহী হয়েছেন। শিকার-সাহিত্যের মাধ্যমে তাঁরা বাঙালি নবীন প্রজন্মের সামনে বাঙালির পুরুষত্বের প্রতীকী পুনরুদ্ধার ও দুঃসাহসী নির্ভীক মৃত্যুভয়হীন বীর-নায়কের নজির তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন।

এখানে একটি বিষয় অবশ্য খেয়াল করা জরুরি, উনিশ শতকের শেষ থেকে শুরু করে বিশ শতকে শিশু-কিশোরদের জন্য যেসব বাংলা শিকার-সাহিত্য রচিত হচ্ছে বা বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে যে অগুণতি শিকার-সাহিত্য প্রকাশিত হচ্ছে তার সবগুলি কখনোই জাতীয়তাবাদী ন্যারেটিভ নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক নানা কারণে বাঙালি মানসে শিকার সম্পর্কে ধ্যানধারণাতে আসছে নানা বদল। ফলে বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে দীর্ঘ সময় ধরে প্রকাশিত শিকার-সাহিত্যগুলির ধরনধারণ, অভিমুখও খুব স্বাভাবিকভাবেই সর্বদা এক নয়।

বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় শিকার-সাহিত্য

বিশ-শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় এক নাগাড়ে অসংখ্য শিশু-কিশোর পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। উপেন্দ্রকিশোরের *সন্দেশ* পত্রিকা (১৯১৩ খ্রি.) থেকেই বাংলা শিশু-সাহিত্যের 'সোনালি যুগের' সূচনা হয় (বুদ্ধদেব বসুর মতে)। তারই কালোপযোগী বাহকরূপে আবির্ভূত হয়—*মৌচাক* (১৯২০ খ্রি.), *শিশুসাথী* (১৯২২ খ্রি.), *রামধনু* (১৯২৭ খ্রি.), *মাসপয়লা* (১৯২৯ খ্রি.), *রংমশাল* (১৯৩৭ খ্রি.), *শুকতারা* (১৯৪৭ খ্রি.) ইত্যাদি।

অবশ্য বাংলা শিশু-কিশোর পত্রিকার জন্ম উনিশ শতকে। মুদ্রণ শিল্পের

বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মূলত উপনিবেশের নতুন শিশুশিক্ষার পরিপূরক ও পাঠ্য বইয়ের সহযোগী বা বিকল্পের প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনেই এই শিশু-কিশোর পত্রিকাগুলি আবির্ভূত হয়। জন ক্লার্ক ম্যার্শম্যানের সম্পাদিত 'দিগ্‌দর্শন' (১৮১৮ খ্রি.)-এর নাম পৃষ্ঠায় 'যুবা লোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' লেখা থাকায় কেবল যুবকদের জন্য পত্রিকাটি প্রকাশিত হত মনে হলেও, খগেন্দ্রনাথ মিত্র একে শিশু ও কিশোরপাঠ্য সাময়িক পত্রিকারূপে চিহ্নিত করেছেন। আদিপর্বের শিশু-কিশোর পত্রিকাগুলি ['সখা' (১৮৮৩ খ্রি.)-এর পূর্ববতী পত্রিকাগুলি অর্থাৎ *দিগ্‌দর্শন*, *পশ্বাবলী*, *সত্যপ্রদীপ*, *অবোধবন্ধু*, *বালকবন্ধু*, *বালকহিতৈষী* ইত্যাদি] অনেকটাই যেন ধর্মীয় ও নীতিশিক্ষার অনুশাসনে ছড়ি হাতে গুরুমশায়েরই ভিন্ন সংস্করণ। শিক্ষা, চাকরি ও সুনাগরিক নির্মাণের এই উপযোগবাদী ভূমিকা থেকে ক্রমে পরবর্তী শিশু-কিশোর পত্রিকাগুলিতে খানিকটা দিক পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। অর্থাৎ পরবর্তী পত্রিকাগুলি [*সখা* (১৮৮৩ খ্রি.), *বালক* (১৮৮৫ খ্রি.)] শিশুশিক্ষার সঙ্গে শিশুর মনোরঞ্জন/ বিনোদন, পড়ার স্বাধীনতা, ইচ্ছার কথাও ভাবনা চিন্তা শুরু করে। শিশুশিক্ষা থেকে শিশুসাহিত্যের নির্মাণের সম্ভাবনার ক্রম অগ্রগতিতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় *সখা* (১৮৮৩ খ্রি.), *বালক* (১৮৮৫ খ্রি.), *মুকুল* (১৮৯৫ খ্রি.)। আর আজ আমরা বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য বলতে যে স্বতন্ত্র সাহিত্য সংরূপটি বুঝি, তা পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করে বিশ শতকের—*সন্দেশ*, *মৌচাক*, *রামধনু*, *রংমশাল* ইত্যাদি পত্রিকাগুলির পাতায়। বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় শিকার-সাহিত্যবর্গটির উদ্ভব ও বিকাশ এখানে দেখা যাক।

বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যের আদিপর্ব

'যুবালোকে'র জন্য প্রকাশিত *দিগ্‌দর্শন* পত্রিকা (১৮১৮ খ্রি.) এদেশবাসীর মনে কৌতূহল জাগ্রত করতে যে সব বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয় নির্বাচন করে তার মধ্যে হস্তী, উষ্ট্র, বীবর পশু, মকর মৎস্য, মিশর দেশের ফিনিক্স, মধুমক্ষিকা, ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বৃক্ষ ইত্যাদি গাছ-জীবজন্তুর বর্ণনামূলক বিবরণ যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি হাজির হয়েছে 'ফেরো উপদ্বীপে পক্ষিধারণোপায়'।[৩৯] 'আশ্চর্য ও অতি দুষ্কর' বলে *দিগ্‌দর্শন* তা 'শ্রবণোপযুক্ত' বলে মনে করেছে। পক্ষিমাংস সদ্য ভোজন ও শীতকালের জন্য সঞ্চয় করে রাখা এবং 'পক্ষ' বিদেশে পাঠানোর জন্য ফেরোদ্বীপে 'পক্ষি' ধরা হয়। আবশ্যকতার ফলে মানুষের মধ্যে কেমন 'আশ্চর্য উপায়' জন্মায় তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। অসম সাহসী পক্ষিধারকরা অতিদুর্গম গুহার মধ্যে কীভাবে অত্যন্ত সঙ্কট মাথায় নিয়েও অন্বেষণ করে

পক্ষিধরার দুষ্কর কর্ম গুহার উপর ও নিচ উভয় দিক থেকেই সম্পাদন করে তার আশ্চর্য নৈপুণ্যময় পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি কৌতূহলোদ্দীপক হলেও নিবন্ধকারে হওয়ায় বর্ণনাটি খানিকটা নীরস।

একটি করে প্রাণীর কাঠখোদাই ছবি সহ বিবরণ স্কুলবুক সোসাইটি প্রকাশিত *পশ্বাবলী*তে (১৮২২ খ্রি.) বেরলেও তাতে পশুটির (সিংহ, ভালুক, হস্তী, গণ্ডার, বাঘ, বিড়াল ইত্যাদি) বিবরণ, বাসস্থান, খাদ্য, স্বভাব বিষয়েই মূলত ছোটোদের পরিচিত করা হচ্ছে; জীবজন্তুগুলিকে শিকারের প্রসঙ্গ (সম্ভবত) নেই, বরং 'গণ্ডার বৃত্তান্ত'তে যেমন জানানো হয়েছে 'কেহ আঘাত না করিলে তাহারা কাহারও হিংসা করে না' তেমনি 'শৃগালের ক্রোড়পত্র'তে শৃগাল ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের—'প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতা'র—একটি অদ্ভুত কাহিনিকে তুলে ধরে নীতিশিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

মানুষই নিজের প্রয়োজনে জঙ্গলে হানা দিয়ে জঙ্গলের বাসিন্দাদের বিরক্ত করে, শিকার করে। *সখা* পত্রিকায় 'মার্কিন মহিষ' (সচিত্র) নিবন্ধে (২য় বর্ষ, অক্টোবর ১৮৮৪) প্রমদাচরণ সেন ভয়ানক চেহারা, গায়ে বিশাল জোর বিশিষ্ট হলেও স্বভাব ভীরু মার্কিন মহিষদের প্রসঙ্গে সকৌতুকে জানিয়েছেন—

> আমাদের মার্কিন মহিষ মহাশয়ও এইখানে (ঘাসবনে) থাকিতে ভালবাসেন। পাহাড়ে বা কোন জঙ্গলে থাকিতেও তাঁহার আপত্তি নাই তবে তিনি কেবল এই চান যে স্থানটী এমন হইবে যেন মানুষগুলো গিয়ে তাহাকে বিরক্ত না করে। মানুষগুলো কি তা শোনে না বোঝে![৪০]

মহিষের সমগ্র দেহই কোনও না কোনও কাজে লাগায় মানুষ ঘোড়ায় চড়ে অতি কষ্ট করে মহিষ শিকার করে। তবে সভ্যতার অগ্রগতিতে মহিষ শিকার সহজতর হয়েছে। ফাঁসি দিয়ে ধরার বদলে এখন অসভ্যের তিরধনুকে ও সুসভ্যের গোলাগুলিতে অতি সহজেই মার্কিন মহিষের পশুজন্ম শেষ হয়। শিকারের কথা বললেও লেখক মনে করিয়ে দেন, 'মার্কিন মহিষ পরমেশ্বরের এক আশ্চর্য সৃষ্টি' আর 'পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে সকলই সুন্দর, সকলই চমৎকার।'

সখা (১৮৮৩-১৮৯৪ খ্রি.), *সাথী* (১৮৯৩-১৮৯৪ খ্রি.), *সখা ও সাথী* (১৮৯৪-১৮৯৭/৯৮ খ্রি.) পত্রিকাগুলিতে পশুপাখির প্রতি নিষ্ঠুরতা, তাদের হত্যার কথা শোনানোর চেয়ে খুদে পাঠকদের মনে তাদের প্রতি ভালোবাসা, দয়া সঞ্চার করাতেই অধিক ঝোঁক দেখা যায়। ভয়ানক রোদে গাড়ির ঘোড়াকে একটি ছোটো ছেলের ঘাস

খেতে দেওয়া ও মাথায় ছাতা ধরার ঘটনার প্রশংসা করে 'পশুর প্রতি দয়া'তে (*সখা*, ২য় বর্ষ, জুন ১৮৮৪ খ্রি.) প্রমদাচরণ সেনের সুস্পষ্ট উক্তি—'যে বালক বা বালিকা পশুর প্রতি দয়া করে, সে বড় হইয়া মানুষের প্রতিও দয়া করে; আর যে ছেলে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা করে, সে তো বড় হইয়া আরও কত নিষ্ঠুরতা, কত কি করিতে পারে!'[৪১] বাল্যকালে কুকুর, মাছি, জীবজন্তুকে নানা কষ্টদানকারী রুম দেশের রাজা নিরোর বড়ো হয়ে আপন মাতাকে বধ ও সৎলোকদের দগ্ধ করার ঘটনা উল্লেখ করে *সত্যপ্রদীপ* (১৮৬০ খ্রি.) পত্রিকাতেও *সখার* এই বক্তব্যেরই অনুরূপ বক্তব্য ধ্বনিত হয়েছিল।[৪২] আবার অন্যদিকে মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় *সখা*-য় 'কোন জীবকে ক্লেশ দিও না' (২য় বর্ষ, আগস্ট ১৮৮৪ খ্রি.)-তে নগেনের গাছে উঠে নিরীহ পাখির ছানাদের ডাকাতি করে এনে বৃথা কষ্ট দিয়ে মারা ও বাসা ভাঙার মতো 'অন্যায়' কাজের তীব্র নিন্দা করেছেন। সর্বনেশে এরূপ 'মহাপাপে'র শাস্তি ঈশ্বর নগেনকে অচিরেই দিয়েছেন—গাছ থেকে পড়ে নগেনের চিরকালের জন্য একটি হাত ও একটি পা ভাঙে। দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে রূপান্তরের মতোই নিষ্ঠুর নগেন এখন পরিবর্তিত হয়ে পশুপাখির কষ্ট দূর করতে প্রাণপণ ব্যস্ত হয়। নগেনের রূপান্তরের গল্প শুনিয়ে লেখক *সখার* পাঠকদেরও এরূপ নিষ্ঠুর অভ্যাস পরিত্যাগের পরামর্শ দেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও 'মাকড়সা' (*সখা*, ১ম বর্ষ, মে ১৮৮৩ খ্রি.)-তে চমকপ্রদ বিবরণ শেষে ভরসা করছেন তাঁর পাঠকরা 'আর মাকড়সা দেখিলেই মারিতে যাইবে না।'[৪৩] মানুষ ও পোষ্য পশুপাখির পারস্পরিক ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে *সখা, সখা ও সাথী* পত্রিকায় বেশ কয়েকটি গল্প (উপেন্দ্রকিশোর রায়ের 'একটি অন্ধ সীলের কথা', মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'জীবন রক্ষক কুকুর') ও কবিতা (প্রমদাচরণ সেনের 'আমার সাধের বিড়াল', মনোরঞ্জন গুহর 'ওরে আমার পায়রামণি', বিজয়কুমার সেনের 'আমার মেনী' 'পুসু আমার শান্ত সোনা', করুণ কুমার চৌধুরীর 'হীরেমোন', ভুবনমোহন রায়ের 'ননীর সাথী') প্রকাশিত হচ্ছে। কোনো কোনো লেখায় পশুপাখির মধ্যেও মানবিক গুণ-বুদ্ধি, ভালোবাসা, মাতৃত্ব, বাৎসল্য ইত্যাদির উপস্থিতি যেমন দেখান হয়েছে (প্রমদাচরণ সেনের 'বিড়ালের বুদ্ধি', 'কুকুরে কুকুরে ভাব'), তেমনি পশুপাখির কিছু বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যেও বিশেষত 'মন্দ অভ্যাস' রূপে (যেমন—সাপের মতো ক্রোধ-নিষ্ঠুরতা, ময়ূরের মতো অহঙ্কার প্রদর্শন) দেখা দিয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা অন্যান্য জীব থেকে মানুষের তফাৎকে বিনষ্ট করে ফেলে বলে সতর্ক করা হচ্ছে। 'সিংহ ও মাতাল' গল্পে (*সখা*, সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ খ্রি.) প্রমদাচরণ সেন সিংহের শিকারে পরিণত হতে হতেও এক মাতাল কীভাবে বিউগেল বাজিয়ে সে

যাত্রা প্রাণে রক্ষা পায়—তার মজাদার গল্প শোনালেও গল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছোটোদের মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা।

পশুপাখির বিবরণ প্রসঙ্গে বা প্রবন্ধাকারে টুকরো টাকরা শিকারের কথা এই পত্রিকাগুলিতে কখনো-সখনো এলেও শিকারকেই কেন্দ্র করে গল্প পাওয়া যায় *মুকুল* (১৮৯৫ খ্রি.) পত্রিকার পাতায়। ৮-৯ থেকে ১৬-১৭ বছরের বালক-বালিকাদের প্রতি দৃষ্টি রেখে *মুকুল* পত্রিকা প্রকাশিত হত। তাদের উপযোগী করে শিকারের গল্প শোনাতে এখানে কলম ধরছেন বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিকরা। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ভালুক শিকার', দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'উভয় সংকট', রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'সিংহ শিকার', শ্যামাচরণ গুপ্তর 'প্যান্থার শিকার', হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'সুন্দরবনের শিকার', সুখলতা রাও-এর 'গন্ডার শিকার' 'বন্য জন্তু ধরা', সুধাংশুমোহন ভট্টাচার্যের 'আসামে হরিণ শিকার' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাহিত্যিকরা বিদেশি শিকারিদের লেখালেখি, সংবাদপত্রের নানা খবর, মৌখিক গল্প, কিংবদন্তি ইত্যাদিতে বর্ণিত দেশবিদেশের পটভূমিতে ঘটা শিকারের ঘটনাগুলির ভিত্তিতে তাঁদের শিকার-গল্পগুলি লিখেছেন। হরিণের চামড়া-শিং ও হাতির দাঁতের বণিক ইংরেজ স্পেনসার সাহেবের নিরস্ত্র অবস্থায় গরিলা ও সিংহের মাঝখানে পড়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন 'উভয় সংকট' (*মুকুল* ১ম বর্ষ, ভাদ্র ১৩০২ বঙ্গাব্দ) গল্প। তবে দু-চারটে ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোটোদের শিকারের গল্প শোনাতে বসে বাঙালি সাহিত্যিকরা ঘটনাগুলির মূল উৎস বা প্রকৃত লেখক বা শিকারির নাম উল্লেখের প্রয়োজনবোধ করেননি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'সিংহ শিকার' (*মুকুল* ১ম বর্ষ, আশ্বিন ১৩০২ বঙ্গাব্দ)-এ আলজিরিয়ার আরবদের সঙ্গে দুজন ইংরেজের রোমহর্ষক সিংহ শিকারের গল্প লিখেছেন কিন্তু গল্পটির কোনও উৎস বা ইংরেজ শিকারিদ্বয়ের নাম ইত্যাদি উল্লেখ করেননি। অনুরূপে তিনটি পৃথক পৃথক স্থানে ও সময়ে তিনটি পৃথক পৃথক পদ্ধতিতে ভালুকের আমনা-সামনা করার তিনটি ঘটনা যোগীন্দ্রনাথ সরকার 'ভালুক শিকার' (*মুকুল* ১ম বর্ষ, কার্তিক ১৩০২ বঙ্গাব্দ) গল্পে সুচারুভাবে উপস্থাপিত করেছেন। আমেরিকার জঙ্গলে এক সাহেব তার শিকারিবন্ধু, লোকজন ও কুকুরদের নিয়ে ভালুক শিকারে যান। বন্ধুর প্রাণ বাঁচাতে কুঠার নিয়ে ভালুকের সঙ্গে লড়াইয়ে থাবার আঘাতে জ্ঞান হারান। পরে প্রিয় কুকুর ও লোকজনের সহায়তায় কোনোক্রমে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় তিনি বাড়ি ফিরতে সক্ষম হলেও ভালুকটির সঙ্গে সঙ্গে শিকারিবন্ধু ও কয়েকটি কুকুর প্রাণ হারায়। উত্তর আমেরিকার এক অত্যন্ত সাহসী শিকারি কোমরে

দড়ি বেঁধে ভালুকের গুহায় ঢুকে রীতিমত প্রচণ্ড যুদ্ধ করে গুহার বাইরের শিকারিদের সহায়তায় ভালুক শিকার করেন। এক ব্যক্তি ছেলেবেলা থেকে শিকারের অদ্ভুত গল্প শুনতে শুনতে শিকারি হবার বাসনায় এক দক্ষ শিকারি-বন্ধুর সঙ্গে জঙ্গলে যান। বন্ধুর অনুপস্থিতিতে হঠাৎ ভালুকের সামনে পড়ে বন্দুক ও ছোরায় ভালুককে কাবু করতে না পেরে গাছে উঠে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে থাকেন। দৈবক্রমে বন্ধু ও লোকজনের উপস্থিতিতে প্রাণে বেঁচে আনন্দের বেগ সহ্য করতে না পেরে অচেতন হন। উপরোক্ত এই তিনটি পৃথক পৃথক ঘটনা নিয়ে যোগীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'ভালুক শিকার'-এর রোমাঞ্চকর গল্পটি। কিন্তু তিনি এই সত্য ঘটনা তিনটির উৎস বা লেখকের নাম উহ্যই রেখেছেন। 'একবার এক সাহেব' বা 'কয়েকজন শিকারি একবার...' কিংবা 'কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন...' দিয়ে তিনি টুকরো টুকরো গল্পগুলির সূচনা করেছেন। *মুকুল*-এর পাঠক বালক বালিকাদের জন্য শিকারের গল্প রচনার ক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিশুসাহিত্যিকরা সম্ভবত মৌখিক রীতির চিরন্তন গল্প বলার ধরণটিকেই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। ভালুকের প্রবৃত্তি, হিংস্রতা, সাহস, শক্তি ইত্যাদি বিবৃত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গের টানেই যেন দেশবিদেশের ভালুক শিকারের ছোটো ছোটো টুকরো গল্পগুলি যোগীন্দ্রনাথ ছোটোদের সহজ সরল ভাবে শোনাচ্ছেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও কথামালার বিখ্যাত 'সিংহ ও ইঁদুরের গল্পে' সিংহের শিকারির জালে পড়ার ঘটনার প্রসঙ্গসূত্রে সত্যিকারের সিংহ শিকারের সঙ্গে ছোটোদের পরিচিত করতেই যেন আলজিরিয়ার সিংহ শিকারের গল্পটি হাজির করেছেন।

ছোটোদের জন্য রচিত বাংলা শিকার-সাহিত্য সূচনাপর্ব অতিক্রম করে বিকাশের পথে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে *সন্দেশ* (১৯১৩ খ্রি.) পত্রিকার মাধ্যমে। *সন্দেশের* ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা থেকে প্রমদারঞ্জন রায়ের 'বনের খবর' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হওয়া শুরু হতেই বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের আঙিনাতে সম্ভবত এই প্রথম আবির্ভাব ঘটছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জঙ্গল-অ্যাডভেঞ্চার বা জঙ্গল অভিযান কাহিনির। 'বনের খবর' শুধুমাত্র শিকার কেন্দ্রিক সাহিত্য নয়, কিন্তু বনের খবরাখবর সূত্রেই এসে গেছে শিকারের গল্পও। উপেন্দ্রকিশোর-ভ্রাতা প্রমদারঞ্জন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার চাকরি সূত্রে দেরাদুন, ব্রহ্মদেশ (শান স্টেট, কেংটুং রাজ্য), বেলুচিস্তান, পূর্ববঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরার নানা দুর্গম, অগম্য ভয়ঙ্কর বন-জঙ্গল-পাহাড়ে জরিপের কাজে যান। সেসব স্থানে তিনি যেসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন, প্রকৃতি ও মানুষজনের সংস্পর্শে আসেন, বন্য জীবজন্তুর সাক্ষাৎ পান—সেই সব বাস্তব অভিজ্ঞতার

ভিত্তিতে লেখা তাঁর ডায়েরিধর্মী রচনাগুলি *সন্দেশ* পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩২০ থেকে আশ্বিন ১৩২১ পর্যন্ত মোট ১৫টি কিস্তিতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। জরিপ কাজে বনজঙ্গলে চলাফেরার সময় হামেশাই বনের বাসিন্দা তথা বাঘ, ভালুক, গন্ডার, হাতি, মহিষ, বন্য শূকর ইত্যাদির মুখোমুখি হওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রথম দিকে লেখক তাঁবুর নিকট বাঘের ফোঁস ফোঁস শব্দে অর্থাৎ অল্পেই ভয় পেলেও ক্রমে ক্রমে মানুষ ও বন্যজন্তুর সহাবস্থানে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন যে বড়ো বড়ো বিপদেও তেমন ব্যস্ত হন না। 'বনের খবর' পড়লে বোঝা যায়, সূর্য বা আকাশ দেখতে না পাওয়া ঘোর অরণ্যগুলিতে লেখকদের জরিপ দল যেমন বন কেটে পথ করে এগোতে এগোতে পদে পদে নানা বন্যজন্তুর দেখা পাচ্ছিল, ঠিক তেমনি এতদিন মানুষের নামগন্ধ না থাকা বনে বন্যজন্তুরাও মানুষের সামনে পড়ে বা মানুষ দেখে যথেষ্টই বিস্মিত হচ্ছিল। ফলে কখনও মানুষের চিৎকারে বাঘ থমথম খেয়ে 'হুপ গাল' দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালায়;কখনো বা জল পানরত বাঘ মানুষজনের চ্যাঁচামেচিতে আস্তে আস্তে উঠে 'বনের রাজা'র মতো চালেই দু চার পা যায় আর ঘাড় ফিরিয়ে দেখে; কখনও মানুষের গন্ধ পেয়ে 'যমদূতের দাদামশায়ে'র মতো বিশাল গন্ডার মিনিট খানেক পাথরের মতো দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিয়ে পাহাড়ে উঠে পড়ে কিম্বা গাছপালা ভেঙে 'কামানের গোলা'র মতো আবির্ভূত গন্ডার এক নজর তাকিয়ে 'ঘ্যোৎ' বলে ছুট দেয়; কখনও লেখকের 'হুঁ-উ-উ' ডাকে বুনো হাতিরাও 'হুঁ-উ-উ' জবাব দিয়ে দূর থেকে দেখতে আসে আওয়াজকারী 'এটি কি রকম জানোয়ার।' হিংস্র বুনো জন্তুর সঙ্গে সাক্ষাতের বিপদঘন উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তগুলিও প্রমদারঞ্জন অসাধারণ মুনশিয়ানায় কৌতুকের মিশেলে সরস ভাবে বর্ণনা করেছেন। মানুষ ও বন্যপ্রাণী উভয় পক্ষই পরস্পরকে দেখে অবাক হচ্ছে, ভয় পাচ্ছে। ফলে মানুষের একত্র চিৎকার চেঁচামেচি, জ্বলন্ত মশাল বা আগুনেই অনেকক্ষেত্রে বুনো জন্তুরা বেগতিক বুঝে জঙ্গলে সরে পড়লে আর শিকারের প্রয়োজন হয়নি। তবে কোনো কোনো বাঘের কিছুতেই পিছু না ছাড়া, ঘাপটি মেরে থেকে হঠাৎ আক্রমণ, বাঘের আগমনে কখনো-কখনো সব জিনিসপত্র, কাজ ফেলে শুধু নকশাগুলি নিয়ে জরিপ দলের পলায়ন—এসব ঘটনাও বিরল নয়। জরিপ দলটির উদ্দেশ্য শিকার করা ছিল না। তবে ভোর বেলায় নানারকম বন্য জন্তু সামনে পড়ায়, শিকার করতে চাইলেও ঘোর বন, কুয়াশা ও পলকের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ায় প্রমদারা শিকারে সফল হতেন না। গন্ডার দেখে একবার সঙ্গী লুসাই প্রমদাকে তা শিকারে বারংবার উৎসাহিত করলেও মাত্র তিনটি গুলির সম্বলে তিনি গন্ডার মারতে উদ্যত হননি—'উপস্থিত গন্ডার এপারে আসতে

চাইলে তবেই মারিব নইলে মারিব না।'[৪৪] এ ঘটনাটি প্রমাণ করে হিংস্র জন্তুর মুখোমুখি হলেও বুদ্ধি বিবেচনা সংযম বজায় রাখা একান্তই জরুরি। প্রমদারঞ্জন অযথা যথেচ্ছ ভাবে নির্বিচার শিকারে অবশ্য কখনই আগ্রহী হননি। আত্মরক্ষার প্রয়োজন হলে তবেই (ও পরবর্তীকালে খালাসিদের নুন লঙ্কা ভাতের একঘেয়েমি কাটাতে মাংসের জন্য) তিনি শিকারে উদ্যত হয়েছেন। লুসাই বুড়োকে তাড়া করা হাতি থেকে বাঁচাতে তিনি হাতিটিকে গুলিবিদ্ধ করেন। বিপদ কাটার পর হাতির রক্তাক্ত গমন পথে একটি চোট পাওয়া বাচ্চা হাতি দেখে বোঝেন পূর্বের হাতিটির আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার কারণ। দল থেকে পিছিয়ে পড়া বাচ্চা হাতিটির খাতিরেই 'বেচারি' মা-হাতিটির এরূপ আচরণ। 'সন্তানের মায়া!'[৪৫]—এই ছোট্ট উক্তি ও বিস্ময়সূচক চিহ্নটির মাধ্যমে লেখকের ভয়ানক জীবজন্তুর, যাকে হয়তো জীবন রক্ষার্থে তিনি মারতে বাধ্য হয়েছেন, তারও প্রতি তাঁর বিস্ময়মাখা সহৃদয় মানসিকতাটি সহজেই ধরতে পারা যায়। লেখক নিজে বাঘ শিকার না করলেও বাঘের চামড়া প্রাপ্তি সূত্রে শুনিয়েছেন দুটি বাঘ শিকারের আশ্চর্য গল্প—এক শান যুবকের হরিণ শিকারে গিয়ে বাঘের মুখে পড়ে খারাপ ক্যাপ বন্দুকেই দৈবক্রমে ফায়ারিং হয়ে বাঘ শিকার; আর দিনের বেলা গ্রামে ঢুকে শুয়োর আহাররত বাঘকে একটি বারো বছরের কিশোরের বড়োদের অনুপস্থিতিতে বাবার বন্দুক দিয়ে শিকার। 'বনের খবর' শুধুমাত্র বুনো জন্তুদের সাক্ষাৎ বা শিকারের কাহিনি নয়, নয় কেবল মাত্র বনজঙ্গলে ঘোরার ভ্রমণ কাহিনি, একই সঙ্গে এতে উঠে এসেছে বিভিন্ন স্থানের হরেক কিসিমের মানুষের কথাও। চলতে চলতে দেখা পাওয়া গ্রামের অধিবাসীদের নানা কথা—লেখকের প্রতি তাদের ভালোবাসা, তাদের সংস্কার-বিশ্বাস, বুনো জন্তুর সঙ্গে তাদের সংঘাতময় জীবনযাত্রা, স্থানীয় শিকার পদ্ধতি, বাঘ মারার মজাদার ফন্দি, চিতা বাঘ ধরার ফাঁদ ইত্যাদি প্রাঞ্জল ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর প্রমদার দিনরাতের সঙ্গী যারা—জরিপ দলের সেই সব খালাসি, সার্ভেয়ার, চাকর, দোভাষীদের কথা, বন্যজন্তুর সঙ্গে তাদের মোলাকাত, তাদের আমোদ হাসি ঠাট্টা হিংসা ভয় সাহসের নানা বিচিত্র গল্প বারংবার উঠে এসেছে 'বনের খবরে'র পাতায় পাতায়। সুচিৎ, বেণী, গঙ্গারাম, শ্যামলালদের মতো ভয়ে থরহরি কম্পমানদের পাশেই হাজির হয়েছে শের শুনেও বেপরোয়া ডম্মর খালাসি, জলন্ত বাঁশ দিয়ে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে সঙ্গীদের বাঘের মুখ থেকে রক্ষাকারী দুঃসাহসী বাহাদুর নান্দো সর্দার। বাঘ থেকে বাঁচা সুচিৎ-এর ভীতসন্ত্রস্ত দশা দেখে হাসা বেণীরও পরে হরিণকে বাঘ ভেবে ঘটানো হাস্যকর কাণ্ড, দোভাষীর বাঘকে লালপাগড়ী মঙ্গল ভেবে কথোপকথন, তাঁবুতে ঢোকা বাঘের য়্যালার্মের শব্দে ভয়ে তাঁবু লণ্ডভণ্ড করা,

গোঁফ গজানোর প্রলোভনে শান যুবককে ভিখারির ঠকানো, নিশানা-চমকদার ফুটকিয়ার জীবনে কখনও বাঘ না দেখায় বাঘকে চিনতে না পারা ইত্যাদি অসংখ্য ছোটো ছোটো দৈনন্দিন মজাদার ঘটনা ভিড় করে আছে লেখকদের প্রতি পলে চরম বিপদের সম্ভাবনাময় বন যাপনের মাঝে মাঝে। ফলে *সন্দেশ* পাঠক শিশু-কিশোরদের মনে 'বনের খবর' শুধু রুদ্ধশ্বাস শিহরণই সঞ্চার করে না, জোগায় উতরোল হাসির খোরাক। সহজ সরল সুখপাঠ্য স্বাদুগদ্যে লেখা 'বনের খবর' *সন্দেশের* খুদে পাঠক মহলের সঙ্গে সঙ্গে বয়স্ক পাঠকদের কাছেও অত্যন্ত সমাদৃত হয়। সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা ছবির অলঙ্করণ নিঃসন্দেহেই এই জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চারটিতে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা [চিত্র ৪৭-৫১]। 'বনের খবর' পরবর্তীকালের বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য জঙ্গল বা শিকার অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলিতেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।

সন্দেশে-র বিভিন্ন সংখ্যায় বেশ কিছু চমৎকার শিকার কাহিনি উপহার দিচ্ছেন কুলদারঞ্জন রায়, দ্বিজেন্দ্র নাথ বসু, শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখরা। উপেন্দ্রকিশোরের আরেক ভাই কুলদারঞ্জন বিদেশি গল্পের সুদক্ষ অনুবাদকরূপে ছোটোদের জন্য যেমন লেখেন 'রবিনহুডের গল্প', 'ওডিসিয়ুস' তেমনি সাহেব শিকারিদের লেখা পুস্তকের নানা শিকারের ঘটনার ভিত্তিতে *সন্দেশের* পাতায় একের পর এক লিখে গেছেন শিহরণ জাগানো রোমাঞ্চকর অনেকগুলি শিকারের গল্প। 'আয়েনপুরের মানুষখাকী' গল্পটিতে (৮ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩২৭) আছে ৬০-৭০ বছর পূর্বে আয়েনপুর ও তার পাশাপাশি গ্রামগুলির ত্রাস হয়ে ওঠা এক মানুষখাকী বাঘিনীর কথা। তার অত্যাচারে অস্থির আতঙ্কিত গ্রামবাসীদের রক্ষাকর্তারূপে আবির্ভূত হন মহীশূরে হাতি ধরতে আসা নামজাদা শিকারি স্যাণ্ডারসন সাহেব। বাঘিনীর উৎপাতে হাতি ধরার কাজে ব্যাঘাত আসতে পারে ভেবে সাহেব চিন্তিত হন। কিন্তু বাঘিনীর হদিশ পাওয়াই ছিল দায়। 'সেয়ানা' বাঘিনী বারবার সাহেবের সুদক্ষ ট্র্যাকারদের 'মুখে কালি' দিয়ে লুকোচুরি খেলতে থাকে; অব্যাহত থাকে তার মানুষ হত্যালীলাও। ট্র্যাকার সর্দার বোমাই গোদাকে সঙ্গে নিয়ে সাহেব মানুষখেকো বাঘিনীকে কীভাবে শিকারে সমর্থ হন, তারই রোমাঞ্চকর গল্প 'আয়েনপুরের মানুষখাকী'। মানুষখাকীর মৃত্যুতে সকলে খুব ফূর্তি তামাশা করে। কিন্তু কুলদারঞ্জন রায়ই 'পেটুক বাঘ' গল্পে (৮ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩২৭) লিখেছেন এমন এক বাঘের কথা যার শিকারে গ্রামবাসীরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বলে 'আহা! বেচারি কোনদিন আমাদের কারো কোন অনিষ্ট করেনি!'[৪৬] এমনকি শিকারি স্যাণ্ডারসন সাহেব যিনি দীর্ঘদিন ধরে বহুবার নাকালের পর ১৮৭৪ সালে বাঘটিকে

মারতে সফল হন, তার মনেও একটু দুঃখ হয়। 'গরু খাবার যম' প্রকাণ্ড ষণ্ডা মোটাসোটা জোয়ান অন্যদিকে নিরীহ 'ভালোমানুষ' বুদ্ধিতেও খানিক ভোঁতা বাঘটিকে 'মরলে গ্রামে'র বাসিন্দারা নাম দেয় 'ডন্'। তাদের বিশ্বাস 'ডন্' বনদেবতা কুমবাপ্পার বাহন; জাদুমন্ত্র জানে; বন্দুকের গুলিও তাকে মারতে ব্যর্থ। ডনকে শিকারের নানারকম ফন্দি বারবার ব্যর্থ হওয়ায় সাহেবেরও তাকে মারার জেদ চেপে যায়। শেষপর্যন্ত অতিরিক্ত পেটুক হওয়াই অর্থাৎ গুরুভোজনের পর গরমে ভালো দৌড়তে না পারাই তার কাল হয়। এই স্যাণ্ডারসন সাহেবেরই ঢাকার পিলখানার সুপারিন্টেন্ডেন্ট রূপে গারো পাহাড়ে বুনো হাতি ধরতে গিয়ে দাঁতালে দাঁতালে লড়াইয়ে আহত গুণ্ডা হাতির সঙ্গে মোকাবিলার রোমহর্ষক গল্প 'গারো পাহাড়ের গুণ্ডা হাতি' (১০ম বর্ষ, ভাদ্র ১৩২৯)। কুলদারঞ্জনের 'চট্টগ্রামে হাতী ধরা'র গল্পটি *সন্দেশে* ১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। শুধু স্যাণ্ডারসন সাহেবই নয় কুলদা ইংরেজ বৈজ্ঞানিক-শিকারি বেরিল ও 'ল্যাসো ছুঁড়ে জীবন্ত পশু ধরায় ওস্তাদ' মেজর এলান্-এর লেখার ভিত্তিতে যথাক্রমে রচনা করেছেন 'জাগুয়ার শিকার' ও 'নাগপাশে বাঘ ধরা' (১১শ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৩০) গল্প দুটি। কুলদারঞ্জনের মতোই শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ ও সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীও বিদেশি শিকারিদের লেখার উপর ভিত্তি করেই ছোটোদের শুনিয়েছেন 'ফাঁদ পাতিয়া বাঘ ধরা' (চার্লস মেয়রের মালয়ের বনে বাঘ ধরে ফেরার পথে পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘকে গন্ডারের হঠাৎ আক্রমণ) কিম্বা 'সিংহের মুখে' (আফ্রিকার টেলিগ্রাম লাইন পাতার কালে হ্যারি ব্যাঙ্কসের সিংহের মুখে তের মিনিট থেকে বেঁচে ফেরার অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা)-র মতো গল্প। কুলদারঞ্জন অবশ্য কেবলমাত্র সাহেব শিকারিদের কাহিনিই শোনাননি, এদেশীয় এক রাজার বীরত্ব, অসীম সাহস ও শিকার নৈপুণ্যকেও তুলে ধরেছেন 'ডোরাদার বাঘ শিকারের গল্পে'। মাচায় বসে শিকারে বিপদের আশঙ্কা কম বলে রাজা কখনও মাচান-শিকার করতেন না। মাটিতে ঝোপে বসে বন্দুকের বদলে পিস্তল দিয়ে ও শিকারে সুশিক্ষিত ভাইপোর হাতের ইলেকট্রিক টর্চলাইটের সহায়তায় প্রজাদের মহিষ 'চোর' বাঘকে খতম করেন এক গুলিতেই।

পশুপাখি, গাছপালা, বন, বনের জীবজন্তু সংক্রান্ত বিষয়গুলির সঙ্গে সঙ্গে *সন্দেশ* পত্রিকায় শিকার বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল; সম্ভবত যথেষ্ট জনপ্রিয়ও হয়েছিল। তার প্রমাণ শুধু শিকারের গল্পই নয় প্রথম পর্যায়ের *সন্দেশের* (১৩২০-১৩৩৩) পাতায় পাতায় হাজির অজস্র শিকার সংক্রান্ত প্রবন্ধও—'অদ্ভুত শিকার', 'তিমি শিকার', 'প্রাচীন কালের শিকার', 'গোখুরা শিকার', 'সিংহ শিকার'

ইত্যাদি। শিকার গল্প বা প্রবন্ধের অনুষঙ্গে বা অলঙ্কার রূপে নয়, 'এক পৃষ্ঠা রঙিন ছবি' বিভাগেও স্থান পেয়েছে 'ক্ষুধিত বাঘ' (৬ষ্ঠ বর্ষ, পৌষ ১৩২৫), 'ঘোগের হরিণ শিকার' (৭ম বর্ষ, মাঘ-ফাল্গুন ১৩২৬) ইত্যাদি নামাঙ্কিত বেশ কিছু সাদা কালো বা রঙিন ছবিও [চিত্র ৫২, ৫৩]।

বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যের স্বর্ণালী অধ্যায়

মুকুল, সন্দেশের পাতায় যে শিশু-কিশোর পাঠ্য শিকার-সাহিত্য সংরূপটির আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ ঘটতে আমরা দেখলাম, তা পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠছে বিশ শতকের *মৌচাক* (১৯২০ খ্রি.), *শিশুসাথী* (১৯২২ খ্রি.), *রামধনু* (১৯২৭ খ্রি.), *রংমশাল* (১৯৩৭ খ্রি.) ইত্যাদি শিশু-কিশোর পত্রিকাগুলির মাধ্যমে। বিশ্বযুদ্ধের সমকাল ও পরবর্তীকালে উক্ত পত্রিকাগুলিতে শিকার-সাহিত্যে ব্যাপক জোয়ার দেখা যায়। দেশ ও বিদেশের পটভূমিতে স্থল ও জলের বিভিন্ন প্রাণী (বাঘ, চিতাবাঘ, চিতা, হাতি, গন্ডার, সিংহ, জলহস্তী, ভালুক, গরিলা, ক্যাঙ্গারু, বুনোমোষ, শুয়োর, তিমি, সিলমাছ, ঘড়িয়াল, কুমির ইত্যাদি) শিকারের বিচিত্র সব রোমহর্ষক কাহিনি প্রকাশিত হচ্ছে উক্ত পত্রিকাগুলিতে। নিরীহ হরিণ, পাখি, মাছ শিকারের কাহিনি কখনো-কখনো উঠে এলেও, তা সংখ্যায় অতিনগণ্য। হিংস্র বন্যজন্তু বিশেষত মানুষখেকো বাঘ শিকারের গল্পেরই প্রাধান্য দেখা যায়। কেননা, বিপদের ঝুঁকিপূর্ণ ভয়ঙ্করের মোকাবিলাতেই থাকে অধিক বীরত্বের পরিচয়। এরূপ কাহিনিই তো শিকারির সঙ্গে সঙ্গে পাঠককেও ভয়াল বন্যপশুটির অনুসন্ধান, রুদ্ধশ্বাস ধৈর্যময় অপেক্ষার অদৃশ্য শরিক করে তোলে; দেয় শিকার ক্রীড়ার রোমহর্ষক উত্তেজনার স্পর্শ। ফলে রোমাঞ্চ-সন্ধানী কিশোর পাঠক স্বাভাবিক ভাবেই শিকার-কাহিনির প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয়।

বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যের প্রকারভেদ

বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত শিকার-সাহিত্যগুলি মূলত দুই প্রকারের—

১. সত্য কাহিনি বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ শিকার কাহিনি।

২. কল্প-শিকার কাহিনি।

সত্য কাহিনি বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ শিকার কাহিনিগুলি আবার লেখক ভেদে তিন ধরনের দেখা যায় :

১.ক. স্বয়ং শিকারির লেখা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ শিকার কাহিনি—

i) বিদেশি শিকারির লেখা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ শিকার কাহিনির বঙ্গানুবাদ। [সমর সরকারের 'সিংহ শিকার', 'মানুষখেকো সিংহ' *(রংমশাল)*]

ii) অ-বাঙালি ভারতীয় শিকারির লেখা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ শিকার কাহিনির বঙ্গানুবাদ। [সমর সরকারের 'বাঘে মহিষে', 'বাঘধরা' *(রংমশাল)*]

iii) বাঙালি শিকারির লেখা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ (মৌলিক) শিকার কাহিনি [দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর 'মাদ্রাজে শিকার কাহিনি', 'বাঘের দেশে' *(মৌচাক)*; সমরেন্দ্রকুমার দত্তের 'আসামে ঘড়িয়াল শিকার' *(রামধনু)*]

১.খ. শিকার-সঙ্গীর লেখা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ শিকার কাহিনি [ধরণীধর সেনের 'হিমালয়ে ভাল্লুক শিকার' (*রংমশাল*); বন্দে আলী মিয়ার 'অন্ধকারের আতঙ্ক' (*রামধনু*); সঙ্কর্ষণ রায়ের 'বন্যরা বনে', মনোরঞ্জন সেনের 'বাঘ শিকার' (*শিশুসাথী*)] ।

১.গ. পেশাদার বা শখের শিকারি কিংবা শিকার-সঙ্গী কোনোটাই নয়, কিন্তু ঘটনাচক্রে বা দৈবক্রমে হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হওয়ার বা শিকার করার বা শিকার দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ শিকার কাহিনি [রবীন্দ্রনাথ সেনের 'পুশপুশে' (*শিশুসাথী*); সুরেশচন্দ্র ঘোষের 'শিকার কাহিনী' (*শিশুসাথী*); চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'জঙ্গল চরিত', 'ব্যাঘ্রচরিত' (*রামধনু*); হীরালাল মিত্রের 'রামগড়ের জঙ্গলে']

বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য কল্প-শিকার কাহিনিগুলিতেও আমরা লেখক ভেদে দু-ধরন দেখতে পাই :

২.ক. সাহিত্যিকদের রচিত কল্প-শিকার কাহিনি। বিভিন্ন বইপত্র, খবর ইত্যাদি পড়ে, বিভিন্ন ঘটনা, কিংবদন্তি বা শিকারির মুখে অভিজ্ঞতা শুনে সাহিত্যিকরা তার সঙ্গে নিজেদের কল্পনার মিশেলে লিখছেন এই শিকার কাহিনিগুলি [প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ভানুমতির বাঘ', হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'বনবাসী অভিশাপ']। সাহিত্যিকদের ভাষা দক্ষতা, পরিবেশন নৈপুণ্যের স্পর্শে তাদের রচিত কল্প-শিকার কাহিনিগুলি অনেক সময়ই

অধিক রম্য, সুখপাঠ্যও কখনো-কখনো যথার্থ শিল্পসম্মতও হয়ে ওঠে। তবে অনেক সময় আবার শিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব ও শিকারির বীরত্বকে মহিমান্বিত করতে গিয়ে অথবা অরণ্য পটভূমির, হিংস্র জন্তুর বা পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে অধিক করে তুলে আখ্যানকে আরও রোমহর্ষক করতে গিয়ে তারা অতিরঞ্জনকে প্রাধান্য দিয়ে ফেলেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে ছোটোখাটো ত্রুটিবিচ্যুতিও কখনো সখনো তাদের রচনায় স্থান পেয়ে যায়। তবে এ ধরনের ছোটোখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি, অতিরঞ্জন দোষ স্বয়ং শিকারিদের কলমেও অনেক সময় দেখা যায়। বরং হেমেন্দ্রকুমার রায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিকরা তাঁদের শিকার কাহিনিগুলিতে যথেষ্ট পড়াশোনা করেই ছোটোদের কাছে নিখুঁত তথ্য পরিবেশনে সচেতন থেকেছেন।

পাঠকের কাছে কাহিনির আবেদন বাড়াতে কাহিনিগুলি লেখকের নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নির্ভর না হলেও যে 'মনগড়া, কাল্পনিক' নয়, 'সত্য ঘটনা নির্ভর' তা অধিকাংশ গল্পেই দাবি করা হয়। এই কল্প-শিকার সাহিত্যের ধারাটি যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণও। সাহিত্যিকরা শুধু শিকারকে কেন্দ্র করে গল্পই লেখেননি, পত্রিকার বাণিজ্যিক মুনাফার অনুকূল যে ধারাবাহিক উপন্যাস, বড়োগল্প কিংবা সিরিজ-সাহিত্য 'শিকার'কে কেন্দ্র করে তারা সেরূপ রচনাতেও সচেষ্ট হয়েছেন [খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'বনে জঙ্গলে' সিরিজ (*শিশুসাথী*)]।

২.খ. দক্ষ শিকারি যখন সুসাহিত্যিকও, তখন তাঁর রচিত কল্পশিকার কাহিনি। এখানে শিকারির অরণ্য ও পশুপাখি সম্পর্কে জ্ঞান, শিকারের নিজস্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, শিকার পদ্ধতি ও অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং সাহিত্যিক মুনশিয়ানা ও কল্পনার যথার্থ মেলবন্ধনের ফলে রচিত হয় অনবদ্য কল্প-শিকার সাহিত্য [বুদ্ধদেব গুহর 'টাঁড়বাঘোয়া' (*সন্দেশ*)]।

প্রাগাধুনিক সাহিত্যে 'শিকার প্রসঙ্গ'টির অনুষঙ্গে যে 'প্রাপ্তির' মোটিফটির কথা আমরা বলেছিলাম, তা বিশ শতকের আধুনিক বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলিতেও বর্তমান। তবে প্রাপ্তি এখানে আর ধন-সম্পদ, স্ত্রীধন, গুরু ইত্যাদি পার্থিব কোনও বস্তু নয়। শিকারের মাধ্যমে শিকারি (ও সাহিত্য বর্ণনাগুণে শিকার-সাহিত্যের পাঠকও) লাভ

করে শিকারের ভয় মিশ্রিত টানটান উত্তেজনা, রোমহর্ষক অপার্থিব রোমাঞ্চ অনুভূতি। তার সঙ্গে কখনও আশ্চর্য ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ; কখনও করে অরণ্য-উপলব্ধি; কখনো বা তার আত্ম-আবিষ্কারও ঘটে। এছাড়া সফল শিকারি লাভ করেন বীরত্ব ও পৌরুষের মর্যাদা, যা অমূল্য।

উনিশ শতকের শেষ পর্বের (*মুকুলে প্রকাশিত*) শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার কাহিনিগুলিতে প্রায়ই পরমেশ্বরের কৃপায় শিকারির প্রাণে বাঁচার প্রসঙ্গ উঠে আসতে দেখা যায়। সেখানে বিশ শতকের পত্রিকার শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার কাহিনিগুলিতে দৈব বা ভাগ্যের প্রসঙ্গ এলেও শিকারির সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, শিকার দক্ষতা ও হাল না ছাড়ার উদ্যমকেই অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

পশুপাখিকেন্দ্রিক সাহিত্য বনাম শিকার-সাহিত্য

এখানে একটা বিষয়ে সচেতন থাকা একান্তই জরুরি, এই কালপর্বে নবোদ্ভূত শিকার-সাহিত্য সংরূপটির অত্যন্ত রমরমা দেখা গেলেও পশুপাখি বা জীবজন্তু কেন্দ্রিক যে সাহিত্যধারাটি বাংলা শিশু-কিশোর পত্রিকা বা শিশু-কিশোর সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকেই প্রচলিত সেই ধারাটি কিন্তু বিশ শতকের উক্ত শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতেও বর্জিত হয়নি; বরং তা আরও সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে। চিরকালই মানবেতর জীবন্ত প্রাণীদের প্রতি ছোটোদের সহজাত আকর্ষণ ও অফুরন্ত বিস্ময়। এজন্য জীবজন্তুকেন্দ্রিক সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি, সহজে ভাষা শিক্ষা, বোধ শক্তি ও কল্পনার বিকাশ, মূল্যবোধ শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক সমাজ, পরিবেশের প্রতিও তাদের সহানুভূতিশীল, দায়িত্ববান করে তোলার পাঠ দেওয়া হয়। উক্ত পত্রিকাগুলিতেও পশুপাখি-সরীসৃপ-কীটপতঙ্গ-গাছপালা ইত্যাদি নিয়ে অসংখ্য কবিতা-ছড়া[৪৭], গল্প[৪৮], নাটিকা[৪৯], পালা[৫০], ব্যঙ্গকৌতুক[৫১], খবরাখবর[৫২], মূল্যবান বিজ্ঞানসম্মত প্রবন্ধ[৫৩] (সচিত্র) নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। চিত্রশিল্প[৫৪], ফটোগ্রাফি চর্চা[৫৫] ও অলঙ্করণে[৫৬]ও অন্যতম মুখ্য কুশীলব হয়ে উঠছে পশুপাখিরাই। পশুপাখিকেন্দ্রিক রূপকথা, নীতিকথাধর্মী গল্প, পশুপাখির কাহিনির ছদ্মবেশে সমকালীন সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির সমালোচনার গল্প ও পশুপাখির বাস্তব গল্প বিশেষত পোষ্য বা বাড়ির আনাচে কানাচে নিত্য দেখা যাওয়া পশুপাখিদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে নানান স্বাদের গল্প যেমন এই কালপর্বে অজস্র রচিত হচ্ছে, তেমনি আবির্ভূত হচ্ছে পশুপাখিকেন্দ্রিক এক নতুন ধরনের গল্প, উপন্যাসও—'পশুপাখিদের নিজস্ব জগতের কাহিনি।' লেখকদের

কল্পনা মারফতই এধরনের গল্প, উপন্যাসে পশুপাখিদের কথাবার্তা, মনোভঙ্গি উঠে আসছে ঠিকই, কিন্তু এগুলি ঠিক রূপকথা, নীতিকথা বা আজগুবি কল্পনা নয়। পশুপাখি, বনজঙ্গল সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা, কল্পনা, রোমান্টিকতা ও প্রাণীবিজ্ঞান সম্মত জ্ঞানের যথার্থ সমন্বয়ে রচিত পশুপাখিকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যের এই অভিনব ধারাটি। সম্ভবত এই ধারাটির আবির্ভাবের পেছনে রয়েছে Rudyard Kipling-এর বিশ্ববিখ্যাত *The Jungle Book* (১৮৯৪ খ্রি.)-এর প্রভাব। *Jungle Book*-এর অংশ বিশেষ নিয়েই রণেশচন্দ্র ঘোষ লেখেন ছোট্ট বেজি 'রিক্কিটিক্কি'র গল্প (*রংমশাল*, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৪৫)। আর এই *রংমশালেরই* কার্তিক, ১৩৪৫ সংখ্যা থেকে *The Jungle Book*-এর অনুকরণে রচিত সুকুমার দে সরকারের অ-ভূতপূর্ব উপন্যাস 'জঙ্গল' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। কিপলিং-এর মধ্যপ্রদেশের সেওনি জঙ্গলে নেকড়ে পালিত মানবশিশু 'মোগলি' ও তার চরম শত্রু 'শেরখান' এখানে হয়েছে গারো পাহাড়ের ভাল্লুকদের 'মংলু' ও 'কালো বাঘ কালকেতু'। এছাড়া আছে ভালুক-মা, তিন ভালুক ভাই, শিক্ষাদাতা ভালুক-বাবা নালুখ, লাঙ্গুররাজ গোদাধর, বন্ধু লাঙ্গুর গুপী, সম্বররাজ শৃঙ্গধর, উঠতি সম্বর যুবা উচ্চরব ও চিরশত্রু ধূর্ত, পাজি শেয়ালও। থাবাতে বিশাল বলশালী কালকেতুর ভয়ে বারবার পালিয়ে কোনও মতে বাঁচার পরিবর্তে দল বেঁধে তাকে মোকাবিলা করে শেষ করার জন্য সম্বর দলপতি শৃঙ্গধরকে মংলুর পরামর্শটিকে এবং প্রবীণ শৃঙ্গধরের যথার্থ বীর দলনায়কের মতো দলের স্বার্থে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেও হিংস্র কালকেতুকে বধ করার ঘটনাকে—ঔপনিবেশিক কালপর্বে ব্রিটিশ অত্যাচারে জর্জরিত ভারতীয়দের স্বাধীনতার স্বপ্নাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলিয়েও হয়তো পড়া সম্ভব। তবে জঙ্গলের নিজস্ব নিয়ম কানুন, জঙ্গলবাসী প্রাণীদের চিন্তাভাবনা-স্নেহ-বাৎসল্য-বন্ধুত্ব-ধূর্ততা-প্রতি পলে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকাকে সুকুমার যেরূপ চমৎকার ভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে উপন্যাসটি জঙ্গল ও জঙ্গলবাসীদের একান্ত নিজস্ব জগতের কাহিনি রূপেই যে কোনও পাঠককে মুগ্ধ করে। এ ধরনের আরও কিছু গল্প (সুকুমার দে সরকারের 'রঙিলা বৌ', 'পানকৌড়ি', 'শেয়াল ভাগ্নে', 'মহাশের', 'তিনটে ইঁদুর বাচ্চা'; বিশু মুখোপাধ্যায়ের 'বুনো'; আরতি ঘোষের 'হাঁস ও হাঁসী') ছড়িয়ে আছে *রংমশাল, রামধনু, মৌচাক, মাসপয়লার* পাতায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আলোয় কালোয়ে' (*মৌচাক*) শহরের কারখানা ঘরের পাশের খাঁচায় বন্দি পাখির সজীব বনের জন্য বেদনা যেমন ধরা পড়েছে তেমনি মুসফির 'কালোবিড়াল' (*মৌচাক*) গল্পটিতে কালো বিড়ালের বয়ানেই সংস্কৃতি ভেদে কালো বিড়াল সংক্রান্ত পয়া-অপয়ার প্রভেদটি বর্ণিত হয়েছে। পোষা হাঁসের জবানীতে তাদের

আনন্দ-দুঃখ-হিংসা-মানুষের অসতর্কতায় শিয়ালে নেওয়ার ভয়— একাকিত্বের বেদনা— পুনরায় বাঁচার স্বপ্ন উঠে এসেছে আরতি ঘোষালের 'হাঁস ও হাঁসী'-তে। কখনো-কখনো জঙ্গল অর্থাৎ পশুপাখিদের একান্ত নিজস্ব জগতে অনধিকার প্রবেশ ঘটে তাদের সবার অনাকাঙ্ক্ষিত তৃতীয় শত্রু বন্দুক হাতে দুপেয়ে শিকারিরও। সুকুমার দে সরকারের মৌলিক উপন্যাস 'ময়ূরকণ্ঠী বনে' বনের পশুপাখি ও মানুষ-শিকারি উভয়েরই মনস্তত্ত্ব, আচরণ, উপলব্ধি অসাধারণভাবে চিত্রিত হয়েছে।

পশুপাখি কেন্দ্রিক-সাহিত্য ও শিকার-সাহিত্য উভয়ই উক্ত শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে একই সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে। পশুপাখিকেন্দ্রিক সাহিত্যে পশুপাখিরাই মুখ্য চরিত্র; বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আখ্যানের নায়কও। তাদের প্রতি লেখক ও পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণত ইতিবাচক, সহানুভূতিশীল। কিন্তু শিকার-সাহিত্যে পশুপাখিরা 'অন্যতম' মুখ্য চরিত্র ও অপরিহার্য হলেও, শিকার সফল বা ব্যর্থ যাই হোক না কেন তারা মূলত নায়ক বা মূল চরিত্র (Protagonist) শিকারির প্রতিপক্ষ; তাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি অন্তত প্রথম পর্বের শিকার-সাহিত্যগুলিতে অনেকটাই নেতিবাচক, প্রতিহিংসাপূর্ণ। তারা সাধারণত চিত্রিত হয় মানুষের শত্রু, ক্ষতিকারক বা আখ্যানের খলনায়ক (Villain) রূপে। অবশ্য কখনো-সখনো শিকার লিখিয়েদের লেখার গুণ কিংবা দুর্বলতায় Hero ও Villain এর স্থান পরিবর্তনও ঘটতেই পারে [প্রেমচন্দের 'বনমানুষের গল্প' বা ননীগোপাল মজুমদারের 'সীলসিংহ']। তবে শিকার প্রতিযোগিতাটিতে সাধারণত বনের পশুটি (শিকার)-কে মানুষ-শিকারির শিকার নৈপুণ্য, বুদ্ধি ও দুঃসাহসিক বেপরোয়া সাহসে ভর করে পরাজিত করা বা করার চেষ্টার মধ্যেই নিহিত থাকে শিকার কাহিনির আসল আকর্ষণ। ভয়ঙ্কর বন্যজন্তুর শিকার ক্রিয়ায় ভয়মিশ্রিত যে রোমাঞ্চ শিহরণ, উত্তেজনা—শিকার লিখিয়েদের লেখনীর দক্ষতায়, অনুপুঙ্খ ধারাবিবরণে সেই রোমাঞ্চ উত্তেজনার অংশীদার হয়ে ওঠে শিকার-সাহিত্যের পাঠকও।

বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে শিকার-সাহিত্যগুলির অত্যধিক রমরমা এবং পত্রিকায় প্রকাশের পর সেগুলির গ্রন্থাকারে বা সংকলন-গ্রন্থরূপে প্রকাশ ও বারংবার পুনমুর্দ্রণের ঘটা থেকেই শিকার-সাহিত্যগুলির জনপ্রিয়তা সহজেই মালুম হয়। এবার এই জনপ্রিয়তার পেছনে কার্যকর সময়ের অদ্ভুত প্রবর্তনাকে বোঝার সঙ্গে সঙ্গে এই শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলিতে বারংবার উঠে আসা মুখ্য ভাবপ্রবণতাগুলিকেও দেখা যাক; বোঝার চেষ্টা করা যাক তার বিকাশ ও বিবর্তনের অভিমুখটিকেও।

তথ্যসূত্র

১. অজয় কুমার ভাণ্ডারী (অণু. ও সম্পা.), *বাল্মীকি রামায়ণ* (কলকাতা : গিরিজা লাইব্রেরী, ২০১৪), ১৭।

২. কালীপ্রসন্ন সিংহ (অনু.), *বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত ১ম খণ্ড* (কলকাতা : সাহিত্যতীর্থ, ২০১৪), ১৭০-১৭১।

৩. তদেব, ৯২.

৪. জ্যোতিভূষণ চাকী, তারাপদ ভট্টাচার্য, রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরী ধর্মপাল, সম্পা. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার.* ১০ম খণ্ড. ২য় মুদ্রণ (কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ২০১১), ৯-৮১.

৫. জ্যোতিভূষণ চাকী, অনু. *কিরাতার্জুনীয়ম্. সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার.* ৩য় খণ্ড. ২য় মুদ্রণ (কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ২০১১), ৪৫.

৬. তদেব, ১১৪.

৭. তদেব, ১১৫.

৮. তদেব, ১২৭-১৩৬.

৯. কালীপ্রসন্ন সিংহ, অনু. *বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত.* ১৮৯-১৯০.

১০. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পা.), *মহাকবি-কালিদাস প্রণীতম্ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্* (কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৫), ১১৬, ১২৩, ১২৮, ১৩২।

১১. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব,* পঞ্চম সংস্করণ (কলকাতা : দে'জ, ১৪২২), ৪৪৯.

১২. তদেব, ৪৪৪-৪৪৫.

১৩. তদেব, ৪৪৫-৪৪৬.

১৪. তদেব, ১৪৬.

১৫. তদেব, ৪৮২.

১৬. তদেব, ১৪৬.

১৭. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা* (কলকাতা : দে'জ, ২০০৫), ১২৬।

১৮. সুকুমার সেন (সম্পা.), *কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল* (কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১), ৪৫।

১৯. সনৎকুমার নস্কর (সম্পা.), *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী* (কলকাতা : রত্নাবলী, ২০০৫), ১৯৬।

২০. সুকুমার সেন (সম্পা.), *কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল,* ৫২।

২১. সনৎ কুমার নস্কর (সম্পা.), *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী,* ২১৬।

২২. *কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল,* ৫৩।

২৩. *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী,* ২৬৮।

২৪. *কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল,* ১২৭।

২৫. এ সম্পর্কে বিশদ জানতে দ্রষ্টব্য অর্জুনদেব সেনশর্মা, *হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ অদি-মধ্যযুগ* (কলকাতা : ভারবি, ২০১৫), ৩৭৪-৩৭৬।

২৬. ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, *শ্রীধর্ম্মমঙ্গল* (কলিকাতা : নটবর চক্রবর্ত্তী বঙ্গবাসী ইলেক্‌ট্রোমেসিন প্রেস, ১৩১৮), ৯৭.

২৭. মানিকরাম গাঙ্গুলি, *ধর্মমঙ্গল,* বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত, সম্পা. (কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০), ১৯৬.

২৮. তদেব, ১৯৭.

২৯. ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, *শ্রীধর্ম্মমঙ্গল*, ১০৩.

৩০. তদেব, ১০৬.

৩১. তদেব, ১০২.

৩২. Walter Cambell, *The Old Forest Ranger* (London : Arthur Hall, Virtue & Co., 1853), 28.

৩৩. William Rice, *Tiger Shooting in India* (London : Smith, Elder and Co., 1857), 28.

৩৪. Walter Cambell, op.cit., 28.

৩৫. Mrinalini Sinha, *Colonial Masculinity : The 'Manly Englishman' and the 'Effeminate Bengali' in the late Nineteenth Century (Manchester and New York : Manchester University Press, 1995), introduction 1-23.*

৩৬. বিশ্বজিৎ রায়, *সংকীর্ণতা বিরোধী বঙ্গসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব* (কলকাতা : আপন পাঠ, ২০২২), ১০৫।

৩৭. চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল, পূর্বোক্ত, ৩৫।

৩৮. তদেব, ২৬-৪৫।

৩৯. সাইফুল্লা ও এটি এম সাহাদাতুল্লা (সংকলন ও সম্পাদনা), *দিগ্‌দর্শন* (কলকাতা : বুকস স্পেস, ২০১৫), ২০৭-২০৮।

৪০. অরুণা চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *সখা, সখা ও সাথী* (কলকাতা : কল্লোল, ২০০২), ৪২০-৪২১।

৪১. তদেব, ৩৯৬-৩৯৭।

৪২. স্বপন বসু (প্রাক্‌কথন), *সত্যপ্রদীপ* (কলকাতা : পারুল, ২০১১), ২৪৮।

৪৩. অরুণা চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *সখা, সখা ও সাথী*, ৪০২-৪০৩।

৪৪. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (সম্পা.), *সন্দেশ,* ১ম বর্ষ, চৈত্র ১৩২০ (কলকাতা : ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স) ৩৯০ (প্রকৃতপক্ষে পৃ. ১৯০; ১৭৫ পৃষ্ঠার পর থেকে মুদ্রণ প্রমাদে পৃ. নং বিভ্রাট ঘটেছে)।

৪৫. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (সম্পা.), *সন্দেশ,* ২য় বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, ৬২।

৪৬. সুকুমার রায় (সম্পা.), *সন্দেশ* , ৮ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩২৭, ২৪৪।

৪৭. *মৌচাকের* পাতাতেই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাঘে মানুষে' (সুঁদরবনের কেঁদো বাঘকে বুদ্ধি জোরে বটুর জব্দ করার মজার আখ্যানমূলক-কবিতা; শ্রাবণ ১৩৪০); নজরুলের অত্যন্ত বিখ্যাত 'খুকু ও কাঠবেড়ালি' (পেটুক দুষ্টু কাঠবেড়ালিকে ঘিরে খুকুর মনের বিস্ময় জিজ্ঞাসা, আত্মীয়তাবোধ, রাগ—শিশুমনস্তত্ত্ব নির্ভর কবিতা); কিংবা অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'দুই বেড়াল ও এক বাঁদর' (বাঁদরের পিঠে ভাগের সুপরিচিত গল্পটি নির্ভর মজাদার সংলাপধর্মী কবিতা; আষাঢ় ১৩৫৩)। গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের 'বক মহাশয়' *(মৌচাক)* কবিতায় বকধার্মিক না হবার জন্য যেমন ছোটোদের সতর্ক করা হয়, আবার নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদারের 'ছোট পাখী বলে গেল' *(রামধনু)* কবিতায় পাখির মুখে ছোটোদের দেশকে না ভুলে দেশের যাতনায় ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কল্যাণী চক্রবর্তীর 'জাগছে গাধার চেতনে' *(মৌচাক)* উঠে আসে গাধাদের স্ট্রাইক ও অধিকারবোধের কথা। অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'পাখি পোষা' *(রংমশাল)* কবিতায় মর্দ্দানী দেখাতে গোপলা বাসা থেকে শালিক ছানা পেড়ে আনলেও অত্যধিক খাওয়ানোর চোটে ছানা বেচারির মৃত্যু হয়। অন্যদিকে সুনীল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নীলপাখি' *(মৌচাক)* কবিতায় বলা হয় মৃত খোকাকে নীলপাখি যেন গান শোনায়। *রামধনু*, *শিশুসাথী* ইত্যাদি পত্রিকার পাতায় পশুপাখিদের নিয়ে বিচিত্র স্বাদের অসংখ্য কবিতা লিখেছেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক ('বাঘের খেদ', 'বাস্তু সাপ', 'পাখীর গান', 'পাখীদের শিক্ষা', 'মিনুর কোকিল', 'পশুরাজের পশুশালায়', 'কচ্ছপ')। ছোটোদের জন্য রচিত কবিতা, ছড়ায় বাড়ির পোষ্য (অজিত দত্তর 'কেষ্টার কুকুর', আশা দেবীর 'পুষির বিপদ'), বনের জীবজন্তু বা বাড়ির আনাচে কানাচে দেখা যাওয়া পশু, কীটপতঙ্গরা (গোপাল ভৌমিকের 'বাঘের গল্প', মোহিনীমোহন গাঙ্গুলির 'শিয়াল রাজা', অসমঞ্জস মুখোপাধ্যায়ের 'রায়দীঘির কাতলামাছ', নবকুমার ভট্টাচার্যের 'কাঁকড়া', বুদ্ধদেব বসুর 'প্রজাপতি', বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের 'প্রজাপতির সাজ', অজিতকৃষ্ণ বসুর 'মৌমাছিদের গান', রাজকৃষ্ণ করের 'মৌমাছি', কালিদাস রায়ের 'প্রজাপতি ও ঘুড়ি', সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জোনাকি') এলেও, কবিতা ছড়ার রাজত্বে সর্বাপেক্ষা আধিপত্য নিঃসন্দেহেই পাখিদের। করুণা দেবীর 'খোকার পাখী', অচ্যুতচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বুলবুলি', সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'পানকৌড়ি', মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের 'বাবুই', হরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত বিদ্যাবিনোদের 'টুনটুনীর টক্কর' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আবার *মৌচাক* ১৩৬৫-র সংখ্যায় বিভিন্ন কবিদের বিভিন্ন পাখিদের নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে কবিতা রচনা করতেও দেখা যায় (সুনীল বসুর 'পাখিরা', নির্মল কুমার চক্রবর্তীর 'চাতক', সুশীল কুমার গুপ্তর 'টিয়া', বীরেন্দ্র কুমার ঘোষের 'বুলবুলি', পলাশ মিত্রের 'শালিক শালিক' ইত্যাদি)।

৪৮. গল্প বা কথাসাহিত্যের জগতেও পশুপাখিদের জয়জয়কার অব্যাহত,—

পশুপাখিকেন্দ্রিক রূপকথাধর্মী গল্প : সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অচিন পাখী' *(মৌচাক)*, স্বপন বুড়োর 'বশ হল বনের প্রাণী' বা 'দুমকার দুগ্‌গা টুনটুনি পাখি' (পশুপাখিরা হাজির

উপকারি বন্ধুরূপে); যতীন সাহার 'নীলপাখি'; গ্রীসদেশের রূপকথার ভিত্তিতে বীরেন্দ্রকুমার গুপ্তর 'ব্যাঙের জন্ম'; পশ্চিম আফ্রিকার রূপকথার ভিত্তিতে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'মাকড়সার কীর্তি';

পশুপাখিকেন্দ্রিক নীতিকথামূলক গল্প : ঈশপ, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশের নানা গল্প; নীলিমা দেবীর 'কাঠঠোকরার মাথায় কেন ঝুঁটি?' *(রামধনু)*; মহাভারতের বা পুরাণের ভিত্তিতে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের 'পক্ষিরাজের তেজ', 'অদ্ভুত বেজি', 'ব্রাহ্মণ ও কুকুরের মাংস', 'ইঁদুরের বুদ্ধি', 'বাঘের মন্ত্রী' কিংবা নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্যের 'শিয়ালের চাতুর্য' *(রামধনু)*; বৌদ্ধজাতক ভিত্তিক কালিদাস রায়ের 'মঙ্গলহস্তী' বা রেখা চট্টোপাধ্যায়ের 'ভক্তহস্তী পারিলেয়ক';

পশুপাখির গল্পের মাধ্যমে সমকালকে সমালোচনামূলক গল্প : পশুপাখির ছদ্মবেশে আসলে মানুষের গল্প ও সমাজ জীবনের নানা উপদেশ উঠে আসে রূপকথা, নীতিকথাধর্মী গল্পগুলিতেও। কিন্তু এই কালপর্বে সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি সম্পর্কে ছোটোদের সচেতন করতে লেখকরা কখনো-কখনো আশ্রয় নিয়েছেন পশুপাখির গল্পের। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'সিংহ শাবকের শিক্ষা' *(রং মশাল)* গল্পে নিজস্ব শিক্ষা সংস্কৃতি ভুলে বিজাতীয় শিক্ষার নকলনবীশী ও বুলি কপচানোর মারাত্মক ফলাফলকে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি বিশু মুখোপাধ্যায়ের 'বুনো' *(মৌচাক)* গল্পে বন্যমহিষের গল্পের মাধ্যমে প্রবীণ ও নবীনের দ্বন্দ্ব এবং নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে স্বজাতি প্রীতিকে মহৎ রূপে তুলে ধরা হয়েছে।

পশুপাখিকেন্দ্রিক বাস্তব গল্প : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কালা' বা প্রবোধকুমার সান্যালের কোকিল *(মৌচাক)* [পোষা অকেজো পশুপাখির প্রতি মানুষের বিশেষত বড়োদের অবহেলা, নিষ্ঠুরতার করুণ কাহিনি]; স্বপনবুড়োর 'রাজেনের রাজহাঁস' [পোষ্যের প্রতি অত্যধিক আদরের অত্যাচার ও মাত্রাহীন আকর্ষণ পোষ্য-পোষক উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর এরূপ বার্তার গল্প]; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'অ্যালসেশিয়ান রাখা না হাতী পোষা' বা অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'ছাগচরিত'*(মৌচাক)* শিবরাম চক্রবর্তীর 'একদা এক কুকুরের পা ভাঙ্গিয়া ছিল' [পোষ্য রাখতে গিয়ে কিংবা পথের পশুর উপকার করতে গিয়ে চরম বিভ্রাটে পড়ার গল্প]; স্বপনবুড়োর 'কেষ্টর জীব' [পোষা নেড়িকুকুরের প্রতি শুচিবায়ুগ্রস্ত ঠাকুমার মনপরিবর্তনের গল্প]; পার্থ দত্ত ও সিদ্ধার্থ দত্তর 'প্রতীক্ষা' *(মৌচাক)* [কুকুরের প্রভুভক্তির গল্প]; শিবরাম চক্রবর্ত্তীর 'ইঁদুর চরিতামৃত' কিংবা সরোজকুমার রায়চৌধুরির 'সাপে মানুষে' *(মৌচাক)* [ইঁদুর তথা প্লেগ কিংবা নকল খেলনা সাপকে ভয় পাবার মজাদার হাসির গল্প]; কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তর 'বলির পূজা' [অসহায় পশুকে বলিদান নিয়ে সমালোচনামূলক গল্প]; খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'সিংহের থাবা' *(মৌচাক)* [যুদ্ধে পড়া বোমায় বিপর্যস্ত চিড়িয়াখানার ভাঙা সিংহের স্ট্যাচুর থাবার টুকরোকে ঘিরে শিশুমনের বীরত্বের স্বপ্ন]; কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ গল্প 'আমার বন্ধু ইঁদুর' *(রংমশাল)* [পশুপাখির প্রতি শিশু-কিশোর মনের সহানুভূতি ও তাদেরকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা]।

৪৯. নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ইঁদুরের আভিজাত্য' নাটক *(মৌচাক)*।

৫০. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চি পালা' *(মৌচাক)* [রামায়ণের অংশ বিশেষ নিয়ে রচিত।

৫১. শৈল চক্রবর্তীর ব্যঙ্গ কৌতুকগুলি; যেমন— 'রেশনিং' *(রংমশাল)*।

৫২. মৌচাক পত্রিকায় প্রকাশিত 'সংবাদিকা' (যেমন— 'বনের-বাহিনী' -বানরদের জাপানে যুদ্ধের জন্য বোমা নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ দান)।

৫৩. পশুপাখি-সরীসৃপ-পতঙ্গ-গাছপালা এমনকি সদ্য আবিষ্কৃত ব্যাকটেরিয়া, জীবাণু নিয়েও অজস্র গুরুত্বপূর্ণ জীববিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ (সচিত্র) নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে,—

***মৌচাকে* :** হিতেন্দ্রমোহন বসুর 'শিশুক'; মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মৌমাছি'; বিনায়ক সেনগুপ্তর 'পাখি দেখা'; সুধাংশুকুমার চৌধুরীর 'ভারতের জাতীয় পক্ষী ময়ূর'; রাণা বসুর 'মজার জীব কচ্ছপ'; কেশবচন্দ্র গুপ্তর 'ব্যাঙ ও ব্যাঙাচী' ইত্যাদি।

***শিশুসাথীতে* :** দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের 'হিমালয়ের অদ্ভুত কুকুর'; কিশোরীমোহন বসুর 'গরু ছাগলের নাম'; রমেশচন্দ্র দাসের 'জীবজন্তুর কথা'; ননীগোপাল চক্রবর্ত্তীর 'উদ্যানের পক্ষী ও মক্ষি মালী'; প্রবোধচন্দ্র দেব চৌধুরীর 'পাখীর বাসা' ইত্যাদি।

***রামধনুতে* :** ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের 'জানোয়ার কি নিরেট বোকা?', 'ওরাং উটানের গল্প', 'গণ্ডারের গল্প', 'কারিগরী পাখী', 'উটপাখী', 'পাখীর ডিম', 'পশুপাখীর ভাষা', 'পঙ্গপাল', 'পোকামাকড়ের বুদ্ধি', 'পোকামাকড়ের চিড়িয়াখানা', 'কয়েকটি অদ্ভুত মাছ', 'রাক্ষুসে গাছ', 'বনমহোৎসব'; সুবিনয় রায়চৌধুরীর 'পশুর বাজার', 'জাত ভাই-এর কাণ্ড'; ধীরেন্দ্রলাল ধরের 'বাঘে মানুষে বন্ধুত্ব'; ননীগোপাল মজুমদারের 'জন্তু জানোয়ারের ভালোবাসা', 'মাছির কথা'; চারুলতা দেবীর 'কয়েকটি অদ্ভুত জন্তু', 'পোকামাকড়ের কি বেদনা নাই?'; হেমলতা দেবীর 'এনাকোণ্ডা সাপ', 'বিষধর'; বেলা বসুর 'উষ্ট্রচরিত'; শ্রী কৌটিল্যের 'পাখী নিয়ে গল্প'; সুশীল কুমার ভট্টাচার্য্যের 'গাছপালার গল্প'; প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'সাপের গল্প'; পঞ্চানন ঘোষালের 'জীবজন্তুর জন্মকথা'; বিরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মানুষের কাছাকাছি জীব'; নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'জীবাণুর জন্মকথা', 'ব্যাকটিরিয়ার গল্প'; সৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমাদের অদৃশ্য শত্রু ও বন্ধুবর্গ' ইত্যাদি।

***রংমশালে* :** সুবিনয় রায় চৌধুরীর 'কোয়ালা', 'জীবজন্তুর রোগচিকিৎসা'; সত্যচরণ লাহার 'পাখি ও পালক'; বিমল ঘোষের 'সরীসৃপের কথা'; নির্ম্মলকুমার সরকারের 'উড়ন্ত জীবজন্তু', শ্রী অণুবীক্ষণের 'পিঁপড়ে'; হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'কেঁচোর কেরামতি'; দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদিম পৃথিবীর মাছ, সরীসৃপ ও পাখী'; রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গাছের বন্ধু ও শত্রু' ইত্যাদি।

৫৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বল্লাহরিণ'।

৫৫. পরিমল গোস্বামীর 'ক্ষুধাচঞ্চল'।

৫৬. উপেন্দ্রকিশোর বা সত্যজিৎ রায়ের *সন্দেশ* পত্রিকার অলঙ্করণগুলি।

তৃতীয় অধ্যায়

বাঙালির জাতীয়তাবাদ, বীরপুরুষের সন্ধান ও শিকার-শিকারি

বাঙালি সম্প্রদায়ের প্রতি ঔপনিবেশিক প্রভুদের ধরাবাঁধা অতিপ্রিয় বুলিই ছিল—শীর্ণদেহ, দুর্বল, মেয়েলি, ভীরু কাপুরুষ। আর এনিয়ে বাঙালির নিজেদেরও ক্ষোভের অন্ত ছিল না। ফলে বাঙালির 'জাতীয়তাবাদী আত্মপরিচয়' গঠনের কালপর্বে (উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত) বাঙালির এজাতীয় কলঙ্কগুলি মোচনের জন্য খুব স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালি তরুণ প্রজন্মের শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। ভগ্নস্বাস্থ্য, মেয়েলি, নিস্তেজ, ভীতু বাঙালি যুবসমাজকে বলিষ্ঠ, পৌরুষদৃঢ়, সবল সতেজ, চারিত্রিক ভাবে আত্মবলীয়ান ও নির্ভীক ডাকাবুকো করে তোলার সেই বিশেষ কালপর্বে, বাঙালির একাংশের কাছে শিকারক্রীড়া ও শিকার-সাহিত্য চর্চায়, এমন কি শিশু-কিশোরদের জন্য শিকার-সাহিত্য রচনায়, অত্যন্ত আগ্রহ দেখা যায়। এই উৎসাহ, আগ্রহ, উদ্দীপনাটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বাঙালির মধ্যে উদ্ভূত 'যৌবনবাদের'[১] জোয়ারের কালে ও স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশেষত জঙ্গি চরমপন্থী আন্দোলনের কালেও বেশ জোরদার ছিল।

বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত শিকার-সাহিত্যগুলিতে 'শিকার'কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপস্থাপিত করা হতে থাকে 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া' বা 'সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক বলেই, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়া' রূপে। শিকারে সাফল্য পেতে গেলে শিকারির সুদৃঢ় কষ্টসহিষ্ণু সবল শরীর, সজাগ সচেতন চোখ-কান-নাক, দুর্জয় সাহস, বিপদের ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা, অসীম ধৈর্য, ইস্পাতদৃঢ় স্নায়ু, সর্বোপরি অভ্রান্ত লক্ষ্যভেদ ক্ষমতা বা সুনিপুণ শস্ত্র চালনদক্ষতা—এতগুলি গুণের একই সঙ্গে সমন্বয়ের দরকার হয়। ফলে এই গুণগুলির চর্চার ক্ষেত্রে বা শরীর মন-চরিত্র গঠনের জন্যও শিকার-ক্রীড়াকে ভাবা হতে থাকে অন্যতম একটি 'জরুরি অনুশীলন'। ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলার খেলোয়াড়দের খ্যাতি তুলনামূলকভাবে হয়তো শিকারিদের চেয়ে অধিক ব্যাপ্ত। কিন্তু শিকার খেলায় ভয়ঙ্কর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের ভয়কে জয় করে শিকারকে মোকাবিলায় শিকারি লাভ করেন এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চানুভূতি; এ অনুভূতি 'অবর্ণনীয়', 'অতুলনীয়'। এভাবে এই কালপর্বে শিকারের মতো নিষ্ঠুর রক্ত খেলার উপরও চাপানো হতে থাকে রোমান্টিকতার প্রলেপ। 'জন্তু জানোয়ার বধ' ও 'শিকার' (Sport) যে 'আসলে পৃথক' এরূপ একটি ধারণা বারবার জোরালো ভাবে তুলে ধরা

হতে থাকে। বাঙালি শিশু-কিশোরদের সামনে হাজির করা হতে থাকে দেশি বিদেশি শিকারিদের অজস্র বীরগাথা; তাদের শৌর্যবীর্য-বলিষ্ঠ পৌরুষ-নির্ভীকতা- প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের নানা আশ্চর্য দৃষ্টান্ত।

বাঙালি তরুণদের মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে শিকার ক্রীড়ায় আগ্রহী বা উদ্বুদ্ধ করতে, অন্তত তাদের মধ্যে ছোটো থেকেই সাহস, নির্ভীকতা সঞ্চারে, ভয় (জন্তুজানোয়ারের ভীতিও) কাটাতে—বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে একই সঙ্গে দেশি ও বিদেশি উভয় শিকারিদেরই শৌর্য-বীর্য-বেপরোয়া দুঃসাহস-বীরত্বের অজস্র শিকার কাহিনি প্রকাশিত হচ্ছে। তবে এই শিকার কাহিনিগুলিতে মাঝে মাঝেই শোনা যায় খানিকটা জাতীয়তাবাদী সুর—'শিকারের রোমাঞ্চকর গল্পগুলো তোমরা সাহেব সুবোদের কাহিনি থেকেই বেশির ভাগ শুনে থাক কিন্তু আমাদের দেশেও যে ওরকম ব্যাপার বহুৎ ঘটে থাকে...'[২]। সেসব দেশীয় কাহিনিগুলোও মোটেই বানানো নয়, সত্য ঘটনা, নিঃসন্দেহেই রীতিমত লোমহর্ষক রোমাঞ্চকর। আমাদের নিজেদের দেশের শিকারিরাও—ভারতীয় শিকারিরা এমনকি বাঙালি শিকারিরাও নৈপুণ্যে কোনও অংশে খাটো নন। এছাড়া গ্রামবাংলায় যেখানে প্রায়ই বাঘ, চিতাবাঘ ইত্যাদি হিংস্র প্রাণীর আনাগোনা হয় ও পথে ঘাটে সাক্ষাৎ মেলে, সেখানে এমন বহু দুর্জয় মানুষ আছেন যারা অনেক সময়ই আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র বন্দুক ব্যতিরেকেই হিংস্র জন্তুর মোকাবিলা করতে ভয় পান না; তাদের সম্বল গায়ের জোর, বেপরোয়া দুঃসাহস, বুদ্ধি আর লাঠি-বর্শা-কুড়ুলের মতো দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র। গল্পের পর গল্পে মাঝে মাঝেই এধরনের কথাবার্তা পুনরাবৃত্ত হতে থাকে; উঠে আসতে থাকে ভারতীয় বা বাঙালিদের নানা শিকার কাহিনি। সত্যরঞ্জন সেনগুপ্তর 'বাঘ শিকার' (*রামধনু*, ১৩৩৯) গল্পে গ্রামের কাছে বাঘের সাক্ষাৎ মিললে গ্রামের পালোয়ান অবিনাশদা ও তার আখড়ার চেলাদের সড়কি-রামদা-লাঠি নিয়ে বাঘকে গোল হয়ে ঘিরে ধরে মোকাবিলার কাহিনি বর্ণিত হয় :

> বাঘের হুঙ্কার সহ তীর বেগে আক্রমণে, অন্য লোক হলে সেখানেই তার 'ইতি' হয়ে যেত সন্দেহ নেই কিন্তু অবিনাশদা ছিলেন সত্যিকার পালোয়ান, আর তাঁর গায়ে ছিল বাস্তবিকই অমিত বল। তিনি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একটু সরে এসে এক ধাক্কায় বাঘটাকে ছিট্‌কে ফেলে দিলেন।[৩]

বাঘের সঙ্গে রক্তাক্ত সাকরেদের শুধু লাঠি নিয়ে বাঘে-মানুষে মরিয়া লড়াইটিও রোমহর্ষক ও বীরত্বের।

বন্দে আলী মিয়ার 'অন্ধকারের আতঙ্ক' (*রামধনু*, ১৩৪৮) গল্পে শহর থেকে

মাইল সাতেক দূরের পার্শ্বডাঙা গ্রামাঞ্চলে নরখাদক বাঘের উৎপাতে গ্রামবাসী ও পথচারীরা ভীতসন্ত্রস্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলে, ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাঘটি শিকারের জন্য সাহায্য নেন স্থানীয় বিখ্যাত শিকারি বিজয়বাবুর। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ভানুমতীর বাঘ' (*রামধনু*, ১৩৩৮) গল্পে কথক বড়োদিনের ছুটি কাটাতে বনবিভাগের বিজ্ঞাপন দেখে মুঙ্গেরের জামালপুরের মানুষখেকো কেঁদোবাঘ থেকে বিপন্ন গ্রামবাসীদের উদ্ধারে যায়। তিনজন শিকারি-সাহেব ইতিমধ্যেই ব্যর্থ। লম্বা-চওড়া বিশাল চেহারা, বাজখাঁই গলার অজয় বাবু দিন সাতেক ধরে ঘুরেও শিকারে জয় তো দূর, বাঘের পাত্তাও পাননি। শিকারে সফল হতে যে শুধু শারীরিক বল ও দুর্জয় সাহসই সব নয়, লাগে যথেষ্ট বুদ্ধিরও। আর বাঙালি 'শীর্ণদেহ' 'দুর্বল' হলেও তার 'বুদ্ধির জোর'কে খাটো করা মুশকিল। ফলে গল্পটিতে কথক বুদ্ধি খাটিয়ে ভানুমতির বাঘের অন্তর্ধান রহস্য বের করতেই মানুষখেকোর শিকার সহজে সম্পন্ন হয়।

'বৈষ্ণব' বললেই মিষ্টভাষী, নরম সরম, বিনয়ী, অহিংস, ধর্মপরায়ণ, কোমল স্বভাব মানুষের চিত্রই সাধারণত আমাদের মনে আসে। 'উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ' বাঙালি চরিত্রের অনুকরণে যেমন গীতিকাব্য বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হচ্ছে, তেমনি প্রায় সাত-আটশো বছর ধরে 'কোমলতা পূর্ণ', 'অতিসুমধুর' বৈষ্ণব পদাবলী ও বৈষ্ণব ধর্মের চর্চা, কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের বদলে মাধুর্যরূপের উপাসনা ইত্যাদির প্রভাবে বাঙালি কীভাবে হীনবীর্য, নিরামিষাহারী দুর্বল, অতিকোমল স্বভাব, নারীপুরুষ প্রণয় বা 'মদন ধর্ম্মোৎসবে'র প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়ে উঠেছে—এসব নিয়ে উনিশ শতকের শেষ থেকেই বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কলমে নানা কথাবার্তা উঠে আসত।[৪] মজার ব্যাপার, বন্দে আলী মিয়া 'বাসি খেকো বাঘ' (*রামধনু*, ১৩৪৮) গল্পে হাজির করেছেন এক বৈষ্ণবেরই বাঘ শিকারের আশ্চর্য বীরত্বের কাহিনি। 'রাজসাহী'র ক্ষেতরের বৈষ্ণব মেলা থেকে ফেরার পথে অন্ধকার নামতেই ঈশান বৈরাগীর বোষ্টমীকে বাঘে নেয়; পরদিন লোকমুখে বাঘটির বাসি শিকার খাবার অদ্ভুত প্রবণতা শুনে বৈরাগী নিজের জীবনের মায়া না করে বাঘের সন্ধানে যায়; এবং শেষ পর্যন্ত বোষ্টমীকে জীবন্ত উদ্ধারে ও রক্তাক্ত দেহেও বীরবিক্রমে লড়ে কুড়ুলের কোপে বাঘের মাথা নামাতে সক্ষম হয়।

উপরোক্ত গল্পগুলির মতোই বাঙালির বীরত্ব, দুঃসাহস, জীবনের ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা, শিকারে লক্ষ্যভেদ নৈপুণ্য, শারীরিক শক্তি, বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকার শিকার-সাহিত্যগুলি থেকে। বাঙালিরও যে বলবার-কইবার মতো অনেক কিছু ছিল, আছে—বাঙালিরও যে

বীরত্ব, শিকার-কুশলতাকে একেবারেই হেলা-ফেলা করার নয়—একথা নিদর্শন সহ প্রমাণে সচেষ্ট হচ্ছেন এই বাংলা শিকার-সাহিত্যগুলির লেখকরা।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, বাঙালির জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে উনিশ শতকে প্রাবল্য দেখা যায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের। হিন্দু-আর্য জাতিত্বের গৌরবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিকদের কলমে উনিশ শতকে এমনকি বিশ শতকেও অনেক সময় প্রতিপক্ষ রূপে চিত্রিত হয় ইংরেজ নয়, প্রধানত যবন বা মুসলমানরা। ফলে মুসলমানদের মধ্যেও ক্রমবর্ধমান ভাবে দেখা যায় এর প্রতিক্রিয়া। কিন্তু বিশ শতকের আমাদের আলোচ্য বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলিতে জাতীয়তাবাদের এই রূপটি সেভাবে ধরা পড়েনি। শিকার-সাহিত্যে আসলে প্রতিপক্ষ বা শত্রু—বনের হিংস্র জন্তু। বন্য ভয়ঙ্কর জন্তুর মোকাবিলায় গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষেই পরস্পরের পাশে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে। হিন্দু সাহিত্যিকের কলমে যেমন স্বীকৃত হয়েছে মুসলমান শিকারির বীরত্ব, শিকার নৈপুণ্য (হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সুন্দরবনের স্থানীয় শিকারি ও বাউলেদের নিয়ে রচিত শিবশঙ্কর মিত্র প্রমুখদের গল্পগুলি), তেমনি মুসলমান সাহিত্যিকও ভয়াল জন্তুর মোকাবিলায় হিন্দু বাঙালির বীরত্বকে তুলে ধরতে কুণ্ঠিত হননি (বন্দে আলী মিয়ার রচিত শিকারের গল্পগুলি)। বিশ শতকের গোড়ায় বঙ্গভঙ্গের ধাক্কায় হিন্দু জাতীয়তাবাদী মেজাজেও অবশ্য ইতিমধ্যে রদবদল ঘটেছে। মুসলমানদের বিদেশি ও নিপীড়ক ভাবার চেয়েও তাদের জাতির অন্তর্ভুক্ত করার তাগিদ দেখা দেয়।

জাতীয়তাবাদী কালপর্বে বিশেষত সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে বাঙালি কিশোর-তরুণ সমাজের মধ্যে জাতীয়চেতনা উন্মেষ বা স্বদেশপ্রেম জাগরণের প্রচেষ্টা তীব্র হয়ে ওঠে। এই সময়কার শিকার-সাহিত্যগুলিতেও মাঝে মাঝেই শিকারের গুণাগুণের পাশাপাশি দেশের দুর্দশা, বাঙালি যুবসমাজের অধঃপতন নিয়ে হাহুতাশ শোনা যেতে থাকে। চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'জঙ্গল-কাহিনি' (*রামধনু*, ১৩৪৬) গল্পে পানাগড়ের পিয়ারীগঞ্জে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধকারী এক সাঁওতাল যুবকের বীরত্বের গল্প শোনাতে বসে বলেন :

> এই দুর্বল বাঙালির দেশে তাহাদের (সাঁওতালদিগের) স্বাস্থ্য দেখিলে আনন্দ হয়। এক একটি চেহারা যেন গ্রীক প্রতিমূর্ত্তির মত---সুগঠিত মাংসপেশী যুক্ত—অপ্রয়োজনীয় চর্ব্বিলেশশূন্য—জার্ম্মানীর হিটলারের আদর্শের অনুরূপ—'*স্লিম্ টাফ্ য়্যান্ড হার্ড*' পাতলা, চিমড়ে এবং শক্ত। সাঁওতালরা নির্ভীক ও সত্যবাদী।...

শিকারে তাহাদের পরম আনন্দ। শিকারলব্ধ আমিষ তাহাদের পরম আদরের খাদ্য।[৫]

দেশের স্বাধীনতা বা মুক্তির জন্য গণআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাঙালি তরুণদের এই সাঁওতাল যুবাটির মতোই স্বাস্থ্যবান, নির্মেদ সবল শরীর, একই সঙ্গে নির্ভীক, সত্যবাদী, মৃত্যুভয়শূন্য হওয়াটাই তো সেসময়কার বাঙালি সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে একান্তই কাম্য ছিল। সেই সঙ্গে এখানে আমাদের মনে পড়তে বাধ্য এই কালপর্বের বাঙালির সুস্বাস্থ্যের জন্য আমিষ-নিরামিষ আহার নিয়ে নানা আলোচনা, বিতর্কও।[৬]

শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলিতেও মাঝে মাঝেই বাঙালির স্টিরিওটাইপ বৈশিষ্ট্যগুলি (ক্ষীণদেহ, রুগ্ন, মেয়েলি, ভীতু) বা দোষগুলি (আলস্য, বাকসর্বস্বতা, অসারতা, অহমিকা) অবশ্য তুলে ধরা হচ্ছে; কখনো বা করা হচ্ছে সমালোচনা-বিদ্রুপ, আত্ম-সমালোচনা বা আত্মবিদ্রুপও। বিশ্বের অন্যতম 'শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া' শিকারে বাঙালির সেভাবে অধিক পরিমাণে অংশগ্রহণ না করা বা শিকার নিপুণ না হয়ে ওঠার কারণ রূপে বন্দুক-বধ-রক্তারক্তি ভরা নিষ্ঠুর শিকার খেলার প্রতি বাঙালি জাতের স্বভাবগত নিস্পৃহতা, নিবীর্যতা ও আলস্যকেই বাঙালি শিকার-লিখিয়েরা বারে বারে দায়ি করতে থাকেন। বাংলা ছাড়িয়ে দেশ বিদেশের বিপদসঙ্কুল অরণ্যে শিকারের জন্য পাড়ি জমানো বা নানা কষ্টস্বীকার করে সেসব স্থানে শিকার ক্রীড়ায় মেতে ওঠা 'ঘরকুনো' 'আরামপ্রিয়' বাঙালির পক্ষে কতটা সম্ভব! তাই ধরণীধর সেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ শিকারের সত্য কাহিনি 'হিমালয়ে ভাল্লুক শিকার'-এর (*রংমশাল*, ১৩৪৪) সূচনা বাক্যেই লেখেন, 'বাঙালির পক্ষে হিমালয়ের জঙ্গলে ভাল্লুক শিকার আশ্চর্য বটে।'[৭] 'আশ্চর্য' হলেও তিনি অবশ্য ১৯৩৫ সালে এক বিদেশি নৃবৈজ্ঞানিক অভিযানের সঙ্গী রূপে কাশ্মীর ও পুঞ্চরাজ্য ভ্রমণকালে বিরল বাদামি ভালুক শিকারের অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

বাঙালি শিকারিদের শিকার ক্ষেত্র ছিল মূলত সুন্দরবন-উত্তরের ডুয়ার্স-চট্টগ্রাম অবিভক্ত বাংলা, প্রতিবেশী আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, বড়োজোর মধ্যপ্রদেশের অরণ্য অঞ্চল। দু-একটি ব্যতিক্রম (পাঞ্জাবের মহারাজ দলিপ সিং, সুরগুজার মহারাজ, বিকানেরের মহারাজা সাদুল সিং, কোচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর) ছাড়া বিদেশে বা দূরবর্তী এলাকায় গিয়ে শিকারের আকাঙ্ক্ষা ভারতীয় বিশেষত বাঙালি শিকারিদেরকে বাস্তবে তাড়িত করেনি। তবে বাঙালি সাহিত্যিকদের কলমে কল্প-শিকার অ্যাডভেঞ্চারগুলিতে বাঙালি শিকারি বিশেষত বাঙালি বা ভারতীয় তরুণ শিকারিরা

হামেশাই পাড়ি দিয়েছে সুদূর বিদেশের (আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, বর্মার) অচেনা অজানা গহন অরণ্যে। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আফ্রিকার জঙ্গলে' (*শিশুসাথী*) দক্ষিণ আফ্রিকার ডার্বানের তিন ভারতীয় বণিকের ছেলে শোভনলাল, বীরেন্দ্র ও রতন রাস্তায় বিপদের প্রবল সম্ভাবনা সত্ত্বেও গরিলা শিকারের জন্য আট বলদ টানা গরুর গাড়িতে করে রওনা হয় কয়েক শ'ক্রোশ দূরের গভীর অরণ্যে। ডার্বানের চারপাশের বনজঙ্গলের প্রাণীদের, এমনকি সিংহকে শিকার করেও তাদের তৃপ্তি নেই; চাই আরও ভয়ঙ্কর জানোয়ার, আরও মরণঘন ঝুঁকিপূর্ণ ভয়াল শিকারের মোকাবিলা। শোভনলাল-বীরেন্দ্র-রতনের শিকার বা আফ্রিকার জঙ্গল-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিটি বাঙালির কাছে 'পৌরুষ উদ্‌যাপনে'র জীবন্ত প্রক্রিয়া। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'বনবাসী অভিশাপে'র (*মৌচাক*) বাঙালি-কথক মহাযুদ্ধের কালে কলমধারী কেরানি রূপে আফ্রিকায় যান। ছেলেবেলা থেকেই তার 'বড়ো শিকারের শখ' হওয়ায় ভারতবর্ষের 'নেটিভ' বাঘ, গন্ডার, ভালুক শিকার করে করে তিনি আর কোনও 'নূতন আনন্দ' খুঁজে পেতেন না। তাই আফ্রিকায় এসে ছুটি পেলেই কলমধারী কেরানি থেকে প্রায়ই তার রূপান্তর ঘটত রিভলভারধারী শিকারিতে। সেবারও তিনি 'গরিলার স্বর্গ' কিভু অরণ্যে তাঁবু ফেলেন। 'আফ্রিকার জঙ্গলে'র ভারতীয় শোভনলালদের বা 'বনবাসী অভিশাপে'র বাঙালি কথকের আফ্রিকার ভয়ঙ্কর অরণ্যে শিকার অ্যাডভেঞ্চারের উদ্দেশ্য কিন্তু মোটেই বস্তুবাদী নয়; বন্যপ্রাণীর মূল্যবান দেহাংশের লোভে তারা শিকারে মাতেনি। তাদের আসল অভিপ্রায়—সাধারণ বন্যপ্রাণীর গতানুগতিক শিকারক্রীড়ার বাইরে 'আফ্রিকার বিভীষিকা' অজানা গরিলার মোকাবিলার মাধ্যমে শিকারের নতুন স্বাদ অনুসন্ধান, আনন্দের আস্বাদন। তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল—আফ্রিকার গভীর অরণ্যে মৃত্যুঘন কঠিন বিপদের সামনে বাঙালি তথা ভারতীয়দের নিজেদের শিকার নৈপুণ্য, অবিমিশ্র পৌরুষ, দুঃসাহসিক বীরত্বকে ঝালিয়ে নেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

সুদূর আফ্রিকার পটভূমি নিয়ে যখন বাংলায় এরকম একের পর এক কল্প-শিকার কাহিনি, অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি রচিত হচ্ছে, প্রায় সেই সময়ে দুর্গম আফ্রিকার বনে-জঙ্গলেই বাস্তবে পাড়ি দিচ্ছেন এক বঙ্গ-সন্তান। তিনি হীরেন্দ্র কুমার বসু (১৯০৩-৮৭ খ্রি.)। 'আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে' কিংবা 'আজি এ শারদ প্রাতে' ইত্যাদি বিখ্যাত গানের রচয়িতা হীরেন বসু নামেই তিনি অধিক পরিচিত। আজ আমরা সেভাবে মনে না রাখলেও, তিনিই প্রথম কোনও ভারতীয় পরিচালক যিনি খাস আফ্রিকার জঙ্গলে চলচ্চিত্রের ('আফ্রিকামে হিন্দুস্থান' বা 'Africa in India') শুটিং

করতে যান। দিল্লির পার্লামেন্ট সদস্য ও ব্যবসায়ী শেঠ গোবিন্দদাসজী আফ্রিকা নিয়ে হলিউড চলচ্চিত্র 'ট্রেডার হর্ন' দেখে হীরেন বসুর কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন :

> আমাদের ভারতীয়রা যা প্রথম করে গেছেন... তার প্রমাণ সাপেক্ষ নজীর নেই বলে আজকাল ইওরোপীয়গণ যথেচ্ছাচার শুরু করে দিয়েছেন। ...ওরা (ইউরোপীয়রা) বলেছে যে আফ্রিকার জলে-জঙ্গলে ওরা ওদের জীবনসংশয় করে কাফ্রীদের সঙ্গে ব্যবসায় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করেছে... কিন্তু সত্যি করে ভারতীয়রাই সর্বপ্রথম এই আফ্রিকার সঙ্গে ব্যবসাভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।[৮]

অতীতের এই ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিশেষত কাথিওয়াড়ীদের কৃতিত্বের যথার্থ স্বীকৃতি না ঘটায় শেঠজী যেমন ক্ষুব্ধ, তেমনি তাঁর আক্ষেপ— 'টের্ডার হর্নে'র মতো চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ভারতীয়দের মধ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের জোগানদার ও প্রযোজক থাকলেও বিপৎসংকুল আফ্রিকায় অ্যাডভেঞ্চার অভিযানের ভার নিয়ে যেতে উদ্যোগী কোনও সাহসী পরিচালকের একান্তই অভাব। তা শুনে হীরেন বসু সোৎসাহে পরিচালক হতে রাজি হন। আফ্রিকা মানেই তখন 'কাফ্রির দেশ', 'ঝলসানো গরম', 'জন্তুজানোয়ার সিংহী মানুষ সব মানুষ খায়', 'একবার গেলে ফেরা অসম্ভব'। আত্মীয়-স্বজনদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও হীরেন বসু দুর্বার মনের বলে পিছু হটেন না। মায়ের অনুমতি নিয়ে শেঠজীর উদ্যম-আর্থিক সহায়তা ও বন্দোবস্তে বোম্বাই থেকে পাড়ি দেন দুর্বোধ্য আফ্রিকার উদ্দেশ্যে (৩১ শে জানুয়ারি, ১৯৩৪ খ্রি.)। তাঁর ফিল্ম-ইউনিটে আরও বেশ কয়েকজন বাঙালিও ছিলেন। যাত্রাপথের ও আফ্রিকায় শুটিং-এর বিচিত্র নানা অভিজ্ঞতাকে তিনি প্রতিদিন ডায়েরি আকারে মাকে চিঠিতে জানাতেন। পরে সেগুলি 'আফ্রিকার ডায়েরী' (সচিত্র) নামে *শুকতারায়* ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে (১৯৫৭ খ্রি.) ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। আরও পরে তা গ্রন্থাগারে প্রকাশ পায় *বনে জঙ্গলে* নামে। আফ্রিকার জলে-জঙ্গলে সুকঠিন রোমাঞ্চকর নানা অভিজ্ঞতা, আফ্রিকার পরিবেশ-প্রকৃতি-পশুপাখি-মানুষজনের কথা যেমন তিনি খুঁটিনাটি সহ বর্ণনা করেছেন, তেমনি তুলে ধরেছেন প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন আফ্রিকার অবস্থা, ঔপনিবেশিক শোষণ ও তীব্র বর্ণবিদ্বেষের চিত্রও। হীরেনরা শিকারের উদ্দেশ্যে যাননি কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য শিকারের দৃশ্য ফিল্ম বন্দি করেন। ফিল্ম বানাতে সিংহদের বাইরে থেকে 'Kill' (জেব্রা ইত্যাদি তৃণভোজী প্রাণী অবাধে মেরে তার মৃতদেহ) দ্বারা লালায়িত করে তাদের দৌড়ানো, কামড়াকামড়ি, মারামারি, খাওয়ার দৃশ্য ফিল্ম করা হয়। এরূপ বীভৎস দৃশ্যে প্রথমে ভয় লাগলেও, পরে হীরেনের কেমন নেশার মতো লাগে। সফল ভাবে ফিল্মবন্দি করতে পারায় গর্বও হয়। তবে নিমন্ত্রিত সিংহরা 'Kill' না

পেলে তাদেরই কাউকে শিবির থেকে তুলে নিয়ে যেত—এরূপ বিপদের কথা নিযুক্ত অভিজ্ঞ দক্ষ-শিকারির মুখে শুনেও, মৃত জেব্রা পুরুষটির পাশে নিশ্চুপ দাঁড়ানো জেব্রা পরিবারের অশ্রুসিক্ত করুণ দৃশ্যটিকে বাঙালি হীরেন মন থেকে সহজে মুছে ফেলতে পারেননি। সিংহ শিকারের বাস্তব চিত্র নির্মাণের জন্য বকশিশ দিয়ে মাসাই যোদ্ধাদের দ্বারা সিংহকে খাদ্যের লোভ দেখিয়ে নৃশংস ভাবে সিংহ-শিকারও করা হয়। মানুষের বিনোদনের স্বার্থে বন্য প্রাণীদের ফিল্ম বানাতে কীভাবে বাইরে থেকে কৃত্রিম উপায়ে সুপরিকল্পিত ভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা হয় (অপব্যবহার করা হয়), এমনকি ইচ্ছে মতো নির্বিচারে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতেও কসুর করা হয় না—তার নিদারুণ নির্মম সত্যটিও ধরা আছে হীরেন বসুর কলমে।

শুধু এই হীরেন্দ্রনাথ বসুই নন, ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখব, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের অর্থনৈতিক মন্দাকালেও সাধারণ বাঙালি ঘরের বহু তরুণ নানা কাজের সন্ধানে বিদেশে বিশেষত ব্রিটিশ সরকারের অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে (আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত ব্রহ্মদেশ) যাচ্ছে। ঐসব স্থানেও ঔপনিবেশিক প্রকল্পের অংশ রূপে অরণ্য কেটে সভ্য শহর গড়া, রেললাইন ও টেলিগ্রাফের তার পাতা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডগুলি যখন ঘটছে তখন হামেশাই বন্যপশুর উৎপাত লেগে থাকত। বিভিন্ন পশুপাখিতে সমৃদ্ধ আফ্রিকার অরণ্যগুলি তো ছিল শিকারিদের কাছে স্বর্গক্ষেত্র। ফলে শুধু বাঙালির কল্পশিকার কাহিনিতেই নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নির্ভর শিকারের সত্য কাহিনিগুলিতেও বিদেশের বিশেষত আফ্রিকার পটভূমি মাঝে মাঝে উঠে আসছে। শিকারের গল্প হওয়ায় বিশদে না হলেও এসময়কার বাঙালি তরুণদের নানা চিন্তাভাবনা, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, বিশ্বরাজনীতির নানা পালাবদলের টুকরো টুকরো খবরও ধরা আছে এই কাহিনিগুলিতে। অমলেন্দু সেনের 'পশুরাজের কবলে' (*রামধনু*, ১৩৪৬) গল্পে চিরকেলে ডানপিটে, ভবঘুরে খুড়োমশায় ১৯১৩ সনে হঠাৎ নিখোঁজ হন। আট-ন বছর পর আবার ঘরে ফেরেন, আফ্রিকা-সিংহল-অস্ট্রেলিয়ায় কাটিয়ে। লেখাপড়া না জানলেও ছবি আঁকার একটু-আধটু হাতের জোরে তিনি কলকাতার মতোই জরিপের কাজ জুটিয়ে নেন জার্ম্মান-ইস্ট আফ্রিকায়। সে দেশ এখন মহাযুদ্ধে ইংরেজের শাসনাধীনে এসে ম্যাপে নাম বদলে টাঙ্গানাইকা টেরিটরী। বাঙালি খুড়োমশায় ডোডোমায় নরখাদক সিংহ দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। অবশ্য শিকারি রূপে নয়; শখের শিকারি বড়োসাহেবের অনুমতি নিয়ে শিকার দর্শক হিসেবে উপস্থিত থেকে। স্টেশনমাস্টারের বদ্ধঘরের কাচের জানলা

থেকে বায়োস্কোপের ছবির মতোই বড়োসাহেবের সিংহশিকার দেখার সুযোগ পান তিনি। আফ্রিকার সিংহ বা হিমালয়ের বিরল ভালুক বাংলায় দেখা যায় না। তাছাড়া শহুরে বাঙালির কাছে এমনিতেও শিকার দেখা দুর্লভ। ফলে নিজে স্বয়ং শিকারি না হলেও সেই কালপর্বে বাঙালির স্বচক্ষে শিকার অভিজ্ঞতা লাভের জন্য শিকার সঙ্গী বা দর্শক হবার আকাঙ্ক্ষাও ছিল যথেষ্ট। অনুরূপ সাক্ষ্য মেলে বন্দে আলী মিয়ার 'অন্ধকারের আতঙ্ক' (*রামধনু*, ১৩৪৮) গল্পের কথকের স্বীকারোক্তিতেও :

> শিকার করতে পারি না পারি—শিকার দেখবার সখ আমার ছেলেবেলা থেকেই। কেউ বন্দুক নিয়ে শিকার করতে বেরিয়েছে দেখলেই তার সঙ্গ ধরতুম। বাড়ীর কথা, ইস্কুলের কথা—কিছুই মনে থাকত না, শিকারীর সঙ্গে সঙ্গে বনবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম। লাভ লোকসানের হিসাব সে বয়সে নয়— রোদে রোদে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানোর কি যে আনন্দ ছিল আজ এই পরিণত বয়সে সেটা বুঝতে পারব না। ছেলে বয়সের সেই বাতিক এখন অবধি যে ধাওয়া করবে ভাবতে পারিনি।[৯]

নিজে শিকারি না হলেও শিকার সঙ্গী বা দর্শক হতে পারলেও বাঙালি সম্ভবত বেশ খানিকটা শ্লাঘা বা আত্মস্বাতন্ত্র্য বোধ করতেন। ধরণীধর সেনের 'হিমালয়ে ভাল্লুক শিকার' (*রংমশাল*) গল্পের সূচনাতেই কথক 'বাঙালির পক্ষে আশ্চর্য'—হিমালয়ের পাহাড়ি ভাল্লুক শিকারের অভিজ্ঞতা তার নিজের জীবনে ঘটার কথা ফলাও করে যতই জানান না কেন, তিনিও আসলে নিজে ভাল্লুক শিকার করেননি। অবশ্য তিনি বারবার জানিয়েওছেন যে তিনি মোটেই শিকারি নন; তার তখনও বন্দুক বা লাইসেন্স ছিল না। তবু দলের পাকা-শিকারি স্কচ ছেলে টম প্যাটারসনকে নিশীথ অভিযানে ভালুক শিকারকালে উৎসাহ দিতে তিনি লম্বা বর্শা হাতে শিকারসঙ্গী হন। তবে ক্রমে শিকারের 'মোহ' তাকে পেয়ে বসে। শিখ শিকারি গুরুদিৎ সিং ও মহাযুদ্ধ ফেরৎ পাঠান বেয়ারা মিশ্রিখানকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দু-বার ভালুক শিকারের চেষ্টা চালান। অমরনাথের এক চোপানের অনুরোধে ভালুক থেকে ভেড়াগুলির রক্ষার্থে তারা সেই রাতে শিকারে সচেষ্ট হন; ভালুক এসেছে বুঝতে পারলেও এবং চোপানের সঙ্গে ভালুকের খোঁজে তাঁবুর বাইরে বার হলেও শেষপর্যন্ত ভালুকের সাক্ষাৎ পাননি। অবশ্য লাভ করেছেন শিকারের ভয় মিশ্রিত রোমাঞ্চকর উত্তেজনাটি :

> উঃ, বাপস, সে কী সময়! ভাল্লুকটা কোথায় ঘাপটি মেরে বসে রইল নাকি? দেখার চেয়ে না দেখা যেন অন্ধকারে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল। আমাদের চারটি প্রাণীর জীবন অত্যন্ত অসহায় মনে হতে লাগল।[১০]

চোপানের ভেড়াদের পরিত্রাতারূপে ভালুক শিকারে ইচ্ছুক হলেও শেষপর্যন্ত তাদের নিদ্রা অবসন্ন দেহ ও বিষণ্ণ মনে বিদায় নিতে হয়েছে। রাস্তায় কিছু গিধ্বড় (বুনো খরগোশ জাতীয় ছোটো জন্তু) মেরে মন ও হাতের আশ মেটাতে হয়েছে। লীডার নদীর ধারের শিকারের রাত্রিতে পঞ্চাশ-ষাট গজের মধ্যে ভালুক দেখে 'রক্ত গরম হয়ে' শিকারের 'অতিলোভে' কথক ভালুকের পিঠ তাক করে বর্শা ছোঁড়েন। কিন্তু তিনি তো 'আফ্রিকার হটেনটট নন'। ফলে তার বর্শা তো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ই, সঙ্গে তার শব্দে বড়ো ভালুকটা চমকে সরে যাওয়ায় গুরদিৎও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পুঞ্চরাজ্যের সাপুরে টমের সঙ্গে ভালুক শিকারের দিন ভালুক তাড়ুয়াদের বিকট বাজনা কোলাহল সহ রীতিমতো রাজ-শিকারের ন্যায় বিরাট কাণ্ডকারখানা জীবনে প্রথম দেখে, শুনে কথকের 'সমস্ত শরীর একটা ভয়ানক উত্তেজনায় ও রোমাঞ্চে কীরকম হতে লাগল...মনে হতে লাগল, ভাল্লুকের দল খেপে গিয়ে একেবারে হত্যাকাণ্ড না শুরু করে।'[১১] নিজেকে সামলে নিয়ে তা বাইরে প্রকাশ না করলেও, কয়েক মিনিট পর হইচই-এর মধ্যে ৫০ গজ দূরে একটা প্রকাণ্ড ভালুক দৃষ্টিগোচর হতেই তার সমস্ত শরীর যেন 'হিপনোটাইজড' হয়ে যায়। মুহূর্তে টমের বন্দুক গর্জে ওঠে। কথকের ঘোর তখনও কাটেনি, মনে হয় যেন দেখলেন ভালুকটা আছড়ে পড়ে গেল। ভালুক তাড়ুয়াদের চেঁচামেচি বন্ধ করার ভুল পদক্ষেপে সবকিছু তুমুল ছত্রভঙ্গ গোলমাল হয়ে পড়লে, পাকা-শিকারি টম যখন উত্তেজিত হয়ে স্থানীয় ঐ তাড়ুয়াদের বোকামির দোষারোপ করেছে, তখন অবশ্য তাতে হেসে যোগ দিতে বাঙালি কথক মোটেই ভোলেননি, 'এদের ব্যাপারই ওই রকম টম; গরিলা যুদ্ধ, এরা নিয়মিত শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কাজে নামতে পারে না, মাঝখান থেকে আমাদের নাকাল করলে।'[১২] কাশ্মীর-পুঞ্চ অভিযান থেকে রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছে বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া পিচ রাস্তা-বাড়িঘর-লোকজন দেখে কথকের মনে হয় যেন 'সুদূর আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার কোনো জঙ্গল' থেকেই সবে মাত্র সভ্যজগতে এলেন। হিমালয়ের এই 'আশ্চর্য' শিকার অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে টমের মতোই তিনিও নিজ দেশের (বাংলা) মাসিক পত্রিকাতে একদিন সব লিখবেন ভেবেছিলেন; তারই ফলশ্রুতি *রংমশালের* গল্পটি। তৎকালীন বাঙালির শিকারের আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবে তার শিকার দক্ষতার—মধ্যেকার বিস্তর ফারাকটি চমৎকার ভাবে ধরা আছে বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী ধরণী সেনের অভিজ্ঞতাঋদ্ধ এই গল্পটিতে। সেই সঙ্গে এটিও সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাঙালি নিজে শিকারি হোক বা না হোক, শিকারে তার দক্ষতা থাকুক বা না থাকুক এই বিশেষ

কালপর্বে বাঙালির বিশেষত শহুরে শিক্ষিত ভদ্রলোক বাঙালির শিকার-ক্রীড়া সম্পর্কে কৌতূহল, স্বচক্ষে শিকারের অভিজ্ঞতা লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজ মাতৃভাষায় শিকার-সাহিত্য রচনার আগ্রহে বিন্দুমাত্র কমতি ছিল না।

ইংরেজ শিকারি ও শিকার লিখিয়েদের প্রচারিত—পৌরুষদৃপ্ত, দুঃসাহসী বীর 'Sportsman' সাহেব শিকারির বিপ্রতীপে এদেশীয় শিকারিরা কাপুরুষ, মেয়েলি, ভীরু, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নীতিনৈতিকতাহীন, মূল্যবোধশূন্য কসাই—এই সুনির্দিষ্ট দ্বৈততার ছকটি খুব স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালি শিকার-লিখিয়ে ও সাহিত্যিকদের মনঃপুত হয়নি। তবে তারা দেশ-বিদেশের বিখ্যাত সাহেব শিকারিদের কৃতিত্বকে অস্বীকার করেছেন এমন নয়। উনিশ শতকের বিশেষত *মুকুল* পত্রিকা থেকেই বিদেশি শিকার-সাহিত্যের বাংলায় অনুবাদ বা ভাবানুবাদের মাধ্যমে শিশু-কিশোরপাঠ্য বাংলা শিকার-সাহিত্যের আদিপর্বের সূচনা। এই বিদেশি সাহেব-শিকারিদের কাহিনি ধারাটি আরও বিকশিত হচ্ছে বিশ শতকের—*সন্দেশ* ইত্যাদি পত্রিকায় কুলদারঞ্জন রায় প্রমুখের কলমে—ভারতাগত ব্রিটিশ শিকারি (মহীশূরে হাতি ধরার বিশেষজ্ঞ ও ঢাকার পিলখানার সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্যাণ্ডারসন সাহেব, শিকারি উইলিয়ামসন, আসাম-বর্মায় শিকারখ্যাত এফ. টি. পোলোক) বা আফ্রিকায় যাওয়া ইউরোপীয়ান (ব্রিটিশ ডাক্তার ও মিশনারি লিভিংস্টোন, সিংহ শিকারি গর্ডন কামিং, মেজর লেভিসন, ইংরেজ বিজ্ঞানী বেরিল) ও মার্কিন বিখ্যাত শিকারি (রাষ্ট্রপতি থিওডোর রুজভেল্ট, জীবজন্তু বিশেষজ্ঞ কার্ল-ই-আকলি) প্রমুখদের লেখা পৃথিবীখ্যাত শিকার অভিজ্ঞতাগুলির বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে। এই ধারাটি বিশ শতকের আমাদের নির্বাচিত পত্রিকাগুলিতেও অনুসৃত হচ্ছে। *মুকুল* ইত্যাদি পত্রিকাগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিকার-কাহিনির মূল লেখক বা শিকারিদের নামের অনুল্লেখ থাকত, বড়োজোর বলা হত একজন বা দুজন ইংরেজ বা সাহেব শিকারি। বিশ শতকের শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্য রচয়িতারা কিন্তু মূল লেখক বা শিকারিদের নাম ধাম পরিচয় জানাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগ্রহী। সেই সঙ্গে আর একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়—আর শুধু ইংরেজ শিকারিদের কথাই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রসিদ্ধ শিকারিদের—সাহেব শিকারি ও সেই দেশের নিজস্ব স্থানীয় শিকারিদেরও—কাহিনি এবার উঠে আসছে অধিক মাত্রায়।

লেখক	শিকার-সাহিত্যের নাম	পত্রিকার নাম	বিষয়বস্তু
সমর সরকার এম.এ.বি.টি	'সিংহ শিকার'	*রংমশাল*, ১৩৪৭	বিখ্যাত স্কটিশ শিকারি জোর্ডান সাহেবের আফ্রিকায় সিংহ শিকার কাহিনি।
	'মানুষ খেকো সিংহ'	*রংমশাল*, ১৩৪৭	জোর্ডান সাহেবের দেখা, আফ্রিকার স্থানীয় চমৎকার শিকারি লুম্বাদের বর্শা ও ঢাল নিয়ে সিংহের সঙ্গে মোকাবিলা করার ও পারস্পরিক ক্ষতবিক্ষত হওয়ার—নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। মধু সংগ্রাহক 'ওয়ানচুলো'দের গ্রামের সর্দারের জামাইয়ের সিংহের মুখ থেকে শুধুমাত্র ছুরি নিয়ে লড়াই করে বেঁচে ফেরার কাহিনি।
—	'তেসাভোর আতঙ্ক'	*শিশুসাথী*	ব্রিটিশ আর্মির আইরিশ সদস্য হ্যানরি প্যাটারসনের ব্রিটিশ ইস্ট-আফ্রিকার তেসাভোতে উগান্ডা রেল কোম্পানীর রেল লাইনের কাজের সময় আফ্রিকান ও ভারতীয় কুলি-শ্রমিকদের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে ওঠা দুই মানুষখেকো সিংহকে শিকারের রোমাঞ্চকর কাহিনি।
রামেন্দ্রনাথ দে	'বেবুনের হাতে'	*রামধনু*, ১৩৪১	দুর্দান্ত শিকারি ইসাডোর সাহেবের আফ্রিকার জঙ্গলে বেবুনের সঙ্গে লড়াই।
	'গরিলার প্রতিহিংসা'	*রামধনু*, ১৩৪৩	ইসাডোর সাহেবের আফ্রিকায় বেবুন ও গরিলার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শন। জনশূন্য কাফ্রি গ্রামে উপস্থিত হয়ে জানতে পারা—গরিলার ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসাতেই গ্রামের এরূপ দুর্দশা।
রমেশচন্দ্র দাস	'বুনো হাতীর কবলে'	*রামধনু*, ১৩৪৩	অসম সাহসী শিকারি পটাসের আফ্রিকার কেনিয়ায় হাতি শিকার এবং

লেখক	শিকার-সাহিত্যের নাম	পত্রিকার নাম	বিষয়বস্তু
			মৃতপ্রায় হাতির অতর্কিত আক্রমণে একটি পা হারানোর করুণ কাহিনি।
সমর সরকার	‘ক্যাঙ্গারু শিকার’	*রংমশাল*, ১৩৪৮	অস্ট্রেলিয়ায় ম্যালেট গাছের ছাল সংগ্রহকারী বার্ট ফেয়ার হেডের ক্যাঙ্গারু, পাখি ও ডিঙ্গো শিকার কাহিনি।
শান্তা দেবী	‘গ্রীজলি ভালুকের কবলে’ ‘দুই শিকারীর কাহিনী’	*রামধনু*, ১৩৪৯ *রামধনু*, ১৩৫৪	ফরাসী দেশীয় সোনার ব্যবসায়ী, দেশ ভ্রমণ ও শিকারের নেশাযুক্ত মিঃ ওগানের উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার বনে ভালুক শিকার কাহিনি। ইউরোপে ফরাসী-প্রুশিয়াদের যুদ্ধকালে অবরুদ্ধ প্যারিস শহরের বাইরে মাছ শিকারে গিয়ে দুই মৎস্য-শিকারির শত্রুসেনার হাতে গুপ্তচর সন্দেহে বন্দি হওয়া ও শত প্রলোভনেও ফরাসি সম্মুখবাহিনির সঙ্কেত শত্রুকে না জানিয়ে বীরের মতো শত্রুর গুলিতে আত্মবলিদানের কাহিনি। এটি শিকার কাহিনির বদলে আসলে স্বদেশপ্রেমের কাহিনি।
কুঞ্জবিহারী পাল	‘তিমি ও তিমি শিকার’	*রামধনু*, ১৩৫৩	১৯০২-০৩-এ সুইডেনের জাহাজের ক্যাপ্টেন লারসেনের দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ অভিযান; ১৯০৪-এ দক্ষিণ মহাসাগরে তিমি শিকার।
সত্য চক্রবর্তী	‘বর্ম্মিজদের বাঘশিকার’ ‘বর্ম্মার জঙ্গলে’	*রামধনু*, ১৩৪৫ *রামধনু*, ১৩৪৫	দুর্গম জঙ্গলময় অঞ্চলে টিকে থাকার জন্য বর্ম্মিজদের কাছে শিকার আমাদের মতো বিলাস বা আড়ম্বরের নয়, নিতান্ত সাধারণ স্বাভাবিক ক্রিয়া।

লেখক	শিকার-সাহিত্যের নাম	পত্রিকার নাম	বিষয়বস্তু
			বন্দুকের বদলে কীভাবে শুধুমাত্র হাতের দা বা গাছের ডাল কেটে মুখ ধারালো করে নিয়ে বর্ম্মিজরা সামনাসামনি বাঘ বুনো মহিষ ইত্যাদির মোকাবিলা বা শিকার করে তার কয়েকটি টুকরো টুকরো বীরত্বের গল্প। শুধুমাত্র দা দিয়েই ডোরাকাটা ভয়ঙ্কর বাঘিনী শিকারে সক্ষম ক্ষতবিক্ষত বর্ম্মিজ যুবক সুস্থ হবার পর পুরস্কারের টাকাটা নিলেও, বন্দুক নেয় না; কেননা বাপঠাকুরদার কাল থেকে হাতের দা'ই তাদের শিকারের ভরসা। কমবয়সী বর্ম্মিজ ছেলেও তাড়া করা ভালুককে বুদ্ধির কৌশলে লাথি মেরে পাহাড় থেকে ফেলে বধ করে। বর্ম্মিজদের নিজস্ব শিকার পদ্ধতি, তাদের দুর্জয় সাহস, বুদ্ধিকৌশল, দৃষ্টিশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।

এই উপরোক্ত তালিকাটিকে অনায়াসেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে তোলা যায়। তালিকাটিতে চোখ বোলালেই বোঝা যায়, বিশ্বসাহিত্যের বিখ্যাত শিকার-সাহিত্য ও বিভিন্ন দেশের প্রসিদ্ধ শিকারিদের বীরত্বগাথা, বিভিন্ন প্রাণীদের শিকার, সেই সব দেশের স্থানীয় শিকারি ও তাদের শিকার পদ্ধতিগুলির সঙ্গেও বাঙালি নবীন প্রজন্মকে পরিচিত করতে, তাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করতে চাইছেন এই বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যের রচয়িতারা।

তবে সাহেব ও ভারতীয় (নেটিভ) শিকারির মধ্যেকার 'পৌরুষদৃপ্ত সাহসী বনাম মেয়েলি ভীরু' দ্বৈততার সুনির্দিষ্ট উপনিবেশবাদী ছকটি ভাঙতেও এই বাঙালি শিকার রচয়িতাদের মধ্যে সবিশেষ সচেতনতা লক্ষ করা যায়। বিদেশি-দেশি সাহেব (ইউরোপীয় ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাহেব) শিকারিদের শিকার নৈপুণ্য-বীরত্ব-দুঃসাহসিকতা নিয়ে অজস্র আখ্যান অবশ্য স্থান পাচ্ছে এই কালপর্বের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলির

পাতায়। আবার বাঙালি ও অবাঙালি ভারতীয় রাজা নবাব-জমিদার, স্থানীয় গ্রাম্য শিকারি বা অরণ্যলগ্ন মানুষ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শিকারি—তিন ধরনের দেশীয় শিকারিদের কাহিনিও উঠে এসেছে। তবে একটু খেয়াল করলে দেখা যায়, এই কালপর্বে রাজন্যবর্গ-নবাব-ভূস্বামীদের রাজকীয় শিকারের মাহাত্ম্য-কীর্তন তুলনামূলকভাবে খুবই কম। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় রাজা-বাদশা-অভিজাতবর্গের মধ্যে শিকার ক্রীড়াবিলাস প্রচলিত থাকলেও ব্রিটিশদের অনুকরণে শিকার-Sports নিয়ে তাদের তীব্র উন্মাদনা দেখা যায় অর্থাৎ ভারতীয় বা বঙ্গীয় রাজা-ভূস্বামী শিকার সম্প্রদায়টির আবির্ভাব ঘটে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ফলে উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমে তাদের নিজেদের লেখা বা তাদেরকে নিয়ে লেখা শিকার-কাহিনির যতটা রমরমা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে তা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ রাজরাজড়াদের হাতি, লোকলস্কর নিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ব্যয়বহুল আয়েশি শিকার-যাত্রা, তাদের শিকারের দেখনদারিত্ব, বীরত্বের ফাঁপা অহমিকাকে নিয়ে মজাদার হাসির গল্প, কখনো কখনো মজার ছলে ব্যঙ্গাত্মক হাসির গল্পের প্রাধান্য দেখা যায় ছোটোদের পত্রপত্রিকাগুলির পাতায়। উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা যায় অজিতকৃষ্ণ বসুর ‘আজগুবিগঞ্জের বাঘ’ *(মৌচাক)*, শৈলেন কুমার দত্তের ‘শিকারে গেলেন গবুচন্দ্র’ *(শুকতারা)*, শৈবাল চক্রবর্তীর ‘শিকার’ *(শুকতারা)*-এর মতো অসংখ্য গল্প।

সর্বাপেক্ষা সুপ্রাচীন যে শিকারি সম্প্রদায় অর্থাৎ আত্মরক্ষা ও জীবিকার জন্য শিকারে বাধ্য যে স্থানীয় শিকারি, ভারতের অরণ্যলগ্ন গ্রামের মানুষ বা অরণ্যবাসী উপজাতি গোষ্ঠীগুলি কিংবা অবিভক্ত বাংলার গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষ—তাদের নিয়ে বরঞ্চ বেশ কয়েকটি গল্প-আখ্যান পাওয়া যায়। ইউরোপীয় সাহেব শিকারিরা অচেনা ভারতীয় অরণ্যে শিকারের জন্য ভারতীয় স্থানীয় শিকারি বা অরণ্যলগ্ন উপজাতি মানুষদের অরণ্যজ্ঞানকে কাজে লাগালেও হাতেগোনা কয়েকজন ব্যতিক্রম (জে.ই. ক্যারিংটন টার্নার, মারভিন স্মিথ, ভারতে জন্মানো সাহেব শিকারি কেনেথ অ্যান্ডারসন) বাদে অধিকাংশ জনই তাদেরকে তাদের প্রাপ্য যোগ্য স্বীকৃতি দেননি; চিহ্নিত করেছেন চোরাশিকারি (Poacher) রূপে; কখনো-কখনো তাদের অরণ্য জ্ঞান-সাহসের প্রশংসা করলেও নিজেদের শিকার কৃতিত্বে তাদের অকুণ্ঠ চিত্তে ভাগ দিতে চাননি। এরূপ প্রবণতা ভারতীয় বা বঙ্গীয় রাজা মহারাজা ও অভিজাত শিকারি, শিকার লিখিয়েদের মধ্যেও দেখা যায়। অরণ্যের জীবজন্তুর ক্রমশ সংখ্যা হ্রাসের কারণ রূপে তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয়দের শিকারকেই পুরোপুরি দায়ি করতেন। নিম্নবর্গের এসব স্থানীয় গ্রাম্য

শিকারি বা অরণ্যবাসী উপজাতি বা গ্রামবাংলার মানুষের শিকার অভিজ্ঞতা, বীরত্বের কথা অরণ্যের গভীরেই হারিয়ে যায়; কিংবা লোককথা-আদিবাসীকথা-কিংবদন্তিতে এইসব স্থানীয় শিকারি বা মানুষের বীরত্ব কথা মৌখিক পরম্পরায় প্রবাহিত হলেও তা আঞ্চলিক গণ্ডিকে অতিক্রম করে সাধারণত বহির্জগতের কাছে সেভাবে এসে পৌঁছায় না বা পৌঁছাবার সুযোগও পায় না। বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকার শিকার-সাহিত্যিকদের কলমে ভারতের তথা বাংলার এইসব অবহেলিত, উপেক্ষিত অরণ্যলগ্ন গোষ্ঠীর বা স্থানীয় শিকারি বা গ্রাম বাংলার মানুষের শিকারের কয়েকটি কাহিনি (সংখ্যায় যদিও খুবই কম তবুও) উঠে এসেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে। এর পেছনে জাতীয়তাবাদী ও স্বদেশি আন্দোলনের কালপর্বে বাঙালির নিজস্ব দেশীয় লোককথা, শিকার-কথা, বীরত্ব-কাহিনিগুলি তুলে ধরার প্রবণতা যেমন থাকতে পারে, তেমনি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের কালে বাঙালি ক্রমশ যে সমাজ-সাম্যের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তার প্রভাবও এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল থাকা সম্ভব।

সত্য চক্রবর্তীর ‘বর্ম্মিজদের বাঘ শিকার’ (*রামধনু*, ১৩৪৫) গল্পের দা’দিয়ে বাঘ মারা বর্ম্মিজ-যুবা যেমন পুরস্কারপ্রাপ্ত বন্দুক ফিরিয়ে দিয়েছিল, তেমনি ‘সুন্দরবনের বাঘ শিকার’ (*শিশুসাথী*) গল্পে শঙ্কর সর্দার রাত্রের অন্ধকারে বাড়ি ফেরার জন্য নায়েবমশাই লণ্ঠন ও বন্দুক দিতে চাইলেও তা নেয়নি; তারও ভরসা হাতের ছাটা-গাছা (বাঘমারা লম্বা লাঠি); ‘সুন্দরবনবাসী’ শঙ্করসর্দার ভয় কাকে বলে যেমন জানে না, তেমনি জানে ‘কপালে মরণ থাকলে কেউ বাঁচাতে পারবে না’। শঙ্কর সর্দার সত্যি সত্যিই তার হাতের ছাটা-গাছা আক্রমণোদ্যত বাঘের মুখের ভেতর কণ্ঠনালী পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিয়ে বাঘকে শিকার করে ফেলে। ‘বর্ম্মিজদের বাঘ-শিকার’ গল্পের বর্ম্মিজযুবাটি ‘খটর মটর যন্তর’ বন্দুকের কায়দা পারবে না বলে, পুরস্কার প্রাপ্ত টাকা নিলেও বন্দুক ফেরত দেয়। শঙ্কর সর্দার কিন্তু শুধু ছাটাগাছাতেই নয়, সাহসিকতার জন্য কাছারিতে চাকরি পাবার পর বন্দুকও আয়ত্ত করে এবং বন্দুকের নিপুণ নিশানাতেও তার দক্ষতার প্রমাণ দেয়। কাছারির বন্দুকে সে শুধু হরিণই শিকার করে না, বেশ কয়েকবার বাঘ শিকারও করে—কখনও গাছাল শিকারে (গাছের উপর থেকে), কখনও বা মাঠাল শিকারে (জঙ্গলের মাটিতে দাঁড়িয়ে)। কাছারিতে আগত শহুরে বাবুদের সুন্দরবনের শিকার দেখার যেমন সে শখ মেটায়, তেমনি তাদের শিকারের গাইড রূপেও অনিবার্যভাবে তার ডাক পড়ে। তবে শঙ্কর সর্দার শিকারি হলেও বন্যপশুর প্রতিও কখনও নিজের মনুষ্যত্ব বর্জন করেনি। ঘুমন্ত বাঘকে বন্দুকের নাগালে পেয়েও সে কখনও ঘুমন্ত অবস্থায় বাঘকে

শিকার করেনি। কব্জার মধ্যে বাঘকে পেয়েও গুলি না চালানো যেখানে শহুরে বাবু শিকারিদের কাছে নেহাৎই 'বোকামি', 'পাগলামি' কাণ্ড, সেখানে শঙ্কর সর্দারের বিবেচনায় ঘুমন্ত প্রাণীকে শিকার 'অমানুষ' ও 'কাপুরুষে'র কর্ম। এখানে আমাদের মনে পড়তে পারে *ধর্মমঙ্গলের* বীরনায়ক লাউসেনের কথা, যে কামদল-বাঘকে ঘুমন্ত অবস্থায় মারেনি (পূর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত)। কাছাকাছি ঢিল ছুঁড়ে বাঘকে জাগিয়ে, আত্মরক্ষার সুযোগটুকু দেবার পরই শঙ্কর সর্দার গুলি চালায়। সুন্দরবন ঘেঁষা গ্রামগুলিতে বাঘে গরু-মহিষ-ছাগল গবাদি নিলে তা গ্রামবাসীদের নিতান্তই গা সওয়া; কিন্তু বাঘ প্রায়ই গ্রামে ঢুকে ক্রমাগত মানুষ ধরে নিয়ে যেতে থাকলে গ্রামবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে। এমনই এক মানুষখেকোর উপদ্রব থেকে বিপন্ন গ্রামবাসীদের রক্ষার্থে—সরকার বাহাদুর ও স্থানীয় জমিদার উভয় পক্ষ থেকেই ঐ মানুষখেকোকে শিকারের পুরস্কার ঘোষিত হয়। ইতিমধ্যে এক আসন্নপ্রসবাকে বাঘে নিলে গ্রামবাসীরা প্রতিশোধস্পৃহায় ক্ষেপে ওঠে। নিকটবর্তী বিভিন্ন কাছারিবাড়ি থেকে দেশীয় শিকারিরা এসে বাঘ শিকারের দলে যোগ দেয়। বনে বাঘ অন্বেষণ কালে শঙ্কর সর্দারের দলের একজনকে হঠাৎ বাঘ আক্রমণ করলে বাঘে-মানুষের যুদ্ধকালে গুলি চালানো বিপজ্জনক হওয়ায় শঙ্কর সর্দার কীভাবে শুধুমাত্র কুড়ুল নিয়েই বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কোপের পর কোপ মেরে বাঘ শিকার করে, সেই স্তম্ভিত করা রুদ্ধশ্বাস রোমহর্ষক শিকার দৃশ্যটি বর্ণিত হয়েছে 'সুন্দরবনের বাঘশিকার' গল্পটিতে। বাঘ শিকারের পুরস্কারের টাকাও শঙ্কর সর্দার নিজে না নিয়ে, বাঘের হাতে মৃত আসন্নপ্রসবার ও তার দলের লোকটির পরিবারের হাতে তুলে দেয়। সুন্দরবনের শঙ্কর সর্দার তার বীরত্ব, দুর্জয় সাহস, প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস, বিপদের সামনেও প্রখর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অসাধারণ শিকার নৈপুণ্য ও মনুষ্যত্বের জন্য অনায়াসেই হয়ে উঠেছে বাংলা শিকার-কাহিনির এক 'অন্য ধরনের নায়ক'। উপনিবেশবাদী ইংরেজ শিকারিদের প্রচারিত 'অতিপৌরুষে'র আদর্শ, যাতে বাঙালি অভিজাত রাজা-জমিদার থেকে শিক্ষিত ভদ্রলোক শখের শিকারিরাও পুরোপুরি মোহগ্রস্ত, শঙ্কর সর্দারের পৌরুষত্ব ও বীরত্ব ঠিক সেরকম নয়; তা কেবলই আগ্নেয়াস্ত্র বা আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর নয়; এমন কি তা শুধুমাত্র শারীরিক বাহুবল বা নিছকই বুদ্ধিবল নির্ভরও নয়; একই সঙ্গে মনুষ্যত্ব, আত্মত্যাগ, বনের হিংস্র প্রাণী থেকে বিপন্ন মানুষ সবার প্রতি সহমর্মিতা, ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস, নৈতিকতা ও সততার বলেও মহীয়ান শঙ্কর সর্দারের এই 'বিকল্প বাঙালি পৌরুষ'। আর জাতীয়তাবাদী কালপর্ব বিশেষত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লববাদ থেকে স্বদেশি আন্দোলন অতিক্রম করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের

কালেও বাঙালি তো এরূপ পৌরুষ প্রতিমার বারবার সন্ধান করেছে; বাঙালি কিশোর-তরুণ সমাজকে এরূপ বিকল্প-পৌরুষের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছে। শঙ্কর সর্দার সুন্দরবনের বাস্তব বা সত্যিকারের মানুষ, নাকি কল্প-শিকার সাহিত্যের নায়ক—আমাদের জানা নেই।[১৩] তবে শঙ্কর সর্দারের মতো পৌরুষপ্রতিমা বা ন্যায়নিষ্ঠ মানবিক বীরশিকারি সুন্দরবন বা গ্রামবাংলায় সত্যিই বিরল ছিল না। এই কালপর্বে ও পরবর্তীতে শিবশঙ্কর মিত্র সুন্দরবনের গ্রাম্য গরীব নিম্নবর্গের স্থানীয় শিকারি-বাওয়ালি-বৈরাগী-বাউলেদের নিয়ে বাংলা-সাহিত্যে উপহার দিয়েছেন বেশ কিছু অসামান্য আখ্যান—'আর্জান সর্দার' (১৯৫৫), 'সুন্দরবন' (১৯৬২; এটি ১৯৬২ সালে শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য রূপে পুরস্কারপ্রাপ্ত), 'বিশু বাউলে' (১৯৭৩), 'দুগ্যোসদ্দার' (১৯৭৩) ইত্যাদি। এলিট শিকারিদের কাহিনি সর্বস্ব বাংলা শিকার-সাহিত্যের জগতে এগুলি নিঃসন্দেহেই অপরূপ সংযোজন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সুন্দরবনের স্থানীয় শিকারি-বাউলিয়া-ফকিরদের জলে ডাঙায় নিত্যদিনের কঠোর জীবন সংগ্রাম, অভাব অনটন, বন ও বনের পশুপাখি সম্পর্কে তাদের গভীর জ্ঞান, বেপরোয়া সাহস, শিকারের অদম্য নেশা ও শিকার দক্ষতা, শিকার পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য, সততা, বনবিভাগের চোখে ধুলো দেওয়া, বিশ্বাস-অন্ধবিশ্বাস, জঙ্গল ও জঙ্গলের বাঘের সঙ্গে ভয়-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-অনুরাগ মিশ্রিত তাদের অদ্ভুত জটিল সম্পর্ক—শিবশঙ্কর চমৎকার ভাবে চিত্রিত করেছেন। সুন্দরবনের দোষগুণ সমন্বিত রক্তমাংসের এই মানুষগুলো চিরায়ত মর্যাদা লাভ করেছে শিবশঙ্কর মিত্রের কলমে।

বাংলার গ্রামগঞ্জ, শহরের উপকণ্ঠ, পথঘাট সেযুগে ছিল জলাজঙ্গলময়। ফলে পেশাদার বা শখের শিকারি নয়, নিতান্ত সাধারণ মানুষকেও হামেশাই হিংস্র জন্তুর মোকাবিলা করতে হত। আত্মরক্ষার তাগিদে মরিয়া হয়ে সাধারণ মানুষও অনেক সময় দুর্জয় সাহস, বীরত্ব ও বুদ্ধির জোরে বাঘ, চিতাকে ঘায়েল করে ফেলত। চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'জঙ্গল কাহিনী'তে (*রামধনু*, ১৩৪৬) পানাগড়ের সাঁওতাল যুবক বাঘের অতর্কিত আক্রমণেও না ঘাবড়ে হাতের লাঠি দিয়েই বাঘের সঙ্গে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে বাঘ তাড়ায়। বন্দে আলী মিয়ার 'বাসি খেকো বাঘ' (*রামধনু*, ১৩৪৮) গল্পে বর্ণিত হয়েছে 'রাজসাহী'র ঈশান বৈরাগীর বোষ্টমীকে উদ্ধারের জন্য জীবনের মায়া না করে শুধুমাত্র কুড়ুল নিয়েই বাঘ শিকারের আখ্যান। আবার হিংস্র জন্তুর সঙ্গে সহাবস্থান ও বিপদের পুনঃ পুনঃ সান্নিধ্য মানুষকে কেমন সাহসী করে তোলে তার প্রমাণ মেলে চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ব্যাঘ্রচরিত' (*রামধনু*, ১৩৪৬) গল্পে। কালনা শহর-উপকণ্ঠের বাড়ির পেছনে খসখস শব্দে বর্ষীয়সী আত্মীয়া কথককে অম্লান বদনে জানান 'ও বোধ হয় সেই

খোঁড়া বাঘটা'।[১৪] শুনে শহুরে কথকের যতই অস্বস্তিবোধ হোক, বাড়ির পেছনে বাঘের হাঁচড় পাঁচড় তাদের কাছে নিত্য নৈমিত্তিক সাধারণ ব্যাপার। পরদিন সন্ধ্যায় বনের রাস্তায় চিতাবাঘ দেখে কথকের যখন ভয়ে কম্পিত বক্ষ, হাত পা ঠান্ডা দশা তখন তার সমবয়সি ম্যালেরিয়াক্লীষ্ট দুর্বল আত্মীয়টি সাহস ও বুদ্ধির জোরে হাতের লণ্ঠনের আলো দ্রুত দুলিয়ে ব্যাঘ্রবাবাজীকে ভয় দেখিয়ে অনায়াসে তাড়িয়ে ফেলে। অবিভক্ত বাংলার গ্রামগঞ্জ মফস্‌সল শহরতলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সাধারণ মানুষের হিংস্র বুনো জন্তু মোকাবিলার নানা বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনিও শিশু-কিশোরদের শোনাতে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায় এই সময়কার বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকার শিকার-সাহিত্যিকদের। সেই সঙ্গে তাঁরা বিভিন্ন দেশের (আফ্রিকার নিগ্রো বা লুম্বাদের বর্শা ঢাল দিয়ে সিংহ শিকার, বর্ম্মিজদের দা' দিয়ে সম্মুখ শিকার ইত্যাদি) শিকার পদ্ধতির মতোই ভারতীয় অরণ্যলগ্ন মানুষদের মধ্যে বংশানুক্রমিকভাবে প্রচলিত নিজস্ব দেশীয় শিকার পদ্ধতিগুলিও তুলে ধরতে আগ্রহী হয়েছেন। কখনও দক্ষিণ ভারতের লাম্বাডীদের ছাগলের টোপের চারধারে আঠা লাগানো পিপুল পাতা বিছিয়ে বাঘকে ফাঁদে ফেলে বর্শা বা বাঁধানো লাঠি দিয়ে অদ্ভুত শিকার পদ্ধতি (সমর সরকারের 'বাঘ ধরা', *রংমশাল* ১৩৪৭), কখনও বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার সাঁওতালদের দেশি শিকারি কুকুর ও বিষমাখা তির ধনুক, টাঙি, ফারসা, সড়কি, ফাঁদ সহযোগে দলবদ্ধ ভাবে শিকার (আদিবাসী শিকার, *শিশুসাথী*), কখনও বা সুন্দরবনের স্থানীয় শিকারিদের বাঘের পায়ের ছাপ দেখে নির্ভুল মাপজোখে সঠিক উচ্চতায় গুলিভরা বন্দুকের ট্রিগারে সুতো বেঁধে বাঘের যাতায়াত পথে রেখে দিয়ে 'কলপাতা' শিকার পদ্ধতি বা বাঘের ডাক অনুকরণ করে বাঘকে প্রলুব্ধ করে এনে নিজেদের তৈরি গাদা বন্দুকেই গাছাল বা মাঠাল শিকার পদ্ধতি ('সুন্দরবনের আতঙ্ক', *শিশুসাথী*)—বর্ণিত হয়েছে। ব্রিটিশদের প্রচারিত শিকার—'Sports'-এ বন্দুকের এক গুলিতেই শিকারের যন্ত্রণাহীন দ্রুত মৃত্যুর থেকে অবশ্য এই দেশীয় শিকারগুলির যথেষ্ট তফাৎ আছে। হাওদা বা মাচান শিকারের তুলনায় স্থানীয় শিকারিদের পদব্রজে বন-বনান্তরে ঘুরে বা সামনাসামনি মাঠাল শিকার অনেক বেশি জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ। নিরাপদ দূরত্ব থেকে বন্দুকের গুলিবৃষ্টি করে শিকারকে নিমেষে খতম করার চেয়ে ফাঁদে জীবন্ত প্রাণী ধরে দেশীয় অস্ত্র সহযোগে সামনাসামনি লড়াই বা তির ধনুকের শিকার অনেক বেশি বিপজ্জনক। তাই বাঙালি শিকার-সাহিত্যিকদের কেউ কেউ এই দেশীয় প্রচলিত শিকার পদ্ধতিগুলি 'শিকারের মতো শিকার' বা 'প্রকৃত বীরত্বে'র মনে করেছেন; স্থানীয় শিকারিদের উদার প্রশস্তি সহ তাদের দেশীয় পদ্ধতিগুলি ছোটোদের সামনে তুলে ধরেছেন যথেষ্ট তারিফ সহকারে।

তবে বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকার শিকার-সাহিত্যগুলিতে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শিক্ষিত শখের শিকারিদের আখ্যান। গল্পের পর গল্পে দেখা যায়, জরিপের কাজ, খনির সন্ধান, নৃতাত্ত্বিক গবেষণা, বনবিভাগের কর্মী ইত্যাদি পেশার সূত্রে বাঙালি তরুণরা সরাসরি বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন বনজঙ্গল পাহাড়ে ঘুরছে। এছাড়াও ডাকবিভাগ, ডেপুটি ইত্যাদি সরকারি কর্মচারীরূপেও তারা বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে আসছে। সেই সব বনজঙ্গলে ঘোরা বা জলাজঙ্গলভরা গ্রামগঞ্জে বসবাস কালে তারা নানা শিকার অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে; বাড়ি আত্মীয় পরিজন থেকে দূরে ছুটির দিনে অবসর বিনোদনের জন্য তারা শিকার ক্রীড়ায় মাতছে বা শিকার ক্রীড়ার দর্শক হচ্ছে। অনেক সময় পড়াশোনা বা চাকরিসূত্রে শহরে থাকা বাঙালি গ্রামাঞ্চলের দেশের বাড়িতে ছুটিতে এসেও শিকার প্রমোদে লিপ্ত হচ্ছে। এই বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শখের শিকারিদের শিকার ক্রীড়ার পেছনে মূলত ক্রিয়াশীল তীব্র অ্যাডভেঞ্চার নেশা। কখনো-কখনো মানুষখেকো বা আক্রমণাত্মক হিংস্র বন্যপ্রাণীকে শিকার করে ত্রস্ত বিপন্ন গ্রামবাসীদের রক্ষাকর্তা শিকারির উজ্জ্বল ভাবমূর্তিটিও তাদেরকে আকৃষ্ট করছে।

ইতিহাসের দিকে তাকালেও দেখব বিশ শতকের প্রথম থেকে বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে মধ্যবিত্ত বাঙালি নানা জীবন সংকটের (কৃষিক্ষেত্রে ভূমির পড়তি ও উপার্জনের ঘাটতি, চাকরিতে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি, নাগরিক জীবনের অনিশ্চয়তা ইত্যাদির) সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে বহু বাঙালি তরুণ নিজ বাসস্থান ছেড়ে গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত স্থানে যেমন চাকরি সূত্রে যাচ্ছে, তেমনি অনেকে কাজকর্মের খোঁজে বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল এমনকি বিদেশেও পাড়ি জমাচ্ছে। আর মধ্যবিত্ত বিশেষত চাকুরে বাঙালিদের একটি অংশ শিকারের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে বিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই।

বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলির উদ্দিষ্ট পাঠক মূলত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বাড়ির ছেলেমেয়েরা, লেখকরাও অধিকাংশ ঐ শ্রেণিরই। ফলে এই শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে শিকারের কাহিনি শোনাতে এসে সাহিত্যিকরা রাজরাজড়া ও নিম্নবর্গের স্থানীয় শিকারিদের তুলনায় বিশ শতকের এই নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণ ভদ্রলোক শখের শিকারিদেরই তাদের আখ্যানের নায়ক রূপে হাজির করায় সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়েছেন। আবার এই বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শখের শিকারিদের কেউ কেউ (দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, হিতেন্দ্রমোহন বসু) নিজের শিকার অভিজ্ঞতা

ছোটোদের শোনাতে এইসব পত্রপত্রিকার পাতায় নিজেরাও কলম ধরেছেন।

ব্রিটিশ প্রভুদের কাছে শিকার ও শিকার-সাহিত্য যেমন উপনিবেশবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের অংশ ছিল, তেমনি জাতীয়তাবাদী কালপর্বে বাঙালিও ঐ শিকার ও বাংলা শিকার-সাহিত্যকে তাদের জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের অঙ্গ রূপে হাজির করতে চায়। জাতীয়তাবাদী কাল থেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কালে অর্থাৎ বাঙালির বীরত্ব ও পুরুষত্বের প্রতীকী পুনরুদ্ধারের কালপর্বে বাঙালি কিশোর তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে ভারতীয় তথা বাঙালি বীরশিকারির নানা পুরুষ-প্রতিমার দৃষ্টান্ত তুলে ধরায় শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকার শিকার-সাহিত্যগুলিতে প্রাধান্য দেখা দেয় ঠিকই। কিন্তু সরাসরি ব্রিটিশ শিকারিদের প্রতি বিদ্বেষ বা উপনিবেশ বিরোধিতার তেমন কোনও সুর এই শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলিতে আমরা পাই না। খুলনার বিখ্যাত গ্রাম্য-শিকারি জালালুদ্দিন হাসেমির 'এক ঠ্যাং দিয়েছি বাঘের মুখে, আর এক ঠ্যাং দিব ইংরেজের মুখে'[১৫]—এর মতো সোচ্চারে ইংরেজবিরোধী 'জেহাদি' সুর ঘোষণা ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোকপ্রাপ্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শিকারি বা শিকার-সাহিত্যিকদের পক্ষে কি সহজ ছিল? আদৌ কি সম্ভব ছিল?

ব্রিটিশ আনুগত্য, ভালো ইংরেজ-খারাপ ইংরেজ দ্বৈততা ও ব্রিটিশ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ার ভয়ও হয়তো বাঙালি ভদ্রলোক শিকার-লিখিয়েদের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকার প্রযুক্ত অরণ্য আইন (অরণ্যে অবাধে প্রবেশ-গাছ কাটা-শিকার সংক্রান্ত বিধিনিষেধ) ও অস্ত্র আইন ভারতের অরণ্যচারী গোষ্ঠী বা স্থানীয় গ্রাম্য নিম্নবর্গীয় শিকারিদের অরণ্য-অধিকারচ্যুত ও সংকটাপন্ন করে তোলে; কিন্তু এরূপ কোনও প্রভাব ভারতীয় তথা বাঙালি উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক ও এই শ্রেণিভুক্ত শখের শিকারিদের উপর পড়েনি। তাছাড়া পাশ্চাত্য জাতির স্বভাবজ শিকার প্রীতি বা অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়তার তুলনায় বাঙালির (বিশেষত মধ্যবিত্ত বাঙালির) সীমাবদ্ধতা বা মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্যগুলিকে না মেনেও বাঙালি শিকার লিখিয়েদের উপায় ছিল না। ব্রিটিশ শ্বেতশিকারিদের প্রচারিত আত্মগর্ব, ঔদ্ধত্য, ভারতীয়দের প্রতি তাদের শ্বেতজাতিবৈর বা অমর্যাদা প্রকাশ, দুর্ব্যবহার—বাঙালি ভদ্রলোক শিকারি ও সাহিত্যিকদের মনে অনেকসময় ক্ষোভের জন্ম দিলেও, তা অনেকটাই থাকল তাদের মনের কোণে, নীরবে; সরাসরি ব্রিটিশ বিদ্বেষ বা ইংরেজদের শ্বেত জাতিবৈরের প্রতি-জাতিবৈর তাদের লেখালেখি বিশেষত শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলিতে সেভাবে প্রকাশ পায়নি।

আসলে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালির শিকার আসক্তির মূলে ছিল দুটি

পরস্পরবিরোধী আকাঙ্ক্ষা— একদিকে ব্রিটিশ প্রভুর অনুকরণ; শিকার 'Sports'-এ অংশগ্রহণ করে সাহেব ও ভারতীয় বা বাঙালি সমাজে নিজ স্বাতন্ত্র্য, কৌলিন্য-গৌরব প্রকাশ। অন্যদিকে বাঙালি জাতির আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা। সাহেব বিদ্বেষের বদলে বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত শিকার-কাহিনিগুলিতে বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোক শিকারি ও ইউরোপীয় অর্থাৎ সাহেব শিকারির মধ্যে অন্তরঙ্গ সখ্য-সৌহার্দ্য-সহযোগিতার উদাহরণ বিস্তর। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকের ভারতীয় রাজা-মহারাজা-নবাব-ভূস্বামী অভিজাতবর্গের সঙ্গে ব্রিটিশ রাজপুরুষ-আমলা-প্রশাসনিক বা সামরিক অফিসারদের শিকার অভিযাত্রাকে কেন্দ্র করে সখ্য অবশ্য সুপরিচিত। কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ও লর্ড কার্জন (একসঙ্গে শিকার অভিযাত্রা ১৯০৪-০৫ খ্রি.) কিংবা বিকানেরের মহারাজ ও লর্ড মাউন্টব্যাটেনের (একসঙ্গে শিকার ১৯২১ খ্রি.) হৃদ্যতার সম্পর্ক তো সর্বজনবিদিত। তবে এই বন্ধুত্বের অনেকটাই রাজনৈতিক অর্থাৎ উভয় পক্ষই নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধি, প্রভাব-প্রতিপত্তি-মর্যাদা বৃদ্ধি, সুযোগসুবিধা লাভের জন্য রাজনৈতিক কূটকৌশলরূপে শিকারকে কেন্দ্র করে সখ্য গড়ে তোলে। এর তুলনায় বিশ শতকের শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলিতে চিত্রিত বন্ধুত্ব খানিকটা হলেও বেশ আলাদা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কর্মসূত্রে কিংবা শিকার-অ্যাডভেঞ্চারকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় তথা বাঙালি পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক এবং ইউরোপীয় বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান জেন্টলম্যান সাহেব শিকারির অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গল্পের পর গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। ধরণীধর সেনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নির্ভর সত্যকাহিনি 'হিমালয়ে ভাল্লুক শিকারে' (*রংমশাল*, ১৩৪৪) জার্মান ভূতত্ত্ববিদ ডি. টেরার তত্ত্বাবধানে ভারতের কাশ্মীর-পুঞ্চরাজ্যগুলিতে নৃবৈজ্ঞানিক অভিযানে যাওয়া দলটির বাঙালি সেন ও পাকা শিকারি স্কচ ছেলে টম প্যাটারসনের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। শিকারে অদক্ষ ও নিজের বন্দুক বা লাইসেন্স না থাকলেও সেন গুহায় টমের ভালুক শিকার কালে কোনও বিপদ ঘটলে যদি কোনও সাহায্যে আসে ভেবে বর্শা নিয়ে শিকার সঙ্গী হয়। টমের শিকার দক্ষতা, দুঃসাহস, বাহাদুরিকে বাঙালি-সেন যেমন বারংবার প্রশংসা করেছে, তেমনি প্রতিতুলনায় নিজের শিকারে অপটুতা, শিকার মোহ, উত্তেজনায় হটকারিতা করে ফেলা বা ব্যর্থ শিকার নিয়েও সে অকপট থেকেছে। অন্যদিকে টমও সেনকে নিজের দুটি বন্দুকের একটি দেয়; কাছাকাছি ভালুক দেখে সেন হিপনোটাইজড হয়ে গেলেও, টমের বন্দুক মুহূর্তে গর্জে ওঠায় সেনের কোনও বিপদ ঘটে না। বুদ্ধদেব গুহর 'টাঁড়বাঘোয়া'য়

(*সন্দেশ*) শিকারে পরস্পরের যোগ্য সাগরেদ, সমদক্ষ শিকারি বাঙালি কথক ও অস্ট্রিয় সাহেব-পুত্র সমবয়সী টেডের মধ্যে 'অভিন্নহৃদয় বন্ধুত্ব' শুধু সদ্যতরুণ বয়সের ভারতের অরণ্যে শিকার-অভিযানেই সমাপ্ত হয়ে যায়নি; পরবর্তী জীবনেও কানাডাবাসী কাঠের কারবারী টেড ভারতীয় বাঙালি বন্ধু কথককে তিন চার বছর অন্তর অন্তর টিকিট কেটে পাঠিয়ে জোর করে নিয়ে গিয়ে কানাডার জঙ্গলেও ঘুরে বেড়ায়। ভারতের পালামৌতে পলাশবনার মানুষহত্যার 'নাটের গুরু' টাঁড়বাঘোয়াকে শিকারের কৃতিত্ব 'কে অর্জন করবে?' 'কে পাবে বাঘিনী শিকারের দায়িত্ব?'—এ নিয়ে ফার্স্ট-ইয়ার পড়ুয়া সদ্যতরুণ বাঙালি কথক ও টেড অযথা রেষারেষির বদলে 'টস্' করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের 'Sportsman' সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় যেমন দিয়েছে, তেমনি পরস্পরের শিকার দক্ষতাকে ঈর্ষার বদলে করেছে শ্রদ্ধা-সম্মান ও তারিফ। আবার জঙ্গলের মাঝে টিকায়েতের কাটা মুণ্ডু দেখে ভয় ও বমি পাওয়ার সময়ও তারা পরস্পরের সহায়ক হয়েছে। একই সঙ্গে থাকা-খাওয়া-গল্পগুজব-কষ্ট, আরাম ভাগ করে নেওয়া—শিকার অভিযান—ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি হওয়া অর্থাৎ 'ক্যাম্পফায়ার মেনটালিটি'টি বাঙালি কথক ও টেডের মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

অরণ্যের রহস্যময় সৌন্দর্যভরা বিপৎসংকুল পরিবেশে একই সঙ্গে একই ধরনের জীবনযাপন, একই ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ, প্রতিপক্ষ ভয়ঙ্কর বন্যপ্রাণীর মুখোমুখি হবার উত্তেজনা-ভয়-রোমাঞ্চ, শিকার সফলতার আনন্দানুভূতি বা ব্যর্থতার বিষাদ—শিকারি বা জঙ্গল অভিযাত্রীদের সামাজিক জাতি-ধর্ম-বর্ণ পরিচয়ের চেয়েও নিঃসন্দেহেই বড়ো করে তোলে তাদের শিকারি বা অরণ্যযাত্রী পরিচয়টিই। তাদের নিজেদের মধ্যে অনায়াসেই গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব, বোঝাপড়া, সহযোগিতার সম্পর্ক। শিকার বা অরণ্যজীবনের এই নিজস্ব নিয়মকেই বিশ শতকের শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্য রচয়িতারা সম্ভবত প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। তবুও বাংলা সত্য ও কল্প উভয় শিকার কাহিনিগুলিতেই বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোক ও জেন্টেলম্যান সাহেব শিকারিদের বন্ধুত্বের বাড়বাড়ন্ত দেখে মনে হয়, এর পেছনে বাঙালির সাহেব-শিকারিদের কাছে সম্মান ও মর্যাদালাভের গুপ্ত আকাঙ্ক্ষাটি সম্ভবত চোরাগোপ্তা মিশে ছিল। সাহেব শিকারি বা শিকার লিখিয়েদের শ্বেতজাতি বৈরের জবাব রূপে প্রতি-জাতিবৈরের বদলে তাঁরা সাহেব শিকারিদের সঙ্গে সৌহার্দ্যের দৃশ্য অঙ্কনেই প্রাধান্য দিয়েছেন; তৎকালীন বাঙালির ভালো সাহেব-খারাপ সাহেবের দ্বৈততার ধারণাটি বা কোনো কোনো ব্যক্তিসাহেব শিকারির নেটিভদের প্রতি ভালো ব্যবহারও সম্ভবত তাঁদেরকে এরূপ সখ্য সম্পর্কের প্রাধান্য দানে উৎসাহিত করে। শাসক ও

শাসিতের মধ্যেকার বিভেদ নীতির বদলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাসটিকেও এই সময়কার বাঙালি শিকার-সাহিত্যিকরা যেন নতুন ভাবে রচনা করতে চাইছিলেন। মজার ব্যাপার, বাঙালি ভদ্রলোক শিকারি ও শিকার-সাহিত্যিকরা 'ক্যাম্পফায়ার মেনটালিটি'র পরিচয় সাহেব শিকারিদের ক্ষেত্রে যেরূপ দিয়েছেন, স্থানীয় গ্রাম্য নিম্নবর্গের শিকারি বা অরণ্যলগ্ন গ্রামবাসীদের ক্ষেত্রে সেরূপ নয়; বিশ শতকে ক্রমশ স্থানীয় গ্রাম্য শিকারি বা অরণ্যলগ্ন মানুষদের প্রতি বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শিকারি ও শিকার লিখিয়েদের মনোভঙ্গি অনেকটাই উদার হয়ে উঠছিল ঠিকই কিন্তু তবুও তাদের সঙ্গে প্রকৃত সখ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি; স্থানীয় নিম্নবর্গের গ্রাম্যশিকারি-বনতাড়ুয়া-হাঁকোয়া-গাইডদের বোকামি, কুসংস্কার, মিথ্যাচার, পেজোমি ইত্যাদি নানা দোষ ত্রুটি নিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা তাদের সাহেব শিকারিবন্ধুদের মতোই, কখনো বা সাহেবদের চেয়েও আরও তীব্র ভাবে, উপহাস-সমালোচনা কটূক্তি করেছেন। 'হিমালয়ে ভাল্লুক শিকারের' বাঙালি সেন বা 'টাঁড়বাঘোয়া'র বাঙালি সদ্যতরুণ কথক দরিদ্র গ্রাম্য বিপন্ন মানুষদের ও স্থানীয় শিকারিদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ও দরদযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণভাবে এই মানসিকতামুক্ত নয়। বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকারের সত্য ও কল্প উভয় কাহিনিতেই পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালি উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শিকারিরা সাহেব জেন্টেলম্যান শিকারিদের প্রতি যে সমমনস্কতা, সমদর্শিতা, সখ্য অনুভব করেছে, স্থানীয় গ্রাম্য নিম্নবর্গ শিকারিদের ক্ষেত্রে তার অনুরূপ কখনোই নয়।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, এই কালপর্বের শিকার-সাহিত্যগুলিতে বাঙালি ভদ্রলোক শিকারিদের সাহেব-বন্ধুরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই খাঁটি ইংরেজ নয়; কখনও অস্ট্রীয়, কখনও আইরিশ, কখনো বা স্কচ কিংবা ভারতে জন্মানো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সাহেব শিকারি। বাংলা শিকার কাহিনিগুলিতে সাহেব-বন্ধুদের এরূপ অ-ইংরেজ জাতি পরিচয়ের কি কোনও আখ্যানগত কারণ আছে? নাকি এর পেছনে ক্রিয়াশীল ইংরেজদের দ্বারা পরাধীন দেশের প্রজা বাঙালি সাহিত্যিকদের কোনও গূঢ় ঈপ্সা? ভারতের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালের পটভূমিতে রচিত 'টাঁড়বাঘোয়া'তে বাঙালি-কথকের বাবার অফিসের সহকর্মী এক অস্ট্রীয় সাহেবের পুত্র হল টেড্; তার জন্ম বেড়ে ওঠা ভারতে; জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো ও শিকারের হাতেখড়িও এখানেই। ফলে ভারতীয় দেশীয় ভাষা বোঝায়, দেশীয় খাবার, পোশাকে—এমনকি গামছা পরে খালি গায়ে ঘটি হাতে জঙ্গলে প্রাতঃকৃত্য যাওয়াতেও সে ভালোই অভ্যস্ত; অভিন্নহৃদয় বন্ধু বাঙালি-কথকের দেশের পরাধীনতার প্রসঙ্গ উঠে আসে টেডের মুখে। পলাশবনার

স্থানীয় ভূস্বামী শিকারি বহিরাগত তরুণ শিকারি সাদা সাহেব টেড্ ও বাঙালি কথকের সঙ্গে টাঁড়বাঘোয়ার শিকার নিয়ে বিরোধিতা করে। টিকায়েতের বিশাল সাদা ঘোড়ায় চেপে রাজার চালে চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে টিকায়েতের ঔদ্ধত্য-গর্ব-জেদের কথা—ভেবে টেড্ মন্তব্য করে 'তোদের দেশে এইরকম গর্বিত, উদ্ধত সব মানুষ থাকতে থাকতে ব্রিটিশরা তোদের পরাধীন করে রাখল যে কী করে এত বছর তা ভাবলেও অবাক লাগে।'[১৬] টেড্ অস্ট্রীয় সাহেবপুত্র না হয়ে, ইংরেজ সাহেব পুত্র হলে, ইংরেজদের ভারতকে পরাধীন করে রাখার প্রসঙ্গটি কি এত সহজে উত্থাপন করতে পারত? আর শুধু বাঙালি বন্ধুর পরাধীন দেশ সম্পর্কে মন্তব্যই নয়, বাঘিনী শিকারের সাফল্যের আনন্দে ও ফেরার পথে টেড্ যখন বন্ধুর মুখে শোনা বাংলা দেশাত্মবোধক বা দেশমাতৃকা-বন্দনার গানটি তার সাহেবি উচ্চারণে বারবার গায়—'ঢানা ঢান্যে ফুস্ফে বারা আমাডের বশুন্ডরা', তখন সৃষ্টি হয় এক অদ্ভুত ব্যঞ্জনা। কেননা, টেডের পৈতৃক নিবাস অস্ট্রীয়ার টীরল হলেও, তার 'জন্মভূমি' তো ভারত।

সাহেব শিকারিদের শিকার দক্ষতাকে অস্বীকারের ক্ষমতা বাঙালি শিকার-সাহিত্যিকদের ছিল না। আবার উনিশ শতকের ব্রিটিশ অনুগত জাতীয়তাবাদ ইতিমধ্যে বিশ শতকে ক্রমশ ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়েছে। 'অব্রিটিশোচিত ব্রিটিশ শাসনের' তত্ত্ব, 'ভালো ইংরেজ-খারাপ ইংরেজের দ্বৈততা'র ধারণাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আর বাঙালিকে মোহগ্রস্ত করে রাখতে পারেনি। ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রবল থেকে প্রবলতর আকার ধারণ করে। ফলে স্বাধীনতা সংগ্রাম বা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কালপর্বে ইংরেজদের চেয়ে চাকরি বা কর্মসূত্রে ভারতে আগত অ-ইংরেজ সাহেব বা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সাহেব শিকারিদের সঙ্গে বাঙালির অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব দৃশ্য অঙ্কনেই বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যের রচয়িতারা অধিক আগ্রহী হয়েছেন। বন্ধুরূপে আইরিশ, স্কটিশ, অস্ট্রীয় ইত্যাদি জাতির সাহেবদের নির্বাচনের পেছনেও তাদের দেশের (আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড বা অস্ট্রীয়ার) সঙ্গে ইংল্যান্ডের সম্পর্কের বিন্যাসগুলিও হয়তো বাঙালি লেখকদের মানসে ক্রিয়া করে।

বিস্তীর্ণ জনপদের দীর্ঘকালের ত্রাস মানুষখেকোর অত্যাচার থেকে বিপন্ন গ্রামবাসীদের রক্ষা করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবির্ভূত হতেন সাহেব শিকারিরা। ফলে অসহায় গ্রামবাসীরাও কৃতজ্ঞচিত্তে সাহেব শিকারির ঐ অবদান, শিকারের কৃতিত্বকে বংশপরম্পরায় স্মরণ করে। মুখে মুখে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে যেত গোরা-সাহেব শিকারিদের কৃতিত্বকাহিনি। ঔপনিবেশিক সরকারও উপনিবেশের ভিত সুদৃঢ় করতে যোগ্য-মহান

প্রজা কল্যাণকারী-সুশাসকের পরিচয় দানে কর্মচারীদের শিকারে উৎসাহিত করত। সাহেব শিকারিদের শিকারের নানা কীর্তি-গাথা সংবাদপত্র, লেখালেখির মাধ্যমেও প্রচারিত হত। আর বাস্তবে খুব কম বাঙালি বা ভারতীয়ই ছিলেন যাঁরা শিকারদক্ষতায় এইসব সাহেব শিকারিদের সমকক্ষ। ফলে ভারতীয় জনমানসে সাহেব শিকারিদের আসনটি হয়ে ওঠে অত্যন্ত পাকা। সাহেব শিকারিদের প্রতি ভারতীয় আমজনতার দৃষ্টিভঙ্গিটি বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলিতেও বারে বারে উঠে এসেছে। গল্পের পর গল্পে মানুষঘাতী হিংস্র জন্তুর আক্রমণে শঙ্কিত অসহায় গ্রামবাসীরা বহিরাগত শিকারির শরণাপন্ন হচ্ছে। ব্রিটিশ সরকারের 'অরণ্য আইন' ও 'অস্ত্র আইনে'র ফলে এছাড়া তাদের গতিও ছিল না। তাছাড়া স্থানীয় শিকারিদের চেয়ে বহিরাগত ভদ্রলোক শিকারি বিশেষত শ্বেতসাহেব শিকারিদের শিকার দক্ষতা ও দুঃসাহসের প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাস ছিল বহু গুণ বেশি। 'হিমালয়ে ভাল্লুক শিকার' (*রংমশাল*) গল্পে দেখা যায় বিদেশি নৃবৈজ্ঞানিক দলটিকে পুণ্ড্ররাজ্যের সাপুরের পাহাড়ি গ্রামবাসীরা শিকার দল ভেবে উৎসাহের সঙ্গে অভ্যর্থনা করে, বিনামূল্যে মুরগি-ডিম-দুধ-কাঠ দেয়; তাদের একটাই আর্জি—সন্ধ্যা হলেই ভুট্টা খেতে নেমে আসা ভালুকদের উপদ্রব থেকে উদ্ধার করতে হবে তাদের; গ্রামের দু-চার জন শিকারিও যোগ দেবে কিন্তু লাইসেন্স না থাকায় তারা নিজেরা মারতে পারবে না; বাজনা-বিগল-ঢোল বাজিয়ে হইহল্লা করে শিকারিদের সামনে ভালুকদের তাড়িয়ে নিয়ে আসার দায়িত্বও তাদেরই। 'টাঁড়বাঘোয়া'তে (*সন্দেশ*) বিকেলে গ্রামের মধ্যে অনেকের চোখের সামনে কুঁয়োতলা থেকে এক বুড়িকে বাঘে নিলে, পলাশবনার গ্রামবাসীদেরকে স্থানীয় ভূস্বামী-শিকারি বিলিতি বন্দুকওয়ালা টিকায়েত পরদিন বাঘটাকে মাচান-শিকার করবে কথা দেয়। কিন্তু পলাশবনার মানুষরা টিকায়েতের উপর আস্থা না রেখে সে রাত্রেই দল বেঁধে জঙ্গলের পথে দশ মাইল পথ হেঁটে এসেছে মহুয়ামিলনের বাংলোয় গরমের ছুটি কাটাতে আসা দুই সদ্যতরুণ শিকারি—সাহেব পুত্র টেড ও বাঙালি কথকের কাছে। গতবছর গরমে জল খেতে আসা বাঘকে টিকায়েত গুলি চালালেও শিকার ব্যর্থ হয়; গ্রামবাসীদের অনুমান, ঐ গুলির আঘাতেই শরীরের জোর কমে বন্যজন্তু ধরতে না পেরে টাঁড়বাঘোয়া মানুষখেকো হয়ে উঠেছে। তাই মানুষখেকোর উপদ্রব থেকে মুক্ত হতে স্থানীয় টিকায়েতের চেয়ে অনেক বেশি আস্থা-ভরসা-বিশ্বাস তাদের স্পোর্টসম্যান শিকারি টেডদের উপর; টেডরা সদ্য কলেজ পড়ুয়া, সবে মাত্র গোঁফ ওঠা, টিকায়েতের তুলনায় নেহাৎই বাচ্চা ছেলে হওয়া সত্ত্বেও। আবার গ্রামের মালিক পলাশবনার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা টিকায়েত বহিরাগত শিকারিদ্বয়কে গ্রাম ছেড়ে চলে

যাবার জন্য বলতে আসে; কিন্তু সাদা সাহেব টেডকে দেখে ও টেডের হর্তাকর্তার মতো কথাবার্তা, এসডিও সাহেব ও ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেটকে বাঘটিকে ম্যানইটার ডিক্লেয়ারের জন্য চিঠি প্রেরণের জন্য লোক পাঠানোর কথায় সেই টিকায়েতও হকচকিয়ে যায়। 'তখন তো দেশ স্বাধীন হয়নি। সাদা চামড়া দেখলেই লোকে বেশ সমীহ করত।'[১৭] ফলে গামছা পরা ঘটি হাতে টেডকে দেখে টিকায়েত সমীহ করতে ইতস্তত করলেও জামাকাপড়পরা পুরোদস্তুর সাহেব টেডকে দেখে তার ভক্তি পুরো হয়; সঙ্গে উগ্র ভাবও নরম হয়; নিজগৃহে টেডদের আতিথ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ করে; মাঠরী ও প্যাঁড়াও উপহার দেয়। এমনকি তিনজন মিলেই টিলাতে বাঘশিকারে বসার প্রস্তাবও টিকায়েত দেয়। সাদা-সাহেব শিকারিদের প্রতি উপনিবেশের প্রজা ভারতীয় আম-জনতার মনোভাবটি চমৎকারভাবে উঠে এসেছে শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-কাহিনিগুলিতেও।

তবে সাদা চামড়ার সাহেব হলেই যে তিনি শিকারে অত্যন্ত পারদর্শী, নিশানা-নিপুণ বেপরোয়া দুঃসাহসী হতেন কিংবা মানুষ ও বন্য পশুপাখির প্রতি সমদরদী, বিবেকবান শিকারি স্পোর্টসম্যান হতেন—এমন অবশ্যই নয়। তবে এরূপ সাহেব-শিকারির চিত্র বিশ শতকের শিশু-কিশোর শিকার-সাহিত্যগুলিতে সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না। সাদা চামড়ার শিকারিদের মোহ থেকে ভারতীয় জনসাধারণ এমনকি বাঙালি সাহিত্যিকরাও সাধারণত মুক্ত নন। এরই মাঝে অবশ্য দু-একটি ব্যতিক্রমী গল্প বা বলা ভালো গল্পাংশ আমাদের নজরে এসেছে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'নকল শিকারির সংকট' গল্পে ইংল্যান্ড থেকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বধের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে এদেশে কোচবিহার রাজসরকারে চাকুরি করতে আসে সাহেব-যুবা ফ্রান্সিস। কিন্তু চিতাবাঘ দেখেই সে যেরূপ ভয় পায় তা উতরোল হাস্যরসের সৃষ্টি করে। পালাতে গিয়ে কাঁটাঝোপের নিবিড় আলিঙ্গনে বন্দি 'ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রিস্টের মতো দু'হাত ছড়ানো' নিশ্চেষ্ট ফ্রান্সিসকে কৃশতনু কালা আদমি বাঙালি কথকই শেষপর্যন্ত উদ্ধার করে। 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' (*শিশুসাথী*, লেখক অজ্ঞাতনামা) গল্পে মানুষখেকো বাঘ শিকারে যাবার পূর্বে দুই বাঙালি তরুণ দাদামশায়ের মুখে বাঘশিকারের দুটি অনুগল্প শোনে। সেখানে একটি অনুগল্পে দুজন ইংরেজ শিকারি ভারতে আসে বিশ্বের সবচেয়ে বিশাল বাঘ-শিকারের রেকর্ড নিজেদের ঝুলিতে পোরার উদ্দেশ্য নিয়ে। তাদের সাহেবি শিকারির সাজসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, দামি দামি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র, খানাপিনা অর্থাৎ শিকারের জমকালো আয়োজনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই। এমনকি শিকারের পর তারা কীভাবে মৃত বিশাল বাঘের সামনে চুরুটমুখে নিস্পৃহদৃষ্টিতে ফটো তুলবে সেসব বন্দোবস্তও নিখুঁতভাবে ছকে রাখা। তারপর দক্ষ গাইড

ও বনতাড়ুয়াদের নিয়ে তাদের মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে রাজকীয় বাঘশিকার শুরু হয়। কিন্তু বিশাল ডোরাদার বাঘ যখন মাচানের কাছে উপস্থিত, গাইড তাদের গুলি ছোঁড়ার ইঙ্গিত করলেও তারা আর কিছুতেই গুলি ছোঁড়ে না। গাইড-সর্দার গায়ে হাত দিয়ে দেখে একজন ইংরেজ যুবা মূর্চ্ছিত, আরেক জনের দেহও ভয়ে শক্ত হয়ে গেছে। ততক্ষণে বাঘ চম্পট দিয়েছে; গাইড ও বনতাড়ুয়ারা বহুকষ্টে ইংরেজ যুবকদ্বয়কে সুস্থ করলে একজন ক্ষীণস্বরে সর্দারকে বলে 'এত্তা বড়া শের কাহে ভেজা?' বিশাল বাঘকে সামনে সচক্ষে দেখে অভিভূত বা ভয়ে আড়ষ্ট হওয়া অবশ্য বিচিত্র নয়; জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে কোনও শিকারির ক্ষেত্রেই এরূপ হতে পারে। কিন্তু শিকারের বাহাদুরি বা জাঁক দেখানো দুই উদ্ধত ইংরেজ শিকারির বিশ্বরেকর্ড ভাঙার সুযোগ ফস্কে গিয়ে জব্দ হবার কাহিনিটি দাদামশায় যে রকম সরস, মজাদার সুরে বর্ণনা করেছেন তাতে একটু ভিন্ন ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনার সন্ধান মেলে। ইঙ্গিত বা ব্যাঞ্জনাটি আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দাদামশায় ঠিক এরপরই শোনান—এক ভারতীয় রাজার শিকারের সফল কাহিনি। রাজা নিজের রাজত্বের মানুষের মতোই বনের পশুপাখিদেরও নিজ প্রজা ভাবতেন। যতদিন বনের হিংস্রজন্তু তার মানুষ প্রজাদের কোনও ক্ষতি করত না, তিনি তাদের কিছুই করতেন না। নিছক শিকার স্পোর্টসের আমোদ গ্রহণেও তিনি আগ্রহী থাকেননি। কিন্তু কোনও হিংস্র বুনো জন্তু তার মানুষ প্রজাদের গবাদি নষ্ট করলে বা বারবার গ্রামে হানা দিয়ে উৎপাত করতে থাকলে তিনি শিকারে সচেষ্ট হতেন। কিন্তু মাচান শিকারও তার অপছন্দ। সার্চ লাইটের তীব্র আলোয় শিকারের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে শিকারও তাঁর নীতিবিরুদ্ধ। মড়ির বিপরীত দিকের ঝোঁপজঙ্গলে সামনের দিকে চেয়ে শিকারের অপেক্ষায় একবার তিনি বসে আছেন। হঠাৎই গায়ে উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ায় চেয়ে দেখেন পাশে সামান্য ব্যবধানে বিশাল ডোরাকাটা। বাঘ এসেছে তার অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। ঘটনার আকস্মিকতায় রাজাও আড়ষ্ট ও ভীত হন। কিন্তু মুহূর্তে ভয়কে জয় করে পিস্তলের নিখুঁত নিশানায় এক গুলিতেই শেষপর্যন্ত মানুষখেকো বাঘটি মারতে সক্ষম হন। বাঘশিকারের অহংকারী-আত্মপ্রচারে যদিও ভারতীয় রাজামশায়ের তেমন রুচি নেই। বরং তাঁর বনের প্রজা বাঘটি মানুষখেকো হয়ে ওঠায় শাস্তিরূপে বাঘটিকে তিনি মারতে বাধ্য হলেও, মৃত সুন্দর চামড়ার, বিশাল বাঘটিকে দেখে তিনি বিষণ্ণ হয়েছেন। ভারতীয় রাজার বাঘ শিকারের বীরত্বব্যঞ্জক অনুগল্পটি, পূর্ববর্তী ইংরেজ শিকারিদ্বয়ের অনুগল্পটির ঠিক বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে আছে। উপনিবেশবাদী ইংরেজদের প্রচারিত সাহসী-অতিপৌরুষদৃপ্ত ইংরেজ সাদা সাহেব শিকারি ও ভীরু-কাপুরুষ-মেয়েলি- নীতিনৈতিকতাশূন্য কালা নেটিভ

শিকারির দ্বৈততার সম্পূর্ণ বিপরীত ছকটিই ফুটে উঠেছে দাদামশায়ের বলা অনুগল্প দুটিতে। ইংরেজ বিদ্বেষ বা প্রবল জাতিবৈর শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলিতে সোচ্চারে কখনই উঠে না এলেও কখনো-কখনো ক্ষেত্রবিশেষে বিপরীত ছকটি উঠে এসেছে। উপনিবেশবাদী শিকারিদের প্রচারিত ছকের এরূপ বিপরীত ছকই তো ছিল জাতীয়তাবাদী কালপর্বে উপনিবেশের মানুষের গভীর গোপন সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা।

শিকারকে 'শারীরিক-মানসিক উন্নতির পন্থা', 'শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া' রূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টার মধ্যে 'দেশীয় ক্রীড়ার ধারাকে নস্যাৎ করে দেবার প্রবণতা'টি যে স্পষ্টতই ধরা পড়ে সে সম্পর্কে বিশিষ্ট শিকার-সমালোচক চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল সচেতন করেছেন।[১৮] বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতেও শিকার সাহিত্যিকরা শিকারকে শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া, সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ক্রীড়ারূপে দাবি করেছেন। যখন যে প্রাণীটির—বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক, গরিলা বা সাগরের তিমি—শিকার নিয়েই তারা গল্প ফেঁদেছেন, গল্পের সূচনাতেই প্রত্যেকেই প্রায় সেই প্রাণীটির শিকারই, শিকারের মধ্যে আবার সবচেয়ে মরণঘন ঝুঁকিপূর্ণ, তাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এরূপ মতটি প্রতিষ্ঠাতেও সচেষ্ট হয়েছেন। তবে তাদের সত্য ও কল্প—উভয় শিকার কাহিনির নায়করাই ভারতীয় বা বাংলার অন্যান্য দেশীয় ক্রীড়াগুলির চর্চাকে অবহেলা করেনি। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আফ্রিকার জঙ্গলে'তে (*শিশুসাথী*) শোভনলাল, বীরেন্দ্র, রতন—ভারতীয় বনিকপুত্রত্রয় ঘোড়ায় চড়তে, বন্দুক ছোড়া ও লাঠি চালাতেও ওস্তাদ। বোঝা যায়, এই দেশীয় ক্রীড়াগুলির চর্চার ফলেই গায়ে অসুরের মতো জোর, মনে ভয়ডর শূন্যতা ও বাধা বিপত্তি না মানার মনোভাব গড়ে ওঠায়, তারা আফ্রিকার দুর্গম জঙ্গলে শিকার অভিযান ও গরিলা শিকারেও সফল হয়েছে। জাতীয়তাবাদী কালপর্বে দেশীয় ক্রীড়াগুলির চর্চার জন্য গড়ে ওঠা ব্যায়ামাগার বা আখড়া শুধু কলকাতা অঞ্চলেই নয়, সুদূর মফস্সল, গ্রামগঞ্জগুলিতেও যে ছড়িয়ে গেছল তার প্রমাণ মেলে সত্যরঞ্জন সেনগুপ্তের 'বাঘ-শিকার' (*রামধনু*) গল্পটিতে। গ্রামের পালোয়ান অবিনাশদা ও তার আখড়ার চেলারা সড়কি-লাঠি খেলায় পারদর্শী ছিল বলেই বাঘকে গোল হয়ে ঘিরে ধরে মোকাবিলা করতে তারা ভয় পায়নি। 'বাঘের দেশে'র (*মৌচাক*) লেখক বিখ্যাত শিকারি দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী যেমন নামকরা কুস্তিবিদ ছিলেন তেমনি 'বাজ-বহেরী'র (*মৌচাক*) রচয়িতা হিতেন্দ্রমোহন বসু বিদেশি খেলা ক্রিকেটে ও 'কুমীর শিকার'-এর কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ক্রিকেটের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ক্রীড়া হকিতেও অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। এরকম ভুরি ভুরি উদাহরণ সহজেই তুলে ধরা যায়। আর শুধু এই শিকার-সাহিত্যগুলিতেই নয়, এগুলি প্রকাশিত হচ্ছিল বিশ শতকের যে শিশু-কিশোর

পত্রিকাগুলিতে সেই *মৌচাক, শিশুসাথী, রামধনু, রংমশাল* পত্রিকাগুলিও দেশীয় লুপ্তপ্রায় ক্রীড়াগুলিকে অবহেলার বদলে নবীন কিশোর-তরুণদের সামনে সেগুলি তুলে ধরতে যথেষ্ট সচেতন ছিল। পত্রিকাগুলিতে শিকার কাহিনির সঙ্গে একই সংখ্যায় দেশীয় ক্রীড়া-কুস্তি, লাঠি-তরোয়াল খেলা, যোগব্যায়াম, সাঁতার নিয়েও প্রচুর প্রবন্ধ, বাঙালি কুস্তিবীরদের নানা বীরত্ব কাহিনি, জীবনী প্রকাশিত হচ্ছে।[১৯]

জাতীয়তাবাদী কালপর্বে বাঙালির ‘মেয়েলি’, ‘ভীরু’, ‘দুর্বল’ কলঙ্কগুলি মোচন করে তার শারীরিক-মানসিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য বাঙালির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ‘বাঙালির পুরুষত্বের প্রতীকী পুনরুদ্ধার ও পরাক্রমশালী বীরের সন্ধান’। আর সেই অভিঘাতেরই ‘একটি’ অন্যতম ফল— এই কালপর্বে শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত শিকার-সাহিত্যবর্গটি। বাঙালির জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা ও তার মধ্যেকার জটিলতা, নানা টানাপোড়েনগুলিও[২০] ধারণ করে আছে এই শিকার-সাহিত্যগুলি। এই অধ্যায়ে আমরা মূলত সেগুলোই দেখার চেষ্টা করেছি।

তথ্যসূত্র

১. যৌবনবাদ সম্পর্কে জানতে দ্রষ্টব্য, অনুরাধা রায়, *ইতিহাসের হরেক গেরো* (কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০১৯), ২১৩-২৫৯।

২. সত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত, বাঘ শিকার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (সম্পা.), *রামধনু*, ৫ম বর্ষ, ৩২৬-৩২৯।

৩. তদেব, ৩২৮।

৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’, *বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী (৩)* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫), ৬২৫-৬২৯।

৫. *রামধনু*, ১২শ বর্ষ, ৪০৯-১০।

৬. ‘আহার ও পানীয়’ (বিবেকানন্দের ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’); ‘পাঠশালার ছেলেদের আহার’, ‘পাঠ্যাবস্থার খাদ্য’ (*স্বাস্থ্য*, ১৯০০); ‘প্রত্যহ কি কি খাওয়া উচিত’ (*রামধনু*); ‘কিশোরদের স্বাস্থ্য’ (*শিশুসাথী*)-তে বাঙালি ছেলেদের পুষ্টির জন্য আমিষ খাদ্য গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৭. *রংমশাল*, ২য় বর্ষ, ১৬৬।

৮. হীরেন্দ্রকুমার বসু, *বনে জঙ্গলে* (কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড), ভূমিকা।

৯. *রামধনু*, ১৪শ বর্ষ, ৩৭৯।

১০. *রংমশাল*, ২য় বর্ষ, ১৭১।

১১. তদেব, ২৬৬।

১২. তদেব, ২৫৬।

১৩. সাদৃশ্যযুক্ত একটি গল্প ‘মহেশ সর্দার’ যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত ‘*বনে-জঙ্গলে*’তেও (কলকাতা : সিটি বুক সোসাইটি, ১৯৩৫, পৃ. ৮৪-৯৩) বর্তমান।

১৪. *রামধনু*, ১২শ বর্ষ, ৪৮৯।

১৫. এ.এফ.এম. আবদুল জলিল, *সুন্দরবনের ইতিহাস* (কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ২০০০) ১১৯।

১৬. *সন্দেশ সেরা উপন্যাস সংকলন* (কলকাতা : দে'জ, ২০১৫), ২৫৮।

১৭. তদেব, ২৫৩।

১৮. চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল, *বঙ্গবাসীর শিকার কথা* (কলকাতা : আনন্দ, ২০২১), ৩৬।

১৯. ‘বাঙ্গালী পালোয়ান ভূপেশচন্দ্র’, ‘পালোয়ানের মত পালোয়ান’, ‘শিশু সাঁতারু’, ‘কয়েকটি যৌগিক ব্যায়াম’ (*রামধনু*) ইত্যাদি।

২০. পাশ্চাত্যের ‘উদারনীতি পরায়ণ যুক্তিবাদী’ পণ্ডিতমণ্ডলী থেকে শুরু করে এমনকি মার্কসবাদী ঐতিহাসিক Benedict Anderson পর্যন্ত পশ্চিমি ছাঁচেই ফেলে দিয়েছেন পুরো জাতীয়তাবাদী ব্যাপারটা, যেন অন্যত্র তার নবরূপায়ণের কোনও সুযোগ নেই। এদের সঙ্গে তর্ক করে পার্থ চট্টোপাধ্যায় উপনিবেশের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে জোরালো প্রশ্ন তোলেন। *The Nation and its Fragments (1993)* বইটিতে তিনি উপনিবেশের জাতীয়তাবাদ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু করেন। উপনিবেশী জাতীয়তাবাদের মূল সমস্যা হল— উপনিবেশিত মানুষরা একই সঙ্গে পশ্চিমি ধ্যানধারণা (পশ্চিমি রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান) গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করে। যেমন, জাতীয়তাবাদ ধারণাটি নিজেই এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিভিন্ন ধারণা পাশ্চাত্য আধুনিক ভাবধারার প্রত্যক্ষ অংশ। আবার উপনিবেশের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য পশ্চিমি সভ্যতার সঙ্গে কোনও ভাবে এক পার্থক্যবোধও তৈরি করতে চায়। এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে উপনিবেশী জাতীয়তাবাদের বিকাশ। পার্থ চট্টোপাধ্যায় ভারত তথা তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদের স্বয়ংক্রিয়তার উপর যেমন জোর দিয়েছেন তেমনি একই সঙ্গে তার মধ্যে একটা পরস্পর-বিরোধিতাও লক্ষ করেছেন। বাঙালির জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনাতেও মিশে ছিল এরূপ অনেক জটিলতা, টানাপোড়েনের ব্যাপার। দ্রষ্টব্য Partha Chatterjee, *The Nation and its Fragments* (Princeton : Princeton University Press, 1993) ; অনুরাধা রায়, *স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের গান-কবিতা উনিশ শতক* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১২), ২ ; সেমন্তী ঘোষ, ‘‘ন্যাশনালিজম’’, সুধীর চক্রবর্তী (সম্পা.), *বুদ্ধিজীবীর নোটবই* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০০৫), ২৫০.

চতুর্থ অধ্যায়

শিকার-সাহিত্যের সমান্তরাল বয়ান ও মেয়েরা

শিকার পুরুষালি ও পৌরুষোচিত ক্রিয়া (exclusively manly and masculine activity)। ২০১৮ সালে দক্ষিণ আমেরিকার আন্দেস পর্বতমালায় শিকারের অস্ত্রশস্ত্রসহ ন'হাজার বছরের প্রাচীন এক সতেরো-উনিশ বছর বয়সি মেয়ের সমাধি (Wilamaya Patjxa, female hunter, Peru) পাওয়া যায়। এটি আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত, গোটা বিশ্বে সাধারণ মানুষ থেকে বিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক গবেষকদেরও ধারণা ছিল—প্রাগৈতিহাসিক কালে শিকার ছিল কেবলমাত্র পুরুষদের ক্রিয়া; সে যুগে মেয়েরা ছিল সংগ্রাহক।[১] তবে অবশ্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকে ক্রমশ সমগ্র বিশ্বে (বিশেষত আফ্রিকা, ঔপনিবেশিক ভারত-বার্ম্মা-তিব্বতে আগত ব্রিটিশ মহিলাদের মধ্যে, আমেরিকা, আলাস্কায়) সংখ্যায় অতিনগণ্য হলেও কয়েকজন নারীশিকারি, অব্যর্থ সন্ধানী/লক্ষ্যভেদীর (Annie Oakley, Paulina Brandreth, Lady Catherine Minna Jenkins, Agnes Cecily Herbert, Osa Johnson প্রমুখদের) উত্থান ও প্রসিদ্ধি ঘটে। ভারতের প্রাচীন মাতৃকা বা দেবী মূর্তিগুলিতে, পুরাণ ও লোককথায় মেয়েদের দ্বারা বধ্য পশু ও বাহন পশুপাখির উপস্থিতি লক্ষণীয়। অরণ্যবাসী ও অরণ্যলগ্ন নানা উপজাতি (যেমন-ভিল, গন্ড, ওঁরাও) সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যেও ফাঁদ পেতে বা নানা দেশীয় পদ্ধতিতে পাখি, ছোটোখাটো পশু শিকারের প্রচলন বর্তমান। মোগল চিত্রকলায় মেয়েদের শিকারে সক্রিয় অংশগ্রহণের চিত্র যেমন দেখা যায়, তেমনি মোগল সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের শিকারে নিশানা দক্ষতার প্রসিদ্ধি জানা যায়। ব্রিটিশ আমলে ভারতে আগত মেমসাহেবরা অনেকেই (Fanny Eden, Emily Eden, Lady Beatrix Scott, Lady Curzon, Lady Ouvry, Mrs. E. Barrett প্রমুখরা) শিকার অভিযানে সঙ্গী হতেন। শিকার করা হিংস্র ভয়ঙ্কর বন্য জানোয়ারদের দেহকে ভারী বুটজুতোর তলায় দাবিয়ে ফটো তোলা যেমন ব্রিটিশ পুরুষদের কাছে অতীব বীরত্ব, শাসকের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা ও বিজয়ীর স্পর্ধার পরিচায়ক রূপে মর্যাদা পেত, তেমনি ব্রিটিশ মহিলারাও কেউ কেউ শিকার নামক মূলত পুরুষ নির্দিষ্ট ক্রীড়াবিনোদনটিতে সহযাত্রী হয়ে শিকার অভিজ্ঞতা লাভ বা হিংস্র বন্য জন্তুর শিকার স্বচক্ষে দেখাকে অন্যতম বিরল কৃতিত্বের বলে আত্মশ্লাঘা বোধ করতেন।

কেননা, সেই কালপর্বে মূল ব্রিটেনেও খুব কম সংখ্যক ইউরোপীয় মহিলাই শিকার অভিজ্ঞতা লাভের বিরলতম সুযোগের অধিকারী ছিলেন। তবে ভারতে আগত মেমসাহেবদের অনেকে অবশ্য শিকারের রক্তাক্ত হত্যালীলা (murder) অংশটি অপচ্ছন্দও করতেন। শিকারে হত্যালীলাটি ব্যর্থ হলে, তা দেখতে পাবার সুযোগ হারানোর জন্য তারা হতাশ হবার বদলে অনেক সময় সৌভাগ্যের মনে করতেন। এক্ষেত্রে সম্ভবত তাদের নারীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করত, যা পুরুষ শিকারি বা শিকার সঙ্গীদের থেকে অনেকটাই আলাদা। তবে এই সব মেমসাহেবদের কাছেও শিকার অভিযান কালের প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ, নতুন নতুন প্রজাতির পশুপাখি-কীটপতঙ্গ-গাছপালা-ফুলফল দেখা, গতানুগতিক জীবন থেকে ক্ষণিক মুক্তি, অ্যাডভেঞ্চারমূলক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ, শিকার পার্টিকে কেন্দ্র করে রাজকীয় খানাপিনা-আমোদ প্রমোদ থেকে মেলামেশা-কোর্টশিপ-প্রেমের সুযোগ লাভ ইত্যাদি কারণে শিকার সঙ্গী হওয়া অত্যন্ত আকর্ষক ছিল। আবার অনেক সময় মেমসাহেবদের শিকার কৃতিত্ব অর্জনের জন্য শিকারকে সাজিয়ে গুছিয়ে মেমসাহেবের বন্দুকের সামনে হাজির করার, এমনকি স্থানীয় শিকারি দিয়ে শিকার করে তার কৃতিত্ব মেমসাহেবদের নামে প্রচার করার ঘটনাও বিরল ছিল না।[২] তবে এই সব 'রেডিমেড' শিকার-কৃতিত্ব অভিলাষী মেমসাহেবদের চেয়ে আলাদা, সত্যিকার শিকার-নৈপুণ্যের অধিকারী কয়েকজন মেমসাহেব-শিকারিও অবশ্যই ছিলেন। Isabel Savory, Mrs. Alan Gardner, Mrs. W. W. Baillie, Mary Procida, Olive Smythies, Lady Catherine Minna Jenkins প্রমুখরা শুধু শিকারসঙ্গী হতেন না, কিংবা আয়োজিত শিকারপার্টিতে মেকি-শিকার কৃতিত্বের অভিলাষী ছিলেন না। তাঁরা নিজেরাই বন্দুক তুলে নিয়ে পাখি, তৃণভোজী নিরীহ পশু (সম্বর, হরিণ, নীলগাই) থেকে বাঘ, চিতার মতো হিংস্র জন্তু শিকার করেছেন। কেউ কেউ স্বামী বা ভাই অর্থাৎ পুরুষ অভিভাবকের অনুপস্থিতিতেও শিকারে স্থানীয় শিকারি ও চাকরদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে সফল শিকার করেছেন। ঔপনিবেশিক পরিভাষায় এই সব শিকারি মেমসাহেবরা অনেক সময়ই সম্বোধিত হতেন 'honorary male' রূপে।[৩] মেমসাহেবদের অনেকেই তাদের শিকার অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করেন যা নারীশিকারিদের অভিজ্ঞতা ও শিকারসঙ্গী রূপে নারীদের শিকার সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির স্বতন্ত্রতা বোঝার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।[৪] তাদের এই লেখালেখিগুলিতে যেমন আত্মজীবনী, সফর-অভিজ্ঞতা, স্মৃতিকথা, অ্যাডভেঞ্চার ইত্যাদির মিশেলে এক মিশ্র বয়ান বৈচিত্র্য দেখা যায়, তেমনি এগুলিতে ধরা আছে

বহুমাত্রিক স্বরও। বিশিষ্ট শিকার-সাহিত্য সমালোচক চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল তাঁর 'মিসেস বেইলি-র শিকার-স্মৃতির ভারত' প্রবন্ধে তাই লেখেন :

> একদিকে যেমন সেখানে রয়েছে আত্মপরিচয় নির্মাণের তাগিদ, তেমনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-নির্ধারিত লিঙ্গ বৈষম্যের নিগড় থেকে মুক্তি পেয়ে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজস্ব পরিসর তৈরির প্রয়াস। সেই সুবাদে উপনিবেশবাদের সঙ্গে নারীত্বের মেলবন্ধনের মধ্যে দিয়ে 'হোয়াইট উয়োম্যানস বার্ডেন'-এর স্বীকৃতি আদায়ের তাগিদ। একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, স্বাধীনচেতা ইউরোপীয় নারীর ঔপনিবেশিক ভারতের অরণ্যজগতে বন্দুক কাঁধে বিচরণ বস্তুত তার সেই স্ববিরোধী অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসার ইঙ্গিত দেয় যাকে ইন্দিরা ঘোষ যথার্থভাবেই বলেছেন : colonized by gender but colonisers by race। ভারতীয় উপনিবেশে বিস্তর ভ্রমণ শুধু যে ব্রিটিশ মহিলাদের আত্মপরিচয় নির্মাণের সুযোগ উপহার দিয়েছে তা-ই নয়, লিঙ্গ ভিত্তিক সামাজিক রীতিনীতির বেড়া টপকে যেতেও সাহায্য করেছে বিস্তর। উপনিবেশের জনজীবনের মূলস্রোতের সংস্রবে এসে তারা সামাজিকভাবে নির্ধারিত গার্হস্থ্য জীবনের গণ্ডিকে পেরিয়ে যেমন নিজেদের জীবনের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে, তেমনি ক্ষমতায়িত হবার পথেও অনেকটা দূর এগিয়ে যেতে পেরেছে। ...এই একক, স্বাধীনচেতা ইউরোপীয় নারীরা তাঁদের ভ্রমণসূত্রে হয়ে উঠেছিলেন একই সঙ্গে দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য দুই-ই। এক বিদেশিনির অরণ্যপ্রদেশে একক ভ্রমণ স্থানীয় মানুষের মধ্যে বেজায় কৌতূহল জাগাত। সে কৌতূহল যে সব সময় আগন্তুকের পক্ষে খুব অনুকূল হয়ে উঠত, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।... একে অরণ্যে একাকিনী বিদেশিনি, তায় রাইফেলধারী। যে গ্রামবাসীর সহায়তা প্রার্থী তিনি, তাদের সামনে নিজেকে প্রমাণ করতে না পারলে শিকারির ভাবমূর্তি তাদের স্বীকৃতি পেতে পারে না।[৫]

দেশীয়দের মধ্যে কোচবিহারের মহারানি সুনীতি দেবী (১৮৬৪-১৯৩২ খ্রি.) স্বামীর সঙ্গে নিয়মিত শুটিং-পার্টিতে যেতেন। রাজ্য পরিচালনার সব দুশ্চিন্তা দূরে সরিয়ে হাল্কা মেজাজে অবসর বিনোদনের জন্য বড়ো সুখ-স্বাচ্ছন্দে ভরপুর এই সব রাজকীয় শুটিং-পার্টির আয়োজন। মূলত ব্রিটিশদের সঙ্গে 'পারস্পরিক বন্ধুত্বের বন্ধন' সুদৃঢ় করতে বিদেশি বিশিষ্ট অতিথি, রাজপুরুষদের জন্য এই শিকার-পার্টিগুলো আয়োজিত হত। রাজকীয় বৈভব ও শৌখিনতায় মোড়া এই শিকার-পার্টিগুলোর আনন্দোচ্ছ্বাস, আহার-বিহার, বন্য জন্তু অধ্যুষিত ঘোর জঙ্গলে শিকার-ক্যাম্পে রাত্রিবাস, রহস্যময় ভারতীয় অরণ্য-রাত্রির অকৃত্রিম রোমান্টিক পটভূমি, গভীর জঙ্গলে অকস্মাৎ বাঘের গর্জন

-ক্যাম্পের কাছাকাছি বাঘের আগমনে সৃষ্ট ভয়মিশ্রিত রোমাঞ্চ, জঙ্গললগ্ন গ্রামের সাদাসিধে সরল মানুষজনের হৃদয়স্পর্শী আন্তরিকতা—ইত্যাদি শিকার-পার্টিতে গিয়ে হওয়া নানা অভিজ্ঞতাকে সুনীতি দেবী হাজির করেছেন তাঁর *The Autobiography of An Indian Princess* (London, 1921)-এর 'Happy Days In India'-তে। ক্যাম্পে চকোলেট-মিষ্টি খেয়ে, উপন্যাস পড়ে, বন্ধুদের সঙ্গে পারিবারিক সুখ-দুঃখের গল্পগুজব -হাসি ঠাট্টায় সময় কাটানো, শিকার থেকে পতিদেবের ফিরতে দেরি হওয়ায় তীব্র মানসিক উৎকণ্ঠা কিংবা রাতের জঙ্গলে বাঘেদের লড়াইয়ের হিংস্র গর্জনে ভীতসন্ত্রস্ত সন্তানের মায়ের দুর্বল আঙুল ধরে শক্তিমান বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাবার প্রয়াস—এই সব টুকিটাকি ঘটনাগুলি তাঁর শিকার-স্মৃতি আলেখ্যটির পরতে পরতে বুনে দিয়েছে স্বতন্ত্র মেয়েলি অলংকরণ। সেকালে বাঘ শিকারকে ঘিরে বিদেশিদের তীব্র উত্তেজনা-উন্মাদনারও পরিচয় মেলে তাঁর লেখায়। বাঘ শিকারে তীব্র উৎসাহী অস্ট্রিয়ার কাউন্ট ওয়াল্ডস্টাইনের শিকার থেকে জ্বর গায়ে ফিরে অকাল মৃত্যু—তাঁকে ব্যথিত করেছে। আবার এক ইংরেজ ভারতে শিকার অভিযানের পুস্তকে মহারাজের (সুনীতি দেবীর স্বামীর) শিকারের ছবিগুলি নিজের শিকারের ছবি বলে দাবি করার মিথ্যাচার করতেও দ্বিধা করেনি। সেসম্পর্কে লেখিকার সরস মন্তব্য : 'মজার ব্যাপার হল গ্রুপ ছবিগুলোতে দেখা যাচ্ছে মহারাজার অতিথিবর্গ, তাঁর এ.ডি.সি এবং কর্মচারীরা সব উপস্থিত। সেগুলো পরিবর্তন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি'।[৬] সুনীতি দেবী *Bengal Dacoits and Tiger* (Calcutta, 1916) বইতেও লোকমুখে প্রচলিত বাংলার ডাকাতদের গল্পের পাশাপাশি বাংলা-আসাম-কাছাড়-হাজারিবাগ অঞ্চলের পথঘাট, গ্রামাঞ্চল, শহরতলির আরেক আতঙ্ক 'বাঘে'রও বেশ কয়েকটি গল্প শুনিয়েছেন। বাঘের বিপদ থেকে সেকালে সাধারণ গ্রামবাসী, শিক্ষিত ভদ্রলোক, সাহেব কারোরই নিস্তার ছিল না। তাঁর গল্পগুলিতে সাহেবরা উপস্থিত থাকলেও তাদের উপস্থিতি ততটা গৌরবোজ্জ্বল বা বীরত্বব্যঞ্জক নয়। সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট-বাঘের ভয়-বাঘের সঙ্গে সংঘাতই গল্পগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে। গ্রামীণ সাধারণ মানুষও কখনো-কখনো বাঘ শিকারের কৃতিত্ব অর্জন করে ফেলত, দিত বীরত্বের পরিচয় ('Earning The Reward' বা 'পুরস্কার প্রাপ্তি')। কোচবিহার মহারাজের (তাঁর স্বামীর) কিশোর বয়স থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত অসংখ্য শিকারের মধ্যে থেকে বেশ কয়েকটি রোমাঞ্চকর ঘটনাও তিনি তুলে ধরেছেন 'A Maharajah's Adventures' বা 'এক মহারাজার অ্যাডভেঞ্চার'-এ। সুনীতি দেবী তাঁর স্বামীর সঙ্গে শিকার-পার্টিতে সঙ্গী হয়েছেন, স্বামীর বাঘ-গন্ডার শিকার সরাসরি চাক্ষুষ করেছেন, তাঁর লেখা আত্মকথা ও

গল্পেও শিকার প্রসঙ্গ বারবার উঠে এসেছে কিন্তু তিনি নিজে সরাসরি কখনও শিকার করেননি। বরং তাঁর আত্মকথনে জানিয়েছেন : 'মহারাজার লক্ষ্য শিকারের দিকে আর আমার দৃষ্টি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের দিকে'।[৭] আবার ক্যাম্প থেকে বেরনোর সময় মহারাজ তাকে শিকার দেখে হাত টেনে না ধরার বা বন্দুকে হাত না দেবার শপথ করিয়ে নিলেও বাঘের শব্দে হাতি কান নাড়তে থাকলে তিনি পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভুলে যথারীতি মহারাজের হাত ও কোট ধরে টানতে থাকেন। ফলে সুনীতির ভাগ্যে জোটে পিছন ফিরে তাকানো মহারাজের অবিস্মরণীয় 'কৌতুকের হাসি'।

সুনীতি দেবী নিজে কখনও শিকার না করলেও তাঁর নাতনি কোচবিহারের রাজকন্যা গায়ত্রী দেবী (১৯১৯-২০০৯ খ্রি.) মাত্র বারো বছর বয়সে গ্রামে উৎপাতকারী এক প্যান্থার-চিতাবাঘকে একুশ বোর শট গান দিয়ে হাওদা-শিকার (হাতির পিঠ থেকে শিকার) করেন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। গায়ত্রীর শিকারে যাওয়ার সূচনা অবশ্য আরও পূর্বে —পাঁচ বছর বয়স থেকেই। কেননা, কোচবিহার রাজপরিবারের নাবালক পুত্র-কন্যাদের পড়াশোনার সঙ্গে শিকার-শিক্ষাও ছিল জীবনের অঙ্গ। তারা শৈশব থেকেই বন্দুক চালানো, শিকারে সতর্কতা অবলম্বনের পদ্ধতি, অতি উত্তেজনায় হাতিকেই গুলি না করে ফেলা—ইত্যাদি শিকারের নানা খুঁটিনাটি শিখত। নানা মুখরোচক, লোভনীয় খাদ্য সহযোগে সুশিক্ষিত শিকারি-হাতিতে চড়ে শুটিং যাত্রা তাদের কাছে পড়াশোনার চেয়েও নিঃসন্দেহেই ছিল আরও উত্তেজক। জীবনের প্রথম শটেই বাঘ কাৎ হওয়ায় প্রধান শিকারি, কর্মচারীদের ও পরিবারের সদস্যদের অভিনন্দনের বন্যায় কিশোরী গায়ত্রী গর্বে উত্তেজনায় বাকরুদ্ধ হন। তা আরও 'থ্রিলিং' হয়ে ওঠে জয়পুরের তরুণ মহারাজা সোয়াই মানসিংহ-দ্বিতীয় গায়ত্রীকে টেলিগ্রামে অভিনন্দন বার্তা পাঠালে। এই শিকার সাফল্যের ঘটনাটি তাঁদের দুজনের মধ্যে পরবর্তীকালে প্রগাঢ় প্রণয়ের পথকে সুগম করে তোলে। শিকার-সংস্কৃতি বিশেষত ঔপনিবেশিক শিকার-সংস্কৃতির রোমান্টিক আবেদনটিই যেন মূর্ত হয়েছে এখানে। যদিও পুরুষ শিকারি (নায়ক) ও তার শিকার বীরত্বে মুগ্ধ নারী (নায়িকা)-র চিরচেনা ছকটি এক্ষেত্রে বিপরীত। গায়ত্রী সারা জীবনে বহু শিকার ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছেন, নিজেও শিকার করেছেন। গন্ডার শিকারে গুলিবিদ্ধ গন্ডারের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত রক্তের ফোয়ারা তাঁর চোখে লেগেছে বীভৎস। তৎকালীন বাঙালি তথা ভারতীয় নারী এমনকি রাজপরিবার বা অভিজাত নারীদের থেকে কোচবিহারের সুন্দরী 'টম বয়', 'পাগলী' রাজকন্যাটি বা জয়পুরের 'সেভাবে পর্দা না মানা', 'বিদেশে-শিক্ষিতা, আধুনিকা' মহারানিটি ছিলেন অনেকটাই স্বতন্ত্র। শিকারে যেমন তিনি নিশানা নিপুণ

ছিলেন, তেমনি শিখেছিলেন তাঁর প্রিয় প্রাণী হাতিদের ভাষা; পুষে ছিলেন প্যান্থার, কুকুর, বানর। তাঁকে কখনও দেখা যায় বরোদায় হাঁস শিকার করতে বা ফেলকনদের শিকার-ক্রিয়া দেখতে, কখনও কোচবিহারে ভাইয়ার দ্বারা জখমি চিতাবাঘকে সম্পূর্ণ নিকেশ করার জন্য শুটিং-পার্টির দায়িত্ব নিতে, কখনও কাশ্মীরে ভালুক শিকারে যেতে বা যোধপুরের পাখি শিকার করে যোধপুররাজের কাছে অতি উৎকৃষ্ট কুড়ি বোরের বন্দুক উপহার পেতে। অন্যান্য রানিরা যখন শিকারকে এড়িয়ে যান, তিনি উদয়পুরে শিকার-পার্টির সঙ্গেই নির্দ্বিধায় থাকেন ও প্রথম শটেই দাঁতাল বন্যশুয়োর মারেন। কখনো বা জয়পুরের মহারানি রূপে স্বামীর সঙ্গে সওয়াই মাধোপুর জঙ্গলে পোষা চিতা সহ হরিণ ও বাঘ শিকারের অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন। তাঁর স্মৃতিকথা *A Princess Remembers: The Momoirs of the Maharani of Jaipur*-এর পত্রেছত্রে ছড়িয়ে আছে তৎকালীন ভারতের রাজন্যবর্গের শিকার-বিলাসের নানা চিত্র। ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিকারের নিজস্ব বিশেষত্ব (বরোদার চিতা শিকার, যোধপুরে ঘোড়ায় চেপে বর্শা দিয়ে বন্য বরাহ শিকার, মহীশূরে হাতি খেদা) যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন, তেমনি স্থানভেদে শিকার বন্দোবস্তেও ফারাক (কোচবিহারে হাওদা-শিকারের প্রাধান্য হলেও জয়পুরে মুখ্য মাচান-শিকার) কিংবা ইংরেজ বা আমেরিকান শিকার-পার্টিগুলির সঙ্গে ভারতীয় শিকার-পার্টিগুলির বিস্তর পার্থক্যটিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। বরোদা রাজপরিবারের পর্দা প্রথার কড়াকড়ি থাকলেও মেয়েদের পুরুষদের বিপরীত দিকে আলাদা বসে পর্দা ছাড়া চিতা শিকার দেখার অনুমতির কথাও তিনি জানিয়েছেন। কোচবিহারের মতো জয়পুর রাজপরিবারও ব্রিটিশ রাজপুরুষ, বিদেশি অতিথির (লর্ড মাউন্টব্যাটেন, প্রিন্স ফিলিপ প্রমুখের) সৌজন্যে রাজকীয় শুটিং-পার্টির আয়োজন করত। ১৯৬১ সালে ইংল্যান্ডের রানির ভারত সফরকালে সাবাই মাধোপুরে শিকার-পার্টির কথা থাকলে, ইংল্যান্ডের 'Anti Blood Sports Group' এই শিকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। এ খবর ভারতীয় পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হলে জওহরলাল নেহেরু গায়ত্রী দেবীর স্বামী জয়পুরের মহারাজকে বাঘ শিকারে ছাগল-ভেড়া টোপ ব্যবহার না করার নির্দেশ দেন। তৎকালীন ভারতে শিকার, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে বাদ-প্রতিবাদ ও দেশীয় রাজনৈতিক টানাপোড়েনের এরূপ নানা অজানা খুঁটিনাটি তথ্য ধরা পড়েছে গায়ত্রীর স্মৃতিকথনে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধী প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও গায়ত্রী দেবী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন—ইন্দিরা গান্ধীর আমলে বন্যপ্রাণী বা পরিবেশ রক্ষণে সরকারের দৃষ্টি থাকলেও পরে তা কমে গেছে। ফলে বিখ্যাত রণথম্ভোর বা সাবাই মাধোপুরের বনভূমি

বিশেষত বাঘ ধ্বংসের পথে। শুধু বাংলা বা জয়পুরের নয়, সমগ্র ভারতেই যে হাতেগোনা দু-একজন ব্যতিক্রমী নারীকে শিকার করতে দেখা যায়, তাদের মধ্যে গায়ত্রী দেবী নিঃসন্দেহেই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তবে শুধু নারী-শিকারি রূপেই নন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিকারি থেকে তিনি হয়ে ওঠেন 'বন্য পশু রক্ষণ সমিতি'র সদস্য। অবশ্য তিনি অকপটে কবুল করেছেন—কোচবিহারে পশুনিধন কমার পেছনে সমিতির কার্যক্রম বা শিকারির অভাব আসল কারণ নয়; জনবসতি ও চাষের জমির বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক হারে জঙ্গল কেটে সাফ করা—যা স্বাধীনতার পর আরও উত্তরোত্তর বেড়েছে—তার ফলে বনের পশুদের বসবাসের স্থানেরই আজ একান্ত অভাব।

গায়ত্রী দেবী ছাড়া জম্মুকাশ্মীরের মহারানি তারা দেবীরও শিকারে খ্যাতি ছিল। আবার পারিবারিক অর্থনৈতিক চাপ সামলাতে Thresya Thomas বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন জারির পূর্বে বিশ শতকে কেরলের প্রথম নারী শিকারি হয়ে ওঠেন ও ক্রমে 'শিকারি-কুট্টি আম্মা' রূপে জনপ্রিয় হন। তবে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের ত্রাস কোনও মানুষখেকোকে শিকার করে বিপন্ন জনজীবনের ত্রাণকর্ত্রী রূপে কোনও বিদেশি বা দেশি মেয়ে শিকারিকে দেখা যায়নি; এক্ষেত্রে বড়োজোর তারা স্বামীর শিকার সঙ্গী বা সহযোগী হয়েছেন মাত্র; তাও এরূপ দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল।

উপরের তথ্যগুলি থেকে বোঝা যায়, উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকে সংখ্যায় খুবই কম হলেও নারীর নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এক নতুন ভূমিকার—সম্পূর্ণ পৌরুষোচিত ক্রিয়া বলে বিবেচ্য শিকার ক্রিয়াতেও সক্রিয় অংশ নেওয়া কিংবা সঙ্গী হওয়ার—বেশ কিছু নজির ছিল। কিন্তু তবুও বাংলা শিকার-সাহিত্যে নারীশিকারির উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে। উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের শিশু-কিশোর সাহিত্যে বিশেষত অ্যাডভেঞ্চারমূলক কাহিনিগুলিতে এমনিতেই মেয়েরা ছিল ব্রাত্য[৮]; সেক্ষেত্রে শিকারের মতো পুরুষালি ক্রীড়া, বিপদসঙ্কুল বনজঙ্গলে যাত্রা (dangerous outdoor activity) ও নিষ্ঠুর রক্তখেলার বিনোদনে মেয়েরা শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত বাংলা শিকার-সাহিত্যে—তা মৌলিক শিকার কাহিনি হোক বা বিদেশি শিকার কাহিনির অনুবাদই হোক—স্বাভাবিকভাবেই গরহাজির। ভারতের দাক্ষিণাত্যের জঙ্গলে শিকারে যাওয়া উইলিয়ম ম্যাকলিন সাহেব তাঁর শিকার দলের এক আহিরিণী 'নারী-শিকারি' কাইরমনের নিষেধাজ্ঞাকে মানলে লোকে সাহেবকে 'কাপুরুষ' বলবে ভাবেন। তাই কাইরমনের বারণ উপেক্ষা করে খালে নেমে বাঘ শিকারে উদ্যত হন। এতে বাঘের আক্রমণে তিনি অচিরেই যখন প্রাণ হারাতে বসেন,

তখন কাইরমনই অসীম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে বাঘ শিকার করে সাহেবকে রক্ষা করে। এই ঘটনার ভিত্তিতে উনিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রিকা *সখা, মুকুল* এ 'রমণীর বিক্রম' বা শিকার দক্ষতার গল্প প্রকাশিত হয়। রক্ষাকর্তা রূপে পুরুষ-শিকারির (বিশেষত পুরুষ সাহেব শিকারির) অতিপৌরুষের চিরাচরিত ছকে বাঁধা Super-Hero ইমেজটির বদলে এ গল্পে নারীশিকারির বিচক্ষণতা, শিকার দক্ষতা, বীরত্ব, সাহসিকতাকে মেনে নেওয়া হয়েছে। গল্পটিতে আহিরিণী কাইরমন (নারী)শিকারি রূপে বিশেষ মহিমা পেয়েছে। তবে এ ধরনের হাতেগোনা দু-একটি অতি ব্যতিক্রমী গল্প ছাড়া উনিশ ও বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে নিয়মিত প্রকাশিত বাংলা শিকার-সাহিত্যের তামাম ভিড়ের মধ্যেও আর একটিও 'কাইরমন' বা তেমন কোনও দক্ষ নারীশিকারির উপস্থিতি আমাদের চোখে পড়ে না। নারীশিকারি তো বহুদূর, শিকার সঙ্গী বা শিকার অভিযানে অংশগ্রহণকারী রূপেও মেয়েদের সাক্ষাৎ মেলা ভার। বহু পরে এমনকি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে শিকার আইনত নিষিদ্ধ হবারও বেশ কয়েক বছর পর বুদ্ধদেব গুহ ঋজুদা সিরিজের 'রুআহা' উপন্যাসে (আনন্দমেলা, ১৩৮৯ ব./১৯৮২-৮৩ খ্রি.) বিবেকবান শিকারি-নায়ক ঋজুদা ও রুদ্রের সুযোগ্য অ্যাডভেঞ্চার সঙ্গী রূপে হাজির করেন—তিতিরকে। তিতির সেন রাইফেল চালানোয় দক্ষ এমনকি রুদ্রের চেয়েও অধিক নিশানা নিপুণ, গাড়ি চালানোতে ওস্তাদ, ওমলেট-খিচুড়ি রান্নায় পারদর্শী, ভীষণ বুদ্ধিমতী, ইংরেজি-ফ্রেঞ্চ-সোয়াহিলি ইত্যাদি নানা ভাষা জানা, কলকাতা মডার্ন হাইস্কুলে ক্লাস নাইনে পড়া, পড়াশোনায় ও বিতর্কে উজ্জ্বল, জিনস-গেঞ্জি পরা চুলে পনিটেল বাঁধা ঝকঝকে স্মার্ট সুন্দরী কিশোরী। পূর্ববর্তী হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'মৃণু', রবীন্দ্রলাল রায়ের 'ইরা', প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'কৃষ্ণা' অথবা 'শিখা'[৯], নলিনী দাশের 'গোয়েন্দা গণ্ডালু'[১০]দের কথা মনে রেখেও বলা যায় তিতিরই প্রথম বাঙালি মধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে যে বাংলা শিকার বা জঙ্গল-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলিতে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে উপস্থিত। বাস্তবতাকে যথাসম্ভব বজায় রেখেই বুদ্ধদেব তার চরিত্রায়ণে সচেষ্ট হয়েছেন। ঋজুদা সিরিজের পূর্ববর্তী উপন্যাস 'গুগুনোগুম্বারের দেশে'তে (*আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী*, ১৩৮৭) পথচিহ্নহীন দুর্গম আফ্রিকার জঙ্গলে ঋজুদাদের মৃত্যুমুখে ফেলে পালায় বিশ্বাসঘাতক আফ্রিকান সঙ্গী ভুষুণ্ডা। সেই ভুষুণ্ডার উপর বদলা নিতে, আসলে পৃথিবীব্যাপী ছড়ানো চোরাশিকার চক্রের সঙ্গে লড়তেই পূর্ব আফ্রিকার তানজানিয়ার 'রুআহা' অরণ্যে ঋজুদা-রুদ্র-তিতিরের অ্যাডভেঞ্চার যাত্রা। উপন্যাসটি রুদ্রের বয়ানে রচিত হওয়ায় মেয়েদের

সম্পর্কে সমাজ-প্রচলিত নানা ধারণাকে রুদ্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলে ধরে ঔপন্যাসিক নিপুণ ভঙ্গিতে যথাসম্ভব বাস্তবসম্মতভাবেই সেইসব চলতি ধারণাগুলি অনেকটাই ভেঙে দেন। তৎকালীন বয়ঃসন্ধির বাঙালি ছেলেদের প্রায় সমবয়সি বা বয়সে অল্প ছোটো মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, চোরা আকর্ষণ, ঈর্ষা, বড়োদের চোখে নিজ কৃতিত্ব প্রমাণের জন্য পারস্পরিক রেষারেষি, মেয়েদের কাছে হেরে যাবার লজ্জা-দুঃখ, ক্রমশ বিরূপ বা প্রতিযোগী মনোভাব বদলে মেয়েটিকেও যথার্থ অ্যাডভেঞ্চার-সঙ্গী রূপে সসম্মানে মেনে নেওয়া—বাঙালি তরুণদের মনের এই অভিযাত্রাটিও বুদ্ধদেব রুদ্রের বয়ানের মাধ্যমে সমস্ত উপন্যাসটিতে সুচারুভাবে বুনে দেন। আর তিতির 'পথি নারী বিবর্জিতা' প্রবাদকে ভেঙে দিয়ে শুধুমাত্র ঋজুদাদের 'একেবারে নাছোড়বান্দা' সঙ্গী হয়েই থাকে না। নিজ যোগ্যতায় চোরাশিকারিদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর জটিল এই অপারেশনে ঋজুদা টিমকে ক্যাপ্টেনের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতাও দখল করে নেয়। তিতির উৎসাহী ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে থেকে ক্রমশ জঙ্গলের পরিবেশে মানিয়ে নিতে সক্ষম, বুদ্ধিমতী, সাহসী জঙ্গল-অ্যাডভেঞ্চারারে পরিণত হয়েছে। ডামুকে পিস্তলের নল দিয়ে জোরে বাড়ি মারতে গিয়ে সেমসাইড হয়ে গুলি বেরিয়ে ঋজুদার মাথায় লেগে গেলে ঘটনার অভাবনীয়তায় তিতির শত্রু ডামুর হাতের কাছে পিস্তল ফেলে দৌড়ে অজ্ঞান ঋজুদার কাছে ছুটে যায়। এই দুর্ঘটনাটি ঘটনাচক্রে ঘটিয়ে ফেলা ছাড়া উপন্যাসটিতে চোরা শিকারিদের বিরুদ্ধে তিতিরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত স্থানীয় নিগ্রো লোকগুলির থেকে তিতির যেভাবে অভিনয়, স্বতঃস্ফূর্ত কথাবার্তা, আন্তরিক ব্যবহারে মন জয় করে চোরাশিকারি চক্রের খবর জোগাড় করে ও তাদেরকেও চোরাশিকারিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগায়—তা নিঃসন্দেহেই প্রশংসনীয়। তিতিরকে দিয়ে বুদ্ধদেব 'রুআহা'তে হে হে লোকেদের ছোটো তির ও বেঁটে ধনুক চালিয়ে বুড়ো হে হে সর্দারের খুনিকে মারিয়েছেন। চোরাশিকারিদের বিরুদ্ধে রুদ্রের 'উজি'র সঙ্গে রীতিমতো সমান তালে পাল্লা দিয়ে তিতিরকে দিয়ে 'ব্রেন গানে'র গুলি বৃষ্টি করে যুদ্ধ করিয়েছেন। 'রুআহা'র লেখক, তিতিরের স্রষ্টাকে পাঠানো অসংখ্য চিঠির সাক্ষ্য থেকে জানা যায় আগ্নেয়াস্ত্রে পারদর্শী বাঙালি জঙ্গল-অ্যাডভেঞ্চারার রূপে তিতিরের আবির্ভাব সেসময়কার বাঙালি কিশোরী পাঠিকাদের বেজায় খুশি করেছিল। কিন্তু তবুও ঋজুদা সিরিজের পরবর্তী কাহিনিগুলিতে মানুষখেকো বাঘ, রোগ্ বা গুণ্ডা হাতি শিকারের ক্ষেত্রে হয় তিতিরকে বুদ্ধদেব কোনও উপযুক্ত কারণ দর্শিয়ে (যেমন—জে এন ইউ গেছে বা এখন দিল্লিতে পড়ছে ইত্যাদি) সেবারের অ্যাডভেঞ্চারে অনুপস্থিত রেখেছেন ('নিনিকুমারীর বাঘ',

'অরাটাকিরির বাঘ') নয় তিতির, ভটকাইকে বাংলোর নিরাপত্তায় রেখে ভয়ঙ্কর বন্যপ্রাণীটির মোকাবিলার জন্য শুধুমাত্র রুদ্রকেই ঋজুদার সঙ্গী করেছেন ('ঋজুদার সঙ্গে লবঙ্গি বনে')। ১৯৭২ সাল থেকেই যেহেতু ভারতে শিকার নিষিদ্ধ তাই সময়ের দাবি মেনেও সরাসরি শিকারের ঘটনার বদলে কখনো-কখনো ঋজুদার মুখে তার অতীত শিকার-কাহিনি শুনিয়েছেন; রুদ্র, ভটকাইয়ের সঙ্গে উৎসাহী শ্রোতা করেছেন তিতিরকেও ('ল্যাংড়া পাহান','ঋজুদার সঙ্গে সুফ্‌কর-এ', 'জুজুমারার বাঘ')। তাই তিতির বাংলা জঙ্গল-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির অন্যতম সেরা নারী চরিত্র হয়ে উঠলেও তাকে ঠিক নারী-শিকারি বলা যায় না।

বাংলা শিশু-কিশোর শিকার-সাহিত্যে মেয়েদের উল্লেখ নিতান্তই গৌণ, তাও মূলত 'Victim' রূপে অর্থাৎ মানুষখেকো বা আক্রমণাত্মক বুনো জন্তুর হাতে মেয়েদের শিকার হবার খবর হামেশাই গল্পের পর গল্পে উল্লিখিত থাকে। কখনো-কখনো মানুষখেকোর কবল থেকে কোনও অসহায়, বিপন্ন মেয়েকে দৈবাৎ রক্ষা করে কোনও দুর্জয় সাহসী (শিকারি) পুরুষ (বন্দে আলী মিয়ার 'বাসি খেকো বাঘ', *রামধনু*)। আবার মেয়েদেরকে প্রায়ই দেখা যায় অরণ্য, অরণ্যের বাসিন্দা বন্যপ্রাণীদের নিয়ে নানা লোকায়ত বিশ্বাস, সংস্কার, কুসংস্কারের ধারক ও বাহক রূপেও। সমর সেনের 'বাঘে মহিষে' গল্পে (*রংমশাল*) শিকার করা মৃত বাঘটি গ্রামে আনার পর গ্রামের মেয়েরা তাকে খুব 'গালিগালাজ' করে কারণ বাঘিনীটি তাদের কিছু কম ক্ষতি করেনি। অনেক সময় শিকারির হাতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের বহুদিনের ত্রাস মানুষখেকোর মৃত্যু হলে পীড়িত জনজীবনের রক্ষাকর্তা বিজয়ী শিকারিকে ফুলে ও গানে সম্বর্ধনা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে দেখা যায় গ্রামের মেয়েদের। কোনো কোনো গল্পে দেখা যায় মেয়েরা (শিবশঙ্কর মিত্রের 'বেদে বাউলে'র মাধুরী কিংবা বুদ্ধদেব গুহর 'ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে'র রুদ্রর নয়না মাসী) শিকারির বীরত্ব, বেপরোয়া দুঃসাহস, বিপন্ন জনপদকে রক্ষার ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ কিংবা বলিষ্ঠ রুক্ষ বন্য পৌরুষ অথবা জীবন উদাসী নিঃসঙ্গ প্রেমিকসত্তার মিশেলে যে রোমান্টিক দুর্নিবার আবেদন তাতে স্বেচ্ছায় বারেবারে আকৃষ্ট হয়, হয় মুগ্ধবিবশ। শিকারি-নায়কের রোমান্টিক 'মাচো হিরো'র ইমেজটি গড়ে তুলতে বা তাকে মহিমান্বিত করতেই শিকার-আখ্যানে এইসব নারীদের ক্ষণিকের উপস্থিতি।

তাহলে কি বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত শিকার-সাহিত্যে মেয়েদের আর কোনও রূপেরই দর্শন মেলে না? বিশেষ কোনও ভূমিকাই কি পালন করে না তারা? মুখ্য বা প্রধান চরিত্রায়ণ রূপে কি তারা বেমালুম গরহাজির?

সেকালে ভারত বনজঙ্গল অরণ্য ও পশুপাখিতে ভরভরন্ত ছিল। অরণ্যলগ্ন গ্রামগুলিতে বন্য জন্তুর দর্শন লাভ প্রায়ই ঘটত। দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি সহাবস্থানের ফলে অরণ্যচারী উপজাতি বা অরণ্যলগ্ন গ্রামের মেয়েদেরকেও অনেক সময় নিত্য দেখতে পাওয়া বন্য হিংস্র জন্তুকে সেভাবে ভয় পেতে দেখা যেত না (চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ব্যাঘ্রচরিত', *রামধনু*)। কাজকর্ম, যাতায়াতের পথে হিংস্র বুনো জন্তুর সামনে পড়ে যাবার ঘটনাও ঘটত আকছার। এরকম আকস্মিক ভাবে ভয়ঙ্কর জানোয়ারের মুখে পড়ে সাহস, উপস্থিত বুদ্ধিবল কিংবা দৈবক্রমে মেয়েদের আত্মরক্ষায় সমর্থ হওয়ার ঘটনাও ততটা বিরল ছিল না। চারুচন্দ্রের 'ব্যাঘ্রচরিতে'ই রাতে বদ্ধঘরে বাঘের উপস্থিতি দেখে লেপমুড়ি দিয়ে নিশ্চল পড়ে থেকে ভাগ্যক্রমে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হন এক বিধবা। এরকমই আর একটি 'অদ্ভুত ঘটনা' *রামধনু* পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাঘে-মানুষে' গল্পে বর্ণিত হয়েছে। লেখক নিজেও পাঠকদের জানিয়ে দিয়েছেন ঘটনাটি 'আষাঢ়ে গল্পে'র মতো অতীব আশ্চর্য হলেও পৃথিবীতে ঘটা 'আশ্চর্য সত্য ঘটনাগুলির একটি'। উড়িষ্যার খণ্ডগিরি-উদয়গিরি অঞ্চলে বাঘের হঠাৎ আগমন ঘটলে লোকজনের চিৎকারে সবাই মুহূর্তের মধ্যে তল্লাট ছেড়ে পালায়; কিন্তু একজন ওদেশীয় মেয়েলোক পালাতে উদ্যোগী হলেও তার ছোট্ট ছেলেটিকে বাঘে ধরে ফেলে; দূর থেকে তা দেখে সবাই হায় হায় করে ওঠে; সন্তানকে বাঁচাতে মরিয়া মা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে হাতের রূপো ও কাঁসার গয়না দিয়েই বাঘের চোখের কোলে ঘা কতক বসায়; এই আঘাতে শেষ পর্যন্ত বাঘ পালায়। এখানে বাঘের হাত থেকে আত্মরক্ষার বদলে নিজ জীবন বিপন্ন করেও সন্তানকে বাঁচাতে মরিয়া মায়ের মাতৃত্বকেই মুখ্যভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা শিকার-সাহিত্যগুলিতে 'মাতৃত্ব' বৈশিষ্ট্যটি—তা পশুমাতার মাতৃত্বই হোক বা মানবীমাতার মাতৃত্ব—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। মেয়েদের শ্রেষ্ঠত্ব 'মাতৃত্বে', 'স্নেহ-বাৎসল্যপ্রেমে'—এই ধারণাটি বাঙালি লেখকদের অতীব প্রিয়। ফলে বাংলা ছোটোদের শিকার-সাহিত্যে মেয়েদের সাহস, বীরত্ব স্বাভাবিক অবস্থায় যতই গরহাজির হোক না কেন, 'মাতৃত্ব' বা মাতৃস্নেহ বাৎসল্যের টানে, 'পত্নীত্ব' বা প্রেম ভালোবাসার জোরে মেয়েরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও অনেক সময় অসম্ভব অবিশ্বাস্য কর্ম, মেয়েদের কোমল নমনীয় মেয়েলি স্বভাব-বিরুদ্ধ দুঃসাহসিক কঠিন কার্যও, মরিয়া হয়ে যে ঘটিয়ে ফেলতে পারে তার পরিচয় মাঝে মাঝে উঠে আসতে দেখা যায়। নিজের জীবন দিয়েও মেয়েরা কখনও হিংস্র জন্তু বা বাঘের মুখ থেকে সন্তানকে, কখনো বা স্বামীকে ফিরিয়ে এনে পুনর্জীবন দান করে ফেলে। শিবনাথ

শাস্ত্রীও পূর্ববর্তী *মুকুল পত্রিকায়* সুন্দরবনের এক আটপৌরে গৃহবধূর বাঘের মুখ থেকে স্বামীকে বাঁচাতে উনুনের জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে তাড়া করার আশ্চর্য সাহসিকতার গল্প শুনিয়েছিলেন। ঠিক তেমনি পরবর্তীকালে লীলা মজুমদারের—'দুই মা' গল্পে দেখা যায় কালো বাঘ প্রধানের পাঁচ মাসের ছেলেকে গায়ে জড়ানো কাঁথা শুদ্ধু তুলে নিয়ে ছুটলে পেছন পেছন প্রধানের বউ চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে মরিয়া হয়ে ছুটে যায়। সুতরাং শুধু 'বাঘে মানুষে' গল্পটিতেই নয়, নিজ জীবনের বিন্দুমাত্র মায়া না করে স্বামীসন্তানকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টায় শিকারি-জন্তুর বিরুদ্ধে মেয়েদের দুর্জয় বিক্রমের আখ্যানধারাটি সমগ্র বিশ শতকের বাংলা ছোটোদের শিকার-সাহিত্যেই মাঝে মাঝে উঠে এসেছে।

'বাঘে মানুষে' গল্পটিতে দেশীয় এক নারীর আকস্মিক বিপদে পড়ে মাতৃত্বের টানে ভয়ানক বাঘের সঙ্গে মরিয়া লড়াই-এর উল্লিখিত আখ্যানটির পাশাপাশি বিদেশি এক নারীশিকারির আহত চিতাবাঘের সন্ধানে গিয়ে বাঘে মানুষে জীবনমরণ লড়াই-এর আখ্যানটিও সুচারুভাবে তুলে ধরা হয়েছে। 'গোঁয়ার গোবিন্দ' মেজাজের আফ্রিকার চিতাবাঘের সঙ্গে মেমসাহেব শিকারির এই 'খুব গুরুতর ও মারাত্মক রকমের' লড়াই এর ঘটনাটি ইংরেজি মাসিক কাগজে পড়ে 'বাঘে মানুষের' অজ্ঞাতনামা গল্পকার তা *রামধনু*-র খুদে পাঠকদের শুনিয়েছেন। শখ বা ক্রীড়াবিনোদন রূপে নয় মূলত প্রয়োজনের তাগিদেই, স্বামীর সঙ্গে আফ্রিকায় আগত মেমসাহেব শিকারে সক্ষম ও অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। কেননা আফ্রিকায় তাদের আস্তানার আশেপাশে 'সিঙ্গি মামারা প্রায়ই হাওয়া খেয়ে বেড়াতেন' ও রাতবিরেতে ছাগল ভেড়া টেনে নিয়ে যেতেও কসুর করতেন না। ফলে পাল্টা জবাবে সাহেব মেম উভয়েই বন্দুকের গুলিতে দু-চারটেকে সাবাড় করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। একরাতে বাড়ির সামনে পাতা ফাঁদ ভেঙে পালানো ক্ষতবিক্ষত জন্তুর পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যায় তা সিঙ্গি নয় 'চিতা'। ভোরে সাহেব এক কাফ্রি ছোকরা চাকরকে নিয়ে রক্তের ছাপ ধরে চিতার সন্ধানে বন্দুক কাঁধে বেরিয়ে পড়েন। সাংঘাতিক আহত চিতার পিছু পিছু যাওয়া বড় নিরাপদ কাজ নয় বলে, সাহেব মেমসাহেবকে না গিয়ে ঘরেই থাকতে বলে যান। কিন্তু 'এত বড় একটা অ্যাডভেঞ্চার সুযোগ মাঠে মারা' যেতে বসেছে ভেবে মেমসাহেবের মনটা খচ্‌খচ্ করতে থাকে। দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে খানিক উসখুস করে তিনিও শিকার পোশাকে বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়েন। অবশ্য বন্দুক নিয়ে মেমসাহেবের অ্যাডভেঞ্চার ও চিতা শিকারের ইচ্ছে অবিলম্বেই ব্যর্থ হয়। কারণ তিনি বেশি দূর না এগোতেই যখন আহত চিতা চোখাচোখি হওয়া মাত্রই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তিনি বন্দুক তুললেও ভয়ের চোটে বন্দুকে গুলি

ভরতে যান ভুলে। শুরু হয় মাটিতে জড়াজড়ি করে চিতা ও মেমসাহেবের সাঙ্ঘাতিক জীবনমরণ লড়াই।

> মেমসাহেব বুঝেছিলেন তাঁকে বাঁচতে হলে ভয় জিনিসটাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়ে সমানে চিতার সঙ্গে লড়াই চালাতে হবে। সেই ফাঁকে তাঁর চিৎকারের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে যদি সাহেব কাফ্রিছোকরাকে নিয়ে এসে পড়তে পারেন তবেই যা বাঁচবার ক্ষীণ আশা।[১১]

শিকারের টুপির জন্য মেমের মাথায় দাঁত বসাতে না পেরে চিতা মাথা উঠাতেই তৎক্ষণাৎ মেমসাহেব দুহাতে সজোরে চিতার দুকান ধরে তাকে ঠেলে ফেলে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন; কখনও দুহাতে চিতার গলা টিপে ধরবার চেষ্টা চালান। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ জঙ্গলের বেড়াজাল ভেদ করে দৈবক্রমে কাফ্রি চাকরের প্রখর দৃষ্টিতে পড়ে যাওয়ায় কাফ্রি চাকর ও সাহেব ঘটনাস্থলে এসে পড়েন। শ্বাসরোধকারী তীব্র উত্তেজনাময় ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের মধ্যে কাফ্রি চাকরের উপস্থিত বুদ্ধিতে সাহেবের গুলিতে চিতার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হওয়ায় মেমসাহেব সে যাত্রা রক্ষা পান।

গল্পটিতে যদি বা 'নারী শিকারি'র বিরলতম সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু তাঁর বিচক্ষণতা, শিকার দক্ষতা বা নৈপুণ্যের সেভাবে কোনও পরিচয় থাকে না। বরং স্বামীর নিষেধাজ্ঞা না মেনে শিকার অ্যাডভেঞ্চারের লোভে বেরিয়ে মেমসাহেব অচিরেই কীভাবে প্রাণান্তক বিপদে পড়ে যান তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। চিতা শিকার করতে গিয়ে মেমসাহেব নিজেই চিতার শিকারে প্রায় পরিণত হচ্ছিলেন; শিকার-অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দ উপভোগের বদলে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত দেহে বেশ কয়েকদিন হাসপাতালের শয্যায় কাটাতে হয়। মেমসাহেবের ভয়কে জয় করে চিতার সঙ্গে জীবনপণ ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের রুদ্ধশ্বাস বর্ণনা গল্পটিতে আছে ঠিকই, কিন্তু গল্পকার একথাও জানাতে ভুলেন না যে, 'বাঘের চেষ্টা ব্যর্থ হয়—মেমসাহেবের পাল্টা আক্রমণে নয়, দৈবের ব্যাপারে।'[১২] শেষপর্যন্ত বিপন্ন নারী শিকারিটিকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে দৈবক্রমে রক্ষা করেন দুই পুরুষ-শিকারি—সাহেব ও কাফ্রি চাকর।

মেয়েরা শিকারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেও বহুক্ষেত্রেই তাদের শিকার ব্যর্থ হত; মেয়েদের শিকার অভিযানে উপস্থিতি কখনো-কখনো সঙ্গের পুরুষ শিকারি ও স্থানীয় ভৃত্যদের কাছে মেয়েদের নিরাপত্তার স্বার্থে অত্যন্ত দায়িত্বশীল চাপের হয়ে উঠত। পুরুষ শিকারি বা স্থানীয় ভৃত্যরা অত্যন্ত শিকারদক্ষ হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই শিকার অভিযানগুলিতে সফলতা আসত না, কারণ প্রিয় নারীটির

বা প্রভুপত্নীর গুলি বা আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকলে তারা ইচ্ছে মতো গুলি চালাতে পারত না; এমনকি মেয়েদের বা প্রভুপত্নী বা মেমসাহেবের নিরাপত্তার জন্য তারা নিজেরাও কখনো-সখনো চূড়ান্ত বিপদ বা মৃত্যুমুখে পড়ে যেত—এধরনের ঘটনা সে যুগের মেয়েদের নিজেদেরই লেখা শিকার অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ স্মৃতিকথাগুলিতে মাঝেমাঝে উঠে আসতে দেখা যায়। 'বাঘে মানুষে' গল্পটিতেও স্ত্রীর গায়ে গুলি লাগার ভয়ে সাহেব গুলি করতে মোটেই ভরসা না পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। কিন্তু চিতা থাবার ঘায়ে মেমসাহেবের ঊরু থেকে হাঁটু পর্যন্ত মাংস চিরে ফেললে সাহেব আর স্থির থাকতে না পেরে বন্দুক ফেলে শুধু হাতেই চিতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হন। অভিজ্ঞ কাফ্রি ছোকরাও প্রভুপত্নীকে বাঁচাতে নিজের জীবন বিপন্ন করে পেছন থেকে চিতার কান দুটো চেপে ধরে চিতাকে মেমের উপর থেকে নামাতে চেষ্টা করে। চিত্ত ঘোষালের 'শয়তানের থাবা' (*শিশুসাথী,* ১৩৭৩) গল্পেও নৈনিতালের ফরেস্ট অফিসারের কিশোরী মেয়ে জোয়ান মাছ ধরতে গিয়ে নরখাদক বাঘের সামনে পড়লে সঙ্গী ভৃত্য অভিজ্ঞ গোবিন্দ সিং নিজের জীবন উৎসর্গ করেও জোয়ানকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিতে চায়। এখানে জোয়ানও অবশ্য বাবার বিশ্বস্ত কর্মচারী আহত বৃদ্ধ মানুষটিকে বাঘের মুখে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে কোনও মতেই পালিয়ে যেতে পারে না। নির্ভীক পদক্ষেপে ফিরে এসে নিজের জীবন বিপন্ন করেও সে গোবিন্দ সিং-কে আক্রমণোদ্যত বাঘের সম্মুখীন হয়। সৌভাগ্য ক্রমে তার অনভ্যস্ত হাতের গুলিতে বাঘ মারা যায়। গল্পটিতে নারী-শিকারির শিকার-নৈপুণ্যের বদলে প্রভু ও ভৃত্য উভয়েরই পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা-শ্রদ্ধা-দায়িত্ব-বিশ্বস্ততা-কৃতজ্ঞতাই প্রাধান্য পেয়েছে।

উল্টোদিকে বুদ্ধদেব গুহ 'নিনিকুমারীর বাঘ' (আনন্দমেলা) উপন্যাসে দেখিয়েছেন কীভাবে ওড়িশার সান্বপানির রাজকুমারী নিনিকুমারী শিকারের শখের বশে বাঘকে মানুষখেকো করে তুলে সান্বপানির প্রজাদের জীবন দুর্বিষহ করে দিয়ে যান। ভারতবর্ষের রাজপরিবার ও তাদের নকলনবিশ জায়গিরদার, জমিদার পরিবারগুলিতে রেওয়াজ বা ট্রাডিশন হয়ে ওঠে রাজকুমারদের মতো রাজকুমারীরাও বারো-তের বছর বয়স হলেই তাদের প্রথম বাঘটি শিকার করবেন। ওড়িশার ছোট্ট অখ্যাত রাজ্য সান্বপানির ছোটো রাজকুমারী নিনিকুমারীরও হঠাৎ খেয়াল চাপে তিনি বাপের বাড়ির খাসজঙ্গলে বাঘ শিকার করবেন। তবে 'নিনিকুমারীর বাঘ'টি তার প্রথম বাঘ নয়, শেষ বাঘ। মৃত্যুর পূর্বে আশি বছর বয়সে নিনিকুমারীর বাঘ শিকার আকাঙ্ক্ষার পেছনে

ক্রিয়াশীল রাজ-পরিবারের ট্রাডিশন ও রাজকুমারীর নিজেকে 'আদৌ বুড়ি হননি' প্রমাণের তাগিদ। সারা দেশেই তখন শিকার বে-আইনি হলেও রাজারানিদের ক্ষেত্রে তা খাটে না, ফলে বাঘ শিকারের বন্দোবস্ত হয়। হাঁকা শুরু হতেই তাড়া খেয়ে বাঘ শিকারিদের পরিকল্পনা মাফিক নিনিকুমারীর মাচার দিকেই যায়। নিনিকুমারীও বাঘ আসা মাত্রই গুড়ুম করে গুলি করেন। বাঘ প্রচণ্ড গর্জন করে পেছনের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঢুকে যায়। হাতে ডাবল-ব্যারেল রাইফেল থাকা সত্ত্বেও রাজকুমারী আর গুলি করেন না। 'সিল্কের ওয়াড-পরানো ডানলোপিলোর গদিমোড়া' মাচা থেকে নেমে 'বাইফোকাল চশমাটি খুলে সুগন্ধী সিল্ক রুমালে কাচ মুছতে মুছতে' সুনিশ্চিতভাবে ঘোষণা করেন বাঘের হার্টে গুলি লেগেছে। রক্তের রকম ও পরিমাণ দেখে অভিজ্ঞ শিকারিরা বোঝেন গুলি বাঘের গা ছুঁয়ে গেছে, নয়ত থাবা বা কব্জিতে লেগেছে। কিন্তু রাজকুমারী বাঘের রক্তের দাগ দেখে বাঘকে অনুসরণ করতে শিকারিদের নিষেধ করেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা তাঁর গুলিতে বাঘ মরে পড়ে থাকবে। কাল মোষ নিয়ে গিয়ে মৃত বাঘকে রাজবাড়িতে নিয়ে এলে মিলবে বখশিশ। সেই 'খণ্ডিয়া' (আহত) বাঘই কব্জি ভেঙে যাওয়ায় শিকার ধরায় অক্ষম হয়ে মানুষখেকো হয়ে ওঠে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে সে সান্বপানি রাজ্যের সাধারণ অসহায় মানুষদের সমানে খেয়ে চলে। রাজকুমারী নিনিকুমারীর শৌখিন শিকার-বিলাসের বলি হয় সান্বপানির বনের প্রজা বাঘটি; আর আত্মগর্বিত রাজকুমারীর শিকারের খামখেয়াল ও অদূরদর্শিতার ফলে বাঘের বলি হয় সান্বপানির অগণ্য গরিব, সর্বংসহ, বোবা মানুষ-প্রজারাও।

ঔপনিবেশিক ভারতে মেমসাহেব, রাজপরিবারের মেয়েদের ও উপজাতি গোষ্ঠীর মেয়েদের শিকারের এমনকি 'Big Game'-এর হিংস্র পশু শিকারের পারদর্শিতার কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। কিন্তু ভারতের সাধারণ মেয়েরা বিশেষত বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা শিকার-ক্রীড়া থেকে বাস্তবে ছিল বহুযোজন দূরেই। সিপাহি বিদ্রোহের পর মেমসাহেবরা যেমন আত্মরক্ষার স্বার্থে হাতে বন্দুক তুলে নেন, তেমনি ভারতের মুক্তি সংগ্রামের কালপর্বে সহিংস বা সশস্ত্র বিপ্লবী মতাদর্শে বিশ্বাসী বাঙালি মেয়েদেরও কাউকে কাউকে নিজ হাতে পিস্তল রিভলভার তুলে নিতে দেখা যায়; বন্দুকের লক্ষ্যভেদে পারদর্শিতা লাভের জন্য তারা মাঝে মাঝে পাখি শিকার করতেন।[১৩] তবে তাদের মূল উদ্দেশ্য জন্তুজানোয়ার শিকার নয়, দেশের স্বার্থে অত্যাচারী বিদেশি শাসকদের হত্যার উদ্দেশ্যে বন্দুকের অভ্যাস করা। সত্য ঘটনা নির্ভর শিকার কাহিনিতে বাস্তবতার খাতিরে সম্ভব না হলেও, মনগড়া কাল্পনিক শিকার

কাহিনিতেও কিন্তু বাঙালি মেয়েদের বন্দুক রাইফেল হাতে শিকারি-বীরাঙ্গনার মূর্তিতে উপস্থাপিত করা বাঙালি শিশু-কিশোর সাহিত্যিকদের সম্ভবত মনঃপূত হয়নি। ব্রিটিশ যুগে যতই 'hunting is an art or sport and is not the something as murder' বলা হোক না কেন, শিকার ক্রিয়াটির সঙ্গে অনিবার্য ভাবে অঙ্গাঙ্গিক যুক্ত থাকে একটি রক্তাক্ত হত্যা বা হত্যার চেষ্টা; কখনও তা পশুপাখির হত্যা, কখনো বা শিকারির মৃত্যুর ঘটনা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হত্যা চেষ্টা সফল হয়, কেনো কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে ব্যর্থও। বহু ক্ষেত্রেই পশুপাখির এই হত্যা হয় নিরপরাধ খুন। আর মাঝে মাঝে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষখেকো বা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার অপরাধের জন্য পশুটির ক্ষেত্রে মানুষের দ্বারা নির্ধারিত হয় চূড়ান্ত শাস্তি—হত্যা। ফলে শিকারে পারদর্শিতার ক্ষেত্রে লক্ষ্যভেদ (Shooting) নৈপুণ্যের পাশাপাশি শিকারির শারীরিক মানসিক দৃঢ়তা, আশ্চর্য নির্লিপ্ততা ও স্নায়বিক কাঠিন্য একান্তই আবশ্যক হয়। আর এজন্যই সম্ভবত বাংলা সত্য বা মনগড়া শিকার কাহিনিতে—এমনকি মেয়েদের (সুখলতা রাও, শান্তা দেবী, আশা দেবী, চারুলতা দেবী, লীলা মজুমদার প্রমুখদের) লেখা যে অল্প কয়েকটি শিকার কাহিনি বা শিকারের গল্প পাওয়া যাচ্ছে তাতেও—মেয়েরা শিকারিরূপে প্রায় অনুপস্থিত। মেয়েদের নিষ্ঠুর, হিংস্র, কঠোর হৃদয় শিকারির বদলে তাদের দয়া-মায়া-প্রেম-স্নেহ-বাৎসল্য-করুণা-ক্ষমার কোমল মূর্তিটিকেই শিশু-কিশোর মানসে জারি রাখতে বাঙালি শিকার-সাহিত্য লিখিয়েরা অধিক সচেষ্ট হয়েছেন। ফলে মেয়েদের মেয়েলি সহজাত বৈশিষ্ট্য বা গুণগুলিকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে, তাঁরা বাংলা ছোটোদের শিকার কাহিনিগুলিতে একটি অন্যরকম বিকল্প ধারারও সংযোজন করেছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সঙ্কর্ষণ রায়ের 'বন্যরা বনে' গল্পটি (১৯৫৭ খ্রি.) বা পরে *কিশোর ভারতী*তে প্রকাশিত 'বনে যারা থাকে' সিরিজের প্রথম গল্প 'টেংনীর চিতাবাঘ' (১৩৮০ ব. বা ১৯৭৩ খ্রি.)। কথক যখন মধ্যপ্রদেশের চিরিমিরির জঙ্গলে কয়লার স্তর সন্ধানরত ছিলেন, তখন গাইড দৌলতদের গ্রামে উপদ্রবকারী চিতাবাঘ মুখিয়ার দুধেলা গাইটাকেও মেরে ফেললে দৌলতের অনুরোধে গ্রামের অন্যান্য গরু ছাগলকে বাঁচাতে সহকর্মী গোপীনের সঙ্গে কথকও চিতাবাঘ শিকারে যান। গরুর অভুক্ত অবশিষ্ট লাশের কাছে বীজাগাছের মাথায় বাঁধা মাচানে তিনজন চিতাবাঘের আগমনের অপেক্ষা করতে থাকেন। কৃষ্ণপক্ষের রাতের আঁধারের মধ্যে স্পটলাইটের আলোর ঝাঁটা বুলোতে বুলোতে দৌলত হঠাৎই নড়ে ওঠা কুর্চিলতার ঝোপের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেমে যায়। ঝোপের আড়াল থেকে গরুর মৃতদেহের

দিকে ছুটন্ত ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করে গোপীন রাইফেল উঁচালে কম্পিত দৌলত আর্তস্বরে বাধা দেয়। কারণ 'ও চিতাবাঘ নয়'। ও যে দৌলতেরই মা হারা বারো-তেরো বছরের জেদি একরোখা মেয়ে রগ্‌গী। রগ্‌গীকে মৃত গরুর পা ধরে টানতে দেখে তিনজনেই তারা বিস্মিত ও হতবাক হয়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তেই ওপাশের ঝোপ পুনরায় নড়ে উঠলে মেয়ের আশঙ্কায় ভীত কম্পিত দৌলতের আলো ফেলার ক্ষমতা লোপ পায়। আলোর অপেক্ষা না করেই গোপীনের রাইফেল গর্জে ওঠে। গুলির সঙ্গে চিতাবাঘের গর্জন ও কিছু পতনের শব্দ শোনা যায়। পরে লাইটে দেখা যায় রগ্‌গীর একদম কাছেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বিশাল আকারের চিতাবাঘের রক্তাক্ত নিঃস্পন্দ দেহ। মেয়ের জান বাঁচানোয় গদগদ দৌলতের হুজুরের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ থাকে না। কিন্তু ভাগ্যজোরে বেঁচে যাওয়া রগ্‌গী পিতাকে ঠেলে সরিয়ে কথকদের দিকে ছুটে আসে; কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে রাইফেলধারী গোপীনের মুখের পানে অগ্নিদৃষ্টি হেনে রগ্‌গী চিতাবাঘটাকে মারার জন্য কৈফিয়ৎ চায় :

> কেন মারলে?—কান্নায় কাঁপানো স্বরে বললে রগ্‌গী—কী করেছিল ও তোমার! ...ক্ষিদে পেলে জানোয়ার মেরে ও খাবেই—ও তো আর আমাদের মত ডাল-ভাত-রুটি খেয়ে থাকতে পারবে না...তাই বলে ওকে মেরে ফেলবে?[১৪]

রাত দুপুরে একাকী রগ্‌গীর গরুর মৃতদেহ ধরে টানার অদ্ভুত আচরণের রহস্য উন্মোচিত হলে কথক, গোপীন, রগ্‌গীর বাবা দৌলতের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদেরও পুরোপুরি চমকে যেতে হয়। শিকারিরা যাতে চিতাবাঘটির নাগাল না পায় এজন্য ভুক্তাবশিষ্ট গরুর লাশ-টাকেই রগ্‌গী সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল নালার ধারের গুহায়—চিতাবাঘের দিনের বেলার লুকিয়ে থাকার আস্তানায়। গোপীন চিতাবাঘের জোড়া বা অন্য আরও চিতাবাঘ থাকলে তাদের সন্ধানে গুহাটা চিনিয়ে দিতে সাধ্য সাধনা করলেও রগ্‌গী কিছুতেই রাজি হয় না,

> না না কক্ষনো না।—রগ্‌গী চিৎকার করে উঠল—আমি কক্ষনো তোমাদের ঐ গুহাটা দেখাব না...আচ্ছা বাবু, ভগবান তো তোমার আমার মত ওদেরও প্রাণ দিয়েছেন...ওদের মেরে ফেলা কী পাপ নয়?[১৫]

চিতা তো আর বোঝে না গরুর লাশটাকে রগ্‌গী তার জন্যই তার আস্তানার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, ফলে চিতাটা হয়তো রগ্‌গীর উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ত—মৃদু হেসে গোপীন বোঝাতে চাইলেও রগ্‌গী তার নিজ বিশ্বাসে ও ভালোবাসায় থাকল অটুট 'না না কক্ষনো না—রগ্‌গী কাঁদতে কাঁদতে বললে ও আমাকে চিনত...ওর আস্তানার কাছে

কতবার গিয়েছি আমি, ও আমাকে কিছু বলেনি।'[১৬] রগ্‌গীর কথায় উঠে এসেছে সেই সত্য—হিংস্র বুনো জীবজন্তুও খাদ্য ও আত্মরক্ষার জন্য ছাড়া সাধারণত অকারণে হনন করে না। মানুষই অকারণে ও নির্বিচারে হত্যাস্পৃহা চরিতার্থ করে। রগ্‌গীর মধ্যে হিংস্র বুনো জন্তুর প্রতিও অসীম মমত্ব ও আন্তরিক ভালোবাসা মূর্ত হয়ে উঠেছে। আক্রমণাত্মক বা গবাদি নষ্টকারী বন্য হিংস্র জানোয়ার বিশেষত তা যদি চিতাবাঘের মতো ক্রমশ বিলুপ্ত কোনও প্রজাতির হয় তাহলে তাকে শিকার করা উচিত নাকি শিকারের বদলে রক্ষা করা বা সংরক্ষণমূলক কোনও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত? আফ্রিকা বা বিদেশ নয় আমাদের মতো দেশ ভারতে, মানুষের জীবন-জীবিকা-সম্পত্তি-নিরাপত্তা আগে, নাকি বনের পশুপাখি, কাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া দরকার?—বিশ শতকে ক্রমশ অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠা এই প্রশ্ন, যুক্তি তর্কগুলি 'বন্যরা বনে'র গল্পকার অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে সমগ্র গল্পটিতে কথক ও সুদক্ষ শিকারি গোপীনের কথোপকথনের মধ্যেও বারবার তুলে এনেছেন। গল্পে শিকার ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়েছে এমন এক চূড়ান্ত সংকট মুহূর্তে যখন গোপীন গুলি না চালালে ও চিতাবাঘটিকে একগুলিতেই মারতে সফল না হলে, চিতাবাঘটিই হয়তো রগ্‌গীকে আক্রমণ করত বা মেরে ফেলত।

শুধু রগ্‌গী নয় সঙ্কর্ষণ রায়ের 'বন্যরা বনে' (পুস্তকাকারে প্রথম সংস্করণ ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত) বা কিশোর ভারতীতে প্রকাশিত 'বনে যারা থাকে' সিরিজের চতুর্থ গল্প 'বাঘ যখন মানুষখেকো' (অক্টোবর ১৯৭৩ খ্রি.)-তে আমরা দেখা পাই আরেক আশ্চর্য নারী যুগলের স্ত্রী-র। বনে তসর গুটি কুড়োতে যাওয়া যুগলকে তার স্ত্রীর চোখের সামনেই বাঘে নেয়। গ্রাম প্রধান যুগলকেও মানুষখেকো নিলে এবার গ্রামবাসীরা বাঘটাকে শিকারের জন্য দক্ষ-শিকারি গোপীনের পায়ে কেঁদে পড়ে; কিন্তু যুগলের বউ মন প্রাণ থেকে বাঘটির শিকার চায়নি। নিতান্তই গ্রাম্য মেয়েমানুষ যুগলের বউ-এর বিচারে তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য আসল দোষী ভাল্লা সাহেব ও রাজাবাহাদুর—যারা বাঘটিকে মানুষখেকো হতে বাধ্য করেছে তারা। চিলখার স্থানীয়দের নিষেধ সত্ত্বেও কয়লাখনির চীফ ইন্সপেক্টর বহিরাগত বীরসিংহ ভাল্লা স্থানীয় ক্ষমতাশালী রাজাবাহাদুরের সহায়তায় বাঘিনীকে শিকার করেন। বাঘিনীর মৃত্যুতে বাঘটি ক্ষেপে গিয়ে মানুষখেকো হয়ে ওঠে। তাই স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হলে আগে তাদের দুজনের উপর নেওয়া উচিত বলেই মনে করে স্বামীহারা যুগলের-বউ।

বাঘের মুখে তুলে দিতে চাই আমি তাদের দুজনকে—ঝলসে উঠলো যুগলের

স্ত্রীর চোখ দুটি,—বাঘটা মানুষখেকো হল অথচ তাদের মাংসের স্বাদ পেল না, এ আমার সইছে না।[১৭]

কিন্তু বিপজ্জনক মানুষখেকো বাঁচিয়ে রাখা যায় না, তাই সেই রাতেই তাকে শিকার করতে চায় গোপীন। 'না, না, কক্ষণো না! —যুগলের স্ত্রী চিৎকার করে উঠল—ওদের দুজন আগে বাঘের পেটে যাক, তারপর মেরো তোমরা ওকে।'[১৮] শোকার্ত ক্ষিপ্ত যুগলের বউ-এর কথা অবশ্য শোনা হয় না, জোর করে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এই বাঘ শিকার রুখতে নিজের জীবন বিপন্ন করেও রাতের জঙ্গলে একাকিই ছুটে যায় যুগলের স্ত্রী;গোপীনদের প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করে। সেই মুহূর্তে হঠাৎ যুগলের বউ-এর উপরই অন্ধকার ফুঁড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রকাণ্ড বড়ো এক বাঘ। গোপীনের রাইফেলের একগুলিতেই বাঘ চোখের নিমেষে ধরাশায়ী হয়। চেতনাপ্রাপ্তির পর যুগলের স্ত্রীর কাছে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফেরার চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছে বাঘটির বাঁচা-মরা।

উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, বাঘটাকে মেরে ফেললে তোমরা।
গোপীন বললে, হ্যাঁ, নইলে বাঘটা তোমাকেই খেত। মুচকি হেসে দৌলত বললে, ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে! তার মানে?—ভুরু কুঁচকে তাকাল যুগলের স্ত্রী। —তার মানে তুমি না এলে বাঘটা আসত না এদিকে। তোমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল বলেই না তাকে রাইফেলের নাগালের মধ্যে পেয়ে গেলেন ব্যানার্জী সাহেব। বাঘটা তাহলে আমার জন্যেই মারা পড়ল—কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে যুগলের স্ত্রী!
একরকম তাই বটে। —মৃদুমন্দ হাসতে থাকে দৌলত।[১৯]

এই কথোপকথনে বাঘটি সম্পর্কে নারী ও পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিগত সূক্ষ্ম তফাৎটি সুচারুভাবে বুনে দেন লেখক। আচ্ছা, 'যুগল' নামটির মধ্য দিয়েও কি লেখক কোনও ব্যঞ্জনার ইশারা রেখে যেতে চান? ভাল্লাসাহেবের শিকার ঈপ্সা চরিতার্থে চিলখার বিখ্যাত জোড় বাঘকে হতে হয় বিজোড়। 'যুগল'-হারা হয়ে যুগলের স্ত্রী হয়তো বিজোড় বাঘটির অর্থাৎ বাঘিনী-হারা একা বাঘটির বেদনা, ক্ষিপ্ত অবস্থা, মানুষের প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহাকে অনুভব করেছিল তার নিজের অসহায় একাকিনী অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে, নিজের সমস্ত হৃদয় দিয়েই।

দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি সহাবস্থানের ফলে অরণ্যচারী উপজাতি গোষ্ঠীগুলি, অরণ্যলগ্ন গ্রামবাসীদের অনেকসময়ই অরণ্য ও অরণ্যের বন্যপ্রাণীদের

প্রতি অদ্ভুত মমত্ব ও সহানুভূতি দেখতে পাওয়া যায়। অরণ্য ও অরণ্যের গাছপালা জীবজন্তুকে রক্ষার ক্ষেত্রে এইসব গোষ্ঠীগুলির বিশেষত মেয়েদের বিশেষ ভূমিকাও থাকে। ভারতীয়দের নানা লৌকিক কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বন্য জীবজন্তু এমনকি মানুষখেকোর শিকারেও শিকারিকে সহায়তা না করা, সঠিক খবরাখবর বা সন্ধান না বলা ইত্যাদি ঘটনা ভারতের বনজঙ্গলে ঘোরা বিদেশি-দেশি উভয় শিকারিদের কলমেই বারবার উঠে এসেছে। 'বন্যরা বনে'র লেখকও সিধি ও রেওয়ার লোকেরা তাদের 'কুসংস্কার'-বশত, মহারাজা সাদা বাঘবাচ্চা মোহনকে ধরার ফলে সাংঘাতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা বা খরার সম্ভাবনায় কেমন ক্ষেপে ওঠে—তার গল্প বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রগ্গী বা যুগলের বউকে তিনি এধরনের কোনও কুসংস্কারগ্রস্ত রূপে চিত্রিত করেননি। শিক্ষিত ভদ্রলোক শখের শিকারি নিশানা-নিপুণ গোপীনের মতে আমাদের দেশ আফ্রিকা নয়; তাঁর অভিজ্ঞতায় এদেশে চিতাবাঘ মাত্রই মানুষের ক্ষতি করে, তাই তার উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাকে মেরে না ফেলে কোনও উপায় নেই। কিন্তু শিকারি-গোপীনের থেকে এমনকি নিজের বাবা গাইড দৌলতের থেকেও সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করে চিরিমিরির অরণ্যলগ্ন গাঁয়ের মেয়ে মাত্র দশবারো বছরের রগ্গী। খাদ্য-খাদক সম্পর্কের স্বাভাবিক নীতিতেই চিতাবাঘটি ক্ষুধার তাড়নায় মুখিয়ার দুধেল গাইটাকে মেরেছে বলে সে ভালোই জানে ও বোঝে। এই অপরাধে চিতাবাঘটিকে একেবারে মেরেই ফেলা হোক—মানতে পারেনি সে। খাদ্য ও আত্মরক্ষার তাগিদ কিংবা বিশেষ কোনও কারণ ছাড়া শিকারের হিংসালীলায় সাধারণত মাতে না বনের হিংস্র জানোয়ার। মানুষই বরং শিকারের আমোদ কিংবা যশ প্রাপ্তির নেশায় নির্বিচারে বন্যপ্রাণীর হননকার্যে লিপ্ত হয়। চিতাবাঘটির আস্তানার কাছ দিয়ে বহুবার গেলেও আক্রমণ, তাড়া করা বা কোনও বিপদে না পড়ার অভিজ্ঞতা ছিল রগ্গীর। অন্যদিকে চিলখার জোড়াবাঘের একটির দিকেও শিকারিরা নজর দিলে যুগলের বউদের গ্রামের লোকেরা ক্ষেপে উঠত। বাইরের জগতের মানুষদের কাছে খুবই অদ্ভুত শোনালেও তারা বাঘের বাসার কাছে বাস করতে একটুও ভয় পেত না, উল্টে বাঘ দুটোর কাছাকাছি বলেই তারা নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে বাস করত। কারণ বাঘ দুটোর জন্যই তাদের গ্রামে কখনও চোর-ডাকাত, চিতাবাঘ, ভালুক ও বুনোশুয়োরের উপদ্রব থাকেনি। ক্ষমতার জোরে নিছক শিকার ক্রীড়ার বিনোদন লাভের জন্য বাঘিনীকে মেরে বাঘটিকে মানুষখেকো বানিয়েছিল যে শিকারিদ্বয় তারাও যেন ঐ মানুষখেকো

বাঘেরই শিকার হয়—এটাই চায় মৃত গ্রাম-মুখিয়ার স্ত্রী। যুগলের স্ত্রীর ধারণা, তবেই বাঘের হাতে তার স্বামীর মৃত্যুর সঠিক ও ন্যায্য প্রতিশোধ হবে। মাতৃহারা কিশোরী রগ্‌গী বা স্বামীকে বাঘের হাতে হারানো যুগলের স্ত্রী তাদের অব্যক্ত দুঃখ, বেদনা, একাকিত্ব, অসহায়তার সঙ্গে কোথাও যেন হয়তো বনের হিংস্র পশুকেও এক করে দেখেছে; তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ করেছে, অনুভব করেছে সহানুভূতি, সহমর্মিতা। শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হলেও নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করেও তারা একাকীই শিকার রধ করতে সচেষ্ট হয়েছে।

রগ্‌গী ও যুগলের স্ত্রীর সূত্রে আমাদের মনে পড়তে পারে পরবর্তীকালে লীলা মজুমদারের লেখা 'কুঁকড়ো' গল্পের (*কাগ নয়*, ১৯৮১ খ্রি. / *বোধন বার্ষিকী*, ১৯৮২) কুমুকে। শীতকালে খিদের চোটে বন থেকে নামা শিয়ালে কাঠগুদাম ঘর থেকে কুমুর অত্যন্ত প্রিয় সাদা মোরগ কুঁকড়োকে নেয়; পড়ে থাকে শুধু ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। তিরধনুকে মারা পড়া কয়েকটা শেয়ালের দেহ গাছে ঝুলিয়ে গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাই যখন প্রতিশোধের আনন্দে মাতে, তখন মজা দেখতে কুমুও যায় ঠিকই, ছোটোদের মতো একটা ঢিলও ছোঁড়ে কিন্তু পরক্ষণেই মরা শেয়ালের ঝোলা জিভ, উল্টানো চোখ নজরে পড়তেই ছুটে বাড়ি ফেরে; আগের বারের মতো বমি না করলেও কেঁদে ভাসায়। মোড়লের হুকুমে গাঁ সুদ্ধু সবাই খুশি মনে যেদিন শিয়াল শিকারে নামে, সেই সন্ধ্যেতে কুমু যখন বাড়িতে একা তখন পেটে দুটো তির বেঁধা রক্তাক্ত কী একটা সাদা জানোয়ার 'মাটিতে গা ঘষটাতে ঘষটাতে লাল চোখ দিয়ে জল ফেলতে ফেলতে' এসে, লোকের হল্লায় কাঠগুদামের খোলা দরজা দিয়ে কোনও মতে গুদামঘরে ঢুকে পড়ে। দেখে কুমুর বুক ঢিপঢিপ, গলা শুকিয়ে কাঠ। কিন্তু তবুও কুমু দ্রুত একটা আশ্চর্য কাণ্ড করে বসে—গুদামের দরজা বন্ধ করে বাইরের থেকে শেকল তুলে যে দু-ফোঁটা রক্ত পড়েছিল তাতে মাটি ছড়িয়ে দেয়। ফলে শিয়ালের খোঁজে বাবা কাকা এসেও চুপচাপ বাড়ি ও ঘুমন্ত কুমুকে দেখে অন্যত্র চলে যান। পরদিন সকালে মা কাঠগুদামের দরজা খুলতেই দেখা যায় দরজার সামনে সাদা মা-শেয়াল মরে পড়ে; তার কোল ঘেঁষে জড়োসড়ো বসা এতটুকু সাদা বাচ্চাটাকে কুমু পরম যত্নে বুকে তুলে নিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। শেয়াল শিকারের কথা শুনে আসা খবর কাগজের লোকেদের মধ্যে একজন অত্যন্ত দামি, দুর্লভ সাদা শেয়াল মারা হয়েছে দেখে দুঃখের সঙ্গে বুঝিয়ে বলেন 'আহা! ...এ জানোয়ার কি মারতে হয় কখনও?'[২০] কাকার কথায় বক্তার আসল পরিচয়—'পশু-সংরক্ষণের লোক—যারা নাকি জানোয়ার বাঁচায়, মারে না'[২১]—শুনতে পেয়ে কুমু সবাইকে

অবাক করে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে আসে। সেই লোকটির কোলে বাচ্চাটা দিয়ে বলে 'ওর নাম কুঁকড়ো। ওকে বাঁচাও, মেরো না।'[২২]

কুঁকড়ো তো ছিল কুমুর হলদু ঝকঝকে পা, লাল ঝুঁটি সাদা মোরগ। আর এতো একটা শেয়াল ছানা! যদিও গায়ের রঙ প্রায় সাদা। আসলে কুমুর শেয়াল ছানাটাকে 'কুঁকড়ো' নামকরণেই বোঝা যায়, কুমুর অনুভূতিতে তার মৃত মোরগ ও মা মরা শেয়াল ছানাটির মধ্যে আর কোনও তফাৎ নেই। কুমু দেখেছিল তির বেঁধা মা-শেয়ালটার থেকে পড়া রক্তের ফোঁটা ঠিক কুঁকড়োর রক্তেরই মতো। কুমুর কুঁকড়োকে ছিনিয়ে নিয়েছে যে শেয়ালেরা সেই শিয়ালদের শিকারের জন্য গ্রামবাসীদের বিকট হইহই দূর থেকে ভেসে এলে প্রতিহিংসায় 'শেয়ালের পাল এবার মজা বুঝছে। বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে'[২৩] এমনটাই ভেবেছিল কুমু। কিন্তু চোখের সামনে আহত রক্তাক্ত সাদা শেয়ালকে গোঙাতে গোঙাতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখে পূর্ব মুহূর্তের সেই প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ স্পৃহাকে ধরে রাখতে পারেনি কুমু। প্রতিহিংসাকে পরাজিত করে কুমুর মধ্যে দয়া-মায়া-ক্ষমা-করুণারই জয় হয়েছে। কুঁকড়োর ঘাতক শেয়ালকেও কুমু শিয়াল শিকারিদের হাত থেকে বাঁচাতে তার সাধ্যমত আপ্রাণ চেষ্টা করে; তিরবিদ্ধ রক্তাক্ত শেয়ালটির প্রতিও সে অনুভব করে সহানুভূতি, মায়া; পরম মমতায় মা হারা বাচ্চা শেয়ালটিকে কোলে তুলে নেয়। পূর্বে আমরা কুমুকে কাঁদতে দেখেছিলাম—'শ্যাল মল' কিন্তু কুঁকড়ো তো আর ফিরে এল না' বলে। সবাই অবাক হত 'মোরগ গেছে শ্যালের পেটে সে আবার ফিরবে কী করে'।[২৪] কিন্তু কুমু তাতে রেগে বকাবকি করত। এখন তো কুমুর কাছে কুঁকড়ো ফিরে এল, না মোরগ নয়, শেয়াল বাচ্চা কুঁকড়ো রূপে; তবুও কিন্তু কুমু স্বেচ্ছায় এই নতুন 'কুঁকড়ো' শেয়াল ছানাটিকে তুলে দিল পশুসংরক্ষকের হাতে। বাচ্চা মেয়ে হলেও কুমু সম্ভবত পূর্ব অভিজ্ঞতায় বুঝেছিল মোরগ কুঁকড়োকে সে বাঁচাতে পারেনি; কুঁকড়ো ছিল গৃহপালিত মোরগ; অন্নঘর ময়লা করা ও ভোরে স্বভাববশত ডাকাডাকি করাতেই কুঁকড়োর উপর বাড়িসুদ্ধ সবাই বিরক্ত হয়। কুমু কাঁদলেও কুঁকড়োর স্থান হয় কাঠগুদামের অন্ধকারে একাকী। গ্রামে শিয়ালের হাঁস মুরগি, সদ্যজাত পাঁঠা বাচ্চা চুরি ও তিরধনুকে কয়েকটা শেয়ালেরও মৃত্যু যত বাড়ছিল, কাঠগুদামে একা থাকা কুঁকড়োর জন্য কুমুও ততই আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়। কিন্তু বড়োরা কেউই কুমুকে পাত্তা দেয় না; কুমুর কান্নায় ঘাবড়ে শুধুমাত্র মা গ্রামবাসীদের পথ পাহারার কথা বলে কুমুকে আশ্বাস দেবার চেষ্টাটুকু করেন। সামান্য মোরগের

জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা তো ভাবাই যায় না! বড়োরা অর্থাৎ কুমুর বাড়ির কেউই ভাবেনি। ফলে ঝমরুর সতর্কবার্তা ও কুমুর আশঙ্কাই সত্য করে একরাতে কাঠগুদামের চাল ফাঁক করে কুঁকড়োকে শেয়ালে নিয়ে যায়। বনের শেয়াল যাদের উপদ্রবে গ্রামসুদ্ধ সবাই শিয়াল নিধনকার্যে খুশি মনে নামে, এমনকি প্রতিশোধস্পৃহায় মৃত শেয়ালের দেহে বাখারির খোঁচা দিয়ে বীভৎস আমোদে মাতে—সেখানে যে মা মরা শেয়ালছানাটিকে বাঁচানো অসম্ভব তা হয়তো ছোট্ট মেয়ে কুমুও বুঝে যায়। তাই কুঁকড়ো শেয়াল ছানা রূপে ফিরে এলেও কুমু নিজের সমস্ত দুঃখ বেদনা কষ্টকে চাপা দিয়ে এই নতুন 'কুঁকড়ো'কে বাঁচাতে তাকে স্বেচ্ছায় তুলে দেয় পশুসংরক্ষকের হাতে। দৌড়ে পালানোর আগে কুমুর একটাই অনুরোধ 'ওর নাম কুঁকড়ো। ওকে বাঁচাও। মেরো না।'[২৫]

জলাজঙ্গলে ভরা গ্রামবাংলায় বা অরণ্যসংলগ্ন ভারতের গ্রামগুলির অন্যতম সমস্যাই হল—খিদের তাড়নায় অনেক সময় বুনো জীবজন্তু জনপদে চলে এসে গবাদি পশুপাখি, শস্য নষ্ট করে; ফলে ক্ষতি হওয়ায় মানুষও প্রতিহিংসায় কার্যকারণ না ভেবেই তাদের তির ধনুক লাঠি কুড়ুল নিয়ে শিকারে উঠে পড়ে নামে। জনপদে চলে আসা বহু বন্যজীবকে আজও নৃশংসভাবে পিটিয়ে মারার ঘটনা ঘটে; এমনকি আইন করেও তা রদ করা যায়নি। ফলে বহু বন্য প্রজাতিই আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বা হবার বিপদ সীমার মধ্যে। এতে পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রও হচ্ছে বিঘ্নিত। তাই মানুষের পৃথিবীতে নিজেরই সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার স্বার্থে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে সচেষ্ট হওয়া উচিত। শুধুমাত্র আইন করে তা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়াতে খবরের কাগজ, বন্য প্রাণ সংরক্ষকদের ভূমিকা অবশ্যই অনস্বীকার্য। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকে সফল করতে একান্তই প্রয়োজন বন্য জীবজন্তুর প্রতি মানুষের একটু দরদ ও ভালোবাসা। আশ্চর্য লাগে লীলা মজুমদার 'কুঁকড়ো' গল্পের কুমুর মাধ্যমে কত কাল আগেই সেই বার্তাই দিতে চেয়েছেন। কুমুর মধ্য দিয়ে ছোটোদের মনে শুধু পোষা পশুপাখিই নয়, বন্যপ্রাণের প্রতি এমনকি অনিষ্ট বা উপদ্রবকারী বুনো জানোয়ারটির প্রতিও সমদর্শী ভালোবাসা, দরদ, মমতা, সহানুভূতি চারিয়ে দিতে চান কুমুর স্রষ্টা। লীলার শিলং এর ছোটোবেলার জীবনের সঙ্গে জড়িয়েছিল নানা মানবেতর প্রাণীরাও—'হিংস্র ঝুঁটিওয়ালা মোরগ, কাউই সাহেবের আদুরে বিড়াল, দুষ্টু ছাই রঙের হুলো, হিংস্র হাঁস পেরুরা, বাবার ঘোড়া কালামানিক' আর নদীর ওপারের লুমপারিং পাহাড়ের রাতে-ডাকা হুতুমপ্যাঁচা, খ্যাক খ্যাক করে হাসা খ্যাঁকশেয়াল।[২৬] খেয়াল করার 'কুঁকড়ো' গল্পে লীলা তুলে ধরেন এমন দুটি প্রাণীর কথা—মোরগ ও

শেয়াল—যাদের হত্যায় কোনও কঠোর বিধিনিষেধ বা সরকারি আইন সেভাবে ছিল না। মানুষ মোরগ পোষে মূলত খাদ্যের জন্যই। 'কুঁকড়ো' গল্পে কাকু যিনি 'এতটুকু তুলোর গুলি' কুঁকড়োকে এনে দেন, তিনিই কুঁকড়ো বড়ো হলে বলেন, 'ইস, জিবে জল আসছে যে রে কুমু, দে না আমাকে।'[২৭] এমনকি শেয়ালে কুঁকড়োকে নিলে কুমুর কান্নায় বাড়ির সবাই যখন চুপ তখনও কাকা বলেন, 'তখনই বললাম জিবে জল আসে, আমাকে দে! তা তো শুনলি না।'[২৮] শীতকালে সব ছোটো জানোয়ার লুকনো জায়গায় শীতঘুম দেয়, তাই খিদের চোটে শিয়ালের বন থেকে খাবারের সন্ধানে গ্রামে আগমন ঘটে—তা ঝমরু থেকে মোড়ল সব গ্রামবাসীরই জানা। কিন্তু তাদের গবাদি পশুপাখি মেরে ক্ষতি করায় গ্রামবাসীরা শিয়ালপালকে নিশ্চিহ্ন করতে উঠে পড়ে লাগে 'যেন একটাও বাকি না থাকে।'[২৯]

বাংলা শিকার-সাহিত্যগুলিতে বুনো হিংস্র জন্তুর কবলে প্রিয়জনকে হারিয়ে পুরুষরা সাধারণত তীব্র আক্রোশে, প্রতিহিংসায় বুনো জন্তুটির নিধনেই প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করতে চায় (বন্দে আলী মিয়ার 'বাসিখেকো বাঘে'র হারান বৈরাগী বা বুদ্ধদেব গুহর 'টাঁড়বাঘোয়া'র বাসমতীর মৃত্যুর বদলা নিতে শিকারে যেতে চাওয়া লোকটি কিংবা স্বপনবুড়োর 'বাঘ শিকারের কাহিনি'র পাগলের মতো আর্তনাদকারী মুংরা ও তাকে আশ্বাসদানকারী শিকারি অরবিন্দ গুহ)। সেখানে আশ্চর্য ব্যাপার, মেয়েরা ঘাতক বুনো জন্তুটির প্রতিও অনেকসময় বিদ্বেষ, আক্রোশ চিরকাল পুষে রাখে না। হয়তো বা নিজেদের অসহায়তার জন্যই ঘটনাটিকে মেয়েরা দুর্ঘটনা, দৈব, দুর্ভাগ্য বা নিয়তি বলে মেনে নেয়; বন-বন্য জীবজন্তু-বনের কুহকময় নেশা থেকে স্বামী সন্তানকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে চায় (শিবশঙ্কর মিত্রের 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দারে'র মা ও স্ত্রী); আবার কখনো-কখনো রগ্‌গী, যুগলের স্ত্রী বা কুমুর মতো ভারী বিস্ময়কর ভূমিকাও তারা গ্রহণ করে ফেলে।

ঘরে বাইরে মেয়েদের সামাজিক বিধিনিষেধের গণ্ডির জন্য বনে-জঙ্গেলে শিকার অভিযানের সঙ্গী বা দক্ষ শিকারি রূপে মেয়েরা সেভাবে উঠে আসেনি বাংলা ছোটোদের শিকার-সাহিত্যে। সেই সঙ্গে শিকার ক্রীড়া নিষ্ঠুর রক্তাক্ত হিংসাত্মক হওয়াতে সম্ভবত বাংলা ছোটোদের শিকার-সাহিত্য ভূমিতে মেয়েদের বিশেষত বাঙালি মেয়েদের প্রবেশ হয়েছে নৈব নৈব চ। এই কালপর্বের বাঙালি শিশু-কিশোর সাহিত্যিকরা দেশি বিদেশি ব্যতিক্রমী মেয়ে-শিকারিদের গল্প শোনাতেও তেমন আগ্রহ বোধ করেননি। বরং হিংস্র নির্দয় শিকার খেলার ঠিক বিপরীত মেরুতে মেয়েদের

কখনো-কখনো তারা হাজির করেছেন; যেখানে মেয়েরা তাদের কোমল প্রবৃত্তি ও নারীসুলভ গুণ নিয়েই হাজির; তাদের স্বভাবজ দয়া-মায়া, আবেগ-সহানুভূতি, ক্ষমা-করুণা, স্নেহ-মমত্বের দ্বারা বন্যপ্রাণের শিকারের বদলে তাদের সুরক্ষায় সচেষ্ট হয়। অরণ্যচারী বা অরণ্যলগ্ন গ্রামের মেয়েদের কাছে অরণ্য তাদের অর্থনীতির উৎস; দৈনন্দিন প্রয়োজনের একান্ত নির্ভরতার স্থান; অরণ্য থেকে জ্বালানি কাঠ, গবাদির জন্য ঘাস, শাল পাতা, রেশম গুটি, মধু, রেজিন, ছাতু, নানা ভেষজ গাছপালা, ফুল ফল ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে মেয়েরা। কখনো-কখনো এসব কাজে গিয়ে তারা বুনো হিংস্র জানোয়ারের কবলেও পড়ে; তারা বা তাদের চোখের সামনে তাদের প্রিয়জন বন্যজন্তুর শিকারেও পরিণত হয়। তবু এই মেয়েদের অরণ্য ও অরণ্যপ্রাণীদের সঙ্গে আশ্চর্য রকমের ঘনিষ্ঠতা, পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়। মেয়েরা তাদের দুঃখ কষ্ট বেদনা অসহায়তা একাকিত্বর সঙ্গে অরণ্যের বুনো জীবজন্তু গাছপালার একাত্মতা অনুভব করে। পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষপ্রধান সমাজে মেয়েরা নিজেদের অবহেলিত, অবদমিত, নিপীড়িত অসহায় অবস্থার সঙ্গে মানুষের দ্বারা অত্যাচারিত, দমিত অসহায় বন্যপ্রাণীদের সাদৃশ্য ও সাযুজ্য উপলব্ধি করে। মাঝে মাঝে মেয়েরা তাদের দুঃখ কষ্ট বেদনা মুক্তির একান্ত নিজস্ব নিভৃত জগৎ গড়ে তোলে প্রকৃতি-মাতার কোলে; কখনও অরণ্য ও অরণ্যজীবী জীবজন্তুদের দেখে নিজেদের দুঃখ কষ্ট অক্ষমতাকে জয় করে বাঁচার সাহস, নতুন উদ্যমও ফিরে পায়। অরণ্যের গাছপালা, বন্যপ্রাণী এমনকি উপদ্রবকারী হিংস্র জন্তু মানুষখেকো থেকে অতিতুচ্ছ নগণ্য প্রাণীর প্রতিও তাদের অদ্ভুত মমত্ব ও দরদ দেখা যায়; এবং তারা বন্য প্রাণের সঙ্গে সহাবস্থানেই অধিক বিশ্বাসী। বন্যপ্রাণীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরুষ তথা শিকারিদের থেকে এখানে তাদের বড়োসড়ো ফারাক। কোনও রকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা হালফিলের পরিবেশ-সংরক্ষণ-বিদ্যার পাঠ ছাড়াই নিজেদের অরণ্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, হয়তো পারস্পরিক নির্ভরতার স্বার্থেই এইসব আনপড়, গ্রাম্য নারীরা অরণ্য পরিবেশ-প্রকৃতি, অরণ্যজীবী প্রাণীদের সুরক্ষায় বিশেষ যত্নশীল হয়। এই অভিজ্ঞতালব্ধ অরণ্য অভিজ্ঞান থেকেই তারা অরণ্য প্রকৃতির নানা জটিল রহস্য, বিভিন্ন গাছপালা ফুলফল গুল্ম ভেষজের গুণাগুণ কার্যকারিতা, প্রাণীজগতের স্বাভাবিক খাদ্যখাদক সম্পর্ক বা অরণ্য নীতি, বন্য পশুপাখির স্বভাব ইত্যাদি সহজেই সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে। যথেচ্ছ ভাবে অরণ্যের বৃক্ষচ্ছেদন, প্রাকৃতিক

সম্পদের অপচয়, অকারণে বা নির্বিচারে বন্য জীবজন্তুর শিকারে তাদের সমর্থন থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের মতো করে অরণ্য পরিবেশ, প্রকৃতি, বন্যপ্রাণীদের তারা রক্ষা করতে চায়। কখনো-কখনো শিকার রদ করতে তারা একাকীই শিকারিদের কঠিন প্রতিপক্ষ রূপে দাঁড়িয়ে যায়; গড়ে তুলতে চায় প্রতিরোধ; এজন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতেও পিছু পা হয় না। কখনো বা নেহাৎই বাচ্চা মেয়ে বা কিশোরী হওয়া সত্ত্বেও হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহ মমত্বের জোরে বুনো জানোয়ারের প্রতিও সহমর্মিতা অনুভব করে; বাড়িয়ে দেয় গোপন শুশ্রূষার হাত; বড়োদের চোখে ধুলো দিয়েও তাদের বাঁচাতে সচেষ্ট হয়। নিজেদের প্রতিশোধস্পৃহাকে পরাজিত করে, ব্যক্তিগত দুঃখ বেদনাকে চেপেও বন্যপ্রাণীদের সংরক্ষণে উদ্যমী পদক্ষেপ নিয়ে ফেলে মেয়েরা। শিকার নিপুণ দুর্ধর্ষ বীরাঙ্গনা এই মেয়েরা নয় ঠিকই, কিন্তু শিকারের বিপ্রতীপে অরণ্যের গাছপালা, পশুপাখিদের রক্ষার জন্য তারা যেসব জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করে ফেলে, স্বেচ্ছায় বন্যপ্রাণের সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে তাও তো কোনও অংশে কম বীরত্বের নয়। মেয়েদের মেয়েলি গুণগুলিকে প্রাধান্য দিয়েই ছোটোদের জন্য লেখা বাংলা শিকার-সাহিত্যের লিখিয়েরা গড়ে তোলেন পুরুষ-সর্বস্ব শিকার-সাহিত্যের সমান্তরাল অথবা কিছুটা বিপ্রতীপেই হয়তো এক বিকল্প বাংলা শিকার-সাহিত্য বা শিকার বিরোধী শিকার-সাহিত্য ধারা; যার প্রাসঙ্গিকতা বিশ-শতকেই ফুরিয়ে যায় না; আজও তা সমান জরুরি, বা বলা ভালো আরো বেশি করে জরুরি হয়ে উঠেছে। আর সেই সঙ্গেই আজ এই আখ্যানগুলি 'ecofeminism' বা 'প্রকৃতি নারীবাদের'[৩০] দৃষ্টিকোণ থেকেও অত্যন্ত মূল্যবান পাঠ।

তথ্যসূত্র

১. Randy Haas, 'Woman the hunter: Ancient Andean remains challenge ideas of who spread big game', accessed 2nd Feb, 2022, https://www.science.org.

২. বিখ্যাত শিকারি জগৎপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এধরনের একটি মজাদার ঘটনা শোনান ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীকে। বাঘ শিকারে অত্যন্ত আগ্রহী আসামের এক ইংরেজ গভর্নর-পত্নী গৌরীপুর শিকারপার্টিতে গিয়ে বাঘ চার্জ করলে গুলি চালিয়েই অজ্ঞান হয়ে যান। বাঘ আসলে মরে হাওদায় মেমসাহেবের পেছনে বসা জগৎপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের রাইফেলে। এদিকে জ্ঞান হারাবার সময় মেমসাহেব ভয়ে মূত্রত্যাগ করে পোশাক ভিজিয়ে ফেলেন। তাকে অপ্রস্তুত দশা থেকে উদ্ধারে জগৎপ্রসন্ন হাওদার ভেতর আছড়ে

চায়ের ফ্লাস্ক ভাঙেন। মেমসাহেব জ্ঞান ফিরলে সত্য ঘটনা চেপে গিয়ে প্রচার করা হয় মহামান্যার গুলিতেই বাঘ মরেছে। বাঘ শিকারের শখ পূরণ হওয়ায় মেমসাহেবেরও আনন্দের শেষ থাকে না। দ্রষ্টব্য গৌরব বিশ্বাস, সম্পা. বাঙালির শিকার স্মৃতি (কলকাতা : সুপ্রকাশ, ২০২৩), ১২.

৩. সফল নারী-শিকারি মিসেস বেইলিকে যেমন তাঁর চাকর-বাকর ও স্থানীয় গ্রামবাসীরা মেমসাহেবের বদলে 'সাহেব' বলেই সম্বোধন করত। দ্রষ্টব্য চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল, 'মিসেস বেইলি-র শিকার-স্মৃতির ভারত', *অনুষ্টুপ*, ৪৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা (২০১৫) : ১১০. 'honorary male' সম্পর্কে বিশদ জানতে দেখা যেতে পারে Indira Ghosh, Women Travellers of Female Gaze (Delhi : Oxford University Press, 1998), 139.

৪. Fiona Mani, 'Guns and shikaris: the rise of the sahib's hunting ethos and the fall of the subaltern poacher in British India 1750-1947', (Ph. D Thesis, History Dept., West Virginia University, 2011).

৫. চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল, 'মিসেস বেইলি-র শিকার-স্মৃতির ভারত', অনুষ্টুপ, ৪৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা (২০১৫) : ১০৭-১১০।

৬. সুনীতি দেবী, এক ভারতীয় মহারাণীর আত্মকথা, নীহার হোড়, অনু. (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০২১), ১১৯।

৭. তদেব, পৃ. ১১৯।

৮. বাংলা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে মেয়েরা প্রায় অনুপস্থিত হলেও দু-একটি ব্যতিক্রম বর্তমান। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বিমল-কুমার সিরিজের দু-তিনটি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে সাক্ষাৎ মেলে 'মৃণু' নামের দীর্ঘ ঋজু দেহ, সুন্দর-স্বাস্থ্য, সরল, ছটফটে, মিষ্টি এক গেছো-মেয়ের (টম বয়ের)। কলেজে পড়া বাঙালি মেয়ে বললে যে দুর্বলতার প্রতিমূর্তি ভেসে ওঠে, মৃণু সেরূপ নয়। *হিমালয়ের ভয়ঙ্কর* উপন্যাসে বিনয়বাবুর কন্যা মৃণুর খোঁজে গিয়ে মৃণুর অপহরণকারী হিমালয়ের-দানবদের হাতে বন্দি হয় বিমল-বিনয়বাবুরা। তখন বন্দি পুরুষ-নায়কদের অপহৃতা মৃণুই উদ্ধার করে। *সূর্যনগরীর গুপ্তধনে* অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়ার জন্য বিমলের আপত্তিকে নস্যাৎ করতে মৃণু দ্রোপদী চাঁদবিবি-লক্ষ্মীবাঈ থেকে রাশিয়া, চিনের মেয়ে যোদ্ধাদের উপমা তুলে ধরে; জানায়—সেও বন্দুক-লাঠি-ছোরা ধরতে পারে। তবু শেষপর্যন্ত অ্যাডভেঞ্চারে সামিল হতে বাবার অনুমতি আদায়ে তাকে মেয়েদের সহজাত কেঁদে ভাসাবার শাসানি-অস্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। দু-দুবার মারাত্মক বিপদে পড়ার পরও *সোনার পাহাড়ের যাত্রী*-তেও মৃণু পুনরায় অ্যাডভেঞ্চারে যেতে চায়। সত্যচরণ চক্রবর্তীর *ওঃ বাবারে* গল্পেও উপস্থিত

একটি মেয়ে—'মীরা'। অসম সাহসী নায়িকা মীরা দাক্ষিণাত্যের দুর্গম পথে একাই যায়। তবে তাকে বিপদ থেকে রক্ষার জন্য নায়ক অরবিন্দও ছদ্মবেশে তার পিছু নেয়। নারীবর্জিত বাংলা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে আরেকটি বিরলতম ব্যতিক্রম রবীন্দ্রলাল রায়ের সৃষ্ট 'ইরা'। *অভিশপ্ত* উপন্যাসে এরোপ্লেন চালানোর অ্যাডভেঞ্চারে দাদা রণজিৎ-কে ইরা সমানে পাল্লা দেয়; এরোপ্লেন বিকল হয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে আদিবাসীদের হাতে তারা বন্দি হলেও ইরার বুদ্ধির জোরেই মুক্তি পায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত দু-ভাইবোন এমনই ভয়ংকর ফাংগাসে আক্রান্ত হয় যে তারা লোকালয়ে ফিরতে পারে না। নারীর (ইরার) অ্যাডভেঞ্চারটির সমাপ্তি ঘটে অত্যন্ত করুণ দুঃখজনক পরিণতিতে যা 'মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর'।

৯. প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কলমে সৃষ্ট হয় দু-জন মেয়ে-গোয়েন্দা 'কৃষ্ণা' (প্রথম উপন্যাস 'গুপ্তঘাতক', *প্রহেলিকা সিরিজ,* দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৪২ খ্রি.) ও 'শিখা' (কুমারিকা সিরিজ, দেব সাহিত্য কুটির)। তাদের কাহিনিগুলিও ভরপুর রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারে। গোয়েন্দা কাহিনির 'ডিটেকশনে'র তুলনায় বরং অ্যাডভেঞ্চারের মাত্রাই এগুলিতে খানিক বেশি। 'বনে জঙ্গলে কৃষ্ণা' অবশ্য শিকার বা জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি নয়। মেয়ে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণার লড়াইয়ের আখ্যান।

১০. ১৯৬৩ সাল থেকে নলিনী দাশ *সন্দেশ* পত্রিকার পাতায় লেখেন 'গণ্ডালু সিরিজ'। বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এক বোর্ডিং স্কুলের চার ছাত্রী—কালু, মালু, টুলু, বুলু (অর্থাৎ এক গণ্ডা 'লু')-দের দিয়ে তিনি একের পর এক রহস্য রোমাঞ্চের সমাধান করিয়েছেন (১৩৬৮-১৩৯৯ ব.)। মূলত হারানো মণিমুক্তো, লুকনো হিরে, গুপ্তধন, বহুমূল্য দলিল, হারানো ভাইবোনকে উদ্ধার করছে তারা। কখনও বা চোর-অপরাধী-স্মাগলার, জাল নোট ছাপার দল কিংবা ভেজাল ওষুধ, খাবার তৈরির কারবারিদের ধরছে।

১১. *রামধনু*, ৫ম বর্ষ, ২৯৭।

১২. তদেব, ২৯৮।

১৩. তিনের দশকে বীণা দাস, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্তরা বন্দুক চালাতে শেখেন। বিপ্লবী অনন্ত সিংহের বড়োদিদি চট্টগ্রাম বালিকা বিভাগের মূল ক্রীড়াশিক্ষক ইন্দুমতি সিংহ প্রায় দিনই দু-একটি পাখি শিকার করতেন বন্দুকের পারদর্শিতা লাভের জন্য। দ্রষ্টব্য কণিষ্ক সরকার, সম্পা. *বাঙালি নারীর অধিকার, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন* (কলকাতা : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ২০২০), ১৩৭-১৪৯।

১৪. সঙ্কর্ষণ রায়, *বন্যরা বনে* (কলকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭) ১১।

১৫. তদেব, ১২।

১৬. তদেব, ১২।

১৭. তদেব, ২৪।

১৮. তদেব, ২৪।

১৯. তদেব, ২৮।

২০. লীলা মজুমদার, *কাগ নয়* (কলকাতা : আনন্দ, ১৯৮১), ৪১।

২১. তদেব, ৪১।

২২. তদেব, ৪১।

২৩. তদেব, ৪০।

২৪. তদেব, ৪০।

২৫. তদেব, ৪১।

২৬. প্রসাদরঞ্জন রায় (সম্পা.), *অনন্য অন্য লীলা মজুমদার* (কলকাতা : অনুষ্টুপ ২০১১), ৫৯-৬০।

২৭. *কাগ নয়*, ৩৭।

২৮. তদেব, ৪০।

২৯. তদেব, ৪০।

৩০. 'পরিবেশ বা প্রকৃতি নারীবাদ' (Ecofeminism) মতাদর্শটির মূল ভিত্তি—প্রকৃতির উপর মানুষের যে নিপীড়ন তার সঙ্গে নারীর উপর পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য ও নিপীড়নের সাযুজ্য, সংযোগ দেখান। বিশ শতকের সাত-আটের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমশ এই 'পরিবেশ নারীবাদ' ধারণাটি দানা বাঁধে। ফ্রাসোয়াঁ দ্যুবন, ক্যারেন ওয়ারেন, ভাল প্লামউড, মারে বুকচিন, জিম চেনি, বন্দনা শিবা, মারিয়া মাইজ প্রমুখ এর প্রবক্তা রূপে সুপরিচিত। তাঁদের তাত্ত্বিক অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিতে তারতম্য থাকলেও তাঁরা এই মতাদর্শে অভিন্ন যে—পুরুষতন্ত্র প্রকৃতি ও নারী উভয়কেই অধস্তন মনে করে উভয়েরই পীড়ন ও শোষণের জন্য দায়ী। আজ পুঁজিবাদ আধুনিকতার নামে প্রকৃতির বিনষ্টির দ্বারা নারীর ও প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ককে ছিন্ন করছে; প্রকৃতি নিধনের মাধ্যমে নারীকে আরও প্রান্তিক স্তরে ঠেলে দিচ্ছে। তাই 'প্রকৃতি বা পরিবেশ নারীবাদ' সমাজে নারীর ন্যায্য অধিকার ও পরিবেশ বিপর্যয় রোধে পরিবেশের সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। দ্রষ্টব্য 'Ecofeminism-an overview', https://www.sciencedirect.com কিংবা শেফালী মৈত্র, 'ইকো ফেমিনিজম', সুধীর চক্রবর্তী, সম্পা. বুদ্ধিজীবীর নোটবই (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০০৫), ৬৩-৬৪।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় শিকার-সাহিত্যের বিষয় বৈচিত্র্য

বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে শিকারকে কেন্দ্র করে স্মৃতিকথা, ডায়েরি, গল্প, উপন্যাস, ধারাবাহিক সিরিজ, প্রবন্ধ এমনকি কবিতা, নাটক, নক্সা, ব্যঙ্গ-কৌতুক, রেখাচিত্র বা কমিক্সও প্রকাশিত হতে দেখা যায় [দ্রষ্টব্য পরিশিষ্টে শিকার-সাহিত্যের তালিকাটি]। আবার এই শিকার-সাহিত্যগুলির বিষয় বৈচিত্র্যও নিঃসন্দেহেই বিস্ময়কর। বাঘ, চিতাবাঘ, চিতা, ভালুক, হাতি, বুনো মোষ, শুয়োর, হরিণ, হাতি, গণ্ডার, সিংহ, জলহস্তী, গরিলা, ক্যাঙ্গারু ইত্যাদি দেশ-বিদেশের স্থলজ প্রাণীদের শিকার কাহিনি যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি উঠে এসেছে বিভিন্ন পাখি, মাছ, তিমি মাছ, হাঙ্গর, সিল মাছ, ঘড়িয়াল, কুমির ইত্যাদির শিকারেরও কাহিনি।

বাঘ শিকারের কাহিনি

বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত দেশ-বিদেশের স্থল ও জলের বিভিন্ন প্রাণীর শিকার কাহিনির মধ্যে নিঃসন্দেহেই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে বাঘ শিকারের কাহিনি। সিংহ পশুরাজ হলেও ভারতীয় উপমহাদেশের বনগুলিতে বনের রাজা বাঘ। ভারতের গির অরণ্যে সিংহের অস্তিত্ব থাকলেও তা তুলনামূলকভাবে নগণ্য এবং মোগল আমল থেকেই সিংহ-শিকারে বাদশার অনুমতি ইত্যাদি বিধিনিষেধ ছিল। ফলে বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-কাহিনির লেখকদের সিংহ শিকারের কাহিনি রচনার জন্য পটভূমি রূপে মূলত হাজির করতে হয়েছে আফ্রিকার অরণ্য [সমর সরকারের 'সিংহ শিকার', 'মানুষখেকো সিংহ' (*রংমশাল*); অমলেন্দু সেনের 'পশুরাজের কবলে' (*রামধনু*), বীরু চট্টোপাধ্যায়ের '*সিংহ কবলিত যাত্রী-ট্রেন*' (শিশুসাথী)]। Big Game শিকারের আরেকটি প্রাণী 'হাতি' ভারতীয় উপমহাদেশে ও বাঙালি শিকারিদের বিচরণভূমি অরণ্যগুলিতে পাওয়া গেলেও, হাতিই সর্বপ্রথম প্রাণী যা ভারতের বণ্যপ্রাণ সংরক্ষণের আওতাভুক্ত হয়। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে হাতি শিকারের জন্য লাইসেন্স চালু হয়ে যায়। কেবলমাত্র খুনিয়া, শস্য ও সম্পত্তি নষ্টকারী

বিপজ্জনক ও রোগগ্রস্ত হাতি শিকারেরই লাইসেন্স বা অনুমতি মিলত। ফলে বিশ শতকের শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার কাহিনিগুলিতে হয় আফ্রিকান হাতির শিকার কাহিনি [রমেশচন্দ্র দাসের 'বুনো হাতীর কবলে' *(রামধনু)*], নয় ভারতীয় পটভূমিতে হাতি ধরা [সমর সরকারের 'হাতী ধরা' *(রংমশাল)*] কিংবা মত্ত খুনিয়া হাতির শিকার কাহিনি [ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের 'কিশোরগঞ্জের পাগলা হাতি' *(রামধনু)*, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মত্ত মাতঙ্গ' (*শুকতারা*)] উঠে এসেছে। ভারতীয় উপমহাদেশের অরণ্যগুলি যেমন বাঘের বাসস্থান ছিল, তেমনি সেকালে অরণ্যলগ্ন গ্রাম, শহরতলি, পথে-ঘাটে বাঘের হামেশাই সাক্ষাৎ মিলত। বাঘের আক্রমণে প্রতি বছর গবাদি ও মানুষের মৃত্যুও ঘটত। ঔপনিবেশিক কালপর্বে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য জমি সম্প্রসারণ ও নগরায়ণের প্রয়োজনে যখন বনজঙ্গল ব্যাপকভাবে কাটা হচ্ছিল তখন বনের হিংস্র জীবজন্তু বিশেষত বাঘকে বনচ্যুত করা অর্থাৎ নিধন করাও জরুরি হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ভিত সুদৃঢ় করতে প্রজাদের ধন ও প্রাণের সুরক্ষাদাতা আদর্শ সুশাসক রূপে নিজেদের প্রমাণের তাগিদেও ব্রিটিশ সরকার রাজপুরুষ ও আর্মি অফিসারদের যেমন বাঘ শিকারে উৎসাহিত করত তেমনি বাঘ শিকারে এমনকি বাঘের বাচ্চাদের শিকারের জন্যও সরকারি ভাবে পুরস্কার ঘোষণা করত। ভারতের অরণ্যলগ্ন অঞ্চলের মানুষরা যুগ যুগ ধরেই বাঘের সঙ্গে সহাবস্থানে অভ্যস্ত ছিল; অরণ্য ও অরণ্যের এই ভয়াল পরাক্রমশালী, রক্ষক ও ভারসাম্যরক্ষাকারী জন্তু বাঘের প্রতি তাদের একই সঙ্গে ভয় ও শ্রদ্ধা দেখা যায়। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে (অন্তত উনিশ শতকের একদম শেষ পর্যন্ত) ঔপনিবেশিক স্বার্থে বাঘ সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্য পেতে থাকে।

সিংহের চেয়ে বাঘ আকারে বড়ো ও শক্তিশালী হতে পারে; মাংসাশী হিংস্র, ধারালো দাঁত ও নখের মহাবলী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ যথেষ্ট বুদ্ধিমান প্রাণীও; বিশেষত মানুষখেকো বাঘ মানুষের গতিবিধি-স্বভাব সম্পর্কেও এতটা ওয়াকিবহাল ও চতুর হয়ে ওঠে, মানুষকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে সুযোগ বুঝে আক্রমণ করতে পারে—যে কুশাগ্র বুদ্ধিসম্পন্ন, ভীষণ ধূর্ত মূর্তিমান যমদূত মানুষখেকোকে শিকার করা যথেষ্টই বিপজ্জনক। সামান্যতম ভুল বা দুর্বলতার জন্যও বহু পোড় খাওয়া দুর্ধর্ষ জাঁদরেল শিকারিও পরিণত হয়ে যান বাঘের শিকারে। প্রতি পলে এরূপ মরণঘন ভয়ঙ্কর বিপদের ঝুঁকি থাকে বলেই বাঘ-শিকারের সঙ্গে যুগ যুগ ধরে জড়িয়ে আছে শিকারির শৌর্যবীর্য-বীরত্ব-মর্যাদার সম্পর্ক। ব্রিটিশ আমলে ঔপনিবেশিক শিকারিদের

বদান্যতায় এই ধারণাটি আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। Big Game-এর মধ্যে বাঘ শিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ Sports ও Trophy Hunting-এর মর্যাদা পায়। ভারতীয় অরণ্যের এই মহাপরাক্রমশালী জন্তুটিকে পদাতন করা ব্রিটিশদের অনেকের কাছেই ছিল পরাধীন ভারতীয়দের সামনে ঔপনিবেশিক শক্তি, ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রকাশেরই নামান্তর। ঠিক উল্টোদিকে পরাধীন ভারতীয়দের কাছেও শৌর্যবীর্য ও অনুপ্রেরণার প্রতীক ছিল বাঘ। এর সাক্ষ্য রূপে তুলে ধরা যায়— 'শের-ই-মহীশূর' টিপু সুলতানের পতাকায় কানাড়ী ভাষায় লেখা 'বাঘই ঈশ্বর' উদ্ধৃতির বা দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধের সেনাপতি হেক্টর মুনরোর পুত্রের সুন্দরবনে বাঘ শিকারকালে নিহত হবার সংবাদ শুনে টিপুর নির্মাণ করানো বাঘ-খেলনাটির (Tipu's Tiger) কথা।[১] পরবর্তীকালে আজাদ হিন্দ ফৌজের পতাকাতেও ব্যবহৃত হয় বাঘের চিত্র। ভারতীয় রাজরাজড়াদের কাছেও পরাধীনতার গ্লানি ভুলে হৃত গৌরব ঝালিয়ে নেওয়া ও বীরত্বের পরিচয় দেবার উপায় হয়ে ওঠে বাঘ-শিকার। যা হোক, দেশি বিদেশি সমস্ত শিকারিদের বীরত্ব, দুঃসাহস, পুরুষত্ব ও শিকার নৈপুণ্যের প্রমাণ দানের অর্থাৎ জাত-শিকারির পরিচয় দানের একচেটিয়া অলিখিত শর্তই হয়ে ওঠে 'বাঘ শিকার'। এজন্য প্রবোধকুমার সান্যালের 'শিকারের সন্ধানে'র *(মৌচাক, ১৩৪২)* কথক বাঘ শিকারের বীরত্বের সঙ্গে রোমান্টিকতা মিশিয়ে সরস ভঙ্গিতে বলেন—বাঘ না মারা পর্যন্ত শিকারির 'আইবুড়োত্ব' ঘোচে না।

বাঘ শিকারের সঙ্গে যশ, কৃতিত্ব ও মর্যাদা এতটাই গভীর ভাবে যুক্ত ছিল যে মাঝে মাঝে বাঘ শিকারকে ঘিরে ঘটত নানা প্রহসনও। দেশীয় রাজরাজড়ারা ব্রিটিশ প্রভুর অনুগ্রহ লাভে রাজকীয় শিকার পার্টির আয়োজন করতেন; সেখানে অনেক সময়ই ইংরেজ রাজপুরুষ বা মান্যগণ্য অভিজাত অতিথির বদলে নিযুক্ত স্থানীয় শিকারির গুলিতেই বাঘ মরত; কিন্তু শিকারের কৃতিত্ব লাভ করতেন ইংরেজ রাজপুরুষ বা রাজরাজড়া অভিজাতরা। শিকারকে ঘিরে এরূপ এক অদ্ভুত শিকার-অভিনয় বা মজাদার প্রহসন উঠে এসেছে অজিতকৃষ্ণ বসুর 'আজগুবিগঞ্জের বাঘ' (*মৌচাক*, আশ্বিন ১৩৬৮) গল্পে। আজগুবিগঞ্জের মহারাজা ভীষণ বিপদে পড়েন। কারণ বাল্যবন্ধু খেয়ালনগরের মহারাজা ৪৫ বছর পর তাঁর রাজ্যের অতিথি। বন্ধু শিকারের বন্দোবস্ত রাখতে বলেছেন, অথচ আজগুবিগঞ্জের অরণ্যে বাঘের আকাল; প্রতিবেশী জগঝম্পপুরের অরণ্যে সবেধন নীলমণি একটি বাঘ থাকলেও, তাকে যাতে কেউ না মারতে পারে এজন্য সর্বদা কড়া পাহারা। নিজের চিড়িয়াখানার বাঘ বৃহল্লাঙ্গুল বুড়ো হয়ে গেলেও তাকে শিকারের জন্য

তুলে দেওয়া যায় না; কারণ সে মহারাজার অতিপ্রিয় ও রাজ্যের গৌরব। শেষপর্যন্ত মন্ত্রীর পরামর্শে সার্কাস কোম্পানী থেকে হার্টফেল করা বাঘের মৃতদেহ কিনে গোপনে বাক্সবন্দি করে এনে আজগুবিগঞ্জের অরণ্যে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রাখা হয়। যথাসময়ে শুরু হয় হাতির পিঠে রাজকীয় শিকার যাত্রা ও শিকার খেলার নিখুঁত অভিনয়। খেয়ালনগরের মহারাজ অবশ্য জীবনে দু-একটা নিরীহ পাখি ছাড়া কিছুই শিকার করেননি, ফলে বাঘ দেখে ভয়ে তিনি জ্ঞান হারান। রাজপ্রাসাদে চোখ মিলে দেখেন চারধারে তাঁর শিকারের 'ধন্য ধন্য' হচ্ছে। তাঁর হাত থেকে বন্দুক পড়ে গুলি ছোটাতেই বাঘ হার্টফেল করায় 'আশ্চর্য শিকার' সম্পন্ন হয়ে গেছে। বাঘ দেখে ক-দিনের বাসি সন্দেহ হলেও শোনেন হার্টফেলে মৃত বাঘ এইরকমই হয়। তৎকালীন ভারতীয় রাজন্যবর্গের বাঘ-শিকারকেন্দ্রিক আভিজাত্য-মর্যাদা প্রদর্শনের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়িকে নিয়ে সমস্ত গল্পটিতে উতরোল হাস্যরস পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ব্যঙ্গও করা হয়েছে।

কিছু গল্পে [হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'নকল শিকারির সঙ্কট' (*নীহারিকা*), *শিশুসাথীতে* প্রকাশিত অজ্ঞাতনামা লেখকের 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'] ভারতে বাঘ শিকারের রেকর্ড ভাঙার ইচ্ছা নিয়ে আসা লালমুখো সাহেব শিকারির দুর্দমনীয় সাহস ও শিকার নৈপুণ্যের বদলে, বাস্তবে ভারতীয় অরণ্যে বাঘ দেখেই খেয়ালনগরের মহারাজের মতো জ্ঞান হারানো বা দাঁত কপাটি লাগার কথা বর্ণিত হয়েছে। সাহেব শিকারিকে এরূপ 'ভীতুর ডিম', 'অকালকুষ্মাণ্ড', 'মুখে-মারি' শিকারি রূপে চিত্রিত করে বা তাদের হেনস্তা বা জব্দ হবার সরস বর্ণনার মাধ্যমে পরাধীন দেশের নাগরিক বাঙালি শিকার-লিখিয়েরা ঔপনিবেশিক প্রভুদের প্রতি তাদের গায়ের জ্বালা মিটিয়েছেন।

অবশ্য সত্যিকারের প্রতিভাবান সাহেব শিকারিদের বাঘ শিকারে দুর্জয় সাহস, অসীম শক্তি, বলিষ্ঠ স্নায়ুমণ্ডলী ও নিশান দক্ষতার প্রশংসা করতেও বাঙালি শিকার-লিখিয়েরা মোটেই কৃপণ নন। এছাড়া, ভারতের 'শিকারি কুলশ্রেষ্ঠ কার্পিট সাহেব' অর্থাৎ জিম করবেটের ও 'দক্ষিণ ভারতের জিম করবেট' রূপে খ্যাত কেনেথ অ্যান্ডারসনের মানুষখেকো বাঘ বা চিতা শিকারের দক্ষতা, শিকারি হয়েও বন্যপ্রাণীর প্রতি তাদের দরদ, সংরক্ষণ প্রচেষ্টা, শিকার কাহিনির রচনা নৈপুণ্যের প্রসঙ্গ বহু গল্পে বারে বারে উঠে এসেছে। প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের রচনার বাংলা অনুবাদও। তাঁদের রচিত শিকার কাহিনিকে মডেল রূপেও বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য এই শিকার-সাহিত্য

রচয়িতারা অনেকে গ্রহণ করেছেন। বাঙালি বাঘ-শিকারিদের মধ্যে কুমুদনাথ চৌধুরীর প্রসঙ্গ অনেক গল্পে উল্লিখিত হতে দেখা যায়। তাঁর বাঘকে অসতর্ক মুহূর্তে কখনও শিকার না করে পাঞ্জা পাঠিয়ে সম্মুখ সমরে শিকার করা, আত্মবিশ্বাস-সাহস-অবিচলিত নার্ভ-অপরাজেয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গুণাবলীর জন্য প্রবোধকুমার সান্যাল 'শিকারের সন্ধানে' গল্পে সমগ্র ভারতবর্ষের শিকারিদের ইতিহাসে একমাত্র (বিরল) প্রকৃত প্রতিভাবান শিকারি রূপে তাঁকে চিহ্নিত করেছেন। সেই সঙ্গে আহত মুমূর্ষু বাঘের চাতুরির ফাঁদে পড়ে কে. এন. চৌধুরীর মতো পাকা শিকারিরও মুহূর্তের ভুল কীভাবে কালাহাণ্ডির অরণ্যের গভীরে চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে—রক্তের অক্ষরে লেখা সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাও বাংলা বাঘ শিকারের কাহিনিগুলিতে 'শিকারিদের জন্য পরম শিক্ষা' রূপে অনেক সময়ই বর্ণিত হতে দেখা যায়।

বিশ শতকের পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রসিদ্ধ শিকারি স্বয়ং কিংবা শিকার অভিযাত্রী সঙ্গী বা শিকার-দর্শক যেমন তাদের প্রত্যক্ষ শিকার অভিজ্ঞতালব্ধ বাঘ শিকারের টানটান উত্তেজনাপূর্ণ রোমাঞ্চকর সত্য কাহিনি ছোটোদের শোনাতে নিয়মিত কলম ধরেছেন, তেমনি বিখ্যাত অখ্যাত সাহিত্যিকরাও রোমাঞ্চ ভরপুর ভয়-মিশ্রিত শিহরণ জাগানো বাঘ-শিকারের নানা স্বাদের বিচিত্র সব কাহিনি লিখেছেন। এসময় গ্রামবাংলায়, পথেঘাটে প্রায়ই বাঘ, চিতাবাঘ বা গুলবাঘের সাক্ষাৎ মিলত। ফলে বাঘের আক্রমণ ও তা মোকাবিলার বিভিন্ন কাহিনিও উঠে এসেছে। স্থান পেয়েছে স্থানীয় (সুন্দরবন, দক্ষিণ ভারত, ব্রহ্মদেশের) শিকারিদের (দেশীয় পদ্ধতিতে) বাঘ-শিকারের কাহিনিও। বাঘকে ঘিরে অরণ্যলগ্ন মানুষ ও শিকারিদের নানা বিশ্বাস-অন্ধবিশ্বাস-সংস্কার ও সংস্কৃতির কথাও হাজির হয়েছে।

জন অরণ্যে থাকা শিকারি ও ঘন অরণ্যে বাস করা বাঘের পরস্পরের মধ্যে 'শুভমুহূর্তে' কিংবা বলা ভালো 'দুঃসময়ে' দেখা হয়; যুযুধান দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে এই সাক্ষাতের ফল হয় সাধারণত একজনের জয় ও অপরজনের পরাজয়ে। সামান্যতম ভুলেও দক্ষ শিকারিরও বাঘের শিকারে পরিণত হওয়ার শোচনীয় ঘটনা বিরল নয় (বুদ্ধদেব গুহর 'টাঁড়বাঘোয়া'তে টিকায়েত বাঘকে গুলি মারতে সক্ষম হলেও বাঘ বা বাঘিনী নিচু করে বাঁধা মাচানে উঠে টিকায়েতকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়)। শিশু-কিশোরপাঠ্য এই বাঘ শিকারের কাহিনিগুলিতে সফল শিকার-কাহিনির প্রাধান্য

হলেও মাঝে মাঝে শিকারের ব্যর্থতাও উঠে এসেছে। ব্যর্থ হলেও অবশ্য সে কাহিনিগুলিও ভয়মিশ্রিত শিহরণ, টানটান উত্তেজনা, অনিশ্চয়তা, রোমাঞ্চ ও গল্পরসে কোনও অংশে খাটো নয়। শিকার ব্যর্থ হলেও শিকার-সাহিত্য রূপে সেগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সফল। কখনও দেখা যায় চতুর ধূর্ত বাঘ শিকারির বন্দুকের নাগালের মধ্যে এসেও কোনও অলৌকিক পদ্ধতিতে ফাঁকি দিয়ে গেছে; কখনও বা রাতের অন্ধকারেও গুলিবিদ্ধ বাঘের আওয়াজে তার মৃত্যু সম্পর্কে শিকারি প্রায় নিশ্চিত হবার পরও সকালের আলো ফুটতে দেখা যায় মৃত বাঘের চিহ্ন মাত্র নেই। তখন আবার শুরু হয় জখমি বিপজ্জনক বাঘকে খুঁজে বের করার জন্য শিকারির নিজের মধ্যেই অহং, জেদ ও ভয়ের চূড়ান্ত লড়াই (দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর 'বাঘের দেশে', *মৌচাক*, ১৩৫১)। কখনো বা গ্রামের পোড়োবাড়িতে আশ্রয় নেওয়া বাঘকে ঘিরে ফেললেও সবার অলক্ষ্যে তা বনে উধাও হয়ে যায় (সত্যরঞ্জন সেনগুপ্তর 'বাঘশিকার', *রামধনু*)। লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত শিকারি শ্রী এন. আর কিদোয়াইয়ের বাঘের বাচ্চাকে ধরে ফেলে বাচ্চার টানে আসা বাঘিনীকে (অমানবিক ভাবে) শিকারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে মনোরঞ্জন সেনের 'বাঘ শিকার' (*শিশুসাথী*, ১৩৫৮) গল্পে। এখানে শিকার সফল হয়েছে; বাঘের বাচ্চা দুটি পরম আদর যত্নে প্রতিপালিত হয়েছে চিড়িয়াখানায় প্রেরণের জন্য; কিন্তু তবুও মাতৃহারা, স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও অধিকার হারানো, মনমরা বাঘ-বাচ্চা দুটির জন্য লেখক বারেবারে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন—'মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহাবেষ্টনী হারিয়ে এইভাবে লালিত পালিত হওয়া বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নেই'।[২] আবার বাঘিনী ও তার শাবকদের মধ্যেকার বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের অপরূপ স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে বাঘ মারতে আগত শিকারির মুগ্ধ চিত্তে বন্দুক নামিয়ে নিঃশব্দে খালি হাতে ফিরে যাওয়াও বিরল নয়। শিকার দেখার সৌভাগ্য এক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেও শিকার-সঙ্গী কথকও ফেলেছে স্বস্তির শ্বাস, লাভ করেছে অলীক আনন্দানুভূতি (সঙ্কর্ষণ রায়ের 'বন্যরা বনে')। নিঃসন্দেহেই সেই অপার্থিব আনন্দের শরিক হয়েছে পাঠকও।

প্রথম পর্বের বাঘ শিকারের কাহিনিগুলিতে দেখা যায় শিকারিরা বাঘ শিকারের অ্যাডভেঞ্চার লাভ ও কৃতিত্ব অর্জন করতে বনে উজিয়ে গিয়ে শিকার ক্রীড়ায় মেতেছেন। কখনও বাঘের সন্ধানে তারা অরণ্যলগ্ন গ্রামবাসীদের কাছে খোঁজ নিতে নিতে বন-বনান্তরে যাত্রা করেছেন (সমর সরকারের 'বাঘে মহিষে', 'বাঘ ধরা'); কখনও নদীপথে সুন্দরবনের

ভয়াল অরণ্যে প্রবেশ করেছেন (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঘের মন্ত্র'); কখনও আবার ট্র্যাকার, বিটার বা হাঁকোয়া, স্থানীয় শিকারি, গাইড সহযোগে হাতির পিঠে হাওদা-শিকার (মনোরঞ্জন সেনের 'বাঘ শিকার') বা গাছের উপরের মাচা থেকে মাচান শিকার (দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর 'বাঘের দেশে') করেছেন। কিন্তু বাঘের সংখ্যা দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্তির ফলে বিশ শতকে ক্রমশ বিবেকবান মানবিক শিকারি, সংরক্ষক ও প্রকৃতিবিদদের দ্বারা বাঘ সংরক্ষণের সুর ধীরে ধীরে জোরালো হতে থাকে। ফলে ক্রমশ দেখা যায় বাংলা শিশু-কিশোর পাঠ্য শিকার-কাহিনিগুলিতেও এই স্বর ধ্বনিত হচ্ছে। শখের শিকারিরা আর শুধুমাত্র বাঘ শিকারের কৃতিত্ব লাভের জন্য নির্বিচারে শিকার করছেন না; হয় আত্মরক্ষার্থে, নয় বিপন্ন মানুষকে রক্ষার্থেই তারা বাঘ শিকারে বাধ্য হচ্ছেন। জনপদে উপদ্রবকারী, মানুষখেকো বাঘের আতঙ্কে ভয়াবহ দিন ও রাত্রি যাপনের অভিশাপ থেকে বিপন্ন গ্রামবাসীদের মুক্ত করতে কখনও গ্রামবাসীদের বা সরকারি অনুরোধে, কখনও বা স্বেচ্ছায় জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ নরখাদক বাঘ শিকারের দায়িত্ব শিকারি কাঁধে তুলে নিচ্ছেন। গল্পের পর গল্পে বাঘ-শিকারির বিপন্ন জনপদের রক্ষাকর্তার ভাবমূর্তিটিই ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এর পেছনে সম্ভবত জিম করবেট, কেনেথ অ্যান্ডারসনের শিকারের ঘটনাগুলির প্রভাব বর্তমান। মূর্তিমান সন্ত্রাস হয়ে ওঠা নরখাদক বাঘকে শিকারে বাধ্য হলেও মৃত বাঘটিকে দেখে এইসব মানবিক স্পোর্টসম্যান শিকারিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিষণ্ন হন। 'শত্রু' বাঘটির প্রতিও ক্রোধ বা ঘৃণার বদলে তাদের সানুরাগ মুগ্ধতা, দরদ, সহমর্মিতা প্রকাশ পায় (বুদ্ধদেব গুহর 'টাঁড়বাঘোয়া')। বাঘটির মানুষখেকো হয়ে ওঠার সম্ভাব্য নেপথ্য ইতিহাসও এই কালপর্বের বাংলা শিকার-লিখিয়েরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছোটোদের সামনে তুলে ধরেছেন (টাঁড়বাঘোয়া', 'বোডিংয়ের বাঘ', 'বন্যরা বনে')। বহু গল্পেই দেখা যায়, যে শিকারি বনে ভয়ঙ্কর বাঘের সামনে দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া দুঃসাহসী তিনিই সমাজ জীবনে খুবই সাধারণ, সাদাসিধে মানুষ। এমনকি বাঘ শিকারিরই বাঘের প্রতি অদ্ভুত ভালোবাসা থেকে বাঘের সংরক্ষক হয়ে ওঠার ঘটনাও বিরল নয়।

বাংলা শিকার-সাহিত্যগুলিতে অবশ্য বাঙালি তথা ভারতীয় শখের শিকারিদের এমনকি বাঘ শিকারে অনভিজ্ঞ শিকারিদেরও বাঘের সন্ধানে অরণ্য তোলপাড় করার চিত্র আরেকবার দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে সদ্য স্বাধীনোত্তর কালে

ভারতীয় অরণ্যগুলি সবার জন্য মুক্ত হয়ে গেলে (প্রবোধকুমার সান্যালের 'শিকারের সন্ধানে')। এবার অবশ্য হাতির বদলে স্থান দখল করে অরণ্যের দুর্গম পথেও সহজে চলাচলে সক্ষম গাড়ি; সঙ্গে থাকে নানা অত্যাধুনিক শিকার সরঞ্জাম—রাইফেল, পিস্তল বিবিধ আগ্নেয়াস্ত্র, টর্চ, সার্চ লাইট, ইলেকট্রিক মিটার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকাল থেকেই এগুলি সহজলভ্য হয়ে ওঠে।

অবশ্য বিশ শতকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঘ শিকার সংক্রান্ত বীরত্ব, পৌরুষের ধারণায় এবং সেই সঙ্গে শিকারের পদ্ধতিতেও ঘটেছে নানা রদবদল। বনে উজিয়ে গিয়ে বাঘের সাক্ষাৎ মাত্রই কিংবা শিকাররত বা জলপানরত বা নুন চাটতে আসা বাঘকে অতর্কিতে নির্বিচারে গুলির পর গুলির বর্ষণে শিকার প্রথম পর্বের শিকার কাহিনিগুলিতে উঠে এলেও, ক্রমশ এগুলি অ-স্পোর্টসসুলভ, অমানবিক বলে উল্লিখিত হতে দেখা যায়। ট্র্যাকার বিটার, স্থানীয় শিকারি সহযোগে রাজকীয় শিকার পদ্ধতিরও সমালোচনা শোনা যায় :

> রাজরাজড়া, লাটবেলাট যখন বাঘ মারে, তখন তাদের প্রশংসা ও ছবি ছাপা হয় কাগজে কাগজে; কিন্তু শিকারিমাত্রই জানে এই হত্যাকাণ্ডে পৌরুষ নেই। প্রথমত, এইসব শিকারে শত শত লোক লাগিয়ে জঙ্গলকে চারিদিক থেকে ঘেরাও করে বিট করা হয়; একদিকের পথ খোলা থাকে, সেই পথের উঁচু মাচার উপর বসে থাকেন নাড়ুগোপাল রাজকুমার; বাঘ যখন সেই পথ দিয়ে পালায় তখন ভালো একজন শিকারি তাকে প্রথম গুলি করে। বহু নামজাদা শিকারি আমার চেয়েও ভীতু—আমার চেয়েও দুর্বলদেহ। তারা শখের তৃপ্তির জন্য অরণ্যে যায়, সাহসের পরিচয় দিতে যায় না।[৩] (প্রবোধকুমার সান্যালের 'শিকারের সন্ধানে', *মৌচাক*)

ফলে এই কালপর্বের বাঘ শিকার কাহিনিগুলিতে দেখা যায়, শিকারি একাকী বা বড়োজোর একজন যোগ্য সঙ্গী বা গাইডের সঙ্গে জঙ্গলে মানুষখেকো বাঘের শিকারে যান। কখনও পদব্রজে বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে, কখনও মড়ি বা টোপের কাছাকাছি ঝোঁপে বা গাছের উপর বা মাচা থেকে বাঘ শিকার করেন। বহু গুলিবর্ষণের বদলে বাঘের দেহের মোক্ষমস্থানে একটি বা দুটি গুলিতেই শিকার সমাধান করেন। তবেই শিকারির যথার্থ বীরত্ব, পৌরুষ ও শিকার নৈপুণ্য। ফলে বাঘ শিকারের এই কাহিনিগুলি নিঃসন্দেহেই আরও ভয়মিশ্রিত টানটান উত্তেজনাময়, রোমহর্ষক।

বাঘ শিকারের গল্পগুলিতে শিকারকৃত বাঘের দৈর্ঘ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উল্লিখিত হয়, কেননা বাঘের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিকারির কৃতিত্বও বাড়ে। এছাড়া বাঘ শিকারের কাহিনিগুলিতে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে তার লিঙ্গ বা আকার বোঝা, গায়ের বোটকা গন্ধ, কাছাকাছি মাছির উপস্থিতি, কাক ময়ূরের ডাক বা বানরের চিৎকারে বাঘের আগমনবার্তা, মাটিতে বা ঘাস-গাছপালায় রক্তের দাগ দেখে গুলিবিদ্ধ বাঘের জখমস্থানের অনুমান, বাঘের চামড়ার উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি বাঘ শিকারের অজস্র খুঁটিনাটি ডিটেলিং শিকার-লিখিয়েরা ছোটোদের জানিয়েছেন। ঠিক তেমনি বাঘের স্বভাব, চরিত্র, বুদ্ধি, শিকারিকে ফাঁকি দেবার ধূর্ততা, শিকার পদ্ধতি, খাদ্যাভ্যাস, বাৎসল্য ইত্যাদি বিষয়ও হাজির করেছেন। তবে কখনো-কখনো বাঘের স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে এইসব শিকার-লিখিয়েরা পরস্পর বিরোধী তথ্যও তুলে ধরেছেন। বিখ্যাত শিকারি জিম করবেটের মতে যেখানে বাঘ তীব্র দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির হলেও তার ঘ্রাণশক্তি ততটা সবল নয়, সেখানে এই শিকার-সাহিত্য লেখকরা অনেকেই বাঘের ঘ্রাণশক্তিও মানুষের চেয়ে অনেক বেশি বলেছেন (প্রবোধকুমার সান্যাল, শিবশঙ্কর মিত্র); সুন্দরবনের স্থানীয় শিকারিদের গল্পগুলিতেও দেখা যায় জঙ্গলে বাতাস প্রবাহের গতির উপর নির্ভর করে তারা বাঘের ঘ্রাণশক্তিকে ফাঁকি দিতে চান। আবার বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য বাঘ শিকারের কাহিনিগুলিতে প্রায়ই বাঘের মানুষ বা গবাদির তাজা রক্ত চোঁ চোঁ করে শুষে খেয়ে তারপর বেমালুম ঠান্ডা হবার বর্ণনা উঠে এসেছে (মোহন ভট্টাচার্য্যের 'বাঘে মানুষে', রবীন্দ্রনাথ সেনের 'পুশ্‌পুশে', *শিশুসাথী*) কিন্তু বাঘের এরূপ রক্ত শোষণের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। শিকার দমবন্ধ হয়ে মারা না যাওয়া পর্যন্ত বাঘ সাধারণত শিকারের শ্বাসনালীতে ক্যানাইন দাঁত ফুটিয়ে রেখেই শিকারকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং শিকার মারা গেলে ছেড়ে দেবার পর ক্লান্তিতে খানিক শান্ত হয়ে যায় ও সঙ্গে সঙ্গেই না খেয়ে খাবার সুবিধার্থে শিকারের মাংসপেশী নরম হবার সময় দেয়—এজন্যই সম্ভবত গোটা উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত শিকারি, প্রকৃতিবিদের ভ্রান্ত ধারণা ছিল বাঘ রক্ত শুষে খায়। বাংলা এই শিকার-কাহিনির রচয়িতারাও প্রচলিত সেই ধারণাই তুলে ধরেছেন। অনুরূপে মানুষখেকো হবার কারণ ও মানুষখেকো বাঘিনীর সন্তানও মানুষখেকো হয় কিনা এ নিয়েও পরস্পর বিরোধী নানা তথ্য ছড়িয়ে আছে এই শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার কাহিনিগুলিতে।

ভারতে বাঘ শিকার আজ নিষিদ্ধ (১৯৭২ খ্রি. থেকে); ফলে বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য বাঘ-শিকারের কাহিনি রচনার দিন আজ গত। কিন্তু বাঘ শিকারের সঙ্গে শৌর্যবীর্য-বীরত্ব-পুরুষত্বের ধারণা এতটাই গভীর ভাবে যুক্ত এবং বাঘ শিকারে ভয়মিশ্রিত উত্তেজনা-রোমাঞ্চ-শিহরণ এতটাই ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে যে বিশ শতকের এই সব শিশু-কিশোরপাঠ্য বাঘ-শিকারের কাহিনিগুলি আজ এই একবিংশ শতাব্দীর ছোটোবড়ো সব বয়সি পাঠককেও আকৃষ্ট করে।

গরিলা শিকার কাহিনি

> চল্‌তে চল্‌তে মাত্র হাত পঞ্চাশেক দূরেই গরিলাটার একেবারে সমুখে গিয়ে পড়ল। গরিলাটা তখন বসে নিশ্চিন্ত মনে গাছ থেকে কচি কচি পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছিল। শোভনলালকে দেখেই সবগুলো দাঁত বার করে চোখ ঘুরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এক হুঙ্কার ছাড়লে। তারপর বুকের ওপর ধুম্‌ধুম্‌ শব্দে ঘুষি মারতে মারতে এগিয়ে আসতে লাগল। একটু করে এগিয়ে আসে আর দাঁড়ায়; আবার বসে, আবার উঠে দাঁড়ায়। হুঙ্কার ও ঘুষির বিরাম নেই। শোভনলাল কিন্তু স্থির—তার বুক লক্ষ্য করে বন্দুক তুলে রইল। গরিলাটা তার সামনে হাত দশেকের মধ্যে এসে পড়তেই সে গুলি করলে—পর পর দুটো! কিন্তু তাতে গরিলাটা পড়া তো দূরের কথা, একটুও কাতর না হয়ে শোভনলালের দিকে ছুটে এল।[৪]

—ছোটোদের এরকম টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ভয়ানক গরিলা শিকারের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি শুনিয়েছেন *শিশুসাথী* পত্রিকায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র। 'কাফ্রিদের দেশ' আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে 'ভয়ঙ্কর প্রাণী' গরিলার শিকারের জন্য তিনি হাজির করেছেন ডার্বিন নগরের তিনটি 'ভারতীয় বণিকের ছেলে' শোভনলাল, বীরেন্দ্র ও রতনকে। লোকালয় থেকে বহুদূরে মানুষের প্রায় অগম্য অন্ধকারাচ্ছন্ন খুব নির্জন গভীর অরণ্যে গরিলা শিকারের জন্য তারা যাত্রা করেছে আট বলদে টানা গাড়িতে। 'পথের মাঝে হিংস্র জন্তুর মুখে, কি নিগ্রোদের হাতে বা তৃষ্ণায় অথবা অসুখে' প্রাণ হারানোর প্রবল সম্ভাবনা বর্তমান। তবু ভয়ডরহীন ভারতীয় ছেলে তিনটির উৎসাহ ও সাহসে বাধা পড়েনি। কারণ তাদের ডার্বানের চারধারের বনজঙ্গলের প্রাণীগুলিকে শিকারের চোটে অস্থির করে তোলা শেষ; শেষ পশুরাজ সিংহের শিকারও। কিন্তু তাতেও তাদের তৃপ্তি হয়নি। চাই এদের চেয়েও 'ভয়ঙ্কর জানোয়ার'। 'শিকারে যদি বিপদের সম্ভাবনা না থাকল তবে

সে শিকারে আবার আনন্দ কি? তারা শুনেছিল, গরিলা শিকার বড় কঠিন কাজ। কত ওস্তাদ শিকারি গরিলা শিকারে গিয়ে আর ফিরে আসেনি'।[৫] এজন্য ভয়শূন্য 'ডাকাতে ছেলে' তিনটি বাড়ি থেকে গোপনে রওনা দেয় গরিলার সন্ধানে। বিপজ্জনক গরিলা শিকার তাদের করতেই হবে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অনুরোধে স্কটিশ লেখক R. M. Ballantyne-এর বিখ্যাত *The Gorilla Hunters : A Tale of the Wilds of Africa* (১৮৬১ খ্রি.)-এর ছায়াতেই খগেন্দ্রনাথ বাংলায় লেখেন গরিলা শিকারের এই অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস 'আফ্রিকার জঙ্গলে' (*শিশুসাথী*)। আর শুধু খগেন্দ্রনাথই নন, বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলির পাতা উল্টালেই দেখা যায়, গরিলা সংক্রান্ত অসংখ্য প্রবন্ধের পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে বেশ অনেকগুলি গরিলা শিকার কাহিনিও। সুদূর আফ্রিকাবাসী এই গরিলাদের প্রতি বাঙালি শিশু-কিশোর সাহিত্যিকদের আগ্রহের অবশ্য যথেষ্ট কারণও ছিল।

'গরিলা' প্রাণীটির অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্ববাসী প্রথম জানতে পারে মাত্র কয়েক বছর পূর্বেই—উনিশ শতকের মাঝামাঝি। ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এক কার্থেজবাসী ভ্রমণকারী Hanno the Navigator প্রথম 'Gorilla' (ancient greek word 'gorillai' —tribe of hairy women) শব্দটি উল্লেখ করেন। তবে পশ্চিম আফ্রিকায় তিনি যে প্রাণীগুলির সাক্ষাৎ পান ও তাদের গরিলা বলে উল্লেখ করেন, তা বানর (monkey) না লেজহীন বানর (Ape) নাকি কোনও অরণ্যবাসী মানবগোষ্ঠী সঠিক কিছুই জানা যায় না। হানোর পর দীর্ঘকাল আর কাউকে এবিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায় না। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান চিকিৎসক ও মিশনারি Thomas Staughton Savage ও প্রকৃতিবিদ Jeffries Wyman-এর বর্ণনায় প্রথম Western Gorilla ('Troglodytes gorilla')-দের বিবরণ মেলে। তবে সভ্য জগতের লোকেরা 'গরিলা'র নাম শুনলেও তাকে চোখে দেখার সৌভাগ্য না হওয়ায়, বেশির ভাগ জনই বিশ্বাস করত গরিলা নেহাৎই 'কাল্পনিক জীব', 'রূপকথার জানোয়ারের মতোই আজগুবি', 'অদ্ভুত প্রাণী'। Du Chaillu নামে এক ফরাসি-আমেরিকান প্রাণীবিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদ ও ভ্রমণকারী ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে নানা অবিশ্বাস্য ও কঠিন বাধা-বিঘ্নের পর ইউরোপীয় সভ্য জগতের কাছে প্রথম গরিলার বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণে সক্ষম হন। ধীরে ধীরে গরিলা সম্পর্কে আরও নানা তথ্য শিকারি, ভ্রমণকারী ও প্রাণীবিজ্ঞানীদের মারফত জানা যেতে থাকে। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে জার্মান

অফিসার Captain Robert Von Beringe প্রথম Mountain Gorilla-র সাক্ষাৎ পান; এতদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র Lowland Gorilla-র অস্তিত্বই জানা ছিল। প্রাণীবিজ্ঞানে বিশেষত বিবর্তনের ক্ষেত্রে গরিলার আবিষ্কার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ফলে উনিশ শতকের শেষার্ধ ও গোটা বিশ শতক জুড়ে গরিলা সম্পর্কে [গরিলা প্রজাতির বিভিন্ন রকমফের(sub-species), তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, বিবর্তন ধারায় মানুষের সঙ্গে গরিলার সম্পর্ক, তাদের দৈহিক গঠন, খাদ্যাভ্যাস, স্বভাব ইত্যাদির] চর্চা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এসময়ের দেশ বিদেশের শিশু-কিশোর সাহিত্যিকরা মানব প্রজাতির সঙ্গে বিবর্তনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত এই নতুন আবিষ্কৃত প্রাণী 'গরিলা' সম্পর্কে ছোটোদের জানাতে আগ্রহী হয়েছেন; আর এক্ষেত্রে বাঙালি শিশু-কিশোর সাহিত্যিকরাও ব্যতিক্রম নন। স্কটিশ লেখক R. M. Ballantyne-এর আফ্রিকা (darkest Africa) কে নিয়ে লেখা *The Coral Island* (১৮৫৮ খ্রি.) ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করলে, তার পরিশিষ্ট (sequel) রূপে তিনি আফ্রিকার গরিলা শিকারকে কেন্দ্র করে লেখেন *The Gorilla Hunters : A tale of the wilds of Africa* (১৮৬১ খ্রি.)। ইতিমধ্যেই ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে Du Chaillu পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ইংল্যান্ডে এসে গরিলার বাস্তবিক অস্তিত্ব প্রমাণ করেন; বিভিন্ন বক্তৃতা ও লেখালেখিতে গরিলা সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষা তুলে ধরে ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। গরিলা সম্পর্কে Du Chaillu-র প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দেই R. M. Ballantyne লেখেন ঐ গরিলা শিকারের কাহিনিটি। সভ্য জগতের কাছে একদমই সদ্য পরিচিত প্রাণীটিকে কেন্দ্র করে লেখা হওয়ায় তাঁর এই কিশোর উপন্যাসটিও দেশবিদেশে দ্রুত খ্যাতি লাভ করে। মূলত *The Gorilla Hunters*-এর প্রভাবেই বা অবলম্বনে বাংলাভাষী শিশু-কিশোরদের জন্য খগেন্দ্রনাথ মিত্র লেখেন 'আফ্রিকার জঙ্গলে'। অজানা রহস্যময় আফ্রিকা সম্পর্কে এমনিতেই বিশ্ববাসীর মতো বাঙালিরও যথেষ্ট কৌতূহল ছিলই। আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পরে বাঙালি কাজের সন্ধানেও আফ্রিকা বিশেষত ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে যাচ্ছে। ফলে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আফ্রিকার জঙ্গলে' (১৯২২-২৩ খ্রি.) প্রকাশিত হবার পূর্বে ও সমকালে আফ্রিকা নিয়েও বেশ কিছু বাংলা লেখালেখির সূচনা ঘটেছে। লিভিংস্টোন, স্টানলী প্রমুখদের আফ্রিকার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ রোমাঞ্চকর ডায়েরি, স্মৃতিকথাগুলির বঙ্গানুবাদ [অবনীমোহন ঘোষের 'আফ্রিকার

জঙ্গলে' (*রামধনু*, ১৯৪২ খ্রি.); 'আফ্রিকার অন্ধকার জঙ্গল' (*রংমশাল*, ১৯৪৪ খ্রি.)] যেমন এই সময়কার শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে তেমনি বাইসাইকেলে বিখ্যাত বাঙালি ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস লিখছেন নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ আফ্রিকা ভ্রমণ কাহিনি [*ভয়ঙ্কর আফ্রিকা* (১৯৪৪ খ্রি.), *দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা* (১৯৪৯ খ্রি.), *নিগ্রো জাতির নূতন জীবন* (১৯৪৯ খ্রি.), *অন্ধকারের আফ্রিকা* (১৯৫০ খ্রি.)] সেই সঙ্গে দুই-তিনের দশক থেকেই আফ্রিকাকে পটভূমি করে রচিত হচ্ছে একের পর এক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি— প্যারীমোহন সেনগুপ্তের *কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায়* (১৯২২ খ্রি.), সত্যচরণ চক্রবর্তীর *রাক্ষসের দেশ* (১৯২৬ খ্রি.), হেমেন্দ্রকুমার রায়ের *আবার যখের ধন* (১৯৩৬ খ্রি.), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চাঁদের পাহাড়* (১৯৩৭ খ্রি.), জ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্তীর *রাক্ষুসে আফ্রিকা* (১৯৪০ খ্রি.), শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের *আফ্রিকার বনে জঙ্গলে* (১৯৬০ খ্রি.) ইত্যাদি। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই শুধু খগেন্দ্রনাথই নন, বাঙালি শিশু-কিশোর সাহিত্যিকরা অনেকেই কয়েক বছর পূর্বেই আবিষ্কৃত এই আফ্রিকাবাসী নতুন ভয়ঙ্কর জন্তু—গরিলাটিকে নিয়ে প্রবন্ধ, শিকার কাহিনি, গল্প, অরণ্য-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি রচনায় উৎসাহী হয়েছেন। বাংলায় গরিলা শিকারের কাহিনি বা গরিলা সংক্রান্ত লেখালেখিগুলিতে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে গরিলা আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর প্রসঙ্গটি বর্ণিত হয়েছে। বিরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'মানুষের কাছাকাছি জীব' (*রামধনু*, ১৩৩৬)-এ এক পাদ্রী সাহেবের (নামের যদিও উল্লেখ নেই, সম্ভবত মিশনারি Thomas Staughton Savage) গরিলার মাথার খুলি দেখে তাদের অস্তিত্ব জানতে পারা ও তাদেরকে 'একরকম অসভ্য বেঁটে মানুষ' ঠাওরানোর গল্প শুনিয়েছেন। এসময়ে অজানা 'অন্ধকারের মহাদেশ' আফ্রিকার প্রতি সভ্য ইউরোপের একটি অন্যতম চিন্তাধারা হল—অসভ্য, অনুন্নত, আদিম কালো আদমিদের উন্নত করে তোলার দায় সুসভ্য সাদা মানুষের। আর এই সুসভ্য বা উন্নত করে তোলার জন্য একান্তই প্রয়োজন সভ্যতা সংস্কৃতির প্রসার ও খ্রিস্টধর্ম প্রচার। যদিও খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ও সভ্যতার বিকাশের এই দায়িত্বের পেছনে আসলে ছিল ঔপনিবেশিক প্রভুদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্বার্থ অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণের অভীপ্সা। আরেক উপনিবেশ ভারতের বাসিন্দা বিরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পাদ্রী সাহেবের প্রথম গরিলার সাক্ষাৎ পেয়ে তাদের অসভ্য বেঁটে মানুষ মনে করার কাহিনি শোনাতে বসে, তাই মজার সুরে বলে বসেন—'পাদ্রীসাহেব ভাগ্যিস, তাদের (গরিলাদের) কাছে ধর্ম্মপ্রচারে

যান নাই!!’[৬] খুব ভালো শিকারি ডু শেলু সাহেব একবার এক আদিম আফ্রিকান সর্দারের কাছে খুব বড়ো জাতের বানরের চামড়া দেখে গরিলার মোলাকাতের জন্য আফ্রিকার ভয়ঙ্কর গভীর জঙ্গলে যাত্রা করেন। মানুষখেকো মানুষের সঙ্গেও বন্ধুত্ব পাতিয়ে তাদের ভাষা শিখে গরিলার নানা খবর জোগাড় করেন। বহু বাধাবিঘ্ন, বিপদ আপদ সহ্য করেও ডু শেলু সাহেব কীভাবে শেষপর্যন্ত একদিন গরিলার আড্ডায় পৌঁছান—তারই দুর্ধর্ষ গল্প ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ‘গরিলা চরিতে’ (*রামধনু*, ১৩৪০) উল্লেখ করেছেন। ডু শেলু শুধু নিজে গরিলা শিকারই করেননি, বিশ্ববাসীর কাছেও কীভাবে গরিলার বাস্তবিক অস্তিত্ব প্রমাণ করেন তাও ক্ষিতীন্দ্র এখানে তুলে ধরেছেন। দেশে প্রত্যাগত পাদ্রী সাহেবেরই বলা আফ্রিকার গরিলার কথা লোকে বিশ্বাস করেনি, গাঁজাখুরি গল্প ভাবে। সেখানে শৈশব থেকে আফ্রিকাবাসী, বুনো জাতেদের সঙ্গে মেলামেশা করা ডু শেলু সাহেবের পক্ষে ইংল্যান্ডে এসে গরিলা ‘বাস্তবিকই কাল্পনিক জীব নয়’ প্রমাণ করা খুব একটা সহজ সরল ব্যাপার ছিল না। ক্ষিতীন্দ্র লিখেছেন, ‘লোকে তাঁর কথা প্রথমে বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু এইসব চামড়া এবং আরও খুঁটিনাটি চাক্ষুষ প্রমাণ দেখাইয়া তিনি গরিলার অস্তিত্ব প্রমাণ করিলেন’।[৭] গরিলা এই অদেখা দারুণ জানোয়ারটিকে শিক ারির প্রথম দর্শনলাভের বিস্মিত ক্ষণটিকে বাঙালি লেখকরা যথেষ্ট টানটান উত্তেজনাময় রোমাঞ্চে ভরপুর ভাবে বর্ণনা করেছেন :

- ‘মাইল কতক চলবার পর হঠাৎ এক জায়গায় তারা দেখল মাটির ওপর পায়ের দাগ—প্রকাণ্ড, যেন ভীমের পা, কি মোটা আঙ্গুলগুলো। ...ডেম্বা ও মঙ্গরু বললে—“এই তো গরিলার পায়ের দাগ!” ...বনের মধ্য দিয়ে প্রায় এক মাইল চ’লে গেল, তবু গরিলা বা একটি শিয়ালের দেখা নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে এক একটা গাছের ছয়-সাত ইঞ্চি মোটা ডাল ভাঙ্গা রয়েছে দেখা গেল...হঠাৎ এক জায়গায় এসে ডেম্বা ও মঙ্গরু থম্‌কে দাঁড়াল। তাদের মুখ-চোখের চেহারা তখন বড় অদ্ভুত। চোখ দুটো বড় বড়, নাকটা ফুলে ফুলে উঠেছে, কান দুটো যেন খাঁড়া, সারা দেহ স্থির। ...শিকারিরা এবার শুনতে পেলে, ডালপালা ভাঙার মড়্ মড়্ শব্দ কিছু দূরে।...কৈ কোথায় কি? —আবার এক পা খুব ধীরে;—না কিছুই নেই তো! তারপর আরও এক পা এবং আরও এক পা বাড়াতে গিয়েই —ঐ যে! শোভনলাল দেখলে সমুখে গোটা কয়েক পাতার ফাঁকে বানরের মত লোমে ঢাকা একটা কালো দেহের খানিকটা অংশ— ঐ তো গরীলা!’[৮] (খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘আফ্রিকার জঙ্গলে’, *শিশুসাথী*)
- ‘জঙ্গলের মধ্যে ডু শেলু বসিয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, হঠাৎ কিছু দূরে ঝোপের

মধ্যে ঢাক পেটান'র মত দুম্ দুম্ আওয়াজ শোনা গেল। ডু শেলু মুখ তুলিয়াই দেখেন তাঁর সামনে বিরাট দৈত্যের মত একটা জানোয়ার দাঁত কিড়মিড় করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে, আর থাকিয়া থাকিয়া বুকের উপর দমাদ্দম্ কীল মারিতেছে। জানোয়ারটি ঠিক মানুষের মত লম্বা, কিন্তু তার বুকের ছাতি মানুষের তিন গুণ, সারা গা ভালুকের মত লোমে ঢাকা, হাত-পা গুলি প্রায় হাতির মত মোটা। মুখের চেহারা এমন বীভৎস যে দেখিলেই ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে। ডু শেলু অবশ্য আর দেরী করিলেন না, চক্ষের পলকে বন্দুকটি তুলিয়া জানোয়ারটিকে গুলি করিলেন।'[৯] (ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের 'গরিলা চরিত', *রামধনু*, ১৩৪০)।

- শোভনলাল একসঙ্গে জোড়া গুলি চালালে '...সারা বন কাঁপিয়ে উঠল এক ভয়ঙ্কর গর্জন। কোথায় লাগে সে গর্জনের কাছে সিংহের নিনাদ। ...এবার জন্তুটাকে স্পষ্ট দেখা গেল। প্রকাণ্ড দেহ। লাল চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মত ঘুরছে, চোখা চোখা দাঁতগুলো রাগে, যন্ত্রণায় বেরিয়ে পড়েছে। একবার নিজের চওড়া বুকখানার ওপর ধুম্‌ধাম্ করে ঘুষি মারে; এক একবার এক একটা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে কাম্‌ড়ে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলে দেয়; হুঙ্কার ছাড়ে, এপাশে ওপাশে হেলে পড়ে দু'হাতের উপর ভর দিয়ে শিকারিদের দিকে লাফিয়ে এল।'[১০] (খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আফ্রিকার জঙ্গলে', *শিশুসাথী*)।

গরিলা সম্পর্কে জানার প্রথম পর্বে ধারণা ছিল গরিলা মানেই 'আতঙ্ক'; কেননা গরিলা নাকি ভয়ানক হিংস্র, নিষ্ঠুর প্রাণী। নিরামিষভোজী হলেও গায়ে অসুরের শক্তি; মেজাজটি মোটেই মোলায়েম নয়, অত্যন্ত কড়া, ভীষণ হিংস্র। বাঘ সিংহ গন্ডার যে কোনও পালোয়ান জীবের সঙ্গে সমানে টক্কর দিতে পারে; আর মানুষ দেখা মাত্রই ভয়ঙ্কর আক্রমণ করে বসে। ডু শেলুর বর্ণনাতে হোক বা তার ভিত্তিতে লেখা ইংরেজি কিশোর উপন্যাসে বা বাংলা ছোটোদের গরিলা শিকারের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে—গরিলার আতঙ্কজনক অতি ভয়ানক রূপটিই প্রাধান্য পেতে থাকে। ফলে ভয়ঙ্কর অজানা জানোয়ারটির সাক্ষাৎ পাওয়া মাত্রই অনেক সময় সঙ্গে সঙ্গেই শিকার করা হত। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আফ্রিকার জঙ্গলে' যেমন শোভনলাল পাতার ফাঁকে বানরের মতো লোমোশ কালো দেহের খানিকটা অংশ দেখা মাত্রই, তা দেহের কোন্ অংশ ঠাহর করতে না পারলেও বুক মনে করে আন্দাজে একসঙ্গে জোড়া গুলি চালায়। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের 'গরিলা-চরিতে' অবশ্য বিশ্রামরত ডু শেলুর দিকে বিরাট দৈত্যের মতো গরিলাটি দাঁত কিড়মিড় করে ও বুকে দমাদ্দম্ কীল মারতে মারতে ছুটে

আসায় আত্মরক্ষার স্বার্থেই ডু শেলু চক্ষের পলকে গরিলাটিকে গুলি চালান। মানুষের সাক্ষাৎ মাত্রই গরিলার অতর্কিতে আচমকা মানুষকে আক্রমণ করতে ছুটে আসার আচরণটিই বেশির ভাগ গল্পে তুলে ধরা হয়েছে। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ডু শেলু ছাড়া আরও এক বড়ো শিকারির কঙ্গো অরণ্যের গরিলা শিকারের যে ঘটনা বর্ণনা করেন সেখানেও গরিলাটি শিকারিকে দেখে অতর্কিতে আক্রমণ করে। শিকারি বন্দুক তুলে গুলি করলেও গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় চোখের নিমেষে গরিলাটি বন্দুকটি কেড়ে নিয়ে 'সেটি দাঁতে টিপিয়া ছেলেরা যেমন করিয়া পাটকাঠি ভাঙ্গে তেমনি অনায়াসে মড়মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল।'[১১] ঠিক অনুরূপ ঘটনা ও দুর্ঘটনা বর্ণিত হয়েছে খগেন্দ্রনাথের 'আফ্রিকার জঙ্গলে'ও। পাহাড়ের তলায় প্রকাণ্ড গরিলাটি শিকারিদের দেখা মাত্রই এগিয়ে আসে। বীরেন্দ্র বন্দুকের দু-দুবার ট্রিগার টিপলেও ক্যাপে আগুন ধরে না। গরিলাটি বীরেন্দ্রকে ধরতে হাত বাড়ালে নিরুপায় বীরেন্দ্র গরিলাটির বুকে বন্দুকটা ছুঁড়ে মারে। 'গরিলাটা খপ্ ক'রে বন্দুক ধ'রে মড়াৎ করে ভেঙে দাঁত দিয়ে তার নলটা চেপ্টে ফেলে।'[১২] সেই সংকটমুহূর্তে রতনের গুলিতে গরিলাটির মৃত্যু হলে বীরেন্দ্র অবশ্য প্রাণে বাঁচে। শিকারিদের সাড়া পেয়ে দু-একটা গরিলার বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কিংবা স্তনদানরত মা গরিলার শিকারিদের দেখে চিৎকার করে উঠলেও আক্রমণ না করে বাচ্চাকে বুকে চেপে পালানোর কথা উল্লিখিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু 'আফ্রিকার জঙ্গলে'তে গরিলার মানুষ দেখে আক্রমণাত্মক রূপটিই প্রাধান্য পেয়েছে। নিশ্চিন্ত মনে গাছের কচি পাতা ভক্ষণরত গরিলাটিও শোভনলালকে দেখে তেড়ে আসে। বন্দুকের দুটো গুলি ও ছোরার আঘাত খাবার পরও গরিলাটি শোভনকে ঘুষি মারতে উদ্যত হয়। শোভনলাল ক্ষিপ্র গতিতে একপাশে সরে দাঁড়ানোয়, ঘুষি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তার বাঁ হাতের উপর পড়ে তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়।

আর গরিলা শিকার এতটা মারাত্মক বিপজ্জনক ও জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার জন্যই শিকারিদের কাছে গরিলা শিকার ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। আফ্রিকায় শিকারের ক্ষেত্রে 'Big-Game Hunting' এ Big Five (সিংহ, আফ্রিকান হাতি, বুনো মহিষ, লেপার্ড ও গন্ডার)-এর অন্তর্ভুক্ত না হলেও শিকারিদের কাছে গরিলা শিকার বিশেষ মর্যাদার হয়ে ওঠে। গরিলার মাংস, চামড়া, দেহাংশ থেকে বাণিজ্যিক

মুনাফা লাভের চেয়ে প্রাধান্য পায় গরিলা শিকার মারফত শিকারির দুর্লভ অসম সাহসিকতার কৃতিত্ব অর্জন। ডু শেলু সাহেব মূলত গরিলার অস্তিত্ব আবিষ্কারের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েও আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে গরিলার অন্বেষণে যান; গরিলা কাল্পনিক/অলৌকিক জীব নয়, বাস্তবে বর্তমান— এটি বহির্বিশ্বের কাছে প্রমাণের জন্য মূল্যবান-সাক্ষ্য রূপে গরিলা শিকার করে চামড়া খুলে নেন (ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের 'গরিলা-চরিত')। কিন্তু 'আফ্রিকার জঙ্গলে' উপন্যাসটিতে শোভনলালরা গরিলা শিকার করে তাদের চামড়া বা দেহাংশ কী করে—তার কোনও উল্লেখ খগেন্দ্রনাথ সেভাবে দেননি। তবে এই গভীরতম জঙ্গলে খাদ্যের অভাবে শোভনলালদের সকলকে খেতেও হয় গরিলার পোড়া মাংস। ডার্বানবাসী ভারতীয় ছেলে তিনটির গরিলা শিকার অভিযাত্রার পেছনে ছিল এক ধরনের অতৃপ্তি। চাই এমন 'ভয়ঙ্কর জানোয়ার' শিকার, যে-শিকারে থাকবে 'বিপদের মহোৎসব', পদে পদে 'মরণঘন ঝুঁকি'। প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গরিলাটিকে শোভনলাল শিকার করায়, পরবর্তী গরিলাটিকে দেখেও শোভনলাল আবার বন্দুক তুললে তাই বীরেন্দ্র শিকারের কৃতিত্ব অর্জনের জন্য বাধা দিয়ে বলে ওঠে—'এবার আমার পালা'।[১৩] পরে আরও চারটে গরিলা শিকারের পরও শোভনলালের শখ মেটেনি, পরের দিন কাউকে কিছু না জানিয়ে একাই সে বনের মধ্যে গরিলা শিকারে যায়। একাকি এরূপ দুঃসাহসী কাজে মন দ্বিধাগ্রস্ত হলেও পরমুহূর্তেই ভাবে 'ভয় কিসের? যার মনে সাহস নেই, সে আবার মানুষ?'[১৪] এ কালপর্বের বাঙালি শিশু-কিশোর সাহিত্যিকদের কলমে গরিলা শিকারের উদ্দেশ্য মূলত 'দুঃসাহসিক বীরত্ব', 'চূড়ান্ত সাহসিকতার' প্রদর্শন; গরিলার মতো 'ভয়ানক প্রাণী'র সাংঘাতিক বিপদঘন শিকারে জীবন-মরণের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে 'যথার্থ মানুষ', 'প্রকৃত বীর', 'শিকারির মতো শিকারি' রূপে নিজেকে প্রমাণ করা।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি চার্লস ডারউইন ও আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস পৃথকভাবে তাদের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব' উপস্থাপন করে জৈব বিবর্তন সংঘটনের প্রক্রিয়াটি অনেকটাই স্পষ্ট করে তোলেন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ডারউইনের *On the Origin of Species* প্রকাশিত হবার পর জৈব বিবর্তনে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব' বৈজ্ঞানিক মহলে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে ও সর্বসাধারণ কর্তৃকও ক্রমশ

সমাদৃত হয়। জৈব বিবর্তনকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের সঙ্গে মেন্ডেলীয় বংশগতিবিদ্যার (genetics) সমন্বয়ে 'বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণীতত্ত্ব' (Modern evolutionary Synthesis) প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে এই কালপর্বে গরিলা প্রাণীটির আবিষ্কার ও গরিলা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যগুলি প্রাণীবিজ্ঞানীদের কাছে এই জৈব বিবর্তনের সপক্ষে প্রামাণ্য রূপে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। মানুষের পূর্বপুরুষ বানর এবং তাদের মধ্যে মানুষের কাছাকাছি হল শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাংওটান—এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি ছোটোদের সামনে বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকার গরিলা সংক্রান্ত প্রবন্ধ, গল্প, শিকার কাহিনিগুলিতেও বারবার উপস্থাপিত করা হচ্ছে। আজ আমরা জানি, শিম্পাঞ্জিদের পরে গরিলাই মানুষের নিকটতম সমগোত্রীয় প্রাণী; মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জির ক্ষেত্রে প্রায় ৯৮.৮%, গরিলাদের ক্ষেত্রে প্রায় ৯৮%, ওরাংওটানের প্রায় ৯৭% DNA-এর মিল আছে।[১৫] তবে বিশ শতকের প্রথম পর্বে সম্ভবত ধারণা ছিল দেখতে শুনতে ও বুদ্ধিবলে মানুষের গরিলার সঙ্গে সাদৃশ্য বা মিলই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় বিরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মানুষের কাছাকাছি জীব' (*রামধনু*, ১৩৩৬), শ্রীকৌটিল্যের 'দুষ্প্রাপ্য জানোয়ার' (*রামধনু*, ১৩৬১) ইত্যাদি একাধিক লেখালেখিতে। আর উনিশ শতক এমনকি বিশ শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্তও বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদ (Scientific racism) অব্যাহত ছিল। বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদের প্রভাবে নিগ্রোরা বনমানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত বা কাছাকাছি, সাব সাহারান আফ্রিকান কালোমানুষ ও বনমানুষদের উভয়েরই মস্তিষ্কের cranial capacity কম বলে উভয়েই অসভ্য বা সভ্যতা গ্রহণে অসমর্থ—এরূপ নানা ছদ্মবৈজ্ঞানিক ধারণাও ছিল সেযুগের প্রচলিত দস্তুর।[১৬] ফলে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও কখনো সখনো এর ছাপ বাংলা ছোটোদের গরিলা সংক্রান্ত লেখাগুলিতেও পরোক্ষভাবে পড়েছে। গরিলা আফ্রিকার গভীরতম জঙ্গলবাসী হওয়ায় তাকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে খুব কম লোকেরই; জ্যান্ত বড় গরিলাও তখনও পর্যন্ত ধরার সাধ্য শিকারিদের হয়নি, বাচ্চা দু-চারটা ধরা পড়লেও লোকালয়ে বাঁচেনি। তাই *রামধনু*র খুদে পাঠকদের গরিলা দেখার সাধ মেটাতে 'মানুষের কাছাকাছি জীব'-এ বিরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল—মহাশয়ের পরামর্শ :

> একটা কালো নিগ্রোজাতীয় অসভ্য মানুষের গায়ে যদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোম লাগিয়ে দেওয়া যায়, হাত দুটিকে মানুষের হাতের দুতিন গুণ মোটা করিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত টানিয়া লম্বা করা যায়, বুক খানাকে ফুলাইয়া তিনগুণ করা যায়, এবং পায়ের পাতার গড়নটিকে অনেকটাই হাতের পাতার মত করা হয়, তবে মনে মনে একটি গরিলা দেখিয়া লইতে পার।[১৭]

বিশ শতক জুড়ে অসম সাহসিক শিকারি, গভীর তত্ত্বলিপ্সু পণ্ডিত, প্রাণীবিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদদের চেষ্টায় গরিলা সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়, তাদের খাদ্য-স্বভাব-আচরণ-ভালোবাসা-ক্রোধ-যৌনতা-অপত্য স্নেহ-ভাব বিনিময়ের নানা আওয়াজ বা ভাষা-পারস্পরিক বন্ধন ইত্যাদি সম্পর্কে নানা তথ্য ও গবেষণা ক্রমশ উঠে আসে; এতে দেখা যায় গরিলা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী সব ধারণাই সঠিক নয়। গরিলা আকারে ওজনে মানুষের সঙ্গে তুলনায় 'ভয়ঙ্কর জীব' বলে 'গরিলার কথা'য় (*রামধনু*, ১৩৪৫) বিরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করলেও সে সময়ে পণ্ডিতদের প্রদত্ত নতুন তথ্যগুলির সহায়তায় গরিলা সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাগুলি (অত্যন্ত হিংস্র, মানুষ দেখলেই পাশ না কাটিয়ে আক্রমণ করেই, মানুষের মতো খাড়া চলে, রাগলে দমাদ্দম্ নিজের বুকে কিল মারে ইত্যাদি গরিলার বদনামগুলি) ভেঙে দিচ্ছেন। ননীগোপাল মজুমদার 'জন্তু জানোয়ারের ভালবাসায়' (*রামধনু*, ১৩৩৮) গরিলার স্বভাব, চরিত্রের কথা বলেছেন। গরিলাদের লতাপাতা দিয়ে বাড়ি তৈরি, স্ত্রী সন্তানদের সুবিধার্থে যথাসাধ্য চেষ্টার কথা শোনানোর পাশাপাশি গরিলা পরিবারের কাউকে শিকারি হত্যা করলে তারা কীরূপ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে হত্যাকারী শিকারির মরিয়া ভাবে পিছু নেয় ও 'হয় নিজের নয় শিকারির' দফা নিকেশ করে—তার বর্ণনা দিয়েছেন। গরিলার স্বভাব সম্পর্কে প্রায় অনুরূপ অভিজ্ঞতাই ব্যক্ত করেন হীরেন্দ্রকুমার বসুর 'আফ্রিকার ডায়েরী'র *(শুকতারা)* এক শ্বেতাঙ্গ শিকারিও। কঙ্গো অরণ্যে তারা চারজন শিকারি বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করতে করতে এগোলে মাটিতে শুয়ে থাকা বাচ্চা গরিলাটিকে ছেড়ে প্রথমে পরিবারের অন্যান্যরা, তারপর পুরুষ গরিলাটি আর একদম শেষে নেহাৎ বাধ্য হয়ে মা-গরিলাও জঙ্গলে শিকারিদের দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। বাচ্চা গরিলাটির গায়ে শিকারি ডেভিস বন্দুকের খোঁচা মেরে তাকে মৃত দেখে দূরে টান মেরে ফেলে দেন। আর এ আচরণটিই ডেকে আনে চূড়ান্ত

বিপদ। ফেরার জন্য ঘুরতেই পুরুষ গরিলাটি ডেভিসকে আক্রমণ করে। অন্য তিন শিকারিকে আক্রমণ না করলেও তাদের বন্দুকগুলি ততক্ষণে অপর তিন গরিলার মুষ্টিতে। মল্লযুদ্ধে ডেভিসকে হত্যা করার পর সন্তানের মৃতদেহ নিয়ে গরিলারা জঙ্গলে অদৃশ্য হয়। হতচেতন স্তম্ভিত অপর তিন শিকারির গায়ে আঁচড়টিও দেয় না। সম্ভবত ডেভিসকেই তারা সন্তানের মৃত্যুর কারণ ভাবে; তাই তার প্রতি প্রতিশোধ। 'গরিলার ভালোবাসা' ও 'গরিলার প্রতিহিংসা'—গরিলার এই দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ শতকের বাংলা গরিলা শিকার কাহিনিগুলিতেও বারবার প্রাধান্য পেতে দেখা যায়।

রমেন্দ্রনাথ দের 'গরিলার প্রতিহিংসা'য় (*রামধনু*, ১৩৪৩) প্রসিদ্ধ শিকারি ইসাডোর সাহেব ও তার অনুচররা আফ্রিকার এক কাফ্রি গ্রামে ঢুকে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। গ্রাম একেবারে জনশূন্য, ঘরবাড়ি সব ভাঙাচোরা, পথে ঘাটে সর্বত্রই পড়ে অসংখ্য কাফ্রি নরনারীর মৃতদেহ ও কঙ্কাল, সঙ্গে দুচারটা গরিলার কঙ্কালও। সাহেবের বহু অনুসন্ধানের পর এই শ্মশানপুরীর প্রকৃত রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত হয়। মাস ছয় পূর্বে জনা পনেরোর এক শিকারি দলের সঙ্গে সাত আটটা গরিলার হঠাৎ সাক্ষাৎ মাত্রই পারস্পরিক প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাঁধে। সম্মুখ সমরে শিকারিদের হাতিয়ার কাজে আসে না, অধিকাংশকেই গরিলারা ছিঁড়ে পিষে ছাতু করে। তবে গরিলা দলেও খুন জখম কিছু না কিছু হয়। ফলে 'হাতের শত্রু' নিপাত হতেই গরিলারা ঠান্ডা না হয়ে প্রতিহিংসায় 'ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প এঁটে ফেল্লে'—'মহাশত্রু' মানুষের মূলই উপড়ে ফেলবে। ফলে 'শান্তির নীড়' কাফ্রি গ্রামখানিতে 'রক্তের দুর্ব্বার পিপাসায়' 'নিষ্ঠুর আক্রমণ' চালিয়ে গরিলা দল সারা রাত থেকে পরদিন দুপুর পর্যন্ত অত্যাচারে রক্তগঙ্গা বইয়ে তবেই অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে চলে যায়। এরপর পালিয়ে প্রাণ বাঁচানো গ্রামবাসীদের থেকে বাছা বাছা শিকারি নিয়ে গঠিত এক সশস্ত্র দল অত্যাচারী গরিলাদের সমুচিত শাস্তিবিধানে রওনা হয়। হঠাৎ একদিন যখন খবর আসে সমর বিজয়ী শিকারিদল হর্ষধ্বনি করে গ্রামে ফিরছে, তখন সহসা দূরে শোনা যায় গরিলাদের রুদ্র কলরব। ব্যাপার ভালো বোঝার আগেই গরিলাদল আবার গ্রাম ছেয়ে ফেলে—

> আজ তারা প্রতিহিংসার দ্বিগুণ আগুন বুকের ভেতর পুষে এনেছে; আজ তারা ক্ষমাহীন, রক্তের নেশায় উন্মাদ। দেখতে দেখতে সমস্ত গ্রামখানি তারা বিপর্য্যস্ত, লণ্ডভণ্ড করে দিল, অসহায় নরনারীগুলির প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি

খেলতে শুরু করল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সে কি প্রলয়ঙ্কর চিৎকার![১৮]

অনিষ্ট বা দলের কাউকে হত্যা করলে গরিলা যে হত্যাকারী মানুষটি বা হত্যাকারীর স্বগোষ্ঠীর মানুষদের প্রতি তীব্র প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে প্রাণ নিতে চায়—একথা গরিলাদের স্বভাব বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত ভাবে সত্য। কিন্তু রমেন্দ্রনাথ দে গরিলাদের ঠিক যেভাবে চিত্রিত করেছেন—'প্রচণ্ড হিংস্র', 'রক্তের নেশায় বেবুন ইত্যাদি প্রাণীর সঙ্গে হাঙ্গামা বাঁধাবার বদ মৎলব নিয়ে ঘোরা', 'শত্রুপক্ষের রক্তে মা বসুন্ধরার বুকখানা ভিজিয়ে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ', 'মানুষ বা শিকারিদল দেখামাত্রই প্রচণ্ড রক্তাক্ত সংঘর্ষে লিপ্ত', 'চোখ মুখে রক্তের দুর্বার পিপাসু', 'নিষ্ঠুর অত্যাচারী চরম প্রতিহিংসাপরায়ণ'—তা বিশ শতকের গরিলাদের সম্পর্কে প্রাপ্ত নতুন নতুন তথ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বেশ খানিকটা অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। প্রায় একই বিষয়—গরিলার সঙ্গিনীর প্রতি ভালোবাসা ও সঙ্গিনীর হত্যাকারী জনগোষ্ঠীর মানুষদের উপর প্রতিহিংসাকে—কেন্দ্রে রেখেই একটি অসামান্য শিকার গল্প 'বনমানুষের গল্প' (*মৌচাক*, পৌষ ১৩৫৪) ছোটোদের জন্য লেখেন প্রেমচন্দ্‌।

বিশ শতকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গরিলাদের নিয়ে গবেষণা চালানো পর্যবেক্ষক বিজ্ঞানীরা গরিলা শিকার, গরিলাদের বাসস্থানের হ্রাসপ্রাপ্তি, অসুখ বিসুখ ইত্যাদি নানা কারণে গরিলাদের সংখ্যা ক্রমশ দ্রুত হ্রাস পাওয়া বা বিলুপ্তি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন; গরিলাদের বিলোপ রুখতে যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও ট্যাক্সিডার্মিস্ট Carl Akeley, লেখিকা Mary Bardley দুই-তিনের দশক থেকে ও প্রাণীবিদ Dian Fossey ছয়ের দশক থেকে সোচ্চার হচ্ছেন। এর প্রতিফলন বাংলায় ছোটোদের জন্য রচিত গরিলা সংক্রান্ত লেখালেখিগুলিতেও [ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের 'গরিলাচরিত' (*রামধনু*, ১৩৪০), বিরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গরিলার কথা' (*রামধনু*, ১৩৪৫), শ্রীকৌটিল্যের 'দুষ্প্রাপ্য জানোয়ার' (*রামধনু*, ১৩৬১), রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বুনো মানুষ নয় বনমানুষ' (*শুকতারা*, ১৩৮২) ইত্যাদিতে] দেখা যায়। 'বনমানুষের গল্প' (*মৌচাক*, ১৩৫৪)-তে সঙ্গিনীর হত্যার প্রতিহিংসায় মানুষঘাতী বিপজ্জনক হয়ে ওঠা একটি গরিলার দুঃখ ভরা শোচনীয় পরিণতির আখ্যানটির মারফত প্রেমচন্দ্‌ গরিলা শিকার সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন।

তিমি শিকার কাহিনি

শুধু ডাঙার প্রাণীদের শিকারই নয়, জলজ প্রাণীদের শিকারের কথাও বিশ শতকের ছোটোদের পত্রপত্রিকায় স্থান পেয়েছে। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য তো 'তিমি শিকার' (*রামধনু*, বৈশাখ ১৩৪৩) এ দাবি করেছেন—সিংহ, গন্ডার শিকার শিকারের দিক দিয়ে 'খুব বড় দরের' 'খুব কষ্টবহুল' 'বিপজ্জনক' হলেও 'শিকারের মত শিকার হইতেছে তিমি শিকার'। কারণ তাঁর যুক্তিতে—তিমি খুব দুরন্ত প্রাণী নয় বরং নিরীহই, কিন্তু বিরাট শরীরের দৌলতে তিমি অনায়াসে সমুদ্র তোলপাড়ে, ঢুঁ মেরে জাহাজকে-জাহাজ চুরমারে কিংবা লেজের ঝাপটায় নৌকা এমনকি জাহাজও উল্টে দিতে সক্ষম। ফলে তখন তিমি শিকারির অবস্থা 'খুব একটা আরামপ্রদ হয় না'; শিকারির তিমির গ্রাসে যাবার পরিণতি ঘটাও অস্বাভাবিক নয়; কারণ তিমির পেটে এমন বিরাট বিরাট জলজন্তুর দেহ পাওয়া গেছে যাদের কাছে মানুষ তো অতিনগণ্য, ডাঙ্গার হাতিও নিতান্ত শিশু। ফলে এহেন তিমি শিকারের কাহিনি নিঃসন্দেহেই বীরত্ব ও রোমাঞ্চের। আটলান্টিক মহাসমুদ্রে তিমি শিকারকালে নিখোঁজ নাবিক বার্টালিকে পরে শিকারকৃত তিমির পেট থেকে অজ্ঞান কিন্তু জীবন্ত পাওয়া যাওয়ার সত্য ঘটনা নির্ভর বিস্ময়কর কাহিনি ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য শুনিয়েছেন 'অদ্ভুত ঘটনা'য় (*রামধনু*, ১৩৪৯)। এরূপ বিপজ্জনক তিমি শিকারের কথা বা গল্প ছোটোদের শোনাতে তাই শিশু-কিশোর সাহিত্যিকদের আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো প্রাণী তিমির সঙ্গে ছোটোদের পরিচিত করার চেষ্টা অবশ্য পূর্ববর্তী বাংলা ছোটোদের পত্রিকাগুলিতেও দেখা যায়। কিন্তু বিশ শতকের বাংলা ছোটোদের পত্রিকাগুলিতে তিমির পরিচয়দানের বদলে, তিমি শিকার কিংবা তিমির শিকার নির্ভর ব্যাবসা সংক্রান্ত লেখালেখি বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। তবে শিকার কেন্দ্রিক লেখা হলেও তিমি সম্পর্কে নানা তথ্য (যেমন—মাছ বললেও কেন তিমি আসলে মাছ নয়, জলজ স্তন্যপায়ী ডলফিন কিংবা শুশুক থেকে কোথায় স্বতন্ত্র; প্রাণীদের বিবর্তনে তিমি যে ডাঙ্গা ছেড়ে জলে আশ্রয় নেয় তার প্রমাণ কী; তিমির নানা প্রকারভেদ, তাদের বৈশিষ্ট্য-নিবাস-খাদ্য-স্বভাব-সন্তানপালন পদ্ধতি; তিমির খাদ্যগ্রহণ বা পরিপাক ক্রিয়া, শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া, শারীরিক গঠন ইত্যাদি) লেখকরা যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা বেশ সহজ সরল প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত হয়েও পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি প্রাণীবিজ্ঞান সম্মত। তিমি শিকার রোমাঞ্চকর হলেও নিছক আনন্দ উপভোগ বা শৌর্য বীর্য প্রদর্শনের জন্য

নয়, তিমি শিকারের আসল উদ্দেশ্য যে ব্যাবসায়িক স্বার্থ বা মুনাফা—বিশ শতকের বাংলার শিশু-কিশোরদের সেটা জানাতেও লেখকরা যথেষ্ট সচেতন :

> তিমির ব্যাবসা ক্রমেই একটা বড় দরের এবং প্রচুর লাভের ব্যাবসা হইয়া দাঁড়াইতেছে। তেমন তেমন এক-একটা তিমি ধরিতে পারিলে দশ পনেরো হাজার টাকা সহজেই উপায় করা যায়।[১৯] (ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের 'তিমি শিকার', *রামধনু* ১৩৪৩)

আমরা জানি, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই উপকূলীয় অঞ্চলে তিমি শিকার হত। কোরিয়ার নবপ্রস্তর যুগীয় 'বাঙ্গুডি পেট্রোগ্লিফস' (সম্ভবত ৬০০০ খ্রি. পূ.) চিত্রকর্মটি তার প্রাচীনতম নিদর্শন।[২০] বাণিজ্যিক তিমি শিকার বাস্কের শিকারিদের দ্বারা শুরু হয়ে ক্রমে ক্রমে প্রথমে উত্তর-আটলান্টিক ও পরে দক্ষিণ আটলান্টিকে পৌঁছে যায়। শিল্পবিপ্লবের সময় (১৭৬০-১৮৪০ খ্রি.) তিমির চর্বি থেকে প্রস্তুত তেলের (ট্রেন-ওয়েল) গুরুত্ব এত বৃদ্ধি পায় যে তিমি শিকারকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ শিল্প গড়ে ওঠে ও ক্রমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তিমি শিকারের জন্য বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে শত শত লোক অভিযানে যেত। প্রথমদিকে তিমি শিকার বেশ একটু বিপজ্জনকই ছিল। নৌকায় চড়ে হাতে করে বল্লম বা হার্পুন ছুঁড়ে তিমি শিকার করা হত। তিমি ক্ষেপে গিয়ে নৌকা ডুবিয়ে দিলে শিকারিদের অনেক সময়ই তিমির পেটে যেতে হত। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 'তিমি শিকার'-এ তেল ও হোয়েল বোনের জন্য নৌকা থেকে হাতে বল্লম ছুঁড়ে তিমি শিকারের বিপজ্জনক পদ্ধতিটি তুলে ধরেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের 'তিমি শিকার' (*সন্দেশ*, ১৩২১) প্রবন্ধটি পাশে রেখে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের তিমি শিকারের আলোচ্য লেখালেখিগুলি [হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তিমির গল্প' (*রামধনু*, ১৩৩৬), ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের 'তিমি শিকার' (*রামধনু*, ১৩৪৩), 'তিমির ব্যাবসা' (*রামধনু* ১৩৪৭), ও 'অদ্ভুত অভিজ্ঞতা' (*রামধনু* ১৩৪৯), কুঞ্জবিহারী পাল 'তিমি ও তিমি শিকার' (*রামধনু* ১৩৫৩), প্রবোধবন্ধু সেনগুপ্ত 'তিমির কথা' (*মৌচাক*, ১৩৬৮), কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 'তিমিঙ্গিল' (*মৌচাক*, ১৩৭১) ইত্যাদি] পড়লে বোঝা যায়, এই কয়েক বছরের মধ্যেই তিমি শিকারে বেশ পরিবর্তন ঘটে গেছে; আর শুধু তিমি শিকারের পদ্ধতিতেই নয়, রদবদল ঘটেছে তিমি শিকারের উদ্দেশ্যেও। তিমি শিকার ভিত্তিক ব্যাবসা বা শিল্প অত্যন্ত লাভজনক হওয়ায় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতেই প্রতিযোগিতামূলক তিমি শিকার শিল্প গড়ে ওঠে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহায়ে তিমি

শিকারকে সহজ ও কম বিপজ্জনক করার চেষ্টা চলতে থাকে। তিমি শিকারের জন্যই আলাদা এমন জাহাজ নির্মিত হয় যা তিমি সহজে উল্টাতে বা বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না। তিমিকে তিন চার দিক থেকে এইসব জাহাজ দিয়ে ঘিরে ফেলে, জাহাজের ছোটো ছোটো কামান থেকে হার্পুন ছুঁড়ে তিমির শরীরে গেঁথে ফেলা হয়। তারপর হার্পুনের সঙ্গের কয়েক হাজার ফুট লম্বা শেকলকেও কলের সাহায্যেই ইচ্ছেমত গুটিয়ে ছেড়ে হার্পুনবিদ্ধ তিমিকে সহজে কাবু করে ফেলে অবশেষে টেনে তোলা হয়। শিকার করা তিমির পেটে পাম্প দিয়ে বাতাস ভরে জলে সহজেই ভাসিয়ে জাহাজের দ্বারা টেনে কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়; কিংবা জলের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাবার বদলে জাহাজেরই খোলে সুরক্ষিত রাখতে বিশেষ দরজাযুক্ত নতুন ধরণের বিশাল জাহাজও ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞান প্রযুক্তির সহায়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ প্রাণী তিমিকেও 'বঁড়শিতে মাছ ধরা'র মতোই সহজে কীভাবে শিকার ও পরিবহণ করা হয় সেই বিস্ময়কর প্রক্রিয়াটি বিশ শতকের—'তিমি শিকার'—এর বাংলা আখ্যান ও প্রবন্ধগুলিতে ডিটেলিংসহ বর্ণিত হয়েছে। ছোটোদের কাছে আধুনিক তিমি শিকার প্রক্রিয়াটি সহজে বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক করতে প্রায় সব রচনাগুলির সঙ্গেই তিমি ও তিমি শিকারের বিভিন্ন আলোকচিত্র (Photo) বিশেষত তিমি শিকারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যে জাহাজগুলির সেগুলির আলোকচিত্র মুদ্রিত হচ্ছে।

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে ক্রমশ বাঙালি কালাপানির নিষেধাজ্ঞা ভেঙে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিয়মিত বিদেশ যাত্রা করছে। এসময়ই তারা অনেকে জীবনে প্রথম তিমি, হাঙ্গর প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ করার সুযোগ পাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই সেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাটি তাদের কলমেও উঠে আসতে দেখা যায়। এমনকি স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রার সময়ে (১৮৯২ খ্রি.) সুয়েজ খালে হাঙ্গর শিকার প্রত্যক্ষ করে তা অত্যন্ত সরস ভঙ্গিতে লিপিবদ্ধ করেন তাঁর 'বিলাতযাত্রীর পত্রে' *(উদ্বোধন পত্রিকা*; গ্রন্থাগারে প্রকাশ— *পরিব্রাজক*)। প্রথম মহাযুদ্ধকালে জার্মান-যুদ্ধ জাহাজ থেকে বাঁচতে সাধারণ সমুদ্রপথ ত্যাগ করে জাহাজ চলায় তিমির পালের প্রত্যক্ষদর্শী হন বাঙালি কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়; তিনি তিমি ধরার ও পরিবহনের আধুনিক জাহাজগুলোরই মজা করে নাম দিয়েছেন 'তিমিঙ্গিল' জাহাজ। কেননা, বাংলা সংস্কৃত অভিধানে, *রঘুবংশে* উল্লিখিত তিমিকে গিলতে পারা 'তিমিঙ্গিলে'র সন্ধান তিনি নানা জীববিজ্ঞানের বই, জাদুঘর ঘেঁটেও পাননি (*মৌচাক*, ১৩৭১)।

বিশ শতকে বিজ্ঞানের কাছে প্রধান দাবিটি হল—বিজ্ঞানকে একই সঙ্গে হতে হবে কার্যকর ও মুনাফাজনক। আগে শিকার করা তিমির চর্বি ও মুখের ঝালর সংগ্রহ করে বাকি দেহাংশ সমুদ্রেই ফেলে দেওয়া হত। কিন্তু ক্রমে তিমি শিকারে অর্থ বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীরা এই বিশাল অপচয় মানতে নারাজ হয়। তাদের উদ্যোগেই তিমি নির্ভর শিল্পগুলির বিকাশে নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণা শুরু হচ্ছে। ফলস্বরূপ—তিমির চামড়া, হাড়, সমস্ত দেহাংশ রাসায়নিক ওষুধ, জমির সার, চামড়াজাত আসবাব-জুতো-ব্যাগ ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হতে থাকে। এমনকি 'তিমির জিভটা নাকি ভীষণ নরম—কাদার মত নরম, সেটিকে দিয়াও কোন নতুন কিছু করা যায় কিনা তার চেষ্টা চলিতেছে।'[২১] সর্বোপরি বিশ শতকে তিমির শিকার ও ব্যবসায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল তিমির মাংসের মানুষের খাদ্যরূপে উন্নীত হওয়া; আর এটি ঘটে বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায়। পরীক্ষায় তিমির মাংস সুস্বাদু ও উপাদেয় প্রমাণিত হলে ব্যবসায়ীরা বিশেষত আমেরিকার তিমি ব্যবসায়ীরা তিমি মাংস মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যরূপে চালাতে 'জোর প্রচার, বক্তৃতা, খবর কাগজে লেখালেখি, সিনেমা ইত্যাদি মারফত জনসাধারণের মন তিমির মাংসের প্রতি লোলুপ করিয়া তুলিলেন।'[২২] নিউইয়র্ক বাজারে যেমন প্রকাশ্যে বেশ চড়া দামে তিমির মাংস বিক্রি হতে লাগল তেমনি এয়ারটাইট টিনে ভরে রাশি রাশি তিমি মাংস ইউরোপে চালান যেতে লাগল। বিশ্বযুদ্ধের কালে খাদ্যের ঘাটতি মেটাতে তিমি মাংস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। ফলে 'যুদ্ধের সময়ে অনেক ব্যাবসাদার টিনে করিয়া হাজার হাজার মণ তিমির মাংস চালান দিয়া এক দিকে যেমন সরকারের একটা মস্ত দুর্ভাবনা ঘুচাইয়াছে—অন্য দিক দিয়া তেমনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছে।'[২৩] ফলে দুই বিশ্বযুদ্ধকালেই তিমির শিকার ব্যাপক আকার ধারণ করে। আর একারণেই সম্ভবত বিশ শতকের এই কালপর্বের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতেও 'তিমি শিকার' নিয়ে আখ্যান, গল্প, প্রবন্ধের এত ছড়াছড়ি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে শুধু তিমি মাংসের চাহিদাই ব্যাপক বৃদ্ধি পায়নি। বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনে বিশেষত কামানশেল, গোলাবারুদে ব্যবহৃত তিমির তেলজাত নাইট্রোগ্লিসারিন ও কর্ডাইট, রাইফেল-ঘড়ি-মেরিন ক্রনোমিটার-মিলিটারি অস্ত্রশস্ত্র-যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত তেল (thin lubricant oil), সৈন্যদের তাঁবু-বালির বস্তা নির্মাণ ইত্যাদির জন্যও তিমির তেলের চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এসময়ে তিমি শিকারে মুখ্য স্থান দখলকারি ছিল নরওয়ে; বিশ্বযুদ্ধে নরওয়ের ভূমিকা ছিল নিরপেক্ষ (neutral)।

কিন্তু নরওয়ের তিমি শিকারের বেশিটাই ঘটত ব্রিটিশ দক্ষিণ আটলান্টিক অঞ্চলে; ফলে ব্রিটেন তিমি শিল্পকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়ে ওঠে এবং প্রাপ্ত তিমির তেলের প্রায় সবটাই খুব কম দামে কিনে নেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে তিমি শিকার ও শিল্পকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্রিটেন তথা মিত্রশক্তি কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার সুযোগ লাভ করে। অন্যদিকে জার্মান, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরিতে তিমির তেলের যথেষ্ট অভাব দেখা দেয়। এই অভাবপূরণের জন্য জার্মান সরকার দেশীয় জেলেদের সিলমাছ, ডলফিন শিকারে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে। বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের এরকম নানা খুঁটিনাটি খবরও ধরা আছে এই সময়ের বাংলা তিমি শিকারের রচনাগুলিতে।

এখানে অবশ্য একটা ব্যাপারে খটকা লাগে। বিশ্বযুদ্ধ কালে 'পৃথিবীর সবচেয়ে মাংসপ্রিয় জাত' ইউরোপীয়দের মাংসের ঘাটতি কমাতে 'আমেরিকার ব্যবসায়ীরা' তিমি মাংস সরবরাহ করে মুনাফায় ফুলে ফেঁপে ওঠে; সেই সঙ্গে মাত্রাহীন তিমি শিকার করার ফলে তিমির বিভিন্ন প্রজাতিকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এসব তথ্য খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে আলোচ্য লেখাগুলিতে উঠে এসেছে। কিন্তু বিশ শতকে বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপানেও তিমি মাংসের ব্যবহার ব্যাপক বেড়ে যায়। জাপানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে তিমি শিকার থাকলেও মোটামোটি ১৮৬০-৯০ খ্রি. নাগাদ জাপানও পাশ্চাত্য আধুনিক তিমি শিকার পদ্ধতি গ্রহণ করে। প্রথমদিকে তিমির চর্বি, রক্ত জলে মেশায় ও তিমিকে 'পবিত্র' ভাবার জন্য স্থানীয় জেলেরা নিজেদের মাছ ধরায় ক্ষতির আশঙ্কাতে আধুনিক তিমি শিকারে বাধা দেয়; কিন্তু ক্রমে বিশ শতকে জাপান (তার উপনিবেশ তাইওয়ান ও কোরিয়ার জলভূমিকেও ব্যবহার করে) ব্যাবসায়িক তিমি শিকার ও শিল্পে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে জাপানের বোর্নিন দ্বীপপুঞ্জাদি মার্কিন সেনারা দখল করায় (১৯৪৫ খ্রি.), ইম্পিরিয়াল জাপান সেনাবাহিনী শিকার জাহাজগুলিকেও পরিচালনা করায় ও যুদ্ধশেষে কয়েকটি জাহাজ ডুবে যাওয়ায়—এই সময় জাপানে তিমি শিকার কিছুটা সীমাবদ্ধ (limited) হয়ে পড়ে। তবে যুদ্ধশেষে আত্মসমর্পণকারী জাপানকে মার্কিন General Dog Douglas MacArthur ক্ষুধিত মানুষের মাংসের সস্তা উৎসরূপে তিমি মাংস ব্যবহারে এবং আমেরিকা ও ইউরোপকে মিলিয়ন ডলার তিমি তেল প্রদানের জন্য পুনরায় তিমি শিকারে উৎসাহিত করেন। বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে জাপানে ব্যাবসায়িক তিমি শিকার আবার দ্রুত পুনরুদ্ধার হয় ও বিশাল আকার ধারণ করে। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জাপানে মানুষের খাদ্যরূপে তিমি মাংস ব্যবহার (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে মূল মাংসের ৫০ শতাংশই) প্রচণ্ড বেড়ে যায়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে জাপানি শিশুদের পুষ্টিতেও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে 'স্কুল লাঞ্চ আক্টে' তিমি মাংস অন্তর্ভুক্ত হয়। ICRW, IWC কেও জাপান অস্বীকার করে। আজ একবিংশ শতাব্দীতেও কখনও গবেষণার নামে তিমি শিকার অব্যাহত রেখে, কখনো বা বাণিজ্যিক তিমি শিকার পুনরায় চালু করে জাপান পরিবেশবিদ, সংরক্ষণবাদী ও তিমি শিকার বিরোধী দেশগুলির সঙ্গে তীব্র সমালোচনা বিতর্কে জড়ায়। তিমি শিকার ও তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত বিশ্বযুদ্ধের নানা ঘটনা, তিমি শিকারে বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ইত্যাদি ছোটোদের পত্রিকার আলোচ্য তিমি শিকার সংক্রান্ত লেখালেখিগুলিতে বারবার উঠে এসেছে। কিন্তু কোনও লেখায় তিমি শিকার নিয়ে জাপানের কোনও তথ্যই এখনও পর্যন্ত অন্তত আমাদের চোখে পড়েনি। অথচ এসময়ের বাঙালি লেখকরা জাপান সম্পর্কে নানা তথ্য ছোটোদের জানাতে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। 'জাপানের দীর্ঘপুচ্ছ ময়ূর', 'জাপান কবে জাগিল', 'জাপান দেশের ছেলেমেয়ে', 'তোমাদের জাপানে এনেছি', 'ড্রাগনের বছরে জাপান', 'জাপানের একটি অশান্ত ছেলে', 'জাপানী সৈনিকের এক পাতা', 'জাপানী সভ্যতায় ডাচ প্রতিভা', 'জাপানী সেলুলয়েড', 'জাপানী বাগান' ইত্যাদি—ছোটোদের পত্রিকায় এই সময় প্রকাশিত এরকম অসংখ্য লেখালেখি তার সাক্ষ্য দেয়। অথচ বাণিজ্যিক তিমি শিকার ও তিমিদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা হ্রাসের ক্ষেত্রে আমেরিকার ব্যবসায়ী, নরওয়ে ও আইসল্যাণ্ডের ভূমিকার প্রসঙ্গ এলেও জাপানের উল্লেখ আমাদের সেভাবে দৃষ্টিগোচর হয়নি। এই কালপর্বের বাঙালি তিমি শিকার লিখিয়েদের জাপান সম্পর্কে এই নীরবতা কেন?

'মরিবার আগে হার্পুন খাইয়া তিমি যে চিৎকার ছাড়ে, লেজের ঝাপ্টায়, মাথার ঢুঁতে সমুদ্রের মধ্যে যে প্রকাণ্ড আলোড়ন তোলে—সে নাকি একটা দেখিবার জিনিস।'[২৪] —এমনটাই জানিয়েছিলেন 'তিমি শিকার' এর লেখক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। বিজ্ঞান নির্ভর আধুনিক তিমি শিকারের রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিলেও ক্ষিতীন্দ্র কিন্তু গোটা রচনাতেই বারবার তিমিদের ক্রমশ সংখ্যা হ্রাস বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া নিয়ে আশঙ্কা করেছেন :

- 'মানুষের এই লোভের ফলে হয়তো পৃথিবী হইতে এক সময়ে তিমির বংশই লোপ পাইয়া যাইবে।'[২৫]
- 'এই চিরুনীর ঝালর মানুষের বড় সৌখীন জিনিস শুধু এরই জন্য আগে বহু শিকারি

তিমির পিছনে পিছনে ঘুরিত এবং শুধু মানুষের এই উৎকট সখ মিটাইবার জন্যই আজ পর্যন্ত বহু তিমি জীবন দিয়াছে।’[২৬]

‘তেলের লোভে’ মানুষের ‘বে-হিসাবী শিকারে’ ব্লু, রাইট, জো হেড, গ্রে তিমিদের সংখ্যা একদম কমে যাওয়া, এসপারেম তিমিদেরও কম দেখতে পাওয়া নিয়ে একই ধরনের আশঙ্কার সুর শোনা যায় প্রবোধবন্ধু সেনগুপ্তর ‘তিমির কথা’তেও (*মৌচাক*, ১৩৬৮)।

নিউজিল্যাণ্ড উপকূলের ‘পোলারস জ্যাক’ যাকে নাবিকরা, স্থানীয় বাসিন্দারা সবাই স্নেহ করত, দেবতা-টেবতাও ভাবত, যার কোনও ক্ষতি করাতে সরকার থেকেও নিষেধাজ্ঞা (একবার কোনও জাহাজ থেকে গুলি চালানোর পর থেকে) জারি ছিল, সেই ‘প্রায়-পোষ মানা’ তিমিটির অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার গল্প ছোটোদের শুনিয়ে শেষে ক্ষিতীন্দ্র দুঃখিত স্বরে জানিয়েছেন—‘গত মহাযুদ্ধের পর হইতে জ্যাককে আর দেখা যায় নাই—হয়তো সে আর বাঁচিয়া নাই।’[২৭] সমুদ্রে প্রায়ই দেখা যাওয়া, জেলেদের জালের মাছ চোর এক সিলমাছের এরকমই একসময় অন্তর্ধান হয়ে যাওয়া নিয়ে ননীগোপাল মজুমদার লেখেন ‘শিকার-কাহিনী সীল সিংহ’ (*রামধনু*,১৩৪৬)। পাহারারত জেলেদের ভয় দেখাতে সীলসিংহ জলাবোটে উঠে মিঃ বার্কারকে আক্রমণ করে; তাকে সমুদ্রের জলে ও পাড়েও তাড়া করে। সিলের সামনের দু-পায়ে প্রাণপণে ছোঁড়া পাথর কপালে লেগে লাঠি নিয়ে তাড়া করা দুজন জেলেও অজ্ঞান হয়। মাছের দেবতার রোষে পড়ার ভয়ে জেলেরা সিল শিকার করতে না চাইলেও এবার মিঃ বার্কারের পরামর্শে ‘জালে মাছ না পড়ার কারণ সীলসিংহ’কে শিকারে মত দেয়। জলাবোটে ব্যান্ড বাজতে থাকলে গানের ভক্ত সিল মিনিট পাঁচের মধ্যেই ভেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তৈরি থাকা দুই শিকারির বন্দুক গর্জে ওঠে। আচমকা আক্রমণে হতবুদ্ধি সীলসিংহ সেই যে ডুব দেয় আর আসে না। লেখকের পক্ষপাত যে সীলসিংহেরই দিকে তা বোঝা যায় গল্পের অন্তিম বাক্যটিতে—‘যারা সামনাসামনি না পেরে কাপুরুষের মত যুদ্ধ করে সীলসিংহ তাদের সঙ্গে থাকতেও ঘৃণা বোধ করে।’[২৮]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় খাবারের চাহিদা মেটাতে তিমি শিকার ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। ১৯৩০-এর দশকের শেষ দিকে বছরে প্রায় ৫০০০০ তিমি হত্যা করা হত।[২৯] ফলে তিমির বিভিন্ন প্রজাতির সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। তিমি প্রজাতিদের যথাযথ সংরক্ষণ ও তিমি শিকারকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বব্যাপী আলাপ আলোচনা শুরু হয়। যার ফলস্বরূপ-১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ‘International Cooperation on Whaling Regulation’ ও ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয় ‘International Convention for

the Regulation of Whaling' (ICRW) এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে এসে IWC (International Whaling Commission) বাণিজ্যিক তিমি শিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে যুদ্ধ থামলে খাদ্যরূপে তিমি মাংসের ব্যবহার বন্ধ হয়নি কিন্তু চাহিদা কিছু কমে গিয়েছিল। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী এই কালপর্বে এবং পরে বিংশ শতাব্দীর পাঁচ-ছয়ের দশকে বাংলা ছোটোদের পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত তিমি শিকারের রচনাগুলিতে আধুনিক তিমি-শিকার পদ্ধতি বর্ণিত হলেও সেগুলিতে তৎকালে তিমির-ব্যাবসাকে সুশৃঙ্খলিত করার বা তিমি সংরক্ষণের জন্য বিশ্বব্যাপী যে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছিল তারও প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন প্রায় আসন্ন, তখন খাদ্যের টান পড়ার আগেই যতটা সম্ভব তিমি মাংসের জোগাড় করে রাখতে ব্যবসায়ীরা তোড়জোড় করছেন; বিজ্ঞানীরাও তিমি ধরার ও তিমি মাংসকে অধিক দিন টাটকা রাখার প্রসেসিং-এর নতুন নতুন উপায় আবিষ্কার করছেন। সেই মুহূর্তের বাংলা লেখাগুলিতে তিমি সংরক্ষণের কথাবার্তা তুলনামূলকভাবে কম। পৃথিবীতে তিমির সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাওয়ায় তিমি ব্যবসায়ীদের সুদিন আর কতকাল চলবে তা নিয়ে আশঙ্কা করা হলেও, সেই আশঙ্কার স্বর বেশ ক্ষীণ বা এর জন্য তামাম লেখায় মাত্র এক লাইন হয়তো ব্যয় করা হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের লেখাগুলিতে মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে তিমি মাংসের ব্যবহার বা তিমি শিকারকে বাঙালি লেখকরাও অস্বীকার করতে পারছেন না—'এমন একটি বিরাট্‌কায় জীবের মাংস যদি খাওয়ার উপযোগী হয় তবে তা দিয়া না জানি কত বুভুক্ষু মানব-সন্তানের মাংস ক্ষুধা দূর করা যায়।'[৩০] (ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের 'তিমির ব্যাবসা', *রামধনু*, ১৩৪৭)

তিমি শিকার ও শিল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয় এমন একটি দেশের বাসিন্দা হয়েও বিশ শতকের বাঙালিরা তিমি শিকার বিশেষত বিজ্ঞান প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক শিকার পদ্ধতিটি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়েছেন ও তা ছোটোদেরও জানাতে চেয়েছেন; তিমি শিকার যে বিনোদনের জন্য নিছক শিকারক্রীড়া নয়, এর সঙ্গে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পুঁজি, ব্যাবসা, শিল্প, মুনাফা, ক্ষমতার লড়াই, রাজনৈতিক ঘটনা, সর্বোপরি দুই বিশ্বযুদ্ধ কীভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তাও লেখাগুলিতে বারবার উঠে এসেছে। তিমি শিকার ও সংরক্ষণ নিয়ে বাঙালির ভাবনাচিন্তা, সমকাল ও সমকালের বাস্তবতার অভিঘাতে সেই ভাবনায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে চলা সূক্ষ্ম রদবদলগুলিও—তাদের এই লেখাগুলিতে চোখে পড়ে।

ক্যাঙ্গারু শিকার কাহিনি

বিশ শতকে বাংলা ছোটোদের পত্রপত্রিকায় 'ক্যাঙ্গারু' নিয়ে যেমন অনেকগুলি প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে, তেমনি শিকার-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও 'ক্যাঙ্গারু-শিকার' বিষয়টি যথেষ্ট প্রাধান্য পাচ্ছে। পৃথিবীর মধ্যে শুধুমাত্র অস্ট্রেলিয়া-নিবাসী, একটু অদ্ভুত গোছের চেহারা (পিছনের পা ও লেজ মস্ত বড়ো), লাফিয়ে চলা, 'মারসুপিয়াল' (থলিওয়ালা) জানোয়ার হওয়ার জন্যই সম্ভবত ক্যাঙ্গারুর প্রতি এই আকর্ষণ। সপ্তদশ শতাব্দীর আগে ক্যাঙ্গারুর সম্পর্কে বাঙালি কেন, বিশ্ববাসীই জানত না। শুধুমাত্র অস্ট্রেলিয়া নিবাসী এই অদ্ভুত প্রাণীটির কে প্রথম বর্ণনা দেন—এনিয়ে যেমন বিতর্ক আছে, তেমনি নামটি নিয়েও আছে মতভেদ। তবে বহির্বিশ্বের কাছে ক্যাঙ্গারুর পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা মূলত গড়ে ওঠে Captain James Cook-এর অস্ট্রেলিয়া আগমনের (১৭৭০ খ্রি.) পর, মূলত এখানে ব্রিটিশ উপনিবেশ (১৭৮৮ খ্রি.) গড়ে ওঠার কালে। বিশ শতকের তিনের দশকে আলিপুর চিড়িয়াখানাতেও বিদেশ থেকে আমদানীকৃত এই অদ্ভুত প্রাণীটি দেখার সুযোগ ছিল। ফলে এই ক্যাঙ্গারুপ্রাণীটি সম্পর্কে নানা তথ্য, গল্প এমনকি শিকার কাহিনি শোনাতে যেমন বাঙালি শিশু-কিশোর সাহিত্যিকরা বারবার আগ্রহী হয়েছেন, তেমনি খুদে পাঠকদেরও সম্ভবত তা জানতে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। মূলত মাংস ও চামড়ার জন্য ক্যাঙ্গারু শিকার করা হত। অবশ্য পরবর্তীকালে মারার চেয়েও জীবন্ত ধরার চেষ্টাই বেশি হত; 'কেননা ওদের ঐ অদ্ভুত চেহারার জন্য জ্যান্ত ক্যাঙ্গারুর চাহিদা পৃথিবীর সর্বত্র।'[৩১] চিড়িয়াখানাগুলিতে প্রদর্শন কিংবা পোষ মানিয়ে নানারকম খেলা বিশেষত boxing দেখানোর জন্যও সেসময় জ্যান্ত ক্যাঙ্গারুর চাহিদা ছিল তুঙ্গে। নিরামিষভোজী, নিরীহ হলেও ক্যাঙ্গারু ছোটায় খুব মজবুত। বাঘ সিংহ হাতি গন্ডার ইত্যাদি শিকারে (Big Games) জীবনের ঝুঁকি থাকায় যে রূদ্ধশ্বাস শিহরণ থাকে, ক্যাঙ্গারু শিকারে তা না থাকলেও শিকারির শিকার নিশানায় (Shooting) দক্ষতা প্রমাণের যথেষ্ট সুযোগ থাকত। ঠান্ডা, নিরীহ স্বভাবের হলেও বিপদের গন্ধ পেলেই দ্রুত পলায়নরত ছুটন্ত ক্যাঙ্গারুকে গুলিবিদ্ধ করা বা ধরা খুব সোজা সরল ব্যাপার নয়। ফলে ক্যাঙ্গারু শিকারের গল্পও হত বেশ আকর্ষক। অস্ট্রেলিয়ার আদি স্থানীয় বাসিন্দারা মূলত মাংস বা দেহাংশের জন্য অনেক সময় জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে বা জাল দিয়ে ক্যাঙ্গারু শিকার করত। কিন্তু ক্যাঙ্গারু শিকার ও

জীবন্ত ক্যাঙ্গারু ধরা ব্যাপক বৃদ্ধি পায় অস্ট্রেলিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের সময় থেকে। ক্যাঙ্গারু শিকারের সঙ্গে বিনোদন ও ব্যাবসায়িক মুনাফা লাভের স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয় এই ঔপনিবেশিক কালপর্বেই। আরেক উপনিবেশের প্রজা থাকার সদ্যস্মৃতি থেকে শ্রীকৌটিল্যের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ায় ক্যাঙ্গারু শিকারের সঙ্গে যুক্ত এই ঔপনিবেশিক মাত্রাটি বুঝতে কোনও ভুল হয়নি। 'ক্যাঙ্গারুর গল্প' (*রামধনু*, শ্রাবণ ১৩৬২)-তে ছোটোদেরকেও এই গভীর সত্যটি তিনি জানিয়ে দেন,

> ক্যাঙ্গারুর মাংস নাকি খেতে বেশ সুস্বাদু, তাছাড়া ওর চামড়াখানারও দাম আছে। কাজেই প্রথম যখন শ্বেতকায় জাতি এসে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস শুরু করল তখন ক্যাঙ্গারু শিকার তাদের কাছে একটা লোভনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তাছাড়া, অস্ট্রেলিয়ার একটা বড় ব্যাবসা হচ্ছে পশুপালন। এইসব পশু বিশেষ করে গরু ভেড়ার জন্য প্রচুর খোলা মাঠ দরকার। ঐসব জায়গা থেকে ক্যাঙ্গারুকে তাড়াবার জন্যও অনেক ক্যাঙ্গারুকে মারা হতে লাগল।[৩২]

বহিরাগত উপনিবেশের স্থপতিরা চাষবাস ও গবাদি পশু পালনের স্বার্থে স্থানীয় বন্য পশুদের—সে নিরীহ ক্যাঙ্গারু হোক কি হিংস্র ডিঙ্গো—নিধনযজ্ঞে মেতে ওঠে। ক্যাঙ্গারু শিকার অস্ট্রেলিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনকারীদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও লাভজনক ছিল তা বোঝা যায় তাদের ক্যাঙ্গারু শিকারে ওস্তাদ বিশেষ শক্তিশালী শিকারি কুকুর ক্যাঙ্গারু-হাউণ্ডের উৎপাদনে (ইচ্ছাপূর্বক বিভিন্ন sight hound প্রজাতির সংকর প্রজনন ঘটিয়ে উৎপাদন)। ক্যাঙ্গারুর আত্মরক্ষার মূল অস্ত্র পলায়ন। অত্যন্ত নিরীহ, লাজুক প্রাণী হলেও আত্মরক্ষার জন্য ক্যাঙ্গারু কখনো-কখনো ভীষণ রাগী বা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ভয়ানক হয়ে উঠে মরিয়া ভাবে রুখে দাঁড়ায়। অনেক সময় কুকুর তাড়া করলে তারা জলে নেমে পড়ে, কুকুরও তাড়া করে জলে নামলে ক্যাঙ্গারু বাগে পেলে কুকুরকে জলের তলায় খানিক চেপে ধরে মেরে ফেলে। এভাবে বহু কুকুরের প্রাণ যাওয়ায় উপনিবেশ স্থাপনকারীদের অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারুকে সহজেই কাবু করার জন্য শক্তিশালী বিশেষ ওস্তাদ শিকারি কুকুরের প্রয়োজন ঘটে। 'ক্যাঙ্গারু হাউণ্ড'দের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হত যাতে জলে নামা ক্যাঙ্গারুকেও চারদিক থেকে তাড়া করে এরা তীরের দিকে নিয়ে এসে কোণঠাসা করে ফেলে। ভালো সাঁতারু না হওয়ায় ক্যাঙ্গারু হাফিয়ে পড়লেই শিকারিরাও তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে সহজেই বন্দি করে ফেলত।

ক্যাঙ্গারু হাউণ্ডদের সাহায্যে শিকারির 'ক্যাঙ্গারু শিকারে'র ছবি সহ বর্ণনা বিশ শতকের বাংলা ছোটোদের পত্রিকায় বারবার উঠে এসেছে (সুবিনয় রায়ের 'কাঙ্গারু শিকার', শ্রী কৌটিল্যের 'ক্যাঙ্গারুর গল্প')।

অস্ট্রেলিয়া দ্বীপ-মহাদেশের পোর্টজ্যাকশনে (যা পরে বৃহৎ হয়ে সিডনি শহর) ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ কয়েদিদের উপনিবেশ (Penal colony)-এর সূচনা হয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন অস্ট্রেলিয়া গঠনের পূর্ব পর্যন্ত উনিশ শতক জুড়ে অস্ট্রেলিয়ায় একগুচ্ছ ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। ফলে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আরেকটি ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারত বিশেষত রাজধানী কলকাতার ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সূত্রে যোগাযোগ ও বন্ধন গড়ে ওঠে। এমনকি পরবর্তী অর্ধশতাব্দীতে অস্ট্রেলিয়ার ভারতের সঙ্গে এই যোগযোগ (immediated direct links) লণ্ডনের চেয়েও অধিক হয়। আমলা, ব্যবসায়ী, যাজক, বিচারকদের উভয় ব্রিটিশ উপনিবেশের মধ্যে যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। ভারতীয়দের শ্রমিক, গৃহসহায়ক কর্মীরূপেও অস্ট্রেলিয়া প্রেরণ করা হয়। নবগঠিত উপনিবেশ, অস্ট্রেলিয়ার খাদ্য রসদের অন্যতম উৎস যেমন ছিল ভারত, তেমনি ভারতের ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির উত্তর পশ্চিম ফ্রন্টের জন্য অশ্বারোহী ঘোড়ার অস্ট্রেলিয়াতে প্রজনন ঘটান হত। ব্রিটিশ উপনিবেশের ফলরূপে উভয় স্থানেই ইংরেজি ভাষা, ক্রিকেট খেলা ইত্যাদি যেমন চালু হয়, তেমনি 'শিকার' হয়ে ওঠে বহুমাত্রিক ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অঙ্গ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অস্ট্রেলিয়ার সরকার (প্রধানমন্ত্রী Ben Chifley) ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ থেকে মুক্তি বা স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে সমর্থন জানান। পরে 'Colombo Plan'-এর মাধ্যমে ১৯৫০-৬০ খ্রি. কালপর্বে বহু ভারতীয় ছাত্র অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চশিক্ষার জন্য যান। অস্ট্রেলিয়ায় ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপন কালে একমাত্র সেখানেই প্রাপ্ত 'ক্যাঙ্গারু' এই অদ্ভুত, নতুন প্রাণীটি খুব দ্রুত ইউরোপের বিশেষত শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণির দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলে। উপনিবেশের স্বার্থ ও মুনাফার লোভে ক্যাঙ্গারু শিকার ব্যাপক বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক সাহেবদের লেখাপত্রেও ক্যাঙ্গারু ও ক্যাঙ্গারু শিকারের কাহিনি উঠে আসতে থাকে। Captain Cook-দের ক্যাঙ্গারুর সাক্ষাৎ লাভ কিংবা কুকের অফিসার John Gore-এর ক্যাঙ্গারু শিকারের প্রথম নথিকরণ (১৭৭০ খ্রি.)-এর সময় থেকে Ethel C. Pedley-এর ক্লাসিক শিশুসাহিত্য *Dot and*

the kangaroo (১৮৯৯ খ্রি.) (ক্যাঙ্গারুসহ বন্য প্রাণীদের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুর অত্যাচারের সমালোচনার)— মধ্যবর্তী কালপর্বে ক্যাঙ্গারুকে কেন্দ্র করে অজস্র সাহিত্য, বিখ্যাত সব চিত্র (Painting) ইত্যাদি শিল্পকর্ম গড়ে উঠেছে। সেইসব লেখাপত্র, খবর পড়ার সুযোগ সম্ভবত আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালিরাও পেত। এজন্যও হয়তো বাঙালি শিশু-কিশোর সাহিত্যিকদের ছোটোদের জন্য রচিত শিকার-সাহিত্যে অস্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্ত 'ক্যাঙ্গারু' এই প্রাণীটি বিষয় রূপে বিশেষ প্রাধান্য পায়। বাঙালি সাহিত্যিকরা বিশ শতকের ছোটোদের পত্রিকার পাতায় ক্যাঙ্গারু শিকারের যেসব গল্প শোনাচ্ছেন খেয়াল করলে দেখব, তার অধিকাংশই হয় বিদেশি শিকার কাহিনির বঙ্গানুবাদ নচেৎ তার বা নানা খবরাখবরের ভিত্তিতেই মূলত লেখা। আর অন্যান্য বাংলা ছোটোদের শিকার কাহিনির মতোই ক্যাঙ্গারু শিকার কাহিনিগুলিতেও ঐ প্রাণীটি শিকারের উদ্দেশ্য, শিকারের পদ্ধতি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীটির একটি বিজ্ঞানসম্মত পরিচয়ও (যেমন—ক্যাঙ্গারুর শারীরিক অদ্ভুত গঠন, বিশেষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, তাদের বিভিন্ন প্রকার ভেদ, স্বভাব, আত্মরক্ষার পদ্ধতি ইত্যাদি) কাহিনিসূত্রেই ছোটোদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়করূপে হাজির করতে সব কাহিনিকাররাই সচেষ্ট হয়েছেন। অনেক সময় ক্যাঙ্গারু শিকারসূত্রেই অস্ট্রেলিয়ার বিশেষ আবহাওয়া, প্রকৃতি, সর্বোপরি অস্ট্রেলিয়াতে প্রাপ্ত ওয়ালেবি (ক্যাঙ্গারু জাতীয় ছোটো প্রাণী), ডিঙ্গো (বুনো কুকুর), ঈমিউ পাখি ইত্যাদির প্রসঙ্গও এসেছে। ক্যাঙ্গারু বা অন্যান্য প্রাণীর শিকারের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ান সরকারের নিয়মকানুন, পুরস্কার ইত্যাদিও উল্লিখিত হয়েছে। সমর সরকারের 'ক্যাঙ্গারু শিকার কাহিনী'তে (*রংমশাল*, বৈশাখ ১৩৪৮) মিঃ বার্ট ফেয়ারহেড দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় ম্যালেট গাছের ছাল সংগ্রহের জন্য 'গবর্নমেন্ট লাইসেন্স' নিয়ে যাত্রা করেছেন। কেননা, তাঁর 'ইচ্ছা—শিকার ক'রে কিছু আমোদ উপভোগ করা ও ম্যালেট গাছের ছাল সংগ্রহ করে কিছু অর্থ উপার্জন'।[৩৩] কাহিনিকারের বর্ণনায় লক্ষণীয়, মিঃ বার্ট ফেয়ারহেড একজন 'ভদ্রলোক', পেশাদার কোনও শিকারি নন তিনি। তবু নিজের কাজের ফাঁকে আমোদ উপভোগের জন্য তিনি ক্যাঙ্গারু ইত্যাদি শিকারে ইচ্ছুক। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, ভারতের মতোই অস্ট্রেলিয়াতেও এই কালপর্বে একদল শিক্ষিত ভদ্রলোক শখের শিকারির উদ্ভব ঘটে। তবে অবশ্য তাদের অবসর বিনোদন বা শখের আমোদের ইচ্ছে পূরণের সঙ্গে সঙ্গে উপরি লাভও হত—'কারণ ক্যাঙ্গারুর চামড়া বেশ চড়া দামে

বিক্রি হয় ও এক একটা ডিঙ্গো মেরে মাথা ও লেজ দিতে পারলে গবর্ণমেন্ট থেকে দশ শিলিং করে পুরস্কার মেলে।'[৩৪] ক্যাঙ্গারুর মাংস 'খুব ভাল, মোটেই বিস্বাদ নয়' অর্থাৎ রুচিকর হওয়াতে উপনিবেশ স্থাপনকারীদের কাছে ক্রমশ খাদ্য অর্থাৎ মাংসের বিকল্প উৎস হয়ে ওঠে অস্ট্রেলিয়ার প্রকৃতিতে লালিত পালিত ক্যাঙ্গারুর দল। যাত্রার প্রথম দিকে মিঃ ফেয়ারহেডও মূলত তাঁর সঙ্গের খাদ্যের মজুত ভাঁড়ারটির পরিমাণ বাড়াতেই ক্যাঙ্গারু শিকার করেছেন; নির্বিচারে মারেননি। এক 'খুব জ্বলজ্বলে' সকালে দুটি ক্যাঙ্গারু দেখে ফেরারহেড লুকিয়ে পা টিপে টিপে এগোলেও তাঁর গন্ধ পেয়ে ক্যাঙ্গারুরা প্রাণপণ শক্তিতে দৌড় দেয়; ফলে ফেয়ারহেড দ্রুত লম্বা শট করলেও ফস্কে যায়; ফেয়ারহেডের প্রথম ক্যাঙ্গারু শিকারের প্রয়াসটি ব্যর্থ হয়। শীতকাল হওয়ায় খুব সহজেই পদচিহ্ন অনুসরণ করে মাইল দুই দূরে—তিনি ক্যাঙ্গারু দুটির পুনরায় সাক্ষাৎ পান। এবার ফেয়ারহেড বড়োটির বুকে গুলি করে শিকারে সফল হন। অনেকটা মাংস তা থেকেই পাবেন বলে তিনি পলায়নরত অপরটিকে আর গুলি করেন না, যেতে দেন। পরে ম্যালেট গাছের ছাল সংগ্রহের ব্যস্ততার ফাঁকে রবিবারগুলোতে যখন ক্যাঙ্গারু শিকার উপভোগ করতে থাকেন, তখন কিন্তু শিকারে প্রচুর মাংস প্রাপ্তি অর্থাৎ মাংসের প্রয়োজন মেটার পরও নিছকই আনন্দের জন্য মিঃ ফেয়ারহেড ও তার ভাই জো ক্যাঙ্গারু শিকার করতে থাকেন। শুধুমাত্র শিকারের সৌভাগ্য অর্জন বা কৃতিত্ব লাভের জন্য তাঁরা অত্যন্ত ঠান্ডা প্রকৃতির ছোট্ট 'brush' ক্যাঙ্গারুর শিকার করতেও ছাড়েন না; 'কিন্তু মাংসের প্রয়োজন না থাকাতে তাঁরা তা ফেলে রেখে দিলেন।'[৩৫] স্পষ্টতই বোঝা যায়, ঔপনিবেশিক সময় থেকে অস্ট্রেলিয়াতে অকারণে, নির্বিচারে ক্যাঙ্গারু শিকার হয়ে উঠেছিল ভদ্রলোকদের কাজের একঘেয়েমি কাটানোর অন্যতম বিনোদন। শিকার-'স্পোর্টসে'র কোনও ethics ক্যাঙ্গারু শিকারে সম্ভবত মানা হত না। ক্যাঙ্গারু শিকারের একটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর দিক মা-ক্যাঙ্গারুর শিকারে মৃত্যু হলে থলিতে থাকা অনাথ ক্যাঙ্গারু-শাবকদের (joeys) হয় শিরচ্ছেদ করে বা পিটিয়ে মেরে ফেলা হত, নতুবা সেভাবেই ছেড়ে দেওয়া হত যাতে খাদ্য ও সুরক্ষার অভাবে অচিরেই তা বেঘোরে মারা পড়তে বাধ্য হয়। শিকারের এই অতীব নিষ্ঠুর দিকটিও কাহিনিকার তুলে ধরেছেন। ফেয়ারহেডের ভাই জো যে বড়ো ক্যাঙ্গারুটাকে মারে তার পেটের থলিতে বাচ্চা ক্যাঙ্গারু ছিল—'ভাগ্যিস বড়ো ক্যাঙ্গারুটাকে মেরেই এটাকে ধরে ফেলেছিলুম

নইলে অন্যগুলোর সঙ্গে এটাও লম্বা দিত আর কী।’[৩৬] জো অবশ্য বাচ্চা ক্যাঙ্গারুটিকে পোষার ও টিনের দুধ খাইয়ে বড়ো করার কথা ভেবেছিল।

ক্যাঙ্গারু শিকার প্রসঙ্গে ঐ অঞ্চলের ঝোপে জঙ্গলে থাকা ডিঙ্গোদের কথাও এসেছে। ডিঙ্গোদের চীৎকার এতটাই স্বাভাবিক যে ক্রমে ফেয়ারহেডরা তাতে অভ্যস্ত হয়ে যান। একবার সদ্য শিকারে প্রাপ্ত ক্যাঙ্গারুর মৃতদেহটি চাষার সতর্কবাণী ভুলে গাছের নিচু ডালে ঝুলিয়ে রাখায় ডিঙ্গোরা রাত্রে তা সাবাড় করে মাত্র চামড়ার কয়েক টুকরো রেখে যায়। কিন্তু সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রী থাকায় ও আরও ক্যাঙ্গারু মারার ইচ্ছে থাকায় ফেয়ারহেডরা সেই মুহূর্তে ডিঙ্গো শিকারের বদলে তাদের কর্মদক্ষতারই তারিফ করেন। পরে অবশ্য তাঁবুর আশেপাশে ডিঙ্গোদের উৎপাত বাড়লে রাত্রে মাংসের টুকরো, হাড় ছড়িয়ে রেখে চার ঘন্টা রুদ্ধনিঃশ্বাস অপেক্ষার পর ফেয়ারহেডরা ‘ভীষণ ধূর্ত ও সতর্ক’ ডিঙ্গো শিকারেও সমর্থ হন। দুভাই আনন্দে উৎফুল্ল হন, কেননা ডিঙ্গো মারার সরকারি পুরস্কার দশ শিলিং। যদিও তাদের দুজনেরই মতে ‘সারাদিনে ঝোপ জঙ্গলে ক্যাঙ্গারু শিকার করার চেয়ে নিজের তাঁবুতে বসে ডিঙ্গো শিকার করাটা ঢের বেশি কষ্টকর।’[৩৭] ক্যাঙ্গারু শিকার করতে করতে তারা হঠাৎই একটি ঈমিউ পাখি দেখে তাও শিকার করেন; মাংস লোভনীয় নয় বলে ফেলে রাখলেও ঈমিউ পাখিটির চামড়া ও পালক সংগ্রহ করে নেন; কারণ সেগুলো ‘শিকারীর গৌরবের সাক্ষ্য দেবে’, সঙ্গে ‘বিক্রি করে কয়েক শিলিং উপার্জ্জন’ও হবে।

বাঙালি শিশু-কিশোর সাহিত্যিকরা একমাত্র অস্ট্রেলিয়াতে প্রাপ্ত ‘অদ্ভুত প্রাণী’ ক্যাঙ্গারুর শিকারের গল্প বিশ শতকের ছোটোদের পত্রিকায় বারবার শুনিয়েছেন ঠিকই; কিন্তু ‘বেচারা’, ‘বড্ড নিরীহ’, ‘আক্রমণের বিশেষ কোনো অস্ত্রহীন, অসহায়’, ‘তীব্র বেগে ছোটা ও অস্বাভাবিক লাফাবার ক্ষমতা ছাড়া আত্মরক্ষার্থে অনেকটাই অসমর্থ, নিরুপায়’, ‘এমন কী শিকারির গুলিতে সঙ্গীর আকস্মিক মৃত্যুর আশ্চর্য ঘটনায় হতচকিত হয়ে থেমে গিয়ে পালাতে অক্ষম’, ‘অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির’ ক্যাঙ্গারু প্রাণীটির জন্য ছোটোদের মনে যেন সমবেদনাকেও চারিয়ে দিতে চান। ফলে শিকারের গল্প শোনাতে বসেও মাঝেমাঝেই তাঁরা ভিন্ন সুর উচ্চারণ করে ফেলেন—

- ‘এহেন নিরীহ জানোয়ারকে মানুষের মত স্বার্থপর জীব যে শিকার করবে, সে বিষয়ে

কি আর সন্দেহ আছে।'[৩৮] (সুবিনয় রায়ের 'কাঙ্গারু শিকার', *রামধনু*, ১৩৩৭)

- 'কুকুরেরা শুধু শিকারের নেশায় এসেছে আর ক্যাঙ্গারু প্রাণের দায়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।'[৩৯] (ঐ)
- 'কাজেই এহেন শান্ত জীবের পেছনে অন্য জানোয়াররা যে সুবিধা পেলে লাগতে ছাড়বে না এতো বোঝাই যায়।'[৪০] (শ্রী কৌটিল্যের 'কাঙ্গারুর গল্প', *রামধনু* ১৩৬২)

উপনিবেশের আমলে ভারতের মতো অস্ট্রেলিয়াতেও 'শিকার' হয়ে ওঠে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিরই অঙ্গ। ক্যাঙ্গারু শিকারের সঙ্গে ঔপনিবেশিক নানা মাত্রা, নিগূঢ় কূটকৌশল, ক্ষমতার জোরে শিকারের অধিকারে দখলদারি ইত্যাদি অঙ্গাঙ্গিকভাবে জুড়ে যাওয়ায় তা প্রাক-ঔপনিবেশিক কালের ক্যাঙ্গারু শিকারের চেয়ে উদ্দেশ্য ও গোত্রে যথেষ্টই ভিন্ন হয়ে ওঠে। অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় বন্যপ্রাণী ক্যাঙ্গারু শিকার ও ঐতিহ্যমণ্ডিত শিকারভূমি বা ক্ষেত্রগুলির দখলদারি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে ইউরোপীয়ান উপনিবেশ স্থাপনকারীদের সহিংস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষও সম্পাদিত হয়।[৪১] ছোটোদের জন্য রচিত বাংলা ক্যাঙ্গারু শিকার কাহিনিগুলিতে অস্ট্রেলিয় আদি অধিবাসী (aboriginal)-দের কোনও উপস্থিতি বা তাদের কোনও কথা অথবা তাদের মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরে প্রচলিত ক্যাঙ্গারু শিকারের নিজস্ব নানা পদ্ধতি সম্পর্কে কোনও তথ্য অবশ্য পাওয়া যায় না। তবে উপনিবেশ স্থাপনের কাল থেকে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের একান্তই নিজস্ব স্থানীয় বন্য প্রাণীরা (বিশেষত ক্যাঙ্গারু) বহির্বিশ্বের মানুষকে বিস্ময়মিশ্রিত তীব্র আকর্ষণে আকৃষ্ট করলেও, কীভাবে ঔপনিবেশিক স্বার্থে—খাদ্য, ভূমি সম্প্রসারণ, গবাদিদের নিরাপত্তা, ব্যবসায়িক মুনাফা (যার পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত রূপ Kangaroo Commercial Industry), বৈজ্ঞানিক গবেষণা কিংবা নিছকই আমোদের জন্য নির্বিচারে নৃশংস শিকারের বলি হয়—এই গভীর সত্যটি বাঙালি লেখকরা অনেকসময়ই কম বেশি তুলে ধরেছেন। এক উপনিবেশের বাসিন্দা হওয়ার জন্যই কি, ভিন্ন মহাদেশের আরেক উপনিবেশের বাসিন্দা ক্যাঙ্গারুদের প্রতি বিশ শতকের বাঙালি শিকার-লিখিয়েদের এত তীব্র গূঢ় আকর্ষণ?

নৃমুণ্ড শিকার কাহিনি

শুধু পশুপাখি শিকারের আখ্যানই নয় ছোটোদের পত্রিকাগুলিতে এক অদ্ভুত শিকার—নৃমুণ্ড শিকার ও শিকারিদের কথা বা গল্পও উঠে আসতে দেখা যায়। নৃতত্ত্ববিদ A. C. Haddon বোর্নিয়াতে অভিযানে (১৮৯৮-৯৯ খ্রি.) গিয়ে আশ্চর্য শিকারি 'Head Hunters' দের কথা জনসমক্ষে তুলে আনেন; তারই ভিত্তিতে শ্রীধর *রংমশাল* (ভাদ্র ১৩৪৯) পত্রিকার 'বিচিত্রা' বিভাগে লেখেন 'নৃমুণ্ড শিকারি'। ঔপনিবেশিক জ্ঞান ও আধুনিকতার স্পর্শে বাঙালির 'আত্ম'-পরিচয় নির্মাণ এবং জাতীয়তাবাদের উন্মেষের জন্য একান্তই আবশ্যিক হয়ে ওঠে 'অপর'-কে, 'অপর'-এর সংস্কৃতিকে জানা ও বোঝা। ফলে উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকে বাঙালি নিজের গণ্ডির বাইরের 'অপর' অর্থাৎ দেশ-বিদেশের নানা জাতি, জনগোষ্ঠীর মানুষ, তাদের রীতিনীতি-আচার ব্যবহার-বেশভূষা-সাজসজ্জা-ধর্ম বিশ্বাস-ভাষা-সৌন্দর্যবোধ-দৈনন্দিন জীবন পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহলী হয়ে ওঠে। নৃতত্ত্ব ও নৃকুলতত্ত্ব চর্চাতে বাঙালির এই আগ্রহ উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে ছোটোদের পত্রপত্রিকাগুলিতেও নানা দেশের (বিশেষত ইউরোপের নানা দেশ ও মহাচীন, জাপান, রাশিয়া, ফ্রান্স, থাইল্যাণ্ড, শ্যামদেশ, কাবুল, আফ্রিকার) বিভিন্ন জাতিদের কথা, তাদের সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে লেখালেখি প্রায়ই উঠে আসতে থাকে। 'নৃমুণ্ড শিকার' কার্যটি অদ্ভুত ও বিচিত্র হওয়ায় শ্রীধর ছোটোদের তা জানাতে আগ্রহী হয়েছেন। প্রথমেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন নৃমুণ্ড শিকার কিন্তু সাধারণ শিকার বা হত্যালীলা থেকে যথেষ্ট স্বতন্ত্র— আনন্দ উত্তেজনার লোভে বাঘ-ভালুক-হরিণ শিকার, স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুদ্ধে মানুষ শিকার বা প্রাচীনকালে দেবতাকে তুষ্ট করে অমানুষিক শক্তিলাভের আশায় যে নরবলি বা শিশুবলি তার থেকে 'নৃমুণ্ড শিকার' অনেকটাই আলাদা, এটি আদিম জাতিদের কল্যাণ-অকল্যাণ বোধ সম্পৃক্ত এক প্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠান; এর উদ্দেশ্য বহুবিধ ও সম্পূর্ণ বিচিত্র রকমের। বিবাহে যোগ্যতা লাভ, সাবালকত্ব অর্জন, পুরুষত্বের প্রমাণ দিয়ে পালক ও উল্কি ধারণের অধিকার লাভ, যুদ্ধে শত্রুর নরমুণ্ড শিকার করে এনে বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দান, শিকারকে অর্থাৎ নৃমুণ্ডের মালিককে পরজন্মে শিকারির ক্রীতদাস রূপে প্রাপ্তির ব্যবস্থা এজন্মেই পাকা করে রাখা, সর্বোপরি শস্যক্ষেত্রে ফলন বৃদ্ধি, সামগ্রিক সমৃদ্ধি ও জলবৃষ্টি-শস্যাদি জলকষ্ট-মড়ক দুর্ভিক্ষকে নিবারণ ইত্যাদি যেসব কারণ ও

বিশ্বাস নৃমুণ্ড শিকার অভিযানের সঙ্গে জড়িত থাকে লেখক আকর্ষক ভাবে একে একে সেগুলি বিবৃত করেন। নৃমুণ্ড শিকার এতটাই মর্যাদা ও বীরত্বের পরিচায়ক যে এর জন্য এই গোষ্ঠীর মানুষরা ছলচাতুরি, কপটতারও আশ্রয় নিয়ে ফেলে। কবর থেকে চুরি করা নৃমুণ্ড বাড়ির সামনে ঝুলিয়ে রেখে নিজের শিকার বলে মিথ্যা বীরত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা ও শেষতক ধরা পড়ে শাস্তি লাভ কিংবা জাদুঘরের সংগ্রহশালা থেকে পূজাপার্বণে বা দরকারে নৃমুণ্ড ধার আনা ইত্যাদি—ছোটো ছোটো বিচিত্র সব ঘটনা ও তথ্য শ্রীধর ছোটোদের জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে নৃমুণ্ড শিকারিদের মধ্যে প্রচলিত নানা লোককথা, কিংবদন্তি, আচার অনুষ্ঠান, বিধিনিষেধ, অদ্ভুত অদ্ভুত সব বিশ্বাস এমনকি বোর্নিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যেও নৃমুণ্ড শিকার সংক্রান্ত বিশ্বাসের প্রভেদ ইত্যাদি লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন। শ্রীধরের রচনাভঙ্গি অনেকটা নিরপেক্ষ ও বিবরণাত্মক। *রংমশালের* 'বিচিত্রা বিভাগে'ই আগের বছর (বৈশাখ, ১৩৪৮) প্রকাশিত 'মানুষে মানুষ খায়?'-এ শ্রীশামুক বোঝানোর চেষ্টা করেন 'মানুষখেকো' মানুষের সঙ্গে 'চিংড়িখেকো' মানুষ আমাদের বিশেষ ভেদ নেই; মানুষখেকোদের কেবলমাত্র 'নিন্দা' না করে তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাও ভাবতে হবে; আমাদের কাছে যেমন নরমাংস ভক্ষণ—'অন্যায়', 'জঘন্য', 'নিষ্ঠুর কাজ', তেমনি আমাদের ভালো কাজগুলিও অন্যের কাছে খারাপ বা নিষ্ঠুর হতে পারে। তবে নৃমুণ্ড শিকারিদের বিবরণে শ্রীধর নিজের এরূপ কোনও ব্যক্তিগত মূল্যবোধ বা মতামতই যোগ করেননি; নৃমুণ্ড শিকারিদের কার্যকলাপেরও 'ন্যায় না অন্যায়', 'সভ্য না অসভ্য বর্বরোচিত', 'ভালো না মন্দ' এমন কোনও মাপকাঠিতে বিচারেও সচেষ্ট হননি। নৃমুণ্ড শিকারিদের ক্ষেত্রে 'অসভ্য' 'বর্বর' 'জঘন্য' ইত্যাদি বিশেষণের বদলে তাঁর বিবরণে উঠে এসেছে 'অদ্ভুত' 'আদিম' শব্দগুলি। নৃমুণ্ড শিকারি ও তাদের শিকারের সম্বন্ধে ইতিমধ্যে যেসব তথ্যগুলি জানা গেছে বা নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় উঠে এসেছে সেগুলিই শ্রীধর মনোজ্ঞভাবে খুদে পাঠকদের শুনিয়েছেন। শুধু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উপদ্বীপ বোর্নিয়ারই নয়, পৃথিবীর বহু দেশেই আদিম জাতিদের মধ্যে যে নৃমুণ্ড শিকারের প্রথা প্রচলিত ছিল, এমনকি ইউরোপের বল্কান উপদ্বীপে কিংবা আমাদের ভারতবর্ষের গারো-নাগা-খাসি-কুকিদের মধ্যেও—সেসব তথ্য পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে।

আর আসাম সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব ভারতের এই নৃমুণ্ড শিকারি গোষ্ঠীগুলি নিয়েই এক দুর্ধর্ষ রোমাঞ্চকর কাহিনি 'আসামের জঙ্গলে' লেখেন *শিশুসাথী* পত্রিকায়

খগেন্দ্রনাথ মিত্র। কাহিনিটি সূচনা হয় পনেরো বছর পূর্বের বাংলা দৈনিকের একটি নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপনে—আঠারো বছরের অমর মিত্র ও বছর ষোলোর মহাদেব রায় বড়োদিনের ছুটির আগের দিন বাড়ি থেকে দশ দিনের কড়ারে দেশভ্রমণে বের হয়ে একমাস হতে চলল নিখোঁজ। অমর ও মহাদেবের যে বলিষ্ঠ শারীরিক বর্ণনা ও দেহে অতীত ক্ষত বা আঘাত চিহ্ন লেখক দেন তাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে তারা শীর্ণকায় কিংবা স্থূলদেহ গড়পরতা বাঙালি ছেলে নয়; ঘরকুনো, গোপাল সুলভ শান্তশিষ্ট সুবোধও নয় মোটেই। উনিশ শতকের শেষপর্বে ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঔপনিবেশিক-আধুনিক বাঙালির ব্যক্তিসত্তা ও জাতিসত্তা নির্মাণ-বিকাশের প্রকল্পে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে 'ভ্রমণ'।[৪২] প্রাক্ ঔপনিবেশিক কালের বাণিজ্যযাত্রা, নতুন বসতির সন্ধানে ভ্রমণ কিংবা ধর্ম ও পুণ্যলাভের জন্য তীর্থযাত্রা থেকে ঔপনিবেশিক কালের ভ্রমণ ও ভ্রমণবৃত্তান্ত যথেষ্টই আলাদা গোত্রের। এই কালপর্বের বাঙালি মানসে দেশভ্রমণ—হয়ে ওঠে দেশ গঠন ও জাতীয়তাবাদ বিকাশে অনিবার্য শর্ত। অন্যদিকে পাশ্চাত্য রোমান্টিকতা ও সৌন্দর্যচেতনা এই সময়ের বাঙালির কাছে ভ্রমণকে করে তোলে মুক্তি (শুধু গৃহকোণ বা ছাপোষা গতানুগতিক জীবন থেকেই মুক্তি নয় চেতনারও মুক্তি), প্রগতি ও আত্মজ্ঞানের প্রতীক। ফলে বাঙালি সদ্যতরুণ অমর ও মহাদেবের পক্ষেও ছুটিতে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়াই তো স্বাভাবিক। যেদিন নিরুদ্দেশের সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, সর্বজ্ঞ কথকের বর্ণনা থেকে পাঠক জানতে পারে সেদিন সকালেই সুদূর আসাম-ব্রহ্মদেশ সীমান্তের জঙ্গলে অমর ও মহাদেব গাছের ডালে রাত্রিযাপনের পর হাজির হয়েছে এক অদ্ভুত জায়গায়—

> একটি বড় ঝাঁকড়া গাছের নীচে অন্ততঃ ত্রিশটা মড়ার মাথা ওপর ওপর সাজানো। তার সামনে একটি মানুষ—মানুষ? হ্যাঁ, মানুষই বটে। কিন্তু তার চেহারা দেখে, দুজনেরই প্রথমে বিশ্বাস হল না যে সে মানুষ। মানুষ কখনও এত কুৎসিত, এমন ভীষণ দর্শন হয়? তার গায়ের রঙ কালো, চোখ দুটি লাল, নাকটা মোটা, গলায় হাড়ের মালা, হাতে হাড়ের তাগা, কানে হাড়ের কর্ণাভরণ, ঠোঁট দুখানা একটু পুরু, পরিধানে সামান্য আচ্ছাদন। তার পাশে গাছের গায়ে দুটো সুতীক্ষ্ণ বর্শা হেলানো রয়েছে।[৪৩]

অমররা বুঝতে পারে লোকটি 'হেড-হানটার, মানুষের মাথা সংগ্রহ করে বেড়ায়।' মহাদেবের উপস্থিত বুদ্ধির জোরে লোকটির ছোঁড়া বর্শা থেকে তারা রক্ষা পায় এবং

'বাঘের মতো গুঁড়ি মেরে নামা' লোকটিকে সাময়িকভাবে ঘায়েলও করতে পারে। কিন্তু অচিরেই পাহাড় থেকে নামা মাথায় শিং, ঢাল-বর্শা-লম্বা দা হাতে একদল লোক ও মাটি ফুঁড়ে হঠাৎ হাজির আরেক দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের দর্শক হয়ে ওঠে তারা। জয়ীদের দ্বারা আহতদের মাথা কেটে নেবার বীভৎস দৃশ্য চলতে থাকে। কিন্তু 'হেড হান্টারদের ধারণা, যে যতগুলো মাথা সংগ্রহ করতে পারবে, সে তত বড় বীর। বীরত্বে খাটো হতে চায় কে? তাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই লক্ষ্য হল, সেই আগে মাথাগুলো সংগ্রহ করবে।'[৪৪] ফলে শুরু হয়ে যায় ঘরোয়া দ্বন্দ্বও, যার পরিণতিতে স্বগোষ্ঠীরই মাথা ধড় থেকে পরিষ্কার নেমে যেতে থাকে। নৃমুণ্ড শিকারি গোষ্ঠীর ভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে ও সগোষ্ঠীর মধ্যেই যুদ্ধের অবকাশে অমররা সরে পড়ে। পিছনে হিংস্র জন্তুর তাড়া, ভালুক তাড়িয়ে রাত্রিতে ভালুকের গুহায় রাত্রিবাস, গুহামুখে জোড়া হায়নার আগমন, গুহার কাছেই বাঘের শিকার মেরে খাওয়া—জঙ্গলের শিহরণ জাগানো একগুচ্ছ ঘটনাবহুল ভয়ানক রাত্রি কাটতে না কাটতেই তারা পুনরায় নৃমুণ্ড শিকারিদের কবলে পড়ে যায়। 'আদিম মানুষে'র মতো পোশাক-পরিচ্ছদ গায়ে, পশুর চামড়া, মাথায় মোষের শিং, গলায় হাতে হাড়ের অলঙ্কার-পরা জঙ্গলের একদল মানুষ অমরদের ঘিরে ফেলে; প্রাণে না মারলেও বন্দি করে মড়ার মাথা জড় করা উৎকট দুর্গন্ধযুক্ত এক গুহায় রাখে; বেঁধে বন্দি রাখে না, কিন্তু গুহামুখে থাকে সজাগ পাহারা। নিজেরা ইঁদুর ব্যাঙ গিরগিটি খেলেও অমররা ইশারায় খাবার চাইলে শাঁখ আলু, কাঁচা চীনাবাদাম, মধু এবং পরে শিকার করা হরিণের ঝলসানো পা খেতে দেয়। প্রাণে মারবে না, নাকি মেরে খাবে—অমররা বুঝে উঠতে পারে না। কেননা, 'বুড়ো লোকটা বসে বসে পাথরে একখানা বড় দা শান দিচ্ছে, আর লাল চোখ, ছোট চোখ দুটো তুলে মাঝে মাঝে তাদের দিকে তাকাচ্ছে। লোকটার চাহনির মধ্যে হিংস্রতা ফুটে বার হচ্ছে।'[৪৫] সন্ধ্যে হতেই হঠাৎই প্রায় উলঙ্গ গলায় সাদা (হাড়ের?) মালা, হাতে তাগা, কানে চামর, মাথায় লম্বা চুল প্রায় শ-দুই লোক বর্শা, দা, জ্বলন্ত মশাল নিয়ে রণহুঙ্কারে গুহাবাসী গোষ্ঠীকে আক্রমণ করে বসে। দু দলে পাথর, বর্শা ছোঁড়া থেকে হাতাহাতি মারাত্মক যুদ্ধ হয়। আগন্তুকরা জয়ী হয়ে অবাধে অলঙ্কার-পশু-চামড়া-বর্শা-দা-ঢাল লুঠপাট চালনো ও অগ্নি সংযোগ করার সঙ্গে সঙ্গে জীবিতদের মাথা কেটে নিতে থাকে। বিজয়ীরা বিজিতদের মধ্যেকার বৃদ্ধদের হত্যা করে; যোদ্ধাদের মাথা কেটে নেয়; তবে বহিরাগত অমরদের সৌভাগ্যবশত হত্যা না করে

বিজিতদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্দি করে বনপথে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। মশাল নেভার সুযোগে অমররা সেখান থেকে পালিয়ে কীভাবে চিতাবাঘ-উল্লুক-বুনো মোষের আমনা সামনা করে ও শেষপর্যন্ত নদী ধারের খড়-চাটাই-বাঁশের বাড়িঘরের বাসিন্দা জামাকাপড়ধারী অর্ধসভ্য মানুষদের সহায়তায় মহাদেব প্রাণে বাঁচে এবং ভয়ঙ্কর 'মানুষ-পিশাচে'র দেশ থেকে তারা ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী সভ্য জগতে ফিরতে পারে—তা খগেন্দ্রনাথ প্রতি পলে টানটান উত্তেজনাসহ বর্ণনা করেন।

অমর ও মহাদেব শিকারি নয়; বাঘের শিকার করে খাওয়া হরিণের অভুক্ত দেহাংশ খেতে প্রবৃত্তি না হওয়ায় মহাদেব বলে 'দেখা যাক হাতে বর্শা ও লাঠি আছে, কোন রকমে যদি এ দুটো মাংস সংগ্রহের কাজে লাগানো যায়।'[৪৬] কিন্তু মহাদেবকে আর শিকার করতে হয়নি, উল্টে তারাই নৃমুণ্ড শিকারিদের শিকারে প্রায় পরিণত হয়েছে। দেশভ্রমণে বেরিয়ে নিরুদ্দিষ্ট দুই বাঙালি সদ্য তরুণের অসম-ব্রহ্মদেশ সীমান্তের জঙ্গলের নৃমুণ্ড-শিকারিগোষ্ঠীদের কবলে পড়ে অভূতপূর্ব বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভই 'আসামের জঙ্গলে' কাহিনির মূল উপজীব্য। তাদের অভিজ্ঞতার সূত্রেই খগেন্দ্রনাথ নৃমুণ্ড শিকারিদের শারীরিক গঠন, পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, নৃত্যবাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র, বিশ্বাস সংস্কার, সর্বোপরি নৃমুণ্ড শিকারি গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক শত্রুতা-রণহুঙ্কার সহ আকস্মিক আক্রমণ-যুদ্ধ ও যুদ্ধের বীরত্ব প্রদর্শনে নৃমুণ্ড শিকার ও স্মারক রূপে কাটামুণ্ডগুলি সংগ্রহ করা, বিজিতদের প্রতি তাদের ব্যবহার ইত্যাদি খুঁটিনাটি ডিটেলিং কাহিনিটির পরতে পরতে সুচারুভাবে বুনে দিয়েছেন। নৃমুণ্ড শিকারি গোষ্ঠীগুলির নিজেদের মধ্যেও রয়েছে সাজসজ্জা পোশাক অলঙ্কারে প্রভেদ, যা দেখে অমররা তাদের এক গোষ্ঠী থেকে আরেক গোষ্ঠীকে পৃথক বলে সনাক্ত করতে পারে। অমরদের প্রথমবার বন্দি করা নৃমুণ্ড শিকারি গোষ্ঠীটি গুহাবাসী হলেও হাঁড়ি ও পাতার পাত্র ছাড়া কোনও বাসনপত্র, কোনও শয্যার ব্যবহার তাদের মধ্যে নেই; খাদ্যে তারা লবণ যোগ করে না; চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালে। তবে শিকার করা গন্ডারের চামড়ার তৈরি ঢালের সঙ্গে ঝকঝকে লোহার দা, বর্শা দেখে অমররা অনুমান করে, হয় এরা অন্য জাতভাইদের থেকে তা পায় নচেৎ নিজেরাই তৈরি করে; জঙ্গলের ভেতরে আকরিক লোহার সন্ধান ও তা সংগ্রহ পদ্ধতিও হয়তো এরা জানলেও জানতে পারে। বিজয়ী বন্দি বিজিতদের মাংস খাবে, না তাদের দিয়ে নিজেদের দলপুষ্টি করবে

নাকি দাস রূপে বিক্রি করে দেবে—অমরদের তা আর শেষপর্যন্ত দেখার বা জানার সুযোগ হয়নি। তবে বহির্জগত থেকে আসা আগন্তুকদের প্রতি নৃমুণ্ড শিকারিদের আচরণের কিছু নিদর্শন অমররা চাক্ষুষ করে; অমরদের দেখে নৃমুণ্ড শিকারিদের মুখচোখে আশ্চর্য হাবভাব ফুটে ওঠে; খানিক চুপচাপ থেকে অমরদের কথাবার্তা অবোধ্য হলেও তা শুনে তারা বিদ্রুপমেশা হাসি হাসতে থাকে; বুক লক্ষ্য করে বর্শা তুললেও তৎক্ষণাৎই না মেরে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে গুহায় বন্দি রাখে; বহিরাগত বন্দি অমরদের দেখতে চারধারে ছেলেমেয়ে বুড়োরা ভিড় জমায়; অমররা ইশারায় খেতে চাইলে খাবারও দেয়; বন্ধনশূন্য থাকায় বন্দি বলে মনে না থাকায় অমররা গুহার বাইরে উঁকি দিতে চাইলে কিন্তু বাধা দেয়; অমরদের জলের কৌটোর ঢাকনি খুলে জল পানরত দেখে বিস্মিত পাহারারত লোকটি কৌটোটি দখল করে; তেমনি অমরদের বাইনোকুলারটি এক নৃমুণ্ডশিকারি অ্যাডজাস্ট করতে না পারলেও উপকারিতাটি বুঝে গলায় ঝুলিয়ে ঘুরতে থাকে। দুটি নৃমুণ্ড শিকারি গোষ্ঠীই শত্রুদের মুণ্ডু কেটে নিতে দ্বিধা করেনি; কিন্তু 'বহিরাগত' অমরদের মুণ্ডু না কেটে তাদের বন্দি করে এবং তখনও পর্যন্ত কোনও অত্যাচার করেনি। উত্তর-পূর্ব ভারত ও ব্রহ্মদেশ সীমান্তের নৃমুণ্ড শিকারি গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে এইসব খুঁটিনাটি তথ্যগুলির সমাহারে ছোটোদের জন্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ কিংবা নৃতাত্ত্বিক আখ্যান বা বিবরণ রচনার পরিবর্তে খগেন্দ্রনাথ সেগুলিকে ছোটোদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তাদের অত্যন্ত প্রিয় সাহিত্য-সংরূপ 'জঙ্গল-অ্যাডভেঞ্চার' উপন্যাসের মাধ্যমে। কিন্তু তথ্যগুলি কোথাও কিশোর-উপন্যাসটিকে ভারাক্রান্ত করেনি; কেননা সেগুলি হাজির হয়েছে উপন্যাসের প্লট বা কাহিনিরই গূঢ় সূত্র মেনে; কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কাহিনিরই প্রসঙ্গ সূত্রে। আর শুধু তাই নয়, অসম-ব্রহ্মদেশ সীমান্তের এই নৃমুণ্ড শিকারিদের কথা বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক তাদের বসবাসের দুর্গম পার্বত্য জঙ্গল অর্থাৎ কাহিনিটির পটভূমি সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন। এই অঞ্চলের জঙ্গলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য—প্রতিকূল পার্বত্য অঞ্চল, তার ভৌগোলিক গঠন, নদনদী, জঙ্গলের বিশেষ বিশেষ গাছপালা সর্বোপরি প্রাপ্ত বিশেষ বন্য প্রাণীদের (উল্লুক, চিতাবাঘ, বুনো মোষ, অজগর, ভালুক, বাঘ, হরিণ-এর) নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে তিনি উপন্যাসটিকে যথেষ্ট বাস্তবানুগ ও জীবন্ত করে তোলেন।

'সভ্য-অসভ্য'-এর ধারণা আমরা মূলত আমাদের নিজস্ব সমাজ সভ্যতা-সংস্কৃতির থেকেই পাই; জ্ঞানচর্চা, অভিজ্ঞতার সূত্রেও হয়তো গড়ে তুলি; আর নিজেদের এই মাপকাঠিকে সর্বত্র প্রয়োগেরও চেষ্টা করি। ফলে 'অপর' অর্থাৎ ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ বিশেষত ভিন্ন জাতির প্রান্তিক বা বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী, অবনমিত জনজাতি বা স্বজাতীয় নিম্নবর্গদের আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'অসভ্য' 'অভদ্র' রূপে অনায়াসে চিহ্নিত করে ফেলি; নিজেদের বিশ্বাস, সৌন্দর্যবোধ, মূল্যবোধের নিরিখে বিচার করে তাদের প্রতি অনেক সময় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করি; তাদের হেয় করি। নৃতাত্ত্বিক বর্ণনামূলক প্রবন্ধে সাধারণত বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষ বর্ণনার যে দাবি থাকে, উপন্যাস শিল্পরূপটির ক্ষেত্রে ততটা নয়। 'আসামের জঙ্গলে'র আখ্যানটি সর্বজ্ঞ কথকের বয়ানে বর্ণিত হলেও সমগ্র আখ্যানটিই অমর ও মহাদেবের দৃষ্টিকোণ থেকেই বর্ণিত হয়েছে; ফলে 'অসভ্য' 'বন্য' নৃমুণ্ড শিকারিদের প্রতি সভ্য বহির্জগতের বাসিন্দা তথা তৎকালীন ঔপনিবেশিক জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক বাঙালিদের ধারণা, মনোভাবটিও উপন্যাসটি ধারণ করে আছে। নিজের 'মোটা নাক, গায়ের রঙ কালো' হলেও সমতলবাসী মহাদেব মড়ার মাথাগুলির সামনের 'গায়ের রঙ কালো, লাল চোখ, মোটা নাক' 'কুৎসিৎ' 'ভীষণ দর্শন' লোকটিকে 'হেড-হান্টার' জেনে তাকে 'পিশাচ' বা 'মানুষ পিশাচ' বলার পক্ষপাতী। তবে শুধু মহাদেব ও মহাদেবের স্রষ্টাই নন, তৎকালীন অধিকাংশ বাঙালিই এর ব্যাতিক্রম নয়। উত্তর-পূর্ব ভারত, ব্রহ্মদেশ সীমান্তের অজানা রহস্যময় দুর্গম পার্বত্য জঙ্গল ও সর্বোপরি সেখানকার প্রায় অজানা অচেনা কুকি, কনিয়াক-নাগা ইত্যাদি যোদ্ধা জনগোষ্ঠীগুলির (warrior tribes) মধ্যে প্রচলিত নারী-শিশু নির্বিশেষে নরমুণ্ড শিকার ও সংগ্রহ প্রথার জন্য সম্ভবত ঐ অঞ্চলকে সেকালের বাঙালিরা তাদের কথাবার্তা ও লেখালেখিতে প্রায়ই ভীতিপ্রদ পিশাচের (পিশাচ—নরমাংস ভক্ষণকারী) দেশ বলে উল্লেখ করত। এবার অমর ও মহাদেবের কথোপকথনগুলির দিকে তাকান যাক,—

- 'আমরা পৃথিবীর আদিম মানুষের পোশাক পরিচ্ছদের যে কল্পনা করি এদের পোশাকও সেই ধরণের ...স্বভাবও নিশ্চয়ই তাদের মত। বন্য জন্তুর কবল থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব কিন্তু এদের কাছে মুক্তি নেই।'[৪৭]
- 'আমরা বন্দী না বলীর পশু।'[৪৮]

- ‘আমার যতদূর মনে হয়, কথার চেয়ে আমাদের রক্ত ও প্রাণই এদের বেশি খুশি করবে।’[৪৯]
- ‘যতদূর মনে হচ্ছে এরা আমাদের প্রাণে মারবে না।’[৫০]
- ‘দেখেছ তো বলির পাঁঠাকে ঘাস জল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়।’[৫১]
- ‘বাঘের মুখ থেকে এবার কুমীরের কবলে পড়া গেল। এবার আর রক্ষা নেই।’[৫২]

অমর ও মহাদেবের মধ্যে বারবার উঠে আসা এধরনের কথাবার্তা থেকে বোঝা যায়, অজানা নৃমুণ্ড শিকারিরা বন্দি ‘বহিরাগত মানুষ’ অমরদের নিয়ে শেষ পর্যন্ত কী করবে সে সম্পর্কে তারা যথেষ্ট অনিশ্চিত ও সংশয়াগ্রস্ত। নৃমুণ্ড শিকারিদের শত্রুর নরমুণ্ড কেটে সংগ্রহ করার বীভৎস দৃশ্য অমররা স্বচক্ষে দেখলেও, ‘ভয়ঙ্কর বড় ও অপরিষ্কার দাঁত’, ‘পুষ্ট শরীরে’র এই মানুষগুলো নরখাদক কিনা এমন কোনও প্রমাণ অমররা পায়নি। গুহাবাসী নৃমুণ্ডশিকারি গোষ্ঠী অমরদের বন্দি করলেও, তাদের অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াই ও আত্মরক্ষার গোলমালের সুযোগে পালাতে-উদ্যত অমর কিন্তু ঐ ‘অসভ্য’ নৃমুণ্ডশিকারিদের সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা না করে পারেনি—‘এরা হেরে যাবে। কিন্তু কি বীরত্ব, কি সাহস!’[৫৩] অমর অনুমান করেছিল বিজিত বন্দি ছেলেমেয়েদের বিজয়ী নৃমুণ্ড শিকারিদল দাস রূপে বিক্রি করে দিতে পারে। তবে এ অঞ্চলে তখনও চলা সেই দাস ব্যবসায় এই ‘অসভ্য’ জঙ্গলবাসী মানুষগুলি হয়তো সরাসরি যুক্ত নয়।

> এদের কোনো কোনো শাখা সভ্য জগতে মেশে। তারাই এই ঘৃণিত কাজের সহায়। পাঁচশ বছর আগের পৃথিবী, আর পাঁচশ বছর পরের পৃথিবীতে তফাৎ ঢের। এখন চারধারে সভ্য জাতির বাস। এদের মধ্যে যদি কোন অসভ্য জাতি থাকে তাহলে তারা নিশ্চয়ই কোন না কোন রকম সভ্য জগতের সংস্পর্শে আসবেই।[৫৪]

আমরা জানি, অষ্টাদশ শতকের শেষে ও উনিশ শতকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত-বর্মা-চীন সংযোগকারী বাণিজ্যপথ নিয়ন্ত্রণের জন্য উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত অঞ্চলগুলির উপর বহু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক প্রশাসন কায়েমের চেষ্টা চালায়।[৫৫] উর্বর মৃত্তিকায় উচ্চ ফলন ও উন্নতমানের দামি কাঠ ইত্যাদি বনজ সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য ঔপনিবেশিক প্রভুরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রতিও আকৃষ্ট হয়। মিশনারিরাও এই অঞ্চলগুলিতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে সচেষ্ট হয়; মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। এখানকার পার্বত্যজাতিগুলি এমনকি নৃমুণ্ড শিকারি গোষ্ঠীদের শাখাগুলির

উপরও খ্রিস্টান মিশনারিরা ক্রমশ প্রভাব বিস্তারে সফল হয়। ফলে সভ্য অসভ্য জাতির পাশাপাশি বসবাসের ফলে পারস্পরিক সংস্পর্শে আসা যে বিশ শতকে ক্রমশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে এবং অনেক সময় এই সংস্পর্শের সমস্ত ফলাফলই যে প্রান্তিক এই 'অসভ্য' অরণ্যচারী মানুষদের পক্ষে সর্বাঙ্গীন মঙ্গল বা শুভ হয়ে ওঠেনি—অমরের কথায় তার ইঙ্গিত আছে। বন্দি বিজিত ছেলেমেয়েগুলিকে না হলেও ভিন্ন পোশাক ও চেহারার একদল ক্রন্দনরত ছেলেমেয়েকে অমররা পরে নৌকা করে নিয়ে যেতেও দেখে; অমররা মাঝিমল্লাকে ডাকতে থাকলে নৌকা কূলে ভিড়ানো তো দূর, বরং আরও জোরে দাঁড় টেনে নৌকাটি দ্রুত অমরদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। বাস্তবিকই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে দাস ব্যাবসা বেআইনি বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে (Indian Slavery Act, 1843)। কিন্তু তারপরও উত্তরপূর্ব ভারতের প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতে মাঝে মাঝেই (বিশেষত ১৯০৮-১৪ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধের সময়) দাস ব্যাবসার হদিশ মেলে।[৫৬] আর মিশনারিদের কল্যাণমূলক কাজের বা তাদের প্রভাবে এ অঞ্চলের পার্বত্য জাতিগুলির এমনকি নৃমুণ্ড শিকারি গোষ্ঠীগুলিরও যে ক্রমশ পরিবর্তন ঘটে সে কথা স্বীকার করলেও, বিশ শতকের মোটামোটি তিনের দশক থেকেই কুকি জাতির সমাজ শিরোমণি লালুত দাই রায়, ত্রিপুরায় জন্মান নলিনীকুমার ভদ্র প্রমুখরা উত্তর-পূর্ব ভারতের অরণ্যবাসী পার্বত্য তথাকথিত 'অসভ্য' জাতিগুলির নিজস্ব ঐতিহ্য ধর্ম সংস্কৃতির শিকড় হারানোর কথা ও তাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি, নতুন ধরনের উদ্দাম বিলাসিতা, নেশার কথা তুলে ধরে তাদের নবলব্ধ 'সভ্যতা' বা 'সভ্য' হয়ে ওঠা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন।[৫৭]

দু-বারই নৃমুণ্ড শিকারি গোষ্ঠী দুটি বন্দি-অমরদের সঙ্গে ঠিক পরমুহূর্তেই কী করবে তা নিয়ে প্রতিক্ষণে চূড়ান্ত সংশয়-শঙ্কা থাকলেও অমররা সাহস হারায়নি। কিন্তু বন্দি অসহায় ছেলে ও স্ত্রীলোকদের ভবিতব্য ভেবে ও বিজয়ীদের হাতে ঝুলন্ত ছিন্ন নরমুণ্ডগুলি দেখে তাদের নৃশংসতায় অমরের মধ্যে নিজের জীবনের প্রতি এক অদ্ভুত উৎকণ্ঠাহীনতা ও ঔদাসীন্য দেখা দেয়। তা দেখে মহাদেব বলে, 'নিতান্ত সভ্য বলে যারা পরিচিত যুদ্ধের সময় তাদের হিংস্র ব্যবহারটিও দেখেছ তো? তবে এদের ব্যবহারে বিচলিত হও কেন? এরা তো অসভ্য।'[৫৮] মহাদেবের এই উক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; আমাদের মতে, এর মধ্যে ধরা আছে সেই ইশারা যা থেকে অনুমান করা যায় অসভ্য

নৃমুণ্ড শিকারিদের কথা বা তাদের নিয়ে আখ্যান বাংলা ছোটোদের পত্রিকায় বিশ শতকের বিশেষত চার থেকে ছয়ের দশকে এত ঘুরে ফিরে উঠে আসছিল কেন? পৃথিবীর বিভিন্ন মানবজাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়—সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে বাঙালি খুদেদের সামগ্রিক জ্ঞানবৃদ্ধি করতেই কি শুধুমাত্র এই আশ্চর্য শিকার ও শিকারিদের কথা অতীতের কোনও বিবরণ বা ঘটনা থেকে তুলে এনে এই কালপর্বে বারবার উপস্থাপিত করা হচ্ছিল? নাকি এর সঙ্গে যুক্ত ছিল সময়ের কোনও প্রবর্তনা? কোনও নিগূঢ় কারণ?

শ্রীধর প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বেকার বোর্নিয়ার নৃমুণ্ড শিকারিদের কথা বলতে বসে একদম সূচনা বাক্যটিতেই দাবি করেছিলেন ‘বোর্নিয়ার নৃমুণ্ড শিকার সম্বন্ধে আজকাল বিশেষ কিছু শোনা যায় না।’[৫৯] কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখব, শ্রীধর *রংমশালের* খুদে পাঠকদের যে বছর (১৯৪২ খ্রি.) নৃমুণ্ড শিকারিদের কথা শোনাচ্ছেন বা *শিশুসাথী*তে খগেন্দ্রনাথ মিত্র পনেরো বছর পূর্বে দুই বাঙালি সদ্য-তরুণের উত্তর-পূর্ব ভারতের নৃমুণ্ড শিকারিদের কবলে পড়ার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ দুর্ধর্ষ অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি যে সময় ফাঁদছেন, সেই চারের দশকেই অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে ‘নৃমুণ্ড শিকার’ এর প্রসঙ্গ পুনরায় বিশ্বখবরাখবরে বারবার উঠে আসতে থাকে।

উপনিবেশ স্থাপন ও প্রসারের কালে নতুন নতুন দেশে অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে ‘অদ্ভুত শিকারি গোষ্ঠী’—নৃমুণ্ড শিকারি (Head Hunters)-দের অস্তিত্ব প্রাচীন কালে ছিল, এমনকি কোথাও কোথাও উনিশ শতক, বিশ শতকের প্রথমার্ধেও বর্তমান এমন নিদর্শন মিলতে থাকে। উপনিবেশের প্রসারের ফলেই মূলত এইসব গোষ্ঠীর পরিচয় ও তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ সম্ভবপর হয়ে ওঠে। নৃমুণ্ড শিকারি গোষ্ঠী ও তাদের নৃমুণ্ড শিকারের উদ্দেশ্য, বিশ্বাস, সামাজিক ভূমিকা অর্থাৎ নৃমুণ্ড শিকারকে ভিত্তি করে ব্যক্তির সঙ্গে শ্রেণি বিন্যস্ত সমাজের সম্পর্ক ইত্যাদি—নৃতাত্ত্বিক গবেষণা ও ব্যাখ্যায় ক্রমশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। নৃতত্ত্ববিদ, মিশনারি, প্রশাসনিক অফিসার, পর্যটক, অভিযাত্রীদের লেখালেখি থেকে নৃমুণ্ড শিকারিদের বিচিত্র কথা জনসমক্ষে উঠে আসতে থাকে।

গবেষক/লেখকের নাম	গবেষণা কর্ম/লেখালেখির বিষয়
ইতালীয় নৃতত্ত্ববিদ Elio Modigliani	পশ্চিম সুমাত্রার কাছে দক্ষিণ নিয়াস-এর নৃমুণ্ড শিকারি গোষ্ঠী (১৮৮৬ খ্রি.) বই : *Un Viaggio a Nias*
ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ A.C. Haddon	বোর্নিয়ার নৃমুণ্ড শিকারি গোষ্ঠী (১৮৯৮-৯৯ খ্রি.) বই : *The Head Hunter* ; *Head hunters: Black, White and Brown* (১৯০১ খ্রি.)
জনৈক মিশনারি	নিউগিনিয়ায় দশ হাজার নৃমুণ্ডের সংগ্রহশালা (১৯০১ খ্রি.)
আমেরিকান লেখক Jack London	লাঙ্গালাঙ্গা অভিযানকালে লাউলাসি দ্বীপে নৃমুণ্ড শিকারি 'Malaita'দের দ্বারা জাহাজ আক্রমণ ও প্রতিশোধ স্পৃহায় ক্যাপ্টেনের মুণ্ডুশিকার (১৯০৫ খ্রি.) বই : *The Cruise of the Snark* (১৯১১ খ্রি.)
নৃতত্ত্ববিদ Kenneth George	ইন্দোনেশিয়ার সুলাওসিদ্বীপে 'Muppurondo'দের মধ্যেকার এক নৃমুণ্ড শিকারি গোষ্ঠীদের বার্ষিক নৃমুণ্ড শিকার অনুষ্ঠান।
ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ ও ব্রিটিশরাজের ICS (আসাম) J.H. Hutton	উত্তরপূর্ব ভারতের নাগা নৃমুণ্ড শিকারি (১৯২০ খ্রি.) 'Head-Hunters of the North-East Frontier' (*Journal of the Royal Society of Arts*, 1936); *Diaries of Two Tours in the Unadministered Area East of The Naga Hills* (১৯২৬ খ্রি.) [এছাড়াও Angami, Sema, Lhoto, Ao Nagas-দের নিয়েও তাঁর বই আছে]

গবেষক/লেখকের নাম	গবেষণা কর্ম/লেখালেখির বিষয়
অস্ট্রিয়ান নৃতত্ত্ববিদ Christoph Von Fürer-Haimendorf	উত্তর পূর্ব ভারতের নাগা বিশেষত কোনিয়াক নাগা নৃমুণ্ড শিকারি (১৯৩৯-৭০ খ্রি.) বই : *The Naked Nagas* (১৯৩৯ খ্রি.); *The Konyak Nagas* (১৯৬৯ খ্রি.); *Return to the naked Nagas : an anthropologist's view of Nagaland 1936-1970* (১৯৭৬ খ্রি.)
মহিলা নৃতত্ত্ববিদ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে গেরিলা যোদ্ধা Ursula Graham Bower	উত্তরপূর্ব ভারতের নাগাগোষ্ঠী (১৯৩৭-৪৬ খ্রি.) বই : *Monographs of the Nagas and the Apatani*
'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক	'কুকিদের নৃমুণ্ড শিকার'
কেদার নাথ মজুমদার	'কুকিদের বিবরণ' (নব্যভারত, ১৯০২ খ্রি.)

উপরোক্ত তালিকাটিতে লক্ষণীয় বিশ্বের ও ভারতবর্ষের নৃমুণ্ড শিকারিদের নিয়ে চর্চা ও গুরুত্বপূর্ণ লেখালেখিগুলি মোটামোটি বিশ শতকের প্রথমার্ধেই প্রকাশিত হচ্ছে। *সৌরভ*, *ভারতী*, *প্রবাসী* পত্রিকাতে বাঙালিরাও মিজো, গারো, নাগা, কুকি ইত্যাদি উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অরণ্যবাসী গোষ্ঠীদের আলোচনায় তাদের মধ্যে প্রচলিত নৃমুণ্ড শিকারের প্রসঙ্গটিও বর্ণনা করছেন।

শ্রীধর যে বোর্নিয়ার নৃমুণ্ড শিকারিদের কথা *রংমশাল* পত্রিকার খুদে পাঠকদের শোনান সেই বোর্নিয়াতে নৃমুণ্ড শিকার 'হোয়াইট রাজা' জেমস ব্রুকের আমলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় ১০০ বছর পূর্বেই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ১৯৪৩-৪৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বোর্নিয়ার এই নৃমুণ্ড শিকারিদের নিষিদ্ধ নৃমুণ্ড শিকার পদ্ধতি জাপানি সেনাদের বিরুদ্ধে পুনরায় প্রযুক্ত হয় এবং তাতে তাদের উৎসাহিতও করা হয়।[৬০] ইম্পিরিয়াল জাপানি সেনাদের শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্ত হতেই বোর্নিয়ার নৃমুণ্ড শিকারিগোষ্ঠী মিত্রশক্তিকে সমর্থন ও সহায়তা করে। যে বোর্নিয়ার 'ডায়াক' গোষ্ঠী নৃমুণ্ড শিকারের জন্য কু/বিখ্যাত, তারা কিন্তু জঙ্গলে ভেঙে

পড়া U. S. বমারু বিমানের বৈমানিক বা কর্মীদের মারে না; উল্টে তাদের আশ্চর্য করে দিয়ে খাদ্য আশ্রয় দানের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে জাপানি সেনাদের থেকেও রক্ষা করে। পরে অস্ট্রেলিয় ও ব্রিটিশ সেনাদের নিয়ে গঠিত 'Special Operatize of Z Special Unit'-এ 'ডায়াক' নৃমুণ্ড শিকারিদের অন্তর্ভুক্ত করে শক্তিশালী 'Headhunting Army' গড়ে ওঠে; যারা প্রায় দেড় হাজার জাপানি সেনাকে মারে বা বন্দি করে। অনুরূপে উত্তর পূর্ব ভারত ব্রহ্মদেশ সীমান্তের পার্বত্য জাতি এমনকি নৃমুণ্ড শিকারি গোষ্ঠীর নাগারাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশেষত কোহিমা-যুদ্ধে (১৯৪৪ খ্রি.) ব্রিটিশ তথা মিত্রশক্তিকে সহায়তা করে; তারা জাপানি সেনা (Japanese U Go Offensive)-দের বিরুদ্ধে যায়।[৬১] প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালেও উত্তর-পুর্ব ভারতের পার্বত্য জাতি গারো, খাসি, লুসাই, মণিপুরি ও নাগা লোকজন যুদ্ধক্ষেত্রে কর্মী বা শ্রমিক রূপে ইউরোপ-ফ্রন্ট তথা ফ্রান্সে প্রেরিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাগাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নাগা পর্বতে জাপানি আগমনকালে প্রথমদিকে নাগারা বন্ধুত্বপূর্ণ থাকলেও ক্রমে জাপানিরা তাদের মজুত ধান, গবাদি পশুপাখি, খাদ্য লুঠ করায়, গ্রাম-বাড়িঘর-জমিক্ষেত সম্পূর্ণ ধ্বংস করায় ও অবরোধ-ধর্ষণ-অত্যাচার চালালে নাগারা জাপানিদের শত্রু রূপে দেখে। Indian National Army জাপানি সেনার পক্ষে ছিল, ফলে এই ভারতীয়রা শত্রু না বন্ধু এ নিয়ে নাগাদের মধ্যে যথেষ্ট সংশয়, সন্দেহ ও অপচ্ছন্দ কাজ করে। যুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীন নাগা স্টেটের স্বপ্নে Zhapu Phizo-র মতো গুটিকয় নাগা জাপানিদের পক্ষে থাকলেও প্রায় সব নাগাগোষ্ঠীগুলিই ব্রিটিশ সেনাদের সমর্থন করে। জাপানিদের প্রতি ব্রিটিশদের ছোঁড়া বোমা ইত্যাদিতে নাগাদের ক্ষতি হয় ঠিকই; কিন্তু ব্রিটিশরা দুর্দিনে তাদের ত্রাণ, ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িঘর ক্ষেত জমি মেরামতে সাহায্য করায়, সর্বোপরি কোহিমার ডেপুটি কমিশনার Charles Pawsey-র মতো ব্রিটিশ অফিসারের নাগাদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা, Prof. Hutton, Mr. Mills বা নৃতত্ত্ববিদ Ursula Graham Bowers প্রমুখের সঙ্গে নাগাদের বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ও নিজেদের ভালো ভবিষ্যতের আশা ইত্যাদি কারণে নাগারা ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য দেখায়। গাইড, মালবাহক মুটে, গুপ্তচর, বার্তা-দাতা (জাপানি সেনাদের ভুল খবর দেওয়া ও ব্রিটিশ সেনাকে জাপানিদের খবর দেওয়া), স্ট্রেচার বাহক, সেনাদের জন্য পরিখা খননকারী থেকে যুদ্ধে তাদের নিজস্ব রণকৌশলদক্ষ সাহসী লড়াকু যোদ্ধা রূপেও নাগারা অত্যন্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

ব্রিটিশ বায়ুসেনা লেফটেন্যান্ট Ray Jackson যুদ্ধকালে বিমান দুর্ঘটনাগ্রস্ত (১৯৪৪ খ্রি.) হলে নাগারাই তার প্রাণ বাঁচায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে এভাবে নৃমুণ্ড শিকারিরা মিত্রশক্তির সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেওয়ায় তারা বিশ্বের খবরাখবরে পুনরায় উঠে আসতে থাকে। ফলে এতদিন পর্যন্ত বিশ্বে 'অসভ্য' নৃমুণ্ড শিকারিদের নিয়ে সত্য মিথ্যা যেসব ধারণা, গুজব প্রচলিত ছিল, তাদের যতটা 'নিষ্ঠুর', 'নৃশংস', 'কুৎসিত', 'ভয়ঙ্কর', 'আদিম নির্বোধ', 'মূর্খ' ভাবার চল ছিল, তাতেও নতুন করে ভাবার প্রয়োজন হয়। অন্য দিকে বিচ্ছিন্ন দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল বা গভীর অরণ্য অঞ্চলগুলিও বিশ্বযুদ্ধ কালে বহির্জগতের সঙ্গে সড়কপথ, রেলপথ বা আকাশ পথে যুক্ত হয়; ফলে নৃমুণ্ড শিকারিরাও নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হয়, ধীরে ধীরে শিক্ষা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

এতো গেল 'অসভ্য' 'আদিম' 'অনুন্নত' বলে কথিত নৃমুণ্ডশিকারিদের কথা। কিন্তু বিশ শতকের যুদ্ধগুলি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিল 'সুসভ্য' 'আধুনিক' 'উন্নত' বলে সুপরিচিত ও গর্বিত জাতিগুলিও 'নৃমুণ্ড শিকার' কার্যটিতে কোনও অংশে কম না। দ্বিতীয় জাপান যুদ্ধ বিশেষত নানজিং হত্যাকাণ্ডে (১৯৩৭ খ্রি.) জাপানি সেনারা চীনা সেনা ও নাগরিকদের—মাথা কেটে নেয়; এমনকি এক তরোয়াল দিয়ে শত মুণ্ড ছেদনের প্রতিযোগিতা ও বীরত্বের স্মারকরূপে—কাটামুণ্ডের সঙ্গে ফটোও তোলা হয়। আর দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধে চীনামুণ্ড শিকার চালিয়েছিল যে জাপানিরা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে সেই জাপানি সেনাদের মুণ্ডগুলিই পরিণত হয়েছে শিকারে; মিত্রশক্তির সেনারা বিশেষত আমেরিকান সেনারা শত্রু মৃত-জাপানি সেনাদের মাথা বা মাথার খুলি সংগ্রহ করে; প্রশান্ত মহাসাগরীয় এই যুদ্ধে কিন্তু শত্রু জার্মানি বা ইতালীয় সেনার মাথা তারা সংগ্রহ করে না। এর পেছনে সম্ভবত ছিল আমেরিকানদের দৃষ্টিতে জাপানিদের 'less human' 'yellow demon' ভাবা ও সর্বোপরি আমেরিকানদের উপর জাপানি সেনার অত্যাচারের প্রতিশোধ। বীরত্বের স্মৃতি স্মারকরূপে নরখুলিগুলি বন্ধু-পরিবার-পরিজনকে উপহার দেওয়া কিংবা অন্যকে বিক্রি করা আমেরিকান সেনাদের মধ্যে এসময় এতটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, শত্রুর মাথা বা দেহাংশ কোনও সেনা সংগ্রহ করলে তা কঠোর শাস্তিযোগ্য বলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের চিফ কমাণ্ডার দ্বারা ১৯৪২ সালে ঘোষিত হয়। অবশ্য এরপরও *Life* পত্রিকা ১৯৪৪ সালে এক তরুণীর নেভিতে থাকা তার প্রেমিকের দেওয়া উপহার 'সই করা নরখুলি' নিয়ে পোজ দেবার

ফটো প্রকাশ করে। ভিয়েতনাম যুদ্ধেও (১৯৫৫-৭৫ খ্রি.) আমেরিকান সেনাদের 'trophy skulls' সংগ্রহ করতে দেখা যায়।[৬২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে 'অসভ্য' নৃমুণ্ড শিকারিদের মিত্রশক্তিকে সহায়তা ও যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে তাদের কথা যেমন বিশ্বখবরে পুনরায় উঠে আসতে থাকে, তেমনি যুদ্ধকালে 'সুসভ্য' 'উন্নত' জাতিগুলি বীভৎস 'নৃমুণ্ড শিকার'কে নিজেদের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করে তুলে সারা বিশ্বকে বিস্ময়-স্তম্ভিত করে। বাংলা ছোটোদের পত্রিকাগুলোতে বিশ শতকের চারের দশকে নৃমুণ্ডশিকারিদের নিয়ে প্রবন্ধ বা আখ্যানের রমরমার পেছনে সম্ভবত এটাই ছিল গূঢ় কারণ। সভ্য আধুনিক জগতের বাসিন্দা কিশোর নায়ক বা নায়কদের দৈবদুর্বিপাকক্রমে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে নৃমুণ্ড শিকারি বা নরখাদক গোষ্ঠীর কবলে পড়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের দুর্ধর্ষ রোমাঞ্চকর 'জঙ্গল-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি' সম্ভবত পাশ্চাত্য কিশোর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির প্রভাবেই এই কালপর্বের ছোটোদের বাংলা পত্রপত্রিকাগুলিতে জাঁকিয়ে বসে। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আসামের জঙ্গলে' উপন্যাসটিও এই ধারার কাহিনি থেকে খুব একটা ব্যতিক্রম হয়তো নয়। দেশীয় পটভূমিতে লেখা উপন্যাসটিতে তিনি বাঙালি দুই সদ্যতরুণের দেখা-শোনা-জানার সূত্রে ভারতেরই উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পার্বত্য-অরণ্যের নৃমুণ্ড শিকারি গোষ্ঠীগুলির পরিচয়-সমাজ-সংস্কৃতি-বিশ্বাসকে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে 'অসভ্য' 'আদিম' নৃমুণ্ড শিকারিদের চেয়ে যে নিতান্ত সুসভ্য উন্নত জাতির মানুষরাও একবিন্দুও কম হিংস্র বা প্রতিহিংসাপরায়ণ, যুদ্ধবাজ, নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর নয়—সেই গভীর সত্যটিও মহাদেবের ছোট্ট উক্তিতে ঔপন্যাসিক খুদে পাঠকদের জানাতে ভোলেননি।

আর এই গভীর সত্যটির প্রমাণ দিতেই যেন *রামধনু* (চৈত্র, ১৩৫৪)-র পাতায় অমলেন্দু সেন বিদেশি গল্পের ছায়ায় রচিত 'সবচেয়ে সাংঘাতিক জানোয়ার' গল্পে শুনিয়েছেন এক ধনী অভিজাত সুসভ্য সুশিক্ষিত চীনাম্যান কর্নেল লিন-হুয়াং-এর পৃথিবীর সবচেয়ে হিংস্র ও চতুর জানোয়ার শিকারের নেশায় 'মানুষ শিকারে'র অদ্ভুত শিকার-খেলায় মাতার কথা। লিনের যুক্তি ছিল : 'মানুষ বনের নিরস্ত্র অবোধ জন্তুকে চুপিচুপি মেরে শিকারির গৌরব পাচ্ছে, বোমা ফেলে হাজার হাজার স্ত্রীলোক আর শিশুকে হত্যা করে দেশপ্রেমিক বলে সম্মান পাচ্ছে, আর আমি বনের মধ্যে একটা দু'টো মানুষ মারলেই যত দোষ হবে?'[৬৩] সিঙ্গাপুর জাহাজ থেকে পড়ে দ্বীপে ওঠা বাঙালি বিখ্যাত শিকারি পুরন্দর এবার কর্নেল লিনের নতুন শিকারে পরিগণিত হয়। খাবার, পোশাক,

'পায়ের ছাপ স্পষ্ট না পড়া'র রবার জুতো ও ছোরা দিয়ে পুরন্দরকে বেলা থাকতে দ্বীপে ছেড়ে দেওয়া হয়। কারণ সন্ধ্যেতে কর্নেল চাকর ফুচিং ও মানুষখেকো কুকুরের পাল নিয়ে পুরন্দরের শিকারে বেরবেন। শুরু হয় শিকার করা ও শিকার থেকে আত্মরক্ষার জন্য দুই ক্ষুরধার বুদ্ধিমান মানুষের মধ্যে প্রাণপণ শিকার-খেলা। শেষপর্যন্ত পুরন্দর বর্মীদের বাঘ ধরার ফাঁদ পদ্ধতিতে চাকর ফুচিংকে মৃত্যুমুখে পাঠাতে এবং শিকার-উন্মাদ কর্নেলের জন্য উগাণ্ডার জংলীদের শিকার কৌশলে ছোরার কল পেতে রেখে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে সক্ষম হয়। ছোরা কর্নেলের গলায় গাঁথা গেলেও তিনি বাড়ি ফিরে কদিনের জমাটি শিকার-খেলাটা থেকে শিকার হাতছাড়া হওয়ায় আফশোস করেন। আর গল্প সমাপ্তিতেই আছে আসল চমক। দেখা যায়, পুরন্দর কর্নেলেরই ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে আসে। 'পৃথিবীর সবচেয়ে সাংঘাতিক জানোয়ার' কর্নেলকে নিজের হাতে শিকারের লোভ সে সামলাতে পারেনি। কর্নেলও বাঙালি পুরন্দরকে 'বাহাদুর শিকারি'র স্বীকৃতি দেন। সে রাতে কুকুরগুলোর ভোজ হয় মনিব কর্নেলেরই মৃতদেহ। সুসভ্য সুশিক্ষিত মানুষের মধ্যেকার নিষ্ঠুর শিকারলিপ্সু আদিম হিংসাত্মক প্রবৃত্তিটিকেই গল্পকার নবীন প্রজন্মকে যেন এখানে চিনিয়ে দিতে চান।

খেয়াল করলে দেখব, বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে চারের দশকের পর ছয়-সাতের দশকে নৃমুণ্ড শিকারিদের কীর্তিকলাপ নিয়ে বেশ কিছু কাহিনি পুনরায় রচিত হচ্ছে। এর পেছনে সম্ভবত ছিল ১৯৬১ সালে ঘটা একটি দুর্ঘটনা। আমেরিকার অন্যতম ধনী ও নিউইয়র্ক গভর্নর Nelson Rockefeller-এর পুত্র ২৩ বছরের তরুণ Michael Rockefeller শিল্পসংগ্রাহকরূপে নিউগিনিতে ক্ষেত্রসমীক্ষাকালে বোট-দুর্ঘটনায় নিখোঁজ হয়ে যান।[৬৪] সন্দেহ করা হয় তিনি অসমতের নৃমুণ্ড শিকারিদের শিকারে হয়তো পরিণত হয়েছেন। খবরটি বিশ্বব্যাপী তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রতিক্রিয়া রূপে সৃষ্ট হয় বেশ ক'টি নাটক, উপন্যাস, রক গান, টেলিভিশন শোর অনুষ্ঠানও। আন্তর্জাতিক মহলে যখন নৃমুণ্ড শিকারিদের নিয়ে পুনরায় চর্চা শুরু হয়, তখন বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতেও সম্ভবত তার প্রভাব পড়ে। তবে শুধু প্রাচ্য অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়া বা এশিয়া ওসিয়ানিয়াতেই নয়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্বিশেষে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানেই যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে নৃমুণ্ড শিকার বা নর শিকার বেশ প্রচলিত ছিল—তা এই সময়কার বাংলা নৃমুণ্ড শিকার-কেন্দ্রিক আখ্যান বা লেখালেখিগুলির মূল উপজীব্য হয়ে উঠছে।

‘নরখাদক গুহামানব’ (*শুকতারা*, ১৩৮১) গল্পে পরমেশ চৌধুরী শুনিয়েছেন সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় স্কটল্যান্ডের উপকূলবাসী সাধারণ মানুষদের অলৌকিক ভাবে প্রায়ই নিখোঁজ হয়ে যাবার পেছনে থাকা গুহাবাসী একদল অদ্ভুত নর-শিকারিদের কথা। তাদের অস্তিত্ব প্রথম লোকসমক্ষে আসে— মেলা ফেরৎ এক তরুণ দম্পতিকে শিকার করতে গিয়ে এক রাতে ঐ সুচতুর হিংস্র শিকারিদলের একজন ঘটনাচক্রে জীবিত ধরা পড়লে। তখন ইংল্যান্ডরাজ ষষ্ঠ জেমস বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ কীভাবে বহুকষ্ট স্বীকারের পর এই গুহাবাসী নরশিকারিদের আস্তানা খুঁজে বের করে তাদের বন্দি করতে সক্ষম হন— সেই রোমহর্ষক কাহিনিই এখানে বর্ণিত হয়েছে। গল্পশেষে উন্মোচিত হয়েছে এই গুহাবাসী নরশিকারিদের রহস্য— এক পলাতক স্কট ও গরীব কৃষকঘরের উৎকট স্বভাব এক মহিলার উত্তরপুরুষ তারা। খাদ্য বা জীবনধারণের জন্যই তাদের নর-শিকার ক্রিয়া। জনসাধারণের দাবিতে এই নরখাদকদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অবসান ঘটে অতীব নিষ্ঠুর এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের। লেখকের মতে এটাই ছিল অবশ্যম্ভাবী, কেননা :

> এমন একটা লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড চলতে পারে না যুগ যুগ ধরে। এইটে কালের ধর্ম। কোন পাপ কর্মই গোপন থাকে না চিরদিন। একদিন না একদিন সব অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের মুখোস খসে পড়বেই।[৬৫]

আবার বীরু চট্টোপাধ্যায়ের ‘নরমুণ্ড শিকারীদের কবলে’ (*উদ্বোধন*, ১৩৭৮) গল্পে বর্ণিত হয়েছে— ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে সুদূর ইংল্যান্ড থেকে কানাডার কাছে নোটকা সাউন্ড উপকূলে আসা ফার-ব্যবসায়ী জাহাজ ‘বোস্টনে’র ক্যাপ্টেন সহ সব নাবিকদের (মাত্র দু-জন বাদে) স্থানীয় রেডইন্ডিয়ান নৃমুণ্ড শিকারিদের শিকারে পরিণত হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনা। ঘটনাটি অবশ্য সম্পূর্ণ কার্যকারণহীন নয়। ক্যাপ্টেনের স্থানীয় রেডইন্ডিয়ান রাজাকে উপহার দেওয়া বন্দুকটি খারাপ হওয়ায় রাজা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কৈফিয়ত চান। অধৈর্য ক্যাপ্টেনও বেশ ক্রুদ্ধকণ্ঠে কদর্য ভাষায় জঘন্য গালাগাল দেন। ফলস্বরূপ রাজার নেতৃত্বে সুকৌশলে ঘটে এই বীভৎস নৃমুণ্ড শিকারের ঘটনাটি। ভবিষ্যতে অস্ত্র মেরামতির প্রয়োজনে লাগতে পারে ভেবে রাজা জাহাজের অস্ত্রাধ্যক্ষ জন রজার্স জুইটকে না মেরে ‘সাদা চামড়ার ক্রীতদাস’ রূপে বাঁচিয়ে রাখেন। বিশ বছরের তরুণ নাবিক জন রজার্সের নৃমুণ্ড শিকারিদের কবলে পড়া, তাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল বসবাস, অন্য রেডইন্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধে নৃমুণ্ড শিকারি রাজার দলকে উন্নত অস্ত্রশস্ত্র জোগান দিয়ে জয় লাভে সাহায্য

করা ও নিজেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা, ক্রমে রাজা রানির প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠা ও শেষ পর্যন্ত উপস্থিত বুদ্ধি বলে তাদের কবল থেকে মুক্ত হবার— সত্য ঘটনা নির্ভর রোমাঞ্চকর কাহিনিই 'নরমুণ্ড শিকারীদের কবলে'। গল্পের শুরুতে ক্যাপ্টেন রাজাকে 'অকৃতজ্ঞ, মিথ্যাবাদী, বন্য, অসভ্য, জংলী' বলে গালাগাল দিয়েছিল। কিন্তু গল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় এই বন্য, জংলী মানুষটি ভয়ঙ্কর নৃমুণ্ড শিকারি হলেও বাস্তবে অকৃতজ্ঞ, মিথ্যাবাদী নয়। উপসর্দাররা, রাজসঙ্গীরা বা দলের অন্যান্যরা রজার্সকে বারবার মেরে ফেলতে চাইলেও রাজা শ্বেতাঙ্গ-বন্দিকে প্রাণরক্ষার কথা দেওয়ায় নিজের শপথ ভাঙেননি; রজার্সের কৃতিত্ব, কারিগরি দক্ষতাকে যথেষ্ট সমাদর করেছেন। আরও বেশি আপনার করে পেতে তাকে বিয়েও দিয়েছেন আইটিজার্ট সর্দারের মেয়ের সঙ্গে। সর্বোপরি রজার্সকে বিশ্বাস করেই তার লেখা শংসাপত্র (যা আসলে রজার্সের ইংরেজিতে লেখা সাহায্য প্রার্থনার চিঠি) নিয়ে নতুন জাহাজে উঠে বিপদে পড়েছেন। অন্যদিকে আবার বন্দি রাজাকে নতুন জাহাজের ক্যাপ্টেন হত্যা করতে চাইলে রজার্সও তার 'প্রাণরক্ষাকারী নৃমুণ্ড শিকারি মানুষটি'কে ক্ষমা করতে বলে; বোস্টন জাহাজের অপহৃত মালের অবশিষ্ট ফেরত দেবার নামমাত্র শর্তেই রাজাকে মুক্তিও দেওয়া করায়। গল্পটি নিঃসন্দেহেই নৃমুণ্ড শিকারিদের কবলে পড়া ও শেষপর্যন্ত তা থেকে মুক্তির রোমহর্ষক আখ্যান। পাইকারি হারে নৃমুণ্ড শিকারের অমানবিক অতি বীভৎস দৃশ্যও গল্পটিতে বারেবারে উপস্থিত। কিন্তু তবুও 'নৃমুণ্ড শিকারি' ও 'শিকার' উভয়ের মধ্যেই বর্তমান মানবিক গুণকেই যেন শেষপর্যন্ত বাঙালি গল্পকার প্রাধান্য দিতে চান।

এতো গেল অতীতের বা বিগত শতাব্দীর নরশিকারিদের কথা, কিন্তু একদম সমকালের বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকের ফিলিপাইনের বিভিন্ন উপজাতিদের (ইগোরেট, ইলঙ্গটস, মানাবোজ, মরোজ ইত্যাদির) মুণ্ড শিকারের টুকরো টুকরো নানা সত্য ঘটনাকে বীরু চট্টোপাধ্যায় তুলে এনেছেন 'নরমুণ্ড শিকারীর বীভৎস কাহিনী'-তে *(শুকতারা)*। নানা আচার-অনুষ্ঠান বিশেষত বিবাহের জন্য জংলী উপজাতিদের ওঁত পেতে থেকে অতর্কিতে নারী-পুরুষ, শ্বেতাঙ্গ-অশ্বেতাঙ্গ নির্বিশেষে মুণ্ড শিকারের বেশ কয়েকটি ঘটনা তিনি হাজির করেছেন। তারই পাশাপাশি দেখিয়েছেন সভ্য জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা উপজাতিগুলির রক্তের মধ্যে আজও কেমন বর্তমান মুণ্ডুশিকারের বীভৎস অনুপ্রেরণা। গ্রামে ফেরার সময় এক সাহেবের মুণ্ডু সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বীরত্বের বলে স্বর্ণখনির সুপারিন্টেন্ডেন্টকে হাসতে হাসতে মুণ্ডুচ্যুত করে তারই অধীনস্থ ইগোরট

কর্মচারীরা। গল্পকার অবশ্য শুধুমাত্র ফিলিপাইনে সম্প্রতি মুণ্ডশিকারিদের উৎপাতের বাড়বাড়ন্তই শোনাননি। এর পেছনে থাকা নিগূঢ় কারণটিও ছোটোদের কাছে যুক্তি সহ উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে :

> বলতে গেলে এর জন্য দায়ী মার্কিন সরকার। এটা তাদের স্বখাত সলিল বলা যায়। কার্যোদ্ধারের বেশী চালাকির পরিণাম।[৬৬]

কেননা, স্পেন অধীনস্থ ফিলিপাইনে মুণ্ডশিকার বন্ধের প্রচেষ্টা না হলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে এসে সরকারি প্রচেষ্টায় এ ভয়ংকর প্রথা হ্রাস পায়। উপজাতীয়রা সরকারি সেনাদলে রিক্রুট হয়ে শহরে বসবাস সূত্রে মুণ্ড শিকারকে 'অতিবড় অপরাধ' রূপে বুঝতে শেখে। ক্রমে এ বীভৎস প্রথা কমে আসে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে নিজেদের সুবিধার্থে মার্কিন সেনাবিভাগ তাদেরকে শত্রু-জাপানিদের নৃমুণ্ড শিকারে উস্কে দেয়। ফলে স্বভাবজাত মুণ্ড-শিকারিরা ক্ষেপে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। জংলিদের হাতে যেমন কয়েক হাজার জাপানির মুণ্ডচ্ছেদ ঘটে, তেমনি জাপানিদের প্রতিশোধমূলক নির্বিচার আক্রমণে জংলিদের গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হয়, মরে অসংখ্য বৃদ্ধ, শিশু,নারীরা। এরপর যুদ্ধ থামলে প্রথমে মার্কিন সরকার, তারপর স্বাধীন ফিলিপাইন সরকারও জারি করে মুণ্ডশিকারের কঠোর নিষেধাজ্ঞা— মুণ্ড শিকারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তখন,

> উপজাতীয়রা হল বিহ্বল। এই একবার বলে মুণ্ডু কাটো, আবার বলে মুণ্ডু কেটো না। কি তাজ্জব কাণ্ড রে বাবা![৬৭]

কাগজের কৃত্রিম মুণ্ডু দিয়ে আচার-অনুষ্ঠান চালানোর সরকারি প্রচার তারা ঘৃণা, ক্ষোভে প্রত্যাখ্যান করে। প্রাগৈতিহাসিক চলিত প্রথাকে পুরোদমে চালিয়ে যায়, তবে খানিক পদ্ধতি বদলে। জীবন্ত অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে নৃমুণ্ড শিকার করা হয়। ফলে মুণ্ডুর সঙ্গে এবার লাশও হয় গায়েব। 'অসভ্য', 'অনুন্নত' নৃমুণ্ড শিকারিদের 'সুসভ্য', 'উন্নত' মানুষ কীভাবে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে, তাদের মধ্যেকার আদিম হিংসা প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে কুণ্ঠা বোধ করে না, তা গল্পকার ছোটোদেরও চিনিয়ে দিতে ভোলেন না। ফলে তরুণ পাঠক মনেও প্রশ্ন জাগে— আজ (ষাটের দশকে) সমস্ত মানব সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে যে নৃমুণ্ড শিকারিরা, তাদের অপরাধের বাড়বাড়ন্তের জন্য প্রকৃত দায়ি কারা? শুধুই কি তারা নিজেরা? নাকি তাদের বীভৎস শিকার-ক্রিয়ার একদা অনুপ্রেরণাদাতা সুসভ্য, উন্নতরাও?

তথ্যসূত্র

১. 'বাঘের মতো তেজী মানুষ' টিপুর ব্যাঘ্রপ্রীতি ও তার বাঘ-খেলনাটি (লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট জাদুঘরে রক্ষিত) সম্পর্কে ছোটোদের জানিয়েছেন শ্রীপান্থ। দ্রষ্টব্য 'জাদুঘর', *আনন্দমেলা* ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৩৮২।

২. আশুতোষ ধর (সম্পা.), *শিশুসাথী* (কলকাতা : আশুতোষ লাইব্রেরী), ৫০৯।

৩. সুধীরচন্দ্র সরকার (সম্পা.), *মৌচাক* (কলকাতা : এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ), ৫৭৯।

৪. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *বনে জঙ্গলে* (কলকাতা : দে'জ, ২০১৬), ৩৪।

৫. তদেব, ১০।

৬. বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য (সম্পা.), *রামধনু* ২য় বর্ষ, ৪৪৯।

৭. *রামধনু* ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩২৫।

৮. *বনে জঙ্গলে*, ৩১-৩২।

৯. রামধনু, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩২৪-৩২৫।

১০. *বনে জঙ্গলে*, ৩৩।

১১. *রামধনু*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩২৫।

১২. *বনে জঙ্গলে*, ৩৩।

১৩. তদেব, ৩৩।

১৪. তদেব, ৩৪।

১৫. https://www.bbc.com/news/science-environment-17239059 (accessed Jan 31, 2022).

১৬. https://theconversation.com/comparing-black-people-to-monkeys-has-a-long-dark-simian - history 55102 (accessed Jan 31, 2022).

১৭. *রামধনু*, ২য় বর্ষ, ৪৪৯-৪৫০।

১৮. *রামধনু*, ৯ম বর্ষ, ৬০৮।

১৯. *রামধনু*, ৯ম বর্ষ, ১৮৭।

২০. Joe Roman, *Whale* (London : Reaktion Books Ltd., 2017), 24.

২১. *রামধনু*, ১৪ম বর্ষ, ১৫১।

২২. তদেব, ১৫০।

২৩. *রামধনু*, ৯ম বর্ষ, ১৮৯।

২৪. তদেব, ১৯১।

২৫. তদেব, ১৮৭।

২৬. তদেব, ১৮৮।

২৭. তদেব, ১৯৪।

২৮. *রামধনু*, ১২শ বর্ষ, ৩৩৯।

২৯. Daniel Francis, *Whaling*, The canadian Encyclopedia. Historica Dominion Institute, 2010.

৩০. *রামধনু*, ১৪শ বর্ষ, ১৪৯।

৩১. *রামধনু*, ২৮শ বর্ষ, ১১৮-১১৯।

৩২. তদেব, ১১৮।

৩৩. *রংমশাল*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩১।

৩৪. তদেব, ৩১।

৩৫. তদেব, ৩৫।

৩৬. তদেব, ৩৪।

৩৭. তদেব, ৩৬।

৩৮. *রামধনু*, ৩য় বর্ষ, ৩৩৪।

৩৯. তদেব, ৩৩৫।

৪০. *রামধনু*, ২৮শ বর্ষ, ১১৭।

৪১. অসমেনিয়ার Black War (১৮২০-৩২ খ্রি.)-এর সূচনাতে ছিল উপনিবেশস্থাপনকারীদের একটি সেনাদলের একটি অস্ট্রেলিয়-আদিবাসী ক্যাঙ্গারু শিকারি দলের সঙ্গে সংঘর্ষ। দ্রষ্টব্য Ken Gelder & Rachael Weaver, ''Kangaroo hunting in Colonial Australia'', accessed Jan 31, 2022, https://pursuit.unimelb.edu.an.

৪২. বিশদ জানতে দ্রষ্টব্য সীমন্তী সেন, 'বাঙালির ভ্রমণ চেতনা', পুলক কুমার সরকার (সম্পা.), *শুভশ্রী* ২০০৫-০৬, পৃ. ১৬-২৪; রাজ্যেশ্বর সিন্হা, 'বাঙালির ভ্রমণ, ভ্রমণ কাহিনি এবং তীর্থভ্রমণ বিষয়ে একটি প্রস্তাব', অনিল আচার্য (সম্পা.), *অনুষ্টুপ প্রাক্ শারদীয়* ২০১২, পৃ. ২৭৭-৩১০।

৪৩. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *বনে জঙ্গলে*, ৯০।

৪৪. তদেব, ৯৫।

৪৫. তদেব, ১০৭।

৪৬. তদেব, ১০২।

৪৭. তদেব, ১০৩।

৪৮. তদেব, ১০৪।

৪৯. তদেব, ১০৪।

৫০. তদেব, ১০৭।

৫১. তদেব, ১০৮।

৫২. তদেব, ১১১।

৫৩. তদেব, ১১০।

৫৪. তদেব, ১১১।

৫৫. বিশদ জানতে দ্রষ্টব্য গুণেল সেডেরলফ, *ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন, ১৭৯০-১৮৪০ আবহাওয়া, বাণিজ্য ও শাসনতন্ত্র* (কলকাতা : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৮)।

৫৬. Sajal Nag, 'Rescuing Imagined Slaves. Colonial State, Missionary and Slavery Debate in North East India (1908-1920)', accessed 2 Feb, 2022, https://journals.sagepub.com/ doi.10.1177/037698361 2449592.

৫৭. প্রদীপ বসু, *বাংলা ভাষায় সমাজবিদ্যাচর্চা* (কলকাতা : চর্চাপদ, ২০১১), ৬৯-৭১।

৫৮. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *বনে জঙ্গলে*, ১১১।

৫৯. *রংমশাল*, ৭ম বর্ষ, ২৫৫।

৬০. headhunting ও বিশ্বযুদ্ধকালে headhunting-এর পুনরুত্থান সম্পর্কে বিশদ জানতে দ্রষ্টব্য— https://en.wikipedia.org/wiki/Headhunting.

৬১. Khrienuo, ''Nagas Role in World War II'', *Journal of North East India Studies,* Vol. 3(2). Jul-Dec., 2013. pp.57-69.

৬২. আধুনিক যুগে head hunting প্রথাটি নিয়ে জানতে দ্রষ্টব্য।
https://en.wikipedia.org/wiki/Headhunting.

৬৩. *রামধনু*, ২০শ বর্ষ, ৪২৪।

৬৪. https://en.wikipedia.org/wiki/Michael-Rockefeller.

৬৫. *শুকতারা*, ২৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৫৭৮।

৬৬. বীরু চট্টোপাধ্যায়, *রোমাঞ্চকর সত্যকাহিনী* (কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর), ৭।

৬৭. তদেব, ৮।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিকার-সাহিত্য ও বাঙালি কিশোরের নতুন চৈতন্য

যে কোনও অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির মতোই শিকার অ্যাডভেঞ্চারেরও অন্যতম উপাদান নায়কের স্থানিক সরণ বা অভিযাত্রা (এখানে শিকারি-নায়কের অরণ্য বা অরণ্যলগ্ন অঞ্চলে যাত্রা), নানা অভিজ্ঞতা অর্জন, বিপদের সম্মুখীন হওয়া ও বিপদ মুক্তির প্রচেষ্টা। শিকার-সাহিত্যে মুখ্য মূর্তিমান বিপদ বা প্রতিপক্ষ সাধারণত বনের হিংস্র জন্তুজানোয়ার। শিকারি-নায়কের বীরত্ব, জীবনের ঝুঁকি নেবার দুঃসাহস, তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা পাঠককে শিকার-সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। শিকারির শিকারের অনুসন্ধান, সতর্ক পদক্ষেপ, শিকার-প্রাণীটির গতিবিধি, শিকার ও শিকারির ভয়ঙ্কর মোকাবিলা— পাঠক মনে জোগায় টানটান উত্তেজনা ভয়মিশ্রিত শিহরণ, রোমাঞ্চানুভূতি। এটাই শিকার-সাহিত্যের জনপ্রিয়তার আসল পুঁজি। শিকার-সাহিত্যে শিকার ক্রিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ছাড়াও অবশ্য পাঠকের আরও কিছু উপরি প্রাপ্তি ঘটে। শিকারির অরণ্য অভিযাত্রার সূত্রেই শিকার-সাহিত্য—তা সত্য বা কল্প যে শিকার কাহিনিই হোক না কেন — উঠে আসে দেশবিদেশের বনজঙ্গলের চেনা-অচেনা নানা পশুপাখি, গাছগাছালির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ অর্থাৎ অজানা রহস্যময় অরণ্যজগতের এক বিশ্বস্ত চিত্র। হাজির হয় অরণ্যলগ্ন মানুষ ও তাদের জীবন-সংগ্রাম, সংস্কার-কুসংস্কার, লোকায়ত বিশ্বাস, গভীর অরণ্যজ্ঞানের কথা। উপস্থিত থাকে শিকারির চাকর, স্থানীয় ভৃত্য, গাইড, শিকার সহায়করাও। শিকারির বিচিত্র অনুভব, মানসিক টানাপোড়েন, আত্ম-আবিষ্কার শিকার-সাহিত্যকে দেয় ভিন্ন মাত্রা। বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত শিকার-সাহিত্যগুলিতে এই উপাদান বা উপকরণগুলি কেমন ভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে? কোন্ কোন্ মুখ্য ভাবপ্রবণতাগুলি ছোটোদের এই শিকার-সাহিত্যগুলিতে বারে বারে উঠে আসছে? আর এই ভাবপ্রবণতাগুলি বা উপাদানগুলির মাধ্যমে এইসব শিকার-সাহিত্যের লেখকরা কীভাবে শিশু-কিশোর বা তরুণ প্রজন্মের চৈতন্যকে নতুন করে গড়েপিঠে নিতে চাইছেন?— তা এই অধ্যায়ে এখন খতিয়ে দেখা যাক।

বন্যপশুর পারস্পরিক যুদ্ধ দৃশ্য : রোমাঞ্চ শিহরণের আস্বাদ ও বাস্তুতন্ত্রের পাঠ

বেঁচে থাকার তাগিদে খাদ্য, বাসস্থান ও আত্মরক্ষার জন্য বন্যপ্রাণীদের পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। অরণ্যের কঠিন জীবনে একমাত্র যোগ্যতমেরই থাকে বেঁচে থাকার অধিকার। শিকারিরা শিকার অভিযানে গিয়ে অনেক সময়ই চোখের সামনে খুব কাছ থেকে বন্যপ্রাণীদের পারস্পরিক লড়াই দেখতে পান; লাভ করেন বিস্ময়কর নানা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই শিকার-সাহিত্যে প্রায়ই উঠে আসে বন্য প্রাণীদের নিজেদের মধ্যেকার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দৃশ্য। বাংলা ছোটোদের শিকার-সাহিত্যগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়।

প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই পশুর লড়াই (ষাঁড়ের লড়াই, ভালুকের লড়াই, কুকুরের লড়াই), পাখির লড়াই (মোরগ লড়াই, বুলবুলির লড়াই) বা হিংস্র পশুর সঙ্গে মানুষের বিশেষত শত্রুপক্ষের বন্দির লড়াই—বিনোদন (public enjoyment) রূপে চলে আসছে। (একাংশ) মানুষ এই হিংস্র, রক্তাক্ত যুদ্ধ দেখে মজা পায়, আমোদ অনুভব করে। অরণ্যের সাধারণ নিয়মেই বন্যপ্রাণীদের পারস্পরিক যুদ্ধ স্বাভাবিক ঘটনা; কিন্তু গভীর অরণ্যের সেসব যুদ্ধ সভ্য জগতের সাধারণ মানুষের পক্ষে দেখা বা উপভোগ করা সম্ভব নয়। আজ আমরা চলমান সবাক ভিডিও রেকডিং, Nature Discovery Channel (১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে সূচনা), animal planet (১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে সূচনা) ইত্যাদির দৌলতে ঘরের নিরাপত্তায় বসে অনায়াসে অরণ্যের এইসব ভয়াল যুদ্ধের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি দৃশ্য, শব্দ সরাসরি (Live) দেখতে, শুনতে পাই। কিন্তু বিশ শতকের চার-পাঁচের দশক পর্যন্তও তা ছিল অসম্ভব। ফলে অরণ্যরাজ্যের এইসব তুমুল যুদ্ধগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে নির্ভর করতে হত শিকারি বা অরণ্য-অভিযাত্রীদের বলা বা লেখা বিবরণের উপর।

সমর সরকার 'সিংহ শিকার' গল্পে (*রংমশাল*, ১৩৪৭) জাঁদরেল শিকারি জোর্ডান সাহেবের স্বচক্ষে দেখা আফ্রিকার সিংহ-সিংহীর জোড়া জোড়া হয়ে দিনের বেলাতেই জেব্রা শিকারের অদ্ভুত বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলকে তুলে ধরেছেন। সিংহের মতোই দলবদ্ধ ভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বুদ্ধির সহায়তায় শিকার ধরে শেয়াল, বুনো কুকুর, নেকড়েরাও (ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের 'জানোয়ার কি নিরেট বোকা', *রামধনু* ১৩৩৫)। অরণ্যের খাদ্য-খাদক নীতিতে মাংসাশী প্রাণীর অন্যান্য প্রাণী শিকার করে ভক্ষণ খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। তবে বিভিন্ন প্রাণীর শিকার ধরায় কৌশলগত পার্থক্য ও বৈচিত্র্য থাকায় বাংলা শিকার লিখিয়েরা ছোটোদের তা জানাতে কখনো-কখনো আগ্রহী

হয়েছেন। জেব্রা, হরিণ, গাধা, খরগোশ এসব তৃণভোজী নিরীহ প্রাণীর আত্মরক্ষার্থে 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি' নীতিতে দৌড়ে পালান ছাড়া গতি থাকে না। তাই হিংস্র প্রাণীর শিকার ধরায় প্রতিপক্ষ যখন নেহাৎই দুর্বল, নিরীহ, তখন তা দেখায় প্রবল উত্তেজনা বা আমোদ থাকে না। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অরণ্যের জীবজন্তু'তে সিংহের হরিণ ধরা সম্পর্কে ঠাকুরদা তো তাই খুদে শ্রোতাদের অকপটে স্পষ্টই জানিয়ে দেন, 'কিন্তু তাতে মজার কিছু নেই, যদি সিংহে-সিংহে বা বাঘ-সিংহে লড়াই দেখতাম তাহলে বলবার আর মনে রাখবার মতো একটি ঘটনা হতো বটে; এমন ব্যাপার জীবনে একবারই দেখা যায়।'[১] তবে শুধু বাঘ, সিংহের মতো শক্তিশালী, হিংস্র মাংসাশী সমজাতীয় বা স্বজাতীয় প্রাণীদের লড়াই নয়, কখনো-কখনো মাংসাশীর সঙ্গে তৃণভোজীর লড়াইও হয়ে ওঠে ভীষণই ভয়ঙ্কর, রীতিমত দেখার জিনিষ, মনে রাখারও। অবিশ্বাস্য হওয়ায় বরং আরও বহুগুণ বেশি আকর্ষক। বুনো শুয়োর, মহিষ, গন্ডার তৃণভোজী ও আপাত নিরীহ প্রাণী হলেও তাদের দাঁত, শিং বা খড়্গের দৌলতে হিংস্র মাংসাশী বাঘ, সিংহ, চিতার আক্রমণে আত্মরক্ষার্থে তারা রুখে দাঁড়ায়; প্রতি আক্রমণ করে। ফলে অরণ্যের রণভূমিতে শুরু হয় জীবনমরণ ঘোর লড়াই। এ যুদ্ধে কখনো-কখনো শক্তি, ক্ষিপ্রতা ও বুদ্ধির সহায়তায় তারা হিংস্র ভয়ঙ্কর শত্রু শিকারি জন্তুটিকে ঘায়েল করতে, এমনকি পরাজিত বা হত্যা করতে সক্ষম হয়। এরূপ ঘটনা আশ্চর্যের হলেও একেবারেই বিরল ঘটনা নয় (সমর সরকারের 'বাঘে মহিষে', *রংমশাল*)। আবার অনেক সময় ভয়ানক যুদ্ধে শুধু একজনেরই নয়, রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দুই শত্রুরই করুণ পরিণতি বা পরস্পরের হাতে মৃত্যু ঘটতে পারে (খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অরণ্যের জীবজন্তু'তে ঠাকুরদার আসাম জঙ্গলে দেখা বাঘ ও শুয়োরের লড়াই)। আপাত নিরীহ তৃণভোজী প্রাণীও যে কতটা ভয়ঙ্কর যোদ্ধা হয়ে উঠতে পারে তা সত্যিই বিস্ময়কর; না দেখলে বা না জানলে বিশ্বাস করাও হয়তো বেশ কঠিন। এজন্য বাংলা ছোটোদের শিকার-সাহিত্যগুলিতে সবচেয়ে বেশি স্থান পেয়েছে সিংহ/বাঘ/চিতা ও বুনো শুয়োর, বাঘ ও মহিষ এবং বাঘ ও গন্ডারের লড়াই। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আফ্রিকার জঙ্গলে' (*শিশুসাথী*) তে ভারতীয় বণিকপুত্রত্রয় গরিলা শিকারের জন্য আফ্রিকার গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যে অভিযাত্রাকালে একের পর এক সম্মুখীন হয় বুনো মহিষ ও চিতা, সিংহ ও গন্ডার, অজগর ও দাঁতাল শুয়োর, দাঁতাল হাতি ও সিংহের ঘোর দ্বন্দ্বযুদ্ধের। হাতি তৃণভোজী হলেও শক্তিশালী, বিশালদেহী, শুঁড়বিশিষ্ট, দাঁতাল হলে আরও ভয়ঙ্কর; বাঘ, সিংহ, চিতা আকারে ছোটো হলেও দাঁত, নখ, থাবায় ভীষণ শক্তিধর। তাই হাতি ও বাঘ/সিংহ/ চিতার লড়াই (খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

'আফ্রিকার জঙ্গলে') এবং শক্তিতে প্রায় সমযোদ্ধা দুই মাংসাশী বাঘ ও ভালুকের বিরল লড়াইও (খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হাজারীবাগের জঙ্গলে') বাংলা ছোটোদের শিকার সাহিত্যিকদের অত্যন্ত প্রিয়। শুধু ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যেই নয়, স্বজাতির প্রাণীদের নিজেদের মধ্যেকার সমর দৃশ্যেরও নজির বর্তমান। সেক্ষেত্রে লেখকরা স্বজাতির মধ্যেকার যুদ্ধের কারণগুলি—অরণ্যরাজ্যের এলাকার অধিকার, সঙ্গিনী নির্বাচন, শাবকদের রক্ষা করা, দলনেতা হয়ে ওঠার জন্য ক্ষমতার লড়াই কিংবা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে খাদ্য, পানীয়ের চরম সঙ্কট ইত্যাদি—কে ছোটোদের উপযোগী করে সহজ সরল ভাবে ব্যাখ্যা করতেও সচেষ্ট হয়েছেন। 'অরণ্যের জীবজন্তু'তে ঠাকুরদার বয়ানে খগেন্দ্রনাথ মিত্র শুনিয়েছেন দুই বীর—দলপতি বুড়ো বড়ো হনুমান ও তরুণ বীর হনুমানের লড়াই—যেন 'বালী ও সুগ্রীবের লড়াই'; পালের গোদা বড়ো হনুমানটির পরাজিত হয়ে নেতৃত্ব হারিয়ে লেজ তুলে রণে ভঙ্গ দেওয়া ও বিজয়ী তরুণটিকে এতক্ষণ বসে থাকা দর্শক বাচ্চাকাচ্চাসহ শ-খানেক হনুমানের সকলের অনুসরণের অদ্ভুত কাহিনি। এছাড়াও অনেকগুলি শিকার কাহিনিতেই দুই দাঁতাল গুণ্ডা হাতির লড়াই কিংবা সিংহীকে নিয়ে দুই সিংহের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। সুন্দরবনের কাহিনিগুলিতে অনিবার্যভাবেই প্রাধান্য পেয়েছে জল ও স্থলের দুই সেরা ভয়ঙ্কর শিকারি কুমির ও বাঘের মরণপণ লড়াই (সুখলতা রায়ের 'বাঘে কুমিরে', *মুকুল*; রমেন দাসের 'রক্তসরার দ্বীপ', *শুকতারা*)।

বন্যপশুর পারস্পরিক যুদ্ধ দেখাটা শিকারিদের কাছে কতটা উত্তেজনায় ভরপুর আমোদের বিষয় তা বোঝা যায় সমর সরকারের 'বাঘে মহিষে' গল্পে (*রংমশাল*, ১৩৪৭)। বন্যপশুর যুদ্ধ দেখার স্বাভাবিক সুযোগ না ঘটলে, শিকারিরা মজা দেখতে ইচ্ছাকৃতভাবে পশুদের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে দিতেও কসুর করতেন না। বাঘ শিকার করে ফেরার পথে চান্নাপ্পা ও আবদুল্লা হঠাৎ যেই খবর পান সে অঞ্চলে বুনো মোষ ও বাঘ দেখা গেছে, আবদুল্লা অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ওঠেন। আবদুল্লার উৎসাহ বাঘ বা বুনো মোষ শিকারের জন্য নয়; বুনো মোষ ও বাঘের লড়াই দেখার দুর্লভ সুযোগ হাতছাড়া করতে আবদুল্লা রাজি নয়, 'কোন রকমে বাঘটাকে একবার মহিষগুলোকে দেখাতে পারা যায় তাহলে ভারী মজা হয়।'[২] ফলে আবদুল্লা লড়াই বাঁধাবার জন্য তড়িঘড়ি আয়োজন শুরু করে দেন। ঝিলের পাশে মহিষদের বিচরণ ক্ষেত্রটিতে বাঘটিকে আকৃষ্ট করে আনার জন্য লোক মারফৎ গরুর গাড়ি চাপিয়ে একটি ভেড়াকে সেদিনই ঝিলের ধারে ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে পরদিন দুপুরে গাছের উপর থেকে শিকারিদ্বয় লাভ করেন কাঙ্ক্ষিত বাঘে-মহিষে লড়াই দেখার সুবর্ণ সুযোগ—

এখন দুই শত্রু পরস্পর সম্মুখীন। যাক্ আমাদের আশা তাহলে সফল হতে চললো। এদের যে লড়াই আরম্ভ হবে, সে লড়াই একের জয়লাভ ভিন্ন শেষ হবে না।[৩] (সমর সরকার, বাঘে মহিষে, *রংমশাল* আষাঢ় ১৩৪৭)।

বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত শিকার-সাহিত্যগুলিতে বিশেষত ধারাবাহিক শিকার কাহিনি বা জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলিতে অধিকাংশক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী ভাবেই যেন হাজির বন্যপশুদের যুদ্ধের দু-একটা ঘটনা। অরণ্যে বন্য পশুর শিকার ধরা বা লড়াই দৃশ্য খুব স্বাভাবিক ঘটনা। ফলে বাঙালি শিকারিদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতানির্ভর সত্য কাহিনিগুলিতে যেমন তা স্থান পেয়েছে তেমনি বাঙালি সাহিত্যিকরাও যখন কল্পনার মিশেলে ছোটোদের শিকার-সাহিত্য রচনা করেছেন তখন অরণ্য পটভূমিটিকে আরও বাস্তব ভাবে তুলে ধরতে, অরণ্য সৌন্দর্যের পাশাপাশি অরণ্যের নিজস্ব ভয়াবহতা, পদে পদে বিপদসঙ্কুলতাকে আরও তীব্র করে তুলতে বন্যপ্রাণীদের পারস্পরিক যুদ্ধগুলিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যুদ্ধদৃশ্যগুলি বর্ণনার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য টানটান উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ পরিবেশন। শিকার-সাহিত্যের প্রাণই হল রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চ, টানটান উত্তেজনা। এই উত্তেজনা, শিহরণ, রোমাঞ্চ তুঙ্গ শিখর স্পর্শ করে নিঃসন্দেহেই শিকারির শিকারকে মোকাবিলা করার মাহেন্দ্রক্ষণটিতে। তবে শিকারিদের দেখা বন্যপ্রাণীদের পারস্পরিক যুদ্ধদৃশ্যগুলিও শিকার-সাহিত্যের উত্তেজনা, বিস্ময়, রোমাঞ্চের মাত্রাকে বৃদ্ধি করে। সমর সরকার ('সিংহের মুখে', 'বাঘে মহিষে'), খগেন্দ্রনাথ মিত্র ('আফ্রিকার জঙ্গলে', 'হাজারীবাগের জঙ্গলে', 'বনরহস্য') প্রমুখরা বন্যপ্রাণীদের লড়াই দৃশ্যগুলি এতটাই জীবন্তরূপে চিত্রিত করেছেন যে দর্শক আর শুধু শিকার অভিযাত্রীরাই নন; অরণ্যের রণক্ষেত্রে সে সময় সশরীরে হাজির না থেকেও শিকার অভিযাত্রীদের মতোই যুদ্ধ দৃশ্যগুলির রুদ্ধশ্বাস দর্শক হয়ে উঠেছে এই শিকার-সাহিত্যগুলির সর্বকালের পাঠকও।

- 'মিনিট দুই ধরে বাঘ ও মহিষ, উভয়েই অপরের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করলো। পরমুহূর্তেই বাঘটি ভীষণ লাফ দিয়ে কামানের গোলার মত ছিটকে উপরে উঠে গেলো। সর্দ্দার মহিষটিও চকিতের মধ্যে সরে গেলো এবং সে যেখানটায় ছিল ঠিক সেইখানটায় বাঘটা এসে পড়লো। ...এখন বাঘটি মাটির উপর পড়লে ক্রুদ্ধ মহিষটি বোঁ করে এক পাক ঘুরে শিং দিয়ে তাকে শূন্যে ছুড়ে দিলো। বাঘটি বুঝতে পারলো সে বড় কম শত্রুর পাল্লায় পড়ে নি। আমরা কিন্তু মহিষটির ক্ষিপ্রতা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। অতবড় মহিষটি, ছোট একটি বিড়ালের মত ক্ষিপ্র।'[৪] (সমর সরকারের 'বাঘে-মহিষে', *রংমশাল*)।

- 'ঐ টুকু প্রাণী সিংহ; কিন্তু তার বিক্রম। মুহুর্মুহু গর্জনে সারা বন কেঁপে উঠছে; উগ্রবেগে ছুটে গিয়ে সে হাতীটাকে আক্রমণ করছে। হাতীটার পিছনের পা দুটি তার দাঁত ও নখের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। ক্ষতগুলো দিয়ে ঝর-ঝর করে রক্ত ঝরছে... একবার শুঁড় তুলে চীৎকার করে সিংহটার দিকে ধেয়ে এল। এমনি সিংহটা স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে সরে দাঁড়াল';[৫] (খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আফ্রিকার জঙ্গলে', *শিশুসাথী*)
- 'রাগে দুটোরই মুখ-চোখের চেহারা ভয়ঙ্কর। আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি ও ঘন ঘন থাবার আঘাতে দুটোরই শরীর ক্ষত-বিক্ষত, মাটিতে, ঝোপের পাতায়, ডালে তাদের ক্ষত থেকে টস-টস করে রক্ত ঝরে পড়ছে। বাঘটা ভালুকটার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল। ভালুকটাও বাঘটাকে বজ্র-আলিঙ্গনে পিষে ফেলবার চেষ্টা করছে। বাঘটা দূরে সরে যায়, মাটিতে ওৎ পেতে বসে, ভালুকটাও তখন দু'পায়ের ওপর উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারে না।'[৬] (খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হাজারীবাগের জঙ্গলে', *শিশুসাথী*)

বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত শিকার-সাহিত্যগুলি থেকে বন্যপশুদের পারস্পরিক যুদ্ধের এরূপ অজস্র জীবন্ত বর্ণনার উদাহরণ হাজির করা যায়। লেখকরা যুদ্ধের প্রতিটি মুহূর্তের ধারাবাহিক বিবরণ দিয়েছেন; পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যুদ্ধের প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি শব্দ (গর্জন, মাটিতে লেজ পাছড়ানোর শব্দ, রাগে যন্ত্রণায় হাঁক, ঘন ঘন নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস, থাবার আঘাতে পা ভাঙার মট, কামড়ে দেহের হাড়গোড় ভাঙার মটমট, পতনের ধপাস ইত্যাদি)। দুই বন্যযোদ্ধার আক্রমণের প্রস্তুতি, শারীরিক ভাষা, গর্জন, আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ পদ্ধতি, আত্মরক্ষা কৌশল, ক্ষিপ্রতা, ভুল পদক্ষেপ, বাঁচার মরিয়া প্রচেষ্টা, জয়-পরাজয়—যুদ্ধের প্রতিটি ডিটেলিং লেখকরা উপস্থাপিত করেছেন। পরপর ছোটো ছোটো সহজ সরল বাক্যগুলি যুদ্ধদৃশ্যতে গতিময়তা যোগ করেছে; আবার তেমনি অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে ঈষৎ দীর্ঘ বা বড়ো বাক্যগুলি কয়েক সেকেণ্ড বা মিনিটের মরণ-বাঁচন লড়াইটিকে যেন করে তুলেছে আরও দীর্ঘায়িত এবং যুদ্ধরত প্রাণীদুটির কিছুতেই হার না মেনে পরস্পরকে পর্যুদস্ত করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা, তাদের ক্রোধ-আঘাত-প্রত্যাঘাত-যন্ত্রণাকেও যেন প্রকাশ করছে আরও তীব্রভাবে।

বন্যজন্তুদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে তাদের স্বভাব, মতিগতি, আক্রমণ ও আত্মরক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে শিকারি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তা তার নিজের শিকার ক্রীড়ার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট শিক্ষাদায়ক হতে পারে। শিশু-কিশোরদের

জন্য রচিত বিশ শতকের বাংলা শিকার-সাহিত্যগুলিতে বন্যপ্রাণীদের যুদ্ধদৃশ্যের মাধ্যমে রচয়িতারা খুদে পাঠকদের মূলত টানটান উত্তেজনা, রোমাঞ্চ উপহার দিয়েছেন। তবে এর পাশাপাশি সম্ভবত বাঙালি নবীন প্রজন্মকে পরিচিত করতে চেয়েছেন প্রাণীবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তৎকালে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা কয়েকটি বিষয়েও—স্বজাতি ও ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের পারস্পরিক সম্পর্ক, আচরণ, জীব সমাহারের পারস্পরিক নির্ভরতা-ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, খাদ্য খাদক সম্পর্ক-খাদ্যশৃঙ্খল-খাদ্যজাল, বাস্তুতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে। Charles Sutherland Elton এর বিখ্যাত বই *Animal Ecology* (১৯২৭ খ্রি.)-এর মারফৎ food chain, food cycle ইত্যাদি ধারণাগুলিতে ব্যাপক জোর পড়ে। অন্যদিকে Sir Arthur G Tansley ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'Ecosystem' শব্দটি ব্যবহার করার পর, 'Ecosystem' সম্পর্কিত গবেষণাগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। হেমচন্দ্র বাগচীর 'শিকার' (*রংমশাল*, ১৩৪৪)-এ ডোবা বা জলাশয়ের বাস্তুতন্ত্র ও তার সঙ্গে সংযুক্ত জলাশয়লগ্ন বনভূমির বাস্তুতন্ত্র এবং বিভিন্ন শ্রেণির খাদকের পারস্পরিক সংগ্রাম অর্থাৎ খাদ্য-খাদক সম্পর্ক বা শিকার-শিকারি সম্পর্কগুলি গল্পের মারফৎ উদাহরণসহ চমৎকার উঠে এসেছে।

জন্তুজানোয়ারের পারস্পরিক জীবন মরণ সংঘর্ষ (violence and aggression) দেখে বা পড়ে কিছু মানুষ কেন আমোদ (Pleasure sensation) অনুভব করেন? এর পেছনে কি থাকে মানুষের অন্তর্নিহিত আদিম হিংসা প্রবৃত্তি, মানুষের মস্তিষ্কের (Coetical arousal, amygdala) গঠন, মস্তিষ্কের (reward networks) কার্যাবলী, স্নায়বিক ফ্যাক্টর, মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (cultural factors)? —সঠিক উত্তর আমাদের অজানা; মনোবিজ্ঞানী, স্নায়ুবিজ্ঞানীদের গবেষণা হয়তো এ ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারবে। সাধারণভাবে এটুকু বলা যায়, শিকার বা জন্তু জানোয়ারের যুদ্ধদৃশ্যে রুদ্ধশ্বাস টানটান উত্তেজনা, রোমহর্ষক রোমাঞ্চ উদ্দীপনা, পরিণতির অনিশ্চিত দোদুল্যমানতা দর্শক (ও পাঠককে) আকৃষ্ট করে; সমরলিপ্ত জন্তুদের দুর্দশায় যদি আমোদ বা আনন্দানুভূতি নাও হয়, তবুও অনেকে আকৃষ্ট হন। জন্তু জানোয়ারের ভয়ঙ্কর যুদ্ধদৃশ্যগুলি দর্শকের ভয় উত্তেজনা-আবেগের নিয়ন্ত্রণে ও মানসিক শক্তিবৃদ্ধিতেও অনেক সময় সহায়ক হয়।

যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত। যে কোনও মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে মোড় বদল। দর্শকরা যে মুহূর্তে ভাবছে এই বুঝি একটির ভবলীলা সাঙ্গ হল, ঠিক পরমুহূর্তেই হয়তো সেই প্রাণীটি বুদ্ধিদীপ্ত রণকৌশল বা চকিত ক্ষিপ্ত আক্রমণে শত্রুকে ধরাশায়ী করে

ফেলল। ফলে শেষতক কে জেতে কে হারে? কি পরিণতি হয়?—এর তীব্র কৌতূহল, রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা দর্শক শিকারিদের সঙ্গে পাঠকদের মধ্যেও রোমহর্ষক শিহরণ, রোমাঞ্চ জাগিয়ে তোলে; বন্যপ্রাণীদের যুদ্ধ দৃশ্য বা বিবরণটিতে মোহাবিষ্ট করে রাখে।

শিকার ও বন্য প্রাণীদের সম্পর্কে শিকারি ও বাঙালি শিকার-সাহিত্যিকদের ধ্যানধারণার ক্রমবিবর্তনটিও স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে এই শিকার-সাহিত্যগুলিতে বর্ণিত বন্যপ্রাণীদের পারস্পরিক যুদ্ধের বিবরণ অংশে। প্রথম পর্বের বাংলা শিকার-সাহিত্যগুলিতে অনেক সময়ই দেখা যায়, শিকারিরা বন্যপ্রাণীর সাক্ষাৎ মাত্রই নির্দ্বির্ধায় নির্বিচারে শিকার আমোদে মেতেছেন। *শিশুসাথী* পত্রিকায় প্রকাশিত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আফ্রিকার জঙ্গলে' শোভনলালরা তিন বন্ধু মাত্র কুড়ি হাত দূরে বুনো মহিষ ও চিতাকে ঘোর সংঘর্ষরত দেখে; দেখামাত্রই 'তিন জনের মাথায় খেয়াল চাপল, কেবল মহিষটাকে মারলেই হবে না, চিতাবাঘটাকেও ঐ সঙ্গে গুলি করতে হবে'।[৭] ফলে খেয়াল চাপা মাত্রই নিমেষে বন কাঁপিয়ে একসঙ্গে গর্জে উঠল তিনটি রাইফেল। চিতাবাঘটাকে ঘাড় থেকে ফেলতে রক্তাক্ত মহিষটা ঘুরপাক খেয়ে প্রাণপণে চেষ্টারত দেখেও, নির্দ্ধিধায় তারা গুলি চালায়। কেননা, মহিষ ও চিতা কাউকেই পালাতে দেওয়া চলবে না। বুনো মহিষ ও চিতাবাঘ উভয়কেই খতম করলেও তারা চিতাবাঘটির চামড়াটা ছাড়া বুনো মহিষের দেহাংশ কিছুই নেয় না। অর্থাৎ শোভনলালরা চিতা ও মহিষের মরণপণ যুদ্ধের মাঝে আকস্মিক তিন নতুন শত্রুরূপে আবির্ভূত হয় নিছকই খেয়ালবশত শিকার আমোদ উপভোগ করতে ও একই সঙ্গে দুটি প্রাণীকে শিকারের কৃতিত্ব অর্জনে। পরেও গন্ডার ও সিংহের যুদ্ধে গন্ডারের খড়্গো গাঁথা 'হাঁ করা পশুরাজে'র দুর্দশা দেখে শোভনলালরা সকলে 'হেসেই অস্থির'। সিংহ গন্ডারের একটা চোখ নষ্ট করে, আর যুদ্ধজয়ী গন্ডারটার আরেকটা চোখ বীভৎস ভাবে কানা করে দেয় রতন। শিকারের কৃতিত্ব অর্জনের জন্য যুদ্ধবিধ্বস্ত, খড়্গো সিংহ গাঁথা, রক্তাক্ত, অন্ধ গন্ডারটার পেছনে রতন ছুটে যায়। অনেক শিকার কাহিনিতেই ('সিংহে সিংহে লড়াই') শিকারিরা নিরাপদ আড়াল থেকে বা গাছের উপর থেকে বিনোদন রূপে বন্যপ্রাণীদের পারস্পরিক লড়াই দেখেন; যুদ্ধের পরিপূর্ণ আমোদ উপভোগ করার পর যুদ্ধের শেষ পর্বে আত্মগোপন স্থান থেকে বেরিয়ে বা গাছের উপর থেকেই যুদ্ধক্লান্ত, পরিশ্রান্ত প্রাণী দুটিকে অতি সহজেই নির্বিচারে শিকার করেন। এমনকি প্রাণপণ লড়ে প্রতিপক্ষ বন্যপ্রাণীটির থেকে রক্ষা প্রাপ্ত, বিজয়ী যে প্রাণীটি—তাকেও অনেক সময়ই শিকারিরা গুলি করে হত্যা করতে দ্বিধা করেন না। মৃত জয়ী ও পরাজিত উভয় প্রাণীরই মূল্যবান দেহাংশ, দাঁত, শিং বা চামড়া মুনাফার লাভের আশায় শিকারিরা সংগ্রহ

করতেও ভুলেন না। তবে এর ব্যতিক্রমও ঘটে কখনো-কখনো। 'সিংহে মহিষে' গল্পে (*শিশুসাথী*) সিংহকে পরাস্ত ও হত্যা করা বীর মহিষটিকে শিকারি ইচ্ছা করলেই মেরে ফেলতে পারতেন; আফ্রিকায় হাতির দাঁতের ব্যবসায়ী শিকারির কাছে মহিষটির শিং দুটিও ছিল মূল্যবান। কিন্তু বিজয়ী বীর মহিষটিকে মারতে শিকারির হাত ওঠেনি। বিজয়ীকে মহাবিক্রমে বীরের মতোই চলে যেতে দেন। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'জঙ্গলের নাট্যাভিনয়' গল্পেও শিকারি বাঘে-মহিষের অভাবিত আশ্চর্য যুদ্ধে বিজয়ী মহিষটিকে মনে মনে বীরের সম্মান, অভিনন্দন জানিয়ে যেমন চলে যেতে দেন, তেমনি অনুভব করেন মহিষের দ্বারা বধ্য বাঘের মহার্ঘ্য দেহটিতেও আসলে শিকারির কোনও অধিকার নেই। সমর সরকারের 'বাঘে মহিষে' (*রংমশাল*) গল্পে বাঘে মহিষের যুদ্ধ দেখার আমোদ উপভোগের জন্যই আবদুল্লা কৃত্রিম উপায়ে বাইরে থেকে তাদের মধ্যে লড়াই বাঁধাবার আয়োজন করেন; ফলে বুনো মহিষগুলিকে নাগালের মধ্যে, এমনকি বাঘটিকেও তাদের লুকনো গাছের নিচে পেলেও স্বাভাবিকভাবেই আবদুল্লা বা চান্নাপ্পা কেউই তাদের শিকারে উদ্যত হননি। বাঘের মতো হিংস্র মাংসাশী শক্তিশালী প্রাণীর কাছে তৃণভোজী মহিষের জয়লাভ খানিক অসম্ভব। কিন্তু মহিষ সর্দারের রণকৌশলে বিস্মিত চান্নাপ্পার পক্ষপাতটি যে খানিকটা মহিষেরই দিকে তা তার বয়ানেই স্পষ্ট। তবু শিকারি চান্নাপ্পা যুদ্ধ শেষে বিজয়ী মহিষ-সর্দারটিকে আবদুল্লার সঙ্গে গুলি করে হত্যা করেন; আসলে হত্যা করতে বাধ্য হন। মহিষটি যুদ্ধে বাঘটিকে পরাস্ত করতে সক্ষম হলেও শেষমুহূর্তে বাঘের মরণ কামড়ে একটি পা হারায়। এক পদশূন্য অবস্থায় মৃত বাঘটির উপর দণ্ডায়মান মহিষটির ক্ষতস্থান থেকে ভীষণ রক্ত পড়ছিল। ফলে মহিষটির সকল যন্ত্রণার অবসানের জন্যই শিকারি বন্ধুদ্বয় তাকে গুলি করে। অন্যরা বাঘের ছাল খুলে নিতে চায়, যদিও তা এতই ক্ষতবিক্ষত যে কোনও দামই হবে না। চান্নাপ্পারা শুধু মহিষের শিং দুটো কেটে নেয়। শিং এই স্মারক চিহ্নটি দেখে পরবর্তীকালেও চান্নাপ্পার ঐ দুই পরাক্রমশালী বীরপশুর কথা মনে পড়ে। শিকারি চান্নাপ্পা তার বিবরণে মহিষ ও বাঘ উভয়কেই 'মহাপরাক্রমশালী বীরযোদ্ধার' সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিকার ও বন্যপ্রাণীদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিতেও ঘটেছে রদবদল। ব্রিটিশ শিকারিদের হাত ধরে বাঙালির কাছেও শিকার ক্রমশ Sports-এর মান্যতা পায়। আবির্ভাব ঘটে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি মানবিক, বিবেকবান শিকারিদের; যাঁরা নির্বিচারে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো যথেচ্ছ শিকার করেন না। স্বেচ্ছায় শিকার Sports-এর নিয়মকানুন (Protocol) মানতে আগ্রহী; 'fair play' শিকার নীতিতে

বিশ্বাসী। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘আফ্রিকার জঙ্গলে’তে শোভনলাল-বীরেন্দ্র-রতন যুদ্ধরত প্রাণীদের দেখা মাত্র কখনও উভয় প্রাণীকেই একসঙ্গে, কখনো বা জীবিত জয়ী প্রাণীটিকে হত্যা করে শিকারের কৃতিত্ব অর্জন করতে চেয়েছিল; অথচ ঐ খগেন্দ্রনাথ মিত্রেরই পরবর্তীকালে রচিত ‘বনরহস্য’তে অরণ্যের রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত বাঘ ও শুয়োরকে অতর্কিতে অলক্ষ্য থেকে কেউ পরপর দু-বার গুলি চালিয়ে হত্যা করলে সিদ্ধেশ্বর বাবু এরূপ বধকার্যকে ‘নিতান্ত কাপুরুষের মতো’ মনে করেছেন। দ্বন্দ্বকালে প্রাণীদুটি পরস্পরকে বধ করতেই মত্ত, অন্য কোনও দিকে ফিরেও তাকায় না। যুদ্ধে দু-পক্ষই হয়ে ওঠে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত, ক্লান্ত বিধ্বস্ত। তাই পারস্পরিক যুদ্ধরত প্রাণীকে শিকার করা সিদ্ধেশ্বর বাবু তথা তার স্রষ্টা খগেন্দ্রনাথ মিত্রের কাছেও হয়ে উঠেছে নৈতিকতা বিরোধী, শিকার Sports-এর ‘fair play’ নীতিবিরুদ্ধ, নেহাৎই কাপুরুষত্বের লক্ষণ।

জন্তু জানোয়ারের লড়াইয়ের (Blood Sport) বিনোদনটি সম্পর্কে ভিক্টোরিয়ান যুগ (১৮৩১-১৯০১ খ্রি.) থেকেই সমাজ সংস্কারকরা নীতি, নৈতিকতা ও প্রাণী কল্যাণের প্রসঙ্গ তুলে সমালোচনা ও প্রতিবাদ শুরু করেন। এই যুদ্ধের মধ্যেকার অমানবিক নিষ্ঠুর দিকটি তুলে ধরা হয়। বিশ শতকে এই প্রতিবাদ বা বিরোধী মতবাদ ক্রমশ আরও জোরালো হয়ে ওঠে। জন্তুজানোয়ারের লড়াই যেখানে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সেরূপ কিছুক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হলেও বিভিন্ন দেশে ক্রমশ জন্তুজানোয়ারের লড়াই নিষিদ্ধ বা অনেকটা সীমাবদ্ধ করা হতে থাকে। অরণ্য জগতে বন্যপ্রাণীদের পারস্পরিক লড়াই অবশ্য স্বাভাবিক ঘটনা। তবুও বাংলা শিশু-কিশোরদের শিকার-সাহিত্যগুলিতে বুনো জন্তুজানোয়ারের পারস্পরিক লড়াই দৃশ্যের বর্ণনাতেও ক্রমশ দেখা দিয়েছে বেশ কিছু রদবদল। বাইরে থেকে শিকারিদের কৃত্রিম উপায়ে বন্য জন্তুগুলিকে পারস্পরিক যুদ্ধে উস্কানো কিংবা যুদ্ধরত প্রাণীদুটির মাঝে আরেক শত্রুরূপে হাজির হওয়া অথবা পারস্পরিক যুদ্ধ কালে তাদের শিকার করা—এগুলিকে আর প্রশংসার চোখে দেখা হচ্ছে না; বরং অমানবিক, অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অন্যায় ভাবা হচ্ছে। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘বনরহস্য’তে এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিটি উঠে এসেছে। সিদ্ধেশ্বর বাবু হুঙ্কার-চিৎকার-খসখসানি শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ক্রমশ পরিষ্কার বুঝতে পারেন দুটি বন্যপ্রাণী পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘোর দ্বন্দ্বে মেতেছে। যুদ্ধরত প্রাণী দুটি ঠিক কী কী—জানার প্রবল কৌতূহলে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও যুদ্ধরত প্রাণী দুটিকে দেখতে তিনি অগ্রসর হন। প্রচণ্ড বিক্রম ও রণহুঙ্কার সহ বাঘ ও শুয়োরের মরণবাঁচন লড়াই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু ভোরের আলোয় ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত, শক্তির প্রায় শেষসীমায় পৌঁছানো ভয়ঙ্কর মূর্তির

প্রাণীদুটি দেখে তিনি কোনও রূপ আমোদ বা মজা অনুভব করেননি। এমনকি শেষতক একজন নাকি দু-জন যোদ্ধাই ধরাশায়ী হয় বা কে জেতে—এই তীব্র কৌতূহলটি মেটানোর আগ্রহও বোধ করেননি। পারস্পরিক যুদ্ধে প্রাণী দুটির দুর্দশা দেখে আমোদ লাভের বদলে, তা দেখারও তার আর ইচ্ছে থাকেনি; ফিরে যেতে চেয়েছেন। আর সেই মুহূর্তে যুদ্ধরত প্রাণীদুটিকে অকস্মাৎ কেউ গুলি করে হত্যা করলে, সিদ্ধেশ্বর বাবু এরূপ শিকারকার্যকে 'নিতান্ত কাপুরুষে'র বলে বোধ করেছেন। সিদ্ধেশ্বর বাবু প্রয়োজনে কখনো কখনো শিকারে বাধ্য হলেও তিনি অবশ্য শিকারি নন। পশুপাখি কীটপতঙ্গের প্রাকৃতিক জীবন পর্যবেক্ষণের বাতিকে তিনি স্বেচ্ছায় বনবাসী। বিশ শতকে ক্রমশ শিকারের বদলে বন্য পশুপাখি সম্পর্কে নানা গবেষণামূলক পর্যবেক্ষণে জোর পড়ে, তাদের সংরক্ষণের জন্যও চিন্তাভাবনা শুরু হয়। সেই পরিবর্তিত নতুন সুরটি ধরা আছে 'বনরহস্য'তে। ময়ূর ও কেউটে সাপকে রণলিপ্ত দেখে সিদ্ধেশ্বর বাবু হাতে তুলে নেন, না বন্দুক নয়, ক্যামেরা। যুদ্ধদৃশ্যটি তিনি ফটো বন্দি করেন। অবশ্য জয়ের গর্বে গর্বিত, আনন্দিত ময়ূরটির হাবভাব, সৌন্দর্যের ছটা, সাপটিকে ঠুকরে ঠুকরে খাওয়ার দৃশ্য দেখে মোহমুগ্ধ সিদ্ধেশ্বর বাবুর মনে হতে থাকে 'এমন দৃশ্য, এমন রঙ তো ক্যামেরায় ধরা পড়ে না। আহা! তিনি যদি ছবি আঁকতে পারতেন, তাহলে এর কতটা ধরা পড়ত এবং চোখের সামনে ধরেও রাখা যেতে পারত বটে।'[৮]

চিড়িয়াখানা প্রসঙ্গ : বন্যপ্রাণীর মুক্তাবস্থা বনাম বন্দিত্ব

এই কালপর্বের বাংলা ছোটোদের শিকার কাহিনি ও প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে অনেক সময়ই চিড়িয়াখানা বিশেষত সেই সময়কার 'আলিপুর চিড়িয়াখানা'র প্রসঙ্গ উপস্থিত [শ্রীমতী চারুলতা দেবীর 'জানোয়ারের মুখে' (*রামধনু*, ১৩৩৫), সুবিনয় রায়ের 'কাঙ্গারু শিকার' (*রামধনু*, ১৩৩৭), শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের 'বুনো জানোয়ার ধরার কৌশল' (*রামধনু*, ১৩৩৬) বা 'জানোয়ার চরিত' (*রামধনু*, ১৩৩৭), পঞ্চানন ঘোষালের 'জীবজন্তুর জন্মকথা' (*রামধনু*, ১৩৩৭)]। লর্ড ওয়েলেসলির আমলে মূলত প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ক পড়াশোনার সুবিধার্থে 'Natural History Museum' গড়ার লক্ষ্যে ব্যারাকপুরে লাটসাহেবের বাগানবাড়িতে একটি প্রমাণ সাইজের চিড়িয়াখানা স্থাপিত হয়। লর্ড লিটনের আমলে তা বন্ধ হলে, জীবজন্তুদের নতুন ঠিকানা হয় নব স্থাপিত কলকাতা আলিপুর চিড়িয়াখানায়। পূর্বেও ভারতীয় মহারাজা-নবাবদের ব্যক্তিগত শখের চিড়িয়াখানা ছিল; কিন্তু কলকাতা আলিপুর চিড়িয়াখানা কোনও ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা ছিল না;

এমনকি বিদ্যায়তনিক গবেষণার কাজেও তা শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ না রেখে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ১৮৭৬ সালে ১লা জানুয়ারি প্রিন্স অফ ওয়েলস সপ্তম এডওয়ার্ড দ্বারা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবার পর থেকে কলকাতাবাসীর মধ্যে চিড়িয়াখানাটির প্রতি আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। দেশি বিদেশি বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি টাকা, ব্যক্তিগত সংগৃহীত জীবজন্তু দান কিংবা খাঁচার বদলে জঙ্গলের আদলে কৃত্রিম খোলামেলা মুক্তাঙ্গন নির্মাণের খরচ প্রদান করে যথেষ্ট সহায়তা করেন। বিশ শতকের বাংলা শিকার কাহিনি ও প্রবন্ধগুলিতে ঘুরেফিরে বারবার আলিপুর চিড়িয়াখানার উল্লেখের আধিক্য প্রমাণ করে সেই সময় এর যথেষ্ট রমরমা ছিল। বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে বিশেষত ছোটোদের কাছে এর জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। আর পৃথিবীটা শুধু মানুষেরই নয়, পশুপাখিদেরও— ছোটোদের মধ্যে এই বোধ গড়ে তুলতে, দেশিবিদেশি বিভিন্ন পশুপাখির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ঘটিয়ে তাদের প্রতি ছোটোদের ভালোবাসার পাঠ দিতে এবং কম বয়স থেকেই প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ে অনুরাগ বৃদ্ধি করতে চিড়িয়াখানা অত্যন্ত সহায়ক। তাই বাঙালি অভিভাবক ও শিক্ষকরাও ছোটোদের পুজোর বা বড়োদিনের ছুটিতে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে নিয়ে যেতে আগ্রহী হতেন। আর ছোটোদের কাছে তো এটি ছিল স্বপ্নের গন্তব্যস্থল; কেননা ছবির বই বা পাঠ্য বইয়ের পাতার নানা জীবজন্তুদের চোখের সামনে একদম কাছ থেকে সত্যিকারের দেখতে পাওয়া তাদের কাছে যেমন আশ্চর্য বিস্ময়ের, তেমনি আনন্দেরও।

এই আলিপুর চিড়িয়াখানা সংক্রান্ত নানা টুকরোটাকরা খবরও উঠে এসেছে ছোটোদের পত্রিকায় এই শিকার সংক্রান্ত লেখালেখিগুলিতে; যেমন—এই সময় বিশেষত বিশ শতকের তিন-চার থেকে ছয়ের দশকে কী কী দেশি-বিদেশি পশুপাখি সরীসৃপ, দুষ্প্রাপ্য গাছ এখানে ছিল, কোন্ কোন্ প্রাণী (সাদা বাঘ 'মোহন', ভারতীয় সিংহ 'শয়তান', সিগারেট খাওয়া শিম্পাঞ্জি, প্রাচীনতম বাসিন্দা গজকচ্ছপ, উত্তর মেরুর ভালুক, সিলমাছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত সাজাদপুরের কুমীরছানা, সাদা হাতি 'জীবন্ত দেবতা', শীতের পরিযায়ী পাখিরা) দর্শকদের কাছে ছিল ভীষণ আকর্ষক, প্রথম ভারতীয় সুপারিন্টেন্ডেন্ট রামব্রহ্ম সান্যালের আমলে 'ক্যাপটিভ ব্রিডিং' সফলতা পাওয়ায় (১৮৮৯ খ্রি.) কীভাবে চিড়িয়াখানাটি দেশবিদেশে খ্যাতি লাভ করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বাগানটি মিলিটারি দখলে যাওয়ায় ট্র্যাঙ্কার-ট্রাক-বুলডেজারের অভিঘাতে কিছু প্রাণীর মৃত্যু ঘটে ও মিলিটারি সরলেই দ্রুত সংস্কার করা হয় কিংবা নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা (সুন্দরবনে ধরা পড়া দুটি নরখাদক বাঘের আগমন, গন্ডারের বাচ্চা 'স্নেহে'র জন্ম) বা দুর্ঘটনা (হাতি

ফুলমালার খেপে গিয়ে মাহুতকে পিষে দেওয়ায় হাতিতে দর্শকদের চাপা বন্ধ হওয়া বা খাঁচায় পড়ে যাওয়া তরুণীকে জলহস্তীর মেরে ফেলা) ইত্যাদি নানা বিচিত্র খবরাখবর যা ছোটোদের এই শিকার কাহিনিগুলিতে ধরা আছে— সেগুলি আজকে দাঁড়িয়ে অবশ্যই ঐতিহাসিক ভাবে অত্যন্ত মূল্যবান।

শিকার প্রাণীটিকে যাতে ছোটোরা সহজে চিনতে পেরে কাহিনির সঙ্গে আরও একাত্ম হতে পারে, এজন্যই মূলত বাংলা শিকার কাহিনিগুলিতে তাদের চিড়িয়াখানায় দেখা প্রাণীটির প্রসঙ্গ বারবার উত্থাপিত হতে দেখা যায়। সেই সঙ্গে ছোটোদের সচেতন করা হচ্ছে যে চিড়িয়াখানা বনের মতো, কিন্তু আদৌ প্রকৃত বন নয়; মানুষের বানানো কৃত্রিম মনোরম চিড়িয়াখানার পরিবেশে দেখা জন্তুটি ও তাদের নিজস্ব স্বাধীন স্বভূমি জঙ্গলের পরিবেশে জন্তুটিকে দেখা সম্পূর্ণই ভিন্ন অভিজ্ঞতা। প্রবোধকুমার সান্যালের 'শিকারের সন্ধানে' (*মৌচাক*, ১৩৪২) গল্পের কথক বিহারের কাহুভাগ অরণ্যে অড়হর পাতা চিবোনো হরিণ তিনটিকে দেখে ভাবেন,

> আলিপুরের অথবা লাহোরের চিড়িয়াখানার আধমরা হরিণ নয়, দিল্লি থেকে রাজপুতনার পথে মাঠে-চরা হরিণ নয়— অরণ্যের হরিণ, পীতাভ নীল, সর্বাঙ্গে-শ্বেতচক্র, কালো চোখে কাজলের রেখা টানা, কপালের শৃঙ্গশাখা— প্রাণময়, চঞ্চল, সুন্দর! ওরা যেন অরণ্যের প্রাণমূর্তি, যেন সফল স্বপ্ন, রহস্য ও বৈচিত্র্যের ওরা জীবন্ত প্রতীক।[৯]

সুন্দরবনের হলদে ডোরার সৌন্দর্য ও বুদ্ধিদীপ্ত শিকার কৌশল, আফ্রিকার সোনালি কেশরের পরাক্রম ও ঔদ্ধত্য, বুনোহাতি বা বনমহিষের বেপরোয়া বিক্রম, বনমানুষের বীরত্ব বা প্রতিহিংসা, জলহস্তীর একগুঁয়েমি হিংস্রতা, অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারুর লম্ফ সহযোগে দৌড়ে পলায়ন ইত্যাদি চিড়িয়াখানার নিরাপদ দূরত্বে খাঁচার ওপার থেকে সম্পূর্ণ বোঝা অসম্ভব। খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে ভয়ঙ্কর হিংস্র পশুপাখিকে দেখা, শব্দ করে, ভেংচি কেটে, ঢিল ছুঁড়ে তাদের রাগিয়ে মজা অনুভব এক জিনিস আর বনজঙ্গলের মুক্ত পরিবেশে তাদের মুখোমুখি হওয়া সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বা লেজ আস্ফালন করে রাগে নিস্ফল গর্জন করা ছাড়া চিড়িয়াখানায় বেচারা জন্তুটির কিছু করার থাকে না। কিন্তু মাঝের লোহার ব্যবধানটা না থাকলে 'মজা দেখা'র বদলে কী ঘটত ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। চিড়িয়াখানার ঘেরাটোপে বন্দি শান্তশিষ্ট, বিনম্র এই সব প্রাণীগুলির প্রকৃত সৌন্দর্য, স্বভাব চরিত্র, আত্মরক্ষা পদ্ধতি, হিংস্রতা, জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার মরিয়া লড়াই সঠিকভাবে দেখা ও জানা যায় একমাত্র তাদের নিজস্ব অবাধ

বিচরণভূমি জঙ্গলে। আর জঙ্গলবাসী প্রাণীদের এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি খানিকটা হলেও ছোটোরা ঘরে বসে অনুধাবন ও অনুমান করতে পারবে এই শিকার কাহিনিগুলি বা শিকারিদের লেখা অভিজ্ঞতাগুলি পড়লে।

আবার বিশ শতকে দেশবিদেশের চিড়িয়াখানাগুলির ও সার্কাসের প্রভূত জনপ্রিয়তার ফলে শিকারে জন্তুটিকে হত্যা করার বদলে ক্রমশ প্রাধান্য পেতে থাকে তাকে সেরকম আহত না করে জ্যান্ত ধরে চিড়িয়াখানাগুলিতে ও সার্কাসে সরবরাহ করা। শিকারের চেয়েও এটি ঢের বেশি কঠিন ও বিপজ্জনক। তাই বাংলা শিকার কাহিনি রূপে শিকারিদের জীবজন্তু জীবিত ধরার নানা রোমাঞ্চকর কাহিনিও ছড়িয়ে আছে এই শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলির পাতায় [সমর সরকারের 'হাতী-ধরা', *রংমশাল* ১৩৪৭; ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের 'বুনো জানোয়ার ধরার কৌশল', *রামধনু* ১৩৩৫)]।

শিকারির চাকর—স্থানীয় ভৃত্য—শিকার সহায়ক ও অরণ্যলগ্ন মানুষের কথা

শিকার-সাহিত্য বা জঙ্গল-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলিতে শিকারি বা জঙ্গল অভিযাত্রীদের চাকরবাকর এবং স্থানীয় ভৃত্যদের উপস্থিতি খুব স্বাভাবিক। কেননা, তাদের ভূমিকা বাস্তবে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিকারি বা জঙ্গলযাত্রীদের রান্নাবান্না, টুকিটাকি যাবতীয় কাজকর্ম, অস্ত্রশস্ত্র মালবহন থেকে শুরু করে তারা শিকারে শিকারির অন্যতম সহায়ক পর্যন্ত হয়ে উঠত। স্থানীয় শিকারি, গাইড বীটার, গেম ট্র্যাকার, হাঁকোয়া, তাঁবু ভৃত্য, মাচান প্রস্তুতকারক প্রমুখদের সহযোগিতা ও তাদের অরণ্যজ্ঞান ছাড়া শিকারির পক্ষে অজানা, অচেনা অরণ্যে শিকারে সাফল্য লাভ করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিকারির শিকার অভিযাত্রা বা অরণ্যযাপনের এই অপরিহার্য সঙ্গীরা থেকে যেত অনেকটাই অবহেলিত, উপেক্ষিত; অনেক সময়ই শিকারিদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য, অবজ্ঞার পাত্র।

বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার কাহিনিগুলিতে বিশেষত প্রথম দশকগুলির কাহিনিগুলিতে শিকারির চাকরবাকর ও স্থানীয় ভৃত্যরা সাধারণত চিত্রিত হয় সহজ-সরল-নির্বোধ রূপে নতুবা অত্যন্ত ভীরু কিংবা বন্য জন্তুর আগমন বা কোনও বিপদ বুঝলেই নিজের প্রাণ বাঁচাতে অতি তৎপর হিসেবে। তাদের বোকামি, ভীরুতা, বিপদ বুঝলেই পলায়ন বা গাছে উঠে পড়া ইত্যাদি নানা কর্মকাণ্ড অনেক সময়ই শিকার কাহিনির রুদ্ধশ্বাস বিপজ্জনক আবহের মধ্যে নিয়ে আসে খানিক ফুরফুরে হাসির আমেজ। সেই সঙ্গে তাদের ভীরুতার বা পলায়নের বিপ্রতীপে শিকারির নির্ভীকভাবে

বিপদ বা হিংস্র জন্তুর মোকাবিলা করার চিত্রটি শিকারির বীরত্ব, দুঃসাহসকে করে তোলে আরও মহিমান্বিত।

প্রথম পর্বের শিকার কাহিনিগুলিতে শিকারির তার চাকর বা স্থানীয় ভৃত্যদের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রায়ই উঠে আসতে দেখা যায়। সমর সরকারের 'মানুষখেকো সিংহ' (*রংমশাল*, ১৩৪৭) গল্পে রাখালের দোষে অর্থাৎ কাজে মন না দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ফলে গরুর পাল নিখোঁজ হয়। সিংহ তাড়া করা নিখোঁজ গরুর সন্ধানে সাহেব ও তার দলবল তাঁবু থেকে বহুদূরে চলে আসায় সিংহ অধ্যুষিত অঞ্চলেই অন্ধকারে আগুন জ্বেলে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করতে হয়। একটি গরুকে কোনও মতে সবাই মিলে চেপে ধরা গেলে পর চাপরাশি সাহেবের জলের ফ্লাস্কে খানিকটা দুধ দুয়ে নেয়। সুনিশ্চিত ভাবে সেই দুধ থেকে 'উপকার লাভে'র অধিকার সাহেবেরই। 'আমার ক্ষুধা পেয়েছিল ভয়ানক—সেই দুধ আগুনে গরম করে একটু খেতে শরীরটা বেশ তাজা হয়ে উঠল।'[১০] দলের সর্বশুদ্ধ ত্রিশ জনের বাদবাকিরা ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর কিনা, তাদের কী ব্যবস্থা হয়—তার কোনও খোঁজ সাহেব দেননি, সম্ভবত রাখেনও নি। চাকরের বোকামি বা সামান্যতম দোষের জন্য তাকে মারধোর করাও অবশ্য সেকালের বিদেশি বা দেশি সব শিকারি-প্রভুদেরই যেন স্বীকৃত অধিকার। সমর সরকারের 'সিংহ শিকার' (*রংমশাল*, ১৩৪৭) গল্পে আফ্রিকার জোর্ডান সাহেবের সিংহির সঙ্গে মোকাবিলাকালে বন্দুক থেকে একটি কার্টিজ ঝোপে পড়ে যাওয়ায় ভারী মুশকিল হয়। ভীষণ জন্তুটির উপর দৃষ্টি রেখেই সাহেবকে পা দিয়ে বুলেটটা খুঁজতে হয়। দু-বার গুলি চালালেও কাঁধে ও পাছায় লেগে সিংহিটা ঝোপে পালায়। সাহেবের শিকারকালে বাহন গাধাকে সামলানোর জন্য সঙ্গে আনা চাপরাশি মাটিনিকে এবার বুলেটটা খোঁজার জন্য সাহেব ডাকতে গিয়ে দেখেন সে কিছুদূরে একটা গাছের আগায় বেশ নিরাপদে বসে। সাহেবের ডাকে খানিকক্ষণ ইতস্তত করার পরে চারিদিকে চেয়ে মাটিনি গাছ থেকে নেমে এসে সাহেবকে জানায় গাধার কোনও ব্যবস্থাই সে করেনি, নিজের বুদ্ধিতে প্রাণের দায়ে গাধা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে। হারানো বুলেটের দুঃখের সঙ্গে মাটিনির এরূপ কাজকর্মে সাহেবের মাথায় রাগ চাপে; ফলে সাহেব চাপরাশি-মাটিনির কানের কাছে ঘুষি মারতে দ্বিধা করেননি। মালিকের ঘুষিতে চাপরাশি কিছু বলে না, কারণ ততক্ষণে সামনে সিংহ দেখে সে বিস্ময়াবিষ্ট। তখন অবশ্য হারানো কার্টিজের শোক ভুলে বাঁচবার আশায় সাহেবকেও চাপরাশি মাটিনির মতোই গাছতলায় পালাতে হয়। সবশুদ্ধ আঠারোটি সিংহ দেখে তাদের ঝগড়ার সুযোগে সাহেব ও মাটিনি কোনও মতে ছুটতে ছুটতে তাঁবুতে ফিরে আসেন।

সারারাত সিংহ পাহারা দেবার ভার অবশ্য পড়ে দুজন চাপরাশির উপরই। চাকরদের গায়ে হাত তোলা শুধু বিদেশি শিকারি প্রভুদেরই একচেটিয়া থাকেনি; বাঙালি শিকারিরাও মালিক রূপে চাকরকে শাস্তি প্রদানে কিছু কম দড় নন। পুঁটিমারিতে বুনো হাতি শিকারের সময় মাহুতের সামান্য ভুলের জন্য বাঙালি শিকারি সুধাংশুকান্ত আচার্য্য রেগেমেগে মাহুতের গালে সপাটে চড় কষান (সুধাংশুকান্ত আচার্য্যের 'আসামের জঙ্গলে')। এমনকি ষাটের দশকে লেখা স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালের পটভূমিতে রচিত বুদ্ধদেব গুহর 'টাঁড়বাঘোয়া'তে (*সন্দেশ*) টিকায়েতের সঙ্গী 'মিথ্যুক, পাজী' লোক দুটোকে সদ্যতরুণ বাঙালি কথক ঠ্যাঙাতে চায়। কেননা, লোক দুটো বলেছিল বাঘিনীও আহত হয়েছে; চোখের সামনে টিকায়েতের বাঘের মুখে মৃত্যু দেখে বেহুঁশ অবস্থাতেও তারা সমানে তির মারে যাতে দুটো বাঘ-বাঘিনীর গায়েই তিন-চারটি করে তির লাগে। কিন্তু পরে কথকরা দেখে বাস্তবে বাঘিনী অক্ষত। ফলে এরূপ অতিরঞ্জিত মিথ্যাচারের শাস্তি হিসেবে তাদের ঠ্যাঙানোই উচিত বলে বাঙালি কথকের মতোই মনে করে টেডও।

শিকার বা অরণ্য অভিযানকালে কোনও চুরি বা অপ্রত্যাশিত ঘটনার দায় পড়ে সাধারণত চাকর, গাইড, কুলিদের উপরই। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'বনবাসী অভিশাপে' (*মৌচাক*) কিভু অরণ্যে রাতে রহস্যময় ভাবে তাঁবু থেকে বিস্কুট, চিনির কৌটা চুরি যেতে থাকলে শিকারি-কথক সঙ্গী কাফ্রি কুলিদেরই সন্দেহ করেছেন এবং তাঁবুর বাইরে রাত জেগে বসে চোর ধরার জন্যও চাপ দিয়েছেন কুলিসর্দার মুরুকে।

শিকারির শিকার ব্যর্থতার কারণ রূপেও বহু গল্পে উঠে আসতে দেখা যায় সঙ্গী চাকর বা স্থানীয়দের নির্বুদ্ধিতা; শিকারিরাও তাদের শিকার-বিফলতার জন্য সঙ্গী চাকর বা স্থানীয়দের বারেবারে দায়ি করেন। 'হিমালয়ে ভাল্লুক শিকার' (*রংমশাল*) গল্পে সাপুরে ভালুক শিকারের দিন ভালুক তাড়ুয়া লোকেরা হঠাৎ চেঁচামেচি বন্ধ না করলে ভালুকরা কিছুতেই তাদের ব্যূহ ভেদ করে যেতে পারত না; সামনে পালাবার একমাত্র রাস্তাতেই ভালুককে আসতে হত যেখানে কথক সেন সহ বন্দুক তাক করে বসেছিল টম। কিন্তু ভালুক তাড়ুয়ারা বোকার মতো চেঁচামেচি বন্ধ করার 'অত্যন্ত অন্যায়'টা করে ফেলায় তুমুল ছত্রভঙ্গ, চরম গোলমাল অবস্থার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় লোকদের এরূপ কাণ্ড দেখে টম উত্তেজনায় লালমুখে উঠে দাঁড়ায়; শিকার শেষেও তার ক্ষোভ যায় না—'...বেটাদের বোকামি না থাকলে অন্তত আরও একটা আমাদের হাতে মরত।'[১১] চাকর বা স্থানীয়দের প্রতি শিকারি ও শিকার-লিখিয়েদের অগাধ তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞার মনোভঙ্গিটিও মাঝেমাঝেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের হাবে ভাবে, কথনভঙ্গিতে। 'হিমালয়ে ভাল্লুক-শিকার' গল্পের

কথক-সেন যে কিছুক্ষণ পূর্বেই হইচইয়ের মাঝে প্রায় ৫০ গজ দূরে ভালুক দেখে নিজে 'হিপনোটাইজড' হয়ে পড়ে, সে কিন্তু ভালুক-তাড়ুয়া স্থানীয় লোকগুলোর ক্ষেত্রে আশা করছে, ভালুক তাড়া করলেও ঐ লোকগুলোর চেঁচামেচি বন্ধ না করে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে ভালুককে তাড়ানোর কাজটা করে যাওয়াই ন্যায় কর্তব্য। সর্দারকে ইঙ্গিতে আবার বাজনা বাজাতে বললে, তুমুল গগনভেদি চিৎকারের মিনিট পাঁচেক পরেই যখন দেখা গেল এক দিকের লোকের দল উর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে, কথক-সেন যেন খানিক স্বস্তি বোধ করছে, 'যাক, বোধ হয় দু-একটা ভাল্লুক দু-এক জনকে জখম করে নিজের রাস্তা করে নিচ্ছে।'[১২] দু-একজন স্থানীয় ভালুক তাড়ানো লোকের জখম হওয়াটা যেন এমন কোনও ব্যাপারই না কিংবা অতি নগণ্য সাধারণ ব্যাপার; কেননা আসল ব্যাপার তো বহিরাগত সেন বা টমদের ভালুক শিকারের সফলতার আনন্দ উপভোগ। অমলেন্দু সেনের 'পশুরাজের কবলে' (*রামধনু*, ১৩৪৬) গল্পে বড় সাহেবের গুলিতে সিংহ সেভাবে জখম না হলেও রাগে কেশর ফুলিয়ে ভয়ানক গর্জন করে ওঠে; আর সে গর্জনেই ঘাবড়ে গিয়ে সাহেবের সঙ্গী তল্পিদার কাফ্রি ছোকরাটা হঠাৎ উঠে দাঁড়ানোয় তার মাথার লাল টুপিটা সিংহ দেখতে পায়। এক লাফে বিশ হাত উঁচু ট্যাঙ্কের ছাদে উঠে সিংহ চোখের নিমেষে ছোকরাটাকে কামড়ে ধরে আরেক লাফে নিজের দলের মধ্যে পড়ে ও তারপর দলবল সহ বনে ঢুকে যায়। ভয়ের চোটে কাফ্রি ছোকরাটার ঘাবড়ানোই তার কাল হয়েছে। তবে দ্রুত ঘটে যাওয়া এরূপ দুর্ঘটনায় কাফ্রি ছোকরার মর্মান্তিক মৃত্যুতেও লেখক কোনও সহানুভূতি বাক্য ব্যয় করেননি। উল্টে গল্প শেষে মজার সুরেই লেখক *রামধনু* পাঠকদের জানিয়ে দেন—'তোমরা শুনে সুখী হবে যে সিংহ আর ডোডোমায় আসেনি। হয়তো কাফ্রিটীকে ফলার করেই সিংহমশাই পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন।'[১৩]

বহু গল্পে দেখা যায়, সঙ্গী চাকররা হিংস্র জন্তু দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এমন সব বোকামি করে ফেলে যার ভয়ঙ্কর মাশুল দিতে হয় শিকারিকে। ননীগোপাল মজুমদারের 'সিংহের সঙ্গে একরাত্রি' (*রামধনু*, ১৩৪০) গল্পে আফ্রিকার কর্পোরাল সাহেবের গাধার ঘরে সিংহ পড়লে সাহেব সিংহের সঙ্গে 'মোলাকাতে'র জন্য বের হন। সকলের আগে চলে হ্যারিকেন্ লণ্ঠনের আলো দেখিয়ে চাকর রইস, তার পেছনে বন্দুক হাতে স্বয়ং সাহেব ও সাহেবের পেছনে বন্দুক হাতে আর্দালি গারুফু। সিংহদের খাবার নিয়ে ঝগড়ার শব্দ শুনে সাহেব ঠিক করেন এমুহূর্তে সিংহদের না ঘাঁটিয়ে নদীর ওপার থেকে আরও কয়েকজন শিকারি জোগাড় করে আসবেন। ইতিমধ্যে সামনে সিংহ দেখে

রইস ‘জমে’ যায়। সাহেবেরও একই দশা হলেও শরীরের কাঁপুনি সত্ত্বেও তিনি আস্তে আস্তে বন্দুক তুলে ধরেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটে যায় বিপর্যয়। রইস ভয়ে তাড়াতাড়ি লণ্ঠন ফেলে ভোঁ দৌড় দেয়; পেছনে কম্পমান গারুফুর সঙ্গে রইসের ধাক্কা লেগে গারুফুর বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে যায়। পরমুহূর্তে চাকর দুজনের আর চিহ্ন মাত্রও থাকে না। সাহেব কিছু বুঝে ওঠার আগে—তাঁর ডান পায়ে অসহ্য বেদনায় মাটির উপর শুয়ে পড়েন। গারুফুর বন্দুকের গুলি আসলে সাহেবের পায়ে ঢোকে। ফলে সাহেবের অবস্থা হয় শোচনীয়—

> এই গহন বন, এই ভীষণ আঁধার, তাঁর মাথার উপরে এক ক্রুদ্ধ ক্ষুধার্ত্ত সিংহ, আর তিনি ঠিক তার নীচে পড়ে আছেন, পা খোঁড়া, উপায় নেই যে পালিয়ে যাবেন। —উঃ কী সাংঘাতিক![১৪]

সেই অবস্থাতেই তিনি মরিয়া হয়ে বন্দুক তুলে সিংহকে গুলি করেন। ভীত চাকররা অবশ্য শুধুই পালিয়ে যায়নি; ওপাড়ে গিয়ে তারা অন্তত ম্যাজিস্ট্রেটকে খবর দেয়; ফলে তিন সাহেব দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে সিংহের মুখ থেকে অজ্ঞান কর্পোরাল সাহেবকে উদ্ধার করেন।

অধিকাংশ গল্পেই চাকর বা স্থানীয় ভৃত্যরা ভীরু, বোকা, পলাতক বা বিঘ্নসৃষ্টিকারী রূপে—চিত্রিত হলেও, মাঝেসাঝে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কখনো-কখনো চাকর বা স্থানীয় ভৃত্যদের অসীম সাহসিকতা, বীরত্বেরও পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। শিকারির সুযোগ্য সঙ্গীরূপে সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় তো তারা দেয়ই, এমনকি জীবন বিপন্ন করেও প্রভুকে রক্ষা করতে পিছু পা হয় না। *রামধনু*তে প্রকাশিত ‘বাঘে-মানুষে’ (আষাঢ়, ১৩৩৯) গল্পে চিতাবাঘ ও মেমসাহেবের ভয়ঙ্কর লড়াইটা বহুদূর থেকে জঙ্গলের বেড়াজাল ভেদ করে কাফ্রি ছোকরা চাকরটাই দেখতে পায়। দিনরাত বুনো জন্তুদের সঙ্গে সহাবস্থানের ফলে প্রতিবেশীরূপে কাফ্রিদের দৃষ্টিশক্তি এরূপ প্রখর হয়। সাহেবকে ইশারায় ডেকে কাফ্রি চাকর সহুঙ্কারে ধেয়ে আসায়, চিতাবাঘটা শব্দে চমকে মাথা তুলে এদিক ওদিক তাকানোয় মেমসাহেবের হাতটা রক্ষা পায়। স্ত্রীর গায়ে গুলি লাগবার ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সাহেব যখন শুধু হাতেই চিতাবাঘটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত, ঠিক সে মুহূর্তে কাফ্রি ছোকরা কর্তাকে বন্দুক উঁচিয়ে ধরতে বলে এক লাফে পেছন দিক থেকে চিতাবাঘের কান দুটো চেপে ধরে মেমের উপর থেকে চিতাবাঘকে নামিয়ে দেয়। ক্রুদ্ধ চিতাবাঘ থাবায় কাফ্রি ছোকরার চোয়াল উড়াতে এদিকে ফিরতেই সাহেবের একগুলিতেই তার হৃৎপিণ্ড ভেদ হয়। কাফ্রি ছোকরা চাকরটির প্রখর দৃষ্টিশক্তি, অরণ্য

জ্ঞান, উপস্থিত বুদ্ধি, বেপরোয়া সাহস ও জানপ্রাণ কবুল করেও মনিবের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার আত্মত্যাগের জন্যই মেমসাহেব সে যাত্রা প্রাণে বাঁচেন।

বাংলা সাহিত্যে আদর্শ পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য অসংখ্য। বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার কাহিনিগুলিতেও তাদের দেখা মেলে। বিশ শতকে মধ্যবিত্ত বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোক তরুণরা যখন শিকার প্রীতি ও অরণ্যপ্রেমে মজে গৃহের বাইরে বিপৎসংকুল বনজঙ্গল-পাহাড়ে যাচ্ছে, তখন তাদের একান্ত সঙ্গী হচ্ছে তাদের গৃহভৃত্যরা। অরণ্যের প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শিকার ক্লান্ত বা অরণ্যমগ্ন বাঙালি যুবাদের খাওয়া বিশ্রাম-আরাম-সুবিধার ব্যবস্থা করা, মালপত্র সামলানো, আদেশের পূর্বেই দরকারি জিনিসপত্র নিশ্চিত ভাবে এগিয়ে দেওয়া, যাবতীয় টুকিটাকি কাজকর্মের ভার পালন করতে দেখা যায় তাদের একান্ত অনুগত, বিশ্বস্ত অভিভাবকসুলভ গৃহভৃত্যদের। বুদ্ধদেব গুহর 'টাঁড়বাঘোয়া'র টিরিদাদা এমনই একজন আদর্শ ভৃত্য। টিরি ওঁরাও—বাঙালি কথক ও টেড দুই সদ্যতরুণ শিকারির 'একাধারে অনুচর, বাবুর্চি, গান বেয়ারার বা বন্দুকবাহক এবং লোকাল গার্জেন'।[১৫] পলাশবনার লোকেদের অনুরোধে কথকরা মানুষখেকো বাঘ শিকারে যাক তা টিরিদাদার পচ্ছন্দ নয়; কারণ কথক বা টেডের কিছু হলে তাদের বাবাদের টিরি কোন্ জবাবদিহিটা করবে; তাছাড়াও অজানা বিপদের আশঙ্কায় তার মন একেবারেই সায় দেয়নি। সদ্যতরুণ প্রভুদেরকে 'কাঁচা পাকা ভুরু'র টিরিদাদা অনায়াসে বলতে পারে, 'সবে কলেজে উঠেছ, এখনও ভালো করে গোঁফ পর্যন্ত ওঠেনি, সব একেবারে, লায়েক হয়ে গেছ দেখি তোমরা! লায়েক!'[১৬] টিরিদাদার কথকদের জন্য স্নেহ-শাসন-দুশ্চিন্তা-রাগ-অভিমান, রাগে গজগজ করতে করতে অতিথি সেবা, ভূতের ভয়, চটে উঠে বলা কথাবার্তা, রোগা সিড়িঙ্গে চেহারা হলেও ঘুমের মধ্যে 'ধাঙড়পাড়ার কোঁৎকা শুয়োরকে জলে ডুবিয়ে মারার মতো' বিকট শব্দে নাক ডাকা—সব মিলেমিশে টিরিদাদা মানুষখেকোর ভয়সংকুল গুমোট পরিস্থিতিতে নিয়ে আসে খানিক হাল্কা আমেজ—কমিক রিলিফ। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোক শিকারিদের আখ্যানে অনেক সময়ই দেশীয় নানা সংস্কার-কুসংস্কার, বিশ্বাস-অন্ধবিশ্বাস, সনাতন ধারণার ধারক ও বাহক হতে দেখা যায় স্থানীয় গ্রামীণ মানুষ বা নিম্নবর্গের মানুষগুলিকে কিংবা শিকারিদের চাকরবাকরদেরও। টিরি ওঁরাও এর ব্যতিক্রম নয়; পলাশবনার বস্তির লোকেদের মতোই সেও বিশ্বাস করে রাতের বেলা বনপাহাড়ে দেবতাদের নিয়ে রসিকতা করা ঠিক না— ওঁদের তো আর বন্দুক দিয়ে মারা যাবে না। ঘরের ভেতর থেকে টিরিদাদার 'হায় রাম! হায় রাম!' ধ্বনি তুলে হাই তোলা এবং গুনগুনিয়ে সুর করে

তুলসীদাসী রামায়ণ আবৃত্তি পলাশবনার মানুষখেকোর রাজত্বের উৎকণ্ঠাভরা, অনিশ্চিত অন্ধকার রাত্রির স্তব্ধ নীরবতার মাঝে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা। টিকায়েত চলে গেলে টিরিদাদা সেদিন হঠাৎ টিকায়েতকে বাঘে খাবার ভবিষ্যতবাণী করে ফেলে; কথক ও টেডের কাছে তার কুসংস্কারের জন্য বকুনি খেয়েও টিরিদাদা গলা নামিয়ে বিশ্বাস করাতে চায় 'পাহান্-এর বেটা' টিরি নিজের চোখে পেছনে যমদূত দেখেছে, টিকায়েতের আয়ু শেষ। সেই টিরিদাদাই কিন্তু পরদিন বাঘের মুখে টিকায়েতের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুসংবাদে 'স্ট্যাচু'র মতো দাঁড়িয়ে থাকে। টিকায়েতের হত্যাকারী মানুষখেকো আহত বাঘ বাঘিনীর সন্ধানে যাওয়া কথক ও টেডকে বিদায় দিতে সে ফ্যাকাশে মুখে গ্রামের শেষ পর্যন্ত আসে। কথকদের যেতে মানা করবে ভেবেও অসহায় গ্রামবাসীদের জন্য ও টিকায়েতের ছেলের কান্নাভেজা মুখের দিকে চেয়ে টিরিদাদা কথকদের আর বাধা দিতে পারে না, বলে, 'এসো, এসো, যাওয়া নেই, এসো'।[১৭] জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে ফার্স্টক্লাস ভাত ও মুরগির ঝোল রেঁধে রাখবে, 'যাও, দেরি কোরো না ফিরতে। আমি কিন্তু না খেয়ে বসে থাকব তোমাদের জন্য।'[১৮] কথকের মনে হয় টিকায়েতের মা ও স্ত্রীও হয়তো কাল বিকেলে এমনি করেই টিকায়েতকে বিদায় দিয়েছিলেন। গৃহ, পরিবার থেকে বহু দূরে জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ অরণ্য পরিবেশে টিরিদাদার মতো অভিভাবক সুলভ গৃহভৃত্যরাই শিকারিদের জন্য বয়ে আনতেন স্নেহ-ভালোবাসা মমতাভরা গৃহের উষ্ণতার স্পর্শ। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'বনরহস্য'তে স্বেচ্ছায় গহন অরণ্যবাসী সিদ্ধেশ্বরবাবুর লোকালয়ের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল সৃষ্টিধর। তার উপর তিনি খুব নির্ভর করতেন, স্নেহও করতেন যথেষ্ট। অরণ্যে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত ভুটিয়া সম্পর্কে তিনি অবশ্য সৃষ্টিধরের কাছে কিছু গোপন করেন। তবে মনিবের অনুপস্থিতিতে বাহাদুর-চাকরের খুনে পুলিশ সৃষ্টিধরকেও সন্দেহ করছে শুনে তিনি তাকে তাদের উকিলবাবুর কাছে যাবার পরামর্শ দিয়ে আশ্বাস দেন—'তুমি যদি ঠিক থাক, তোমাকে আমার অবিশ্বাস না হয়, তাহলে পুলিশ কেন, পুলিশের ভূত এলেও তোমার কিছু করতে পারবে না।'[১৯] সিদ্ধেশ্বরবাবুর সৃষ্টিধরের প্রতি স্নেহ ও বিশ্বাসের উল্টোদিকে সৃষ্টিধরেরও কর্তার প্রতি টান, শ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম। কর্তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী অরণ্যে পৌঁছে দিতে বা লোকালয়ে খারাপ কিছু ঘটলে সে কর্তার খোঁজ নিতে গভীর অরণ্যে ছুটে আসত কখনও ঘোড়ায়, কখনও পুলিশের নজর এড়াতে হেঁটেও। এক ভুটিয়ার গায়ে কর্তার কোট-কম্বল দেখে কর্তার জন্য সে ভীত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। পার্বত্য ভুটিয়াদের সম্পর্কে বাঙালি বা অন্যান্যদের দৃষ্টিভঙ্গিটি ধরা আছে সৃষ্টিধরের কথায়; কর্তা ঠান্ডায় কষ্ট পাওয়া ভুটিয়াকে নিজেই কোট, কম্বল দিয়েছেন শুনে সে

বলে—'ভুটিয়ার আবার মরণ। ওরা হল পাথর।'[২০] কর্তার অরণ্যবাতিক সে ভালো বুঝত না, কিন্তু কর্তার চেহারা খারাপ হচ্ছে দেখে ফিরে যেতে বারবার অনুরোধ করত। চিঠিতে মেয়ের অসুখ শুনেও কর্তার দেখাশোনার কথা ভেবে সে দেশে চলে যেতে পারেনি। কর্তা তাকে এনিয়ে ভাবতে না বলাতেও সে ক্ষুণ্ণ মনে বসে থাকে। কর্তা ছুটি দিলে ও মেয়ের অসুখ ভালো হলেই আসতে বলার পর, সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্তাকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেয়। সৃষ্টিধরের বিলীয়মান মূর্তি দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই সিদ্ধেশ্বরবাবুও নিজেকে হঠাৎ বড় নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকেন, উপলব্ধি করেন এবার তিনি সত্যই একা। ডাকাতাক্রান্ত আহত জ্ঞানশূন্য সিদ্ধেশ্বরবাবু প্রাণে বেঁচে ছিলেন আরেক চাকরের দৌলতেই। রমেশবাবুর চাকর রতন নদীধারে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে ঘোড়ায় করে দ্রুত নিজ কর্তাকে খবর দেয়। দেখা যাচ্ছে, বাঙালি ভদ্রলোক শিকারি বা অরণ্য অভিযাত্রীদের লোকালয়বিচ্ছিন্ন গভীর গহন অরণ্যে অন্যতম সঙ্গী, একান্ত সহায় ও সম্বল ছিল তাদের অনুগত, বিশ্বস্ত সেবকরাই। 'বন রহস্য'র শেষে সৃষ্টিধরের আর ফিরতে না পারার—মেয়ের অসুখ সারাতে গিয়ে নিজেই দু-দিনের জ্বরে মারা যাবার—খবরটি নিঃসন্দেহেই পাঠককে বিষণ্ণ করে তোলে। সৃষ্টিধরের মতোই খগেন্দ্রনাথ মিত্রেরই সৃষ্ট আরেকটি ভৃত্য চরিত্র 'শক্তিধর' পাঠক হৃদয়কে নাড়িয়ে দেয়। 'হাজারীবাগের জঙ্গল'-এ মিঃ ফরেস্টার ২৫-২৬ বছর বয়সে কিছুকাল বন জঙ্গল পাহাড়ে ঘুরবেন ভাবলে বহুদিনের চাকর শক্তিধরও সঙ্গী হতে চায়; তাকে কিছুতেই নিরস্ত করা যায় না। অচিরেই শক্তিধর শিকার সঙ্গীরূপেও নিজ যোগ্যতার পরিচয় দেয়। বাঘের সঙ্গে মোকাবিলাকালে মিঃ ফরেস্টারের শক্তিধরের কথা খেয়াল না থাকলেও, পরে পেছনে তাকিয়ে দেখেন শক্তিধর টাঙ্গিখানা বাগিয়ে ধরে তার কাছেই স্থির দাঁড়িয়ে—একপাও নড়েনি। আখ্যানটিতে দুর্ধর্ষ শিকারি মিঃ ফরেস্টারের নাম বা তিনি কোন্ দেশীয় তা অজানা কিন্তু 'তাদের' বাড়ির ভৃত্য, 'তার' শিকার সঙ্গীর নাম বা পরিচয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন। 'শক্তিধর' নামটি নিঃসন্দেহেই ব্যঞ্জনাময় বা সাংকেতিক বিভাযুক্ত। সে শুধু সাহসীই নয়, শুধুমাত্র টাঙ্গি নিয়েই বাঘ ভাল্লুকের সঙ্গে একা যুদ্ধ করার শক্তি ও বীরত্বও সে রাখত। টাঙ্গিতে ভাল্লুকের মাথা দু-ফাঁক করার আনন্দে সে নিজের ক্ষত বিক্ষত হাতের যন্ত্রণাও যেন ভুলে যায়। শক্তিধরকে মিঃ ফরেস্টার আর সঙ্গে নিতে না চেয়ে, ফেরত পাঠাতে চাইলে সে ফরেস্টারের পা জড়িয়ে ধরে, 'এতকাল আপনাদের খেয়ে আমি মানুষ। শেষ অবধি আপনার সঙ্গেই থাকতে চাই।'[২১] ফরেস্টার বোঝেন আসলে শক্তিধর তাকে বনে একলা ছাড়তে চাইছে না। ফরেস্টার ও শক্তিধরের সম্পর্ক প্রভু ও মাইনে করা ভৃত্যের

সম্পর্কের গণ্ডিতেই আটকে থাকে না। বনের অন্যদিকে গিয়ে ফরেস্টারও শক্তিধরের জন্য দুশ্চিন্তা করেছেন—তার দেরি দেখে আহত শক্তিধর টাঙ্গি সম্বল করেই তাকে খুঁজতে বেরলে শক্তিধরকে যে আর ফিরে পাবেন না। অন্যদিকে কর্তার বাঘ মারার সফলতায় গ্রামের লোকেদের সামনে শক্তিধরের মুখে দেখা দিয়েছে গর্বের হাসি। শক্তিধর কতটা সুদক্ষ অরণ্য-সঙ্গী ছিল তা বোঝা যায় তার ঝোপে ক্রুদ্ধ গর্জন শুনে 'বাঘ' বোঝায় বা বনে সুতীক্ষ্ণ শব্দ ও গাছপালার নড়া দেখে কর্তার কানে কানে 'বুনো হাতি' বলে সাবধান করায়। বুনো হাতির তাড়াতেই শক্তিধর ও মিঃ ফরেস্টার পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পরে বহুকষ্টে ফরেস্টার শক্তিধরকে খুঁজে পান বাঘ ধরার চোরাগর্তের মধ্যে। গর্তে পড়া বাঘের সঙ্গে শুধু টাঙ্গি নিয়ে লড়ে শক্তিধর বাঘটি মারতে পারলেও তার নিজের দুখানা হাত, পাঁজর ক্ষতবিক্ষত হয়। শক্তিধর বুঝে যায় সে আর বাঁচবে না। কিন্তু ফরেস্টার ভৃত্য শক্তিধরকে 'ভাই' সম্বোধন করে আশ্বাস দেন যে কোনও ভাবে তাকে সুস্থ করে তুলবেনই। গর্তের ধারে আগুনের পাশে সারারাত অভুক্ত, ক্লান্ত শরীরে ফরেস্টার শক্তিধরকে পাহারা দেন যাতে কোনও প্রাণী আর গর্তের মধ্যে না পড়ে। পরদিন জংলিদের সাহায্যে শক্তিধরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার সময়ও বুনোহাতির আক্রমণে জংলিরা ছুট দিলে, ফরেস্টার নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করেও শক্তিধরকে রক্ষা করতে হাতির মোকাবিলা করেন। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও মিঃ ফরেস্টার তার আশ্বাসবাক্যকে বাস্তবায়িত করতে পারেন না। জংলিদের গ্রাম থেকে ডাক্তার-বৈদ্য বিশ ক্রোশের মধ্যে না থাকায় শক্তিধরকে জংলিদের চিকিৎসাধীনই রাখতে হয়। তিনদিন পর সে মারা যায়। শক্তিধরের মৃত্যুর এত বছর পরও 'আমাদের বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য, আমার সঙ্গী'—বলতে বলতে অবিচলিত নির্ভীক পোড়খাওয়া শিকারি মিঃ ফরেস্টারের চোখ দুটো ছল-ছল করে ওঠে। শক্তিধরের কথা বলার শুরুতেও মিঃ ফরেস্টারের গভীর স্বর একটু কোমল ও চোখ দুটো ম্লান হয়ে পড়েছিল। বোঝা যায়, জাঁদরেল শিকারি ফরেস্টারের হৃদয়ে আজও অনেকটা জায়গা দখল করে আছে শক্তিধর। শক্তিধরকে বাঁচাতে না পারার স্মৃতি বেদনার নিশ্চয়। তবে মিঃ ফরেস্টার স্মৃতিচারণায় মনিবের প্রতি শক্তিধরের একান্ত আনুগত্য, আন্তরিক ভালোবাসা, আত্মত্যাগের কাহিনি যেমন বর্ণনা করেছেন (যাতে হয়তো সুপ্ত থাকতে পারে মনিবের তৃপ্তি বা সন্তুষ্টিবোধ), শুনিয়েছেন শক্তিধরের জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা, তাকে হারিয়ে নিঃসঙ্গতাবোধ, তাকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করেও হিংস্র জন্তুর মোকাবিলা করার রোমহর্ষক বর্ণনা (যার মধ্যে হয়তো আত্মমহিমা বা বীরত্ব প্রচারের সুপ্তাকাঙ্ক্ষা থাকলেও থাকতে পারে); তেমনি

একই সঙ্গে বারে বারে প্রশংসা সহ তুলে ধরেছেন শক্তিধরের অসীম সাহস, শক্তি, শুধুমাত্র টাঙ্গি নিয়েই হিংস্র জন্তুকে মোকাবিলা করার বীরত্ব কথাও। শক্তিধর বাংলা সাহিত্যের একান্ত অনুগত, বিশ্বস্ত, মনিবের হিতাকাঙ্ক্ষী, আত্মত্যাগী, বাড়ির পুরাতন ভৃত্যের পরিচয় বা অভিধাতেই চিরস্থির থেকে যায় না; হয়ে ওঠে একজন সুযোগ্য, শিকার-সঙ্গী ও দক্ষ, নির্ভীক বীর শিকারিও।

সুদক্ষ শিকার সহায়ক রূপে শুধু চাকর, স্থানীয় গাইড ইত্যাদি মানুষরাই নয়, মনুষ্যেতর প্রাণীর (সুশিক্ষিত বাহক হাতি, সুদক্ষ ঘোড়া, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকরে বাজ সর্বোপরি প্রভুভক্ত কুকুরদের) কথা শিশু-কিশোরপাঠ্য এই শিকার কাহিনিগুলিতে প্রায়ই উঠে এসেছে। বিদেশি নানা প্রজাতির কুকুর নিয়ে শখের শিকারিদের বাংলার শহরতলি বা গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়ানো এবং বন্যজন্তুটির পেছনে সেইসব বিলাতি শিকারি কুকুর লেলিয়ে দিয়ে শিকার করা যখন ছিল প্রচলিত দস্তুর [ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের 'শিকারী জীবন' (*জয়যাত্রা*)] তখন এই কাহিনিগুলিতে প্রায়ই দেশি কুকুরের শিকার দক্ষতাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। 'বাজবহেরী' গল্পে (*মৌচাক*) হিতেন্দ্রমোহন বসু শিকারি 'চরখ পাখি' দিয়ে চিংকারা হরিণ শিকারের কাহিনি শোনানোর সঙ্গে শিকার সহায়ক দেশি 'তাজী কুকুরে'র (গ্রে হাউন্ডের) ইংল্যান্ডের জাত গ্রেহাউন্ডের তুলনায় অধিক শক্তি ও শিকার পারদর্শিতার কথা বলেছেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হাজারীবাগের জঙ্গলে'তে (*শিশুসাথী*) মিঃ ফরেস্টারকে ভালুকের হাতে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচায় পোষা গ্রাম্য দেশি কুকুরটি। সাহস, শিকার চাতুর্য ও প্রভুভক্তিতে কুকুরটি নিঃসন্দেহেই অনন্য।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার কাহিনিগুলিতেও স্থানীয় বা গ্রাম্য শিকারি, গাইড, ট্র্যাকার, স্থানীয় ভৃত্য বা অরণ্যলগ্ন মানুষদের প্রতি শিকারি ও শিকার-লিখিয়েদের মনোভঙ্গির পরিবর্তনটি লক্ষ্য করা যায়। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আফ্রিকার জঙ্গলে'তে পথ প্রদর্শক মাক্‌রুরুর (যাকে বুদ্ধির জন্য বীরেন্দ্র মজা করে নাম দেয় মঙ্গরু, তার) হিংস্র জন্তু বা কোনও বিপদ বুঝলেই গাছে উঠে পড়া, সেখান থেকে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে নিরাপদ বুঝলে তবেই নামা, শিকারলব্ধ প্রাণীর মাংস দেখে তীব্র উল্লাস ইত্যাদি সহ তার হাবভাব, চালচলনকে হাস্যকর ভাবে হাজির করা হয়েছে ঠিকই। নিগ্রোদের কাছে বন্দিকালে 'কালো মানুষ' পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও নিগ্রো সর্দারের 'কাল ওদের মাথার খুলি দিয়ে দেবতার পূজো হবে' হুকুমে ভারতীয় শিকারি তিনজন যেখানে চুপ সেখানে মঙ্গরুরা ভয়ে ক্রন্দনরত রূপে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু মঙ্গরুর আফ্রিকার জঙ্গল, বন্য পশুপাখি গরিলা সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান, প্রখর ঘ্রাণ-শ্রবণ-দৃষ্টিশক্তি

ও অরণ্য অভিজ্ঞতাকে লেখক বারংবার তুলে ধরেছেন। শোভনলালরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে 'হাঁ, নিগ্রোদের কথাই ঠিক। এসব বিষয়ে তাদের জ্ঞান বড় পাকা'।[২২] আবার উল্টোদিকে মঙ্গরুও জল ঝরানো পোকা বা গরিলাদের পায়ের দাগ কিংবা গরিলাদের উপস্থিতিকাল সম্পর্কে শোভনলালদের অজ্ঞতা, মূর্খতার জন্য হো হো করে হেসেছে। মঙ্গরুর সঠিক নির্দেশের জন্যই ভারতীয় বণিকপুত্রত্রয় আফ্রিকার ভয়ঙ্কর জঙ্গলে গরিলা শিকারে সফল হয়েছে; নরখাদক নিগ্রোদের থেকে বাঁচতে মঙ্গরুর কথা মতোই ছুটে চলেছে ঙ্গুইলো নদীর দিকে। ধরণীধর সেনের 'হিমালয়ে ভাল্লুক শিকারে'ও দেখা যায় কথক সেন নিযুক্ত স্থানীয় শিখ শিকারি গুরুদিৎ সিং ও মহাযুদ্ধফেরৎ পাঠান বেয়ারা মিশ্রিখানের সাহস ও বলবত্তার প্রশংসা করেছেন। শীঘ্রই তারা তাঁর আপনার লোক হয়ে ওঠে। এমনকি লীডার নদীর ধারে রাতে ভালুক শিকার কালে গুরুদিতের শব্দে চমকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কারণ রূপে—কথক সেন নিজের অতিলোভের ফলে ভালুককে লক্ষ করে বর্শা ছোঁড়ার লজ্জাজনক ঘটনাটিও অকপটে স্বীকার করেছেন; গুরুদিতের শিকার করা ভালুক বাচ্চাটি তাকেই উপহার দিয়েছেন। শিকার-ক্লান্ত কথকদের জন্য মিশ্রিখানের তৈরি 'খাসা ডিনারে'রও তারিফ করেছেন। ভবঘুরে কাশ্মীরি চোপানের স্ত্রী, সুন্দর ছেলে মেয়ে দুটির সঙ্গে পরিচয় করেছেন—'ছেঁড়া জামার ভেতর থেকে তাদের গায়ের রং আর স্বাস্থ্য যেন ফেটে পড়ছে। ছেলে-মেয়ে দুটিকে কোলে নিলাম, কথা বললাম, কিন্তু তারা কিছুই বোঝে না, বড়ো বড়ো চোখে বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে রইল।'[২৩] চোপানকে সাহায্যে ব্যর্থ হয়ে সেন অত্যন্ত মন খারাপ নিয়েই নিজ ঘাঁটিতে ফিরেছেন। সাপুরে গ্রামবাসী ভালুক তাড়ুয়াদের ভুল পদক্ষেপ বা বোকামিকে কথক সেন দোষারোপ করেছেন ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে উত্তেজিত টমকে হেসে মনেও করিয়ে দিয়েছেন তারা যে পাকা শিকারি নয় তাও বোধ হয় স্থানীয়রা বুঝতে পেরেছে। বুদ্ধদেব গুহর 'টাঁড়বাঘোয়া'তে বহিরাগত শিকারি কথক ও টেড়ের তীব্র প্রতিরোধী রূপে আবির্ভূত হয় স্থানীয় ভূস্বামী শিকারি টিকাদার। তবুও উপন্যাসটিতে টিকাদার সম্পূর্ণ নেগেটিভ চরিত্ররূপে উপস্থাপিত হয়নি। বাঘের মুখে প্রাণ গেলেও পলাশবনার রাজা টিকায়েত তার দম্ভ, জেদের সঙ্গে অসম সাহসিকতা, নিশান নৈপুণ্য বা শিকার দক্ষতার জন্যও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্থানীয় শিকারি, ভৃত্য, অরণ্যচারী মানুষ বা গ্রামবাসীদের প্রতি বাঙালি শিকারি ও শিকার-সাহিত্যিকদের অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যের ভাবটা ক্রমশ দূরীভূত হয়ে তাদের প্রতিও প্রকাশ পাচ্ছে সহমর্মিতা, সহানুভূতি। শিক্ষিত ভদ্রলোক

বাঙালি শিকারিদের কাছেও জাতি-ধর্ম-বর্ণগত ভেদাভেদ, ধনী-গরীব উচ্চনীচ বিভেদের বদলে ক্রমশ প্রাধান্য পাচ্ছে শিকার নৈপুণ্য ও অরণ্যদক্ষতা। তাছাড়াও শিকার সফলতার জন্য যে স্থানীয় শিকারি ও গ্রামবাসীদের সহযোগিতা ও সমর্থন একান্তই প্রয়োজন তাও তারা অনুধাবন করছেন। ফলে তুলনামূলকভাবে উদার, মুক্ত চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেদের শিকার সফলতার স্বার্থেও এইসব ভদ্রলোক শিকারিরা স্থানীয় গ্রাম্য শিকারি ও অরণ্যলগ্ন মানুষদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ভানুমতীর বাঘ' গল্পে শিকারি কথক গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে গল্প করেই এক রাখালের কাছে বখশিসের বিনিময়ে পাহাড়ের গুপ্ত গুহার সন্ধান পান। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হাজারীবাগের জঙ্গলে'তে মিঃ ফরেস্টারের সঙ্গে জংলি গ্রামের সর্দারের সুসম্পর্কের ফলেই গ্রামবাসীরা তার খাদ্য-বিশ্রাম ও ভেলায় বসে শিকারের ব্যবস্থা করে; নিখোঁজ হলেও প্রতিবার চারিদিকে সন্ধানের চেষ্টা করে; ফরেস্টার ফিরে এলে গ্রামবাসীদের আনন্দের সীমা থাকে না।

স্থানীয় গ্রাম্য বা নিম্নবর্গের শিকারি, গাইড, বীটারদের দক্ষতা, অরণ্য জ্ঞানকে শুধু প্রশংসা করাই নয় তাদের শিকার নৈপুণ্য, নিজস্ব দেশীয় শিকার পদ্ধতি, সাহস, বীরত্ব নিয়েও গল্প রচনায় এই বাঙালি সাহিত্যিকরা ক্রমশ আগ্রহী হচ্ছেন [সমর সরকারের 'বাঘ ধরা' (*রংমশাল*), সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের 'বাঘে মানুষে' বা অনিলকুমার চক্রবর্তীর 'বাঘের গল্প' (*শিশুসাথী*), শিবশঙ্কর মিত্রের 'সুন্দরবন')] শিকার-লিখিয়েদের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি বদলের পেছনে সম্ভবত ক্রিয়াশীল ছিল জাতীয়তাবাদী কালপর্বে ও সদ্য স্বাধীনতা লাভের সময়কালে বাঙালির সমগ্র ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীদের সঙ্গে ঐক্য স্থাপনের ও স্বদেশীয় নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবনের প্রয়াস এবং ইতিমধ্যে সাম্যবাদ আদর্শের বা মুক্ত চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়াও।

শিকার-সাহিত্যিকরা অনেক সময়ই অরণ্যলগ্ন গ্রামবাসী ও অরণ্যচারী/ অরণ্যজীবী গোষ্ঠীগুলির মানুষদের সঙ্গে, তাদের জীবনযাত্রা, খাদ্য, পোশাক পরিচ্ছদ, আচার সংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কেও শিশু-কিশোরদের পরিচিত করতে চাইছেন। দেশের (আসাম বা উত্তর পূর্ব ভারত, বিহার, মধ্যপ্রদেশ) কিংবা বিদেশের (বিশেষত আফ্রিকার) গভীর অরণ্যবাসী মানুষদের বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যিকরা প্রায়ই 'বুনো', 'জংলি', 'অসভ্য' ইত্যাদি শব্দে চিহ্নিত করেছেন। এই অরণ্যজীবী মানুষগুলির মধ্যে দেশ-বিদেশ নির্বিশেষে বেশ কিছু সাদৃশ্যও তাদের লেখায় বারবার উঠে এসেছে—

* শিকারলব্ধ প্রাণীকে বা মানুষখেকো হিংস্র জন্তুটিকে ঘিরে মহাস্ফূর্তিতে নৃত্য।

* শিকারকৃত প্রাণীটির মাংস সংগ্রহের জন্য তীব্র উল্লাস। কখনো-কখনো মৃত প্রাণীর দেহ নিয়ে তারা (বিশেষত আফ্রিকার নিগ্রোদের কয়েকটি গোষ্ঠী) এতটাই টানাটানি, কাড়াকাড়ি শুরু করে দেয় যে, বহিরাগত 'সভ্য জগতে'র বাসিন্দা শিকারি বা অরণ্যযাত্রীদেরও তাদের কাণ্ড দেখে মনে হয় যেন 'রাক্ষসের মেলা'।
* শিকারলব্ধ প্রাণীটির মাংস ছাড়াও চামড়া, দাঁত, নখ, চর্বি—বিভিন্ন প্রয়োজন, দেশীয় ওষুধ তৈরিতে ও নানা জাদুক্রিয়াকলাপের জন্য তাদের দ্রুত সংগ্রহ করতে দেখা যায়।
* দেশ-বিদেশের অনেক অরণ্যজীবী গোষ্ঠীই কাঁচা মাংস কিংবা বড়োজোর আগুনে ঝলসানো বা পোড়া মাংস খাদ্যরূপে গ্রহণ করে।
* দেশ-বিদেশ নির্বিশেষে অরণ্যচারী ও অরণ্যলগ্ন মানুষদের মধ্যে অরণ্য ও তার জীবজন্তুর প্রতি আছে অদ্ভুত শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়। অরণ্যের দেবতা-অপদেবতা, দুষ্ট আত্মা, জীন প্রমুখ নিয়ে তাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস-অন্ধবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কারের মধ্যেও নানা মিল দেখা যায়।
* বিভিন্ন অরণ্যচারী গোষ্ঠীগুলি নিজেদের মধ্যেও নানা বিরোধ, আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ, লুঠপাট, নৃশংস হত্যালীলাতে প্রায়ই মেতে ওঠে।
* তাদের অরণ্যজ্ঞান অপরিসীম ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভুল; বনের পশুপাখির আচরণ-স্বভাব-গতিবিধি 'বাহান্-সাহান্' তাদের নখদর্পণে; অরণ্যের জীবজন্তু ও বিপদ সম্পর্কেও তাদের ইন্দ্রিয় সর্বদা সজাগ; আবার কীটপতঙ্গের কামড়, হিংস্র জন্তুর আক্রমণের প্রতিষেধক নানা ভেষজ ওষুধপত্রও তাদের জানা।
* অরণ্যের জীবজন্তুর আক্রমণে আহত হওয়া বা মৃত্যু তাদের কাছে নিত্যনৈমিত্তিক সাধারণ ঘটনা; বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরূপ মৃত্যুকে তারা দৈবনির্দিষ্ট বা ভাগ্য বলেই মেনে নেয়।

অরণ্যজীবী বা অরণ্যলগ্ন মানুষদের আচরণ, খাদ্যাভ্যাস অনেক সময়ই 'সভ্য জগতের বাসিন্দা' শিকারি বা জঙ্গল অভিযাত্রীদের বিস্মিত করেছে; তাদের প্রতি ঘৃণা, অবজ্ঞা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাবটিও অনেক সময় ফুটে উঠেছে বাংলা শিকার-সাহিত্য বা জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চারগুলিতে। কিন্তু আস্তে আস্তে এধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতেও বদল দেখা যায়। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আফ্রিকার জঙ্গলে'তে বেচুয়ানদের রাজা রানির চেহারা, তাদের সাজ পোশাক, 'কুঁড়েঘরে'র রাজবাড়ি, কাচের মালা দেখে বিস্ময়, বহির্জগতের উপহারগুলির প্রতি লোলুপতা, খাদ্য-অখাদ্য দিয়ে অতিথি সেবা ইত্যাদি মজাদার ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে—তাঁদের সারল্য-আন্তরিকতা-দামি হাতির দাঁত শিকারিদের উপহার দেওয়া-তাঁদের রাজত্বে যতদিন খুশি থাকার অনুমতির কথাও তুলে ধরা হয়েছে। রানিরা

কদাকার চেহারার হলেও ভারতীয় সদ্য তরুণ শিকারিত্রয়ের প্রতি তাঁদের স্নেহ বাৎসল্যে কোনও খাদ নেই। তাদের ধরে রাখতে তাঁরা বহুচেষ্টা করেছেন; শেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিকারিদের যেতে দিতে হওয়ায় বিদায়কালে তাঁরা নিতান্ত আপনজনের মতোই বলেন 'আবার এসো, বাছারা!'[২৪] বলিষ্ঠ, লম্বা যে নিগ্রোরা হাতি শিকারে শোভনলালদের নিয়ে যায়, হাতি দেখতে না পেয়ে তাদের 'কুমতলবে'র কথা ভাবা হলেও দেখা যায় তারা আদৌ মিথ্যা বলেনি। জলহাতির মাংস দিয়েই বেচুয়ানবিরোধী নিগ্রোদের সঙ্গেও শোভনলালরা অনায়াসেই মিতালি করে ফেলে। যে নিগ্রোদের হাতে তারা বন্দি হয় সেখানেও কারণ রূপে উঠে এসেছে বহিরাগত সাহেব দাসব্যবসায়ীদের অত্যাচারে তাদের ক্ষেপে থাকার কথা। সব নিগ্রোরাই যে 'হিংস্র' বা 'নরখাদক রাক্ষস' নয়, তার পরিচয়ও বারবার উঠে এসেছে 'আফ্রিকার জঙ্গলে'। ঠিক একই সুর শোনা যায় খগেন্দ্রনাথের 'জঙ্গলের জালে'ও। ডিসুজা পেরুর নৃশংস বুনোদের হাতে বন্দি হবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বুনোদের 'শয়তান' বিশেষণে বিশেষিত করলে সঙ্গে সঙ্গেই রিভেরা সংশোধন করে দেন 'সকলে শয়তান নয়।'[২৫] রিভেরাও দু-বন্ধুকে এখানকার বুনোদের বিষাক্ত তিরে হারান, নিজে কোনও মতে তাদের থেকে পালান কিন্তু তারপরও তিনি জানিয়েছেন এই অঞ্চলের বুনোরা যেরূপ হিংস্র, নিষ্ঠুর, তার এতদিন দেখা অন্যান্য বুনোরা সেরূপ নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অন্যান্য বুনোরা তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে; গ্রামে আশ্রয় দেয়। বুনোদের এগিয়ে আসতে দেখে ডিসুজার 'ক্রুদ্ধ বুনো মানুষ, আর বুনো মোষ সমান'[২৬] ভাবনাটি আসে অজ্ঞান রিভেরাকে নিয়ে একাকি তার অসহায়তা থেকেই। কেননা, পূর্বে নৃশংস বুনোদের হাতে বন্দিকালে যে মুহূর্তে ডিসুজা ভাবেন 'পশুর সমান লোক', ঠিক পর মুহূর্তেই তিনি মনে মনে হেসেছিলেন 'সভ্য যারা তারাও সে সময়-সময় পশুর মত ব্যবহার করে।'[২৭] সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'সভ্য-অসভ্য', 'ভদ্র-জঙ্গলি' ইত্যাদি বিভেদগুলি নিয়ে এ কালপর্বের সাহিত্যিকরা খুব ধীরে ধীরে হলেও প্রশ্ন তুলছিলেন এবং তাদের সেসব চিন্তাভাবনার সঙ্গে শিশু-কিশোরদেরও পরিচিত করতে চাইছিলেন। শুধু আফ্রিকা বা পেরুর অরণ্যবাসীরাই নয়, 'হাজারীবাগের জঙ্গলে'তে ভারতের অরণ্যচারী গোষ্ঠীগুলিকে বারেবারে দেখা যায় বিপন্ন মিঃ ফরেস্টারের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। কালো বাঘের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত ফরেস্টারকে খানিক সুস্থ করে জংলি শিকারিদের ভেষজ ওষুধ, হরিণের পোড়া মাংস ও ঝরণার জলই। জ্বরে অজ্ঞান ফরেস্টারকে বাড়ি ঘরহীন জঙ্গলে ঘোরা জঙ্গলি শিকারির দলটি ছেড়ে না দিয়ে, কাঁধে তুলে নেয়। পরে নিরাপদ গুহার মধ্যে এক ভাঁড় জল ও খানিক মাংস সহ রেখে দিয়ে যায়। 'আসামের

জঙ্গলে'তে অমর ও মহাদেব যেমন অসম-ব্রহ্মদেশ সীমান্তের নৃমুণ্ড শিকারিদের কবলে পড়ে মরতে বসে, তেমনি প্রাণেও বেঁচে বাড়ি ফিরতে পারে ঐ অঞ্চলেরই নদীতীরবর্তী 'অর্ধসভ্য' মানুষদের সহায়তায়। ফলে বিশ শতকের শিকার কাহিনিগুলিতে সমস্ত অরণ্যজীবী গোষ্ঠীগুলিকেই একই রকম 'হিংস্র', 'নৃশংস', 'বর্বর' রূপে চিত্রিত করা হয়নি, তাদের মধ্যেকার বিভেদগুলি তুলে ধরতেও সাহিত্যিকরা কখনো কখনো সচেষ্ট হয়েছে।

বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার কাহিনিগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারতের অরণ্যলগ্ন গ্রামবাসী, অরণ্যজীবী উপজাতি গোষ্ঠী বা গ্রামবাংলার মানুষরা সাধারণত উঠে এসেছে সহজ-সরল-বড়ো ভালোমানুষ, আড়ম্বরহীন ও প্রচণ্ড পরিশ্রমী রূপে। অরণ্য ও অরণ্যের জীবজন্তুর সঙ্গে তাদের ভয়-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-মোহ মিশ্রিত আশ্চর্য সহাবস্থানটিও চিত্রিত হয়েছে। উঠে এসেছে পরম্পরাসূত্রে প্রাপ্ত অরণ্য-অভিজ্ঞান থেকে নিজেদের বিশ্বাস, সংস্কার অনুযায়ী নিজেদের মতো করে অরণ্য ও অরণ্যের জীবজন্তুকে তাদের রক্ষা করে আসার কথাও। হয় নিদারুণ তাচ্ছিল্য, নয় সস্তা রোমান্টিকতা—চিরচেনা এই দুই ছকের বদলে অরণ্যপ্রদেশবাসী এইসব মানুষদের প্রকৃত অবস্থা, তাদের অসহায়তা, কঠোর জীবনযুদ্ধ, দারিদ্র্যও অনেক শিকার সাহিত্যিকরা সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন। কখনো-কখনো রোমাঞ্চকর শিকার কাহিনি বা অরণ্য অভিযান কাহিনি বলতে বসেও তাঁরা সমকালীন জটিল সমাজবাস্তবতার কিছু ইঙ্গিতও দিয়ে যান। শ্বেতসাহেব দাস ব্যবসায়ীদের আফ্রিকার নিগ্রো ছেলেমেয়ে বুড়ো জোয়ান নির্বিশেষে দাসরূপে বন্দি করা—নিগ্রোদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে খুন জখম নিষ্ঠুর অত্যাচারের খবরটি ধরা আছে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আফ্রিকার জঙ্গলে'। উত্তর-পূর্ব ভারতের দাসব্যাবসার বার্তাটি আছে খগেন্দ্রনাথেরই 'আসামের জঙ্গলে'তে। ধরণীধর সেনের 'হিমালয়ে ভাল্লুক শিকার' গল্পে উঠে এসেছে বিরল বাদামি ভালুক শিকারের জন্য কাশ্মীর-রাজ থেকে স্পেশাল লাইসেন্স নেবার নিয়মের কথা। সন্ধ্যা নামলেই ভুট্টাচোর ভালুকের জ্বালায় অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও লাইসেন্স না থাকায় অসহায় সাপুরবাসীরা ভালুক মারতে পারত না। সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাঘে মানুষে' (*শিশুসাথী*) গল্পেও ঢাকার আল্‌গী গ্রামাঞ্চলে বাঘের উৎপাতে কাজকর্ম-স্কুল বন্ধ, আবালবৃদ্ধবণিতার নিদারুণ অসহায় ত্রস্ত অবস্থার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সরকারি 'অস্ত্র আইনে'র বিধিনিষেধের কথা। কয়েক মাইল দূরে বসবাসকারী বন্দুকের পাস থাকা ব্যক্তিকে বাঘের খবর পাঠাতে হলেও গ্রামবাসীদের বাঘের আক্রমণের ভয় মাথায় নিয়েই যাত্রা করতে হত। অবশ্য নিয়মের ব্যতিক্রমও যে ছিল না এমন নয়। শিবশঙ্কর মিত্রের সুন্দরবনের গল্পগুলিতে স্থানীয়দের সরকারি

আইনকে ফাঁকি দেবার নানা ছলচাতুরিরও পরিচয় মেলে। তৎকালীন পুলিশি ব্যবস্থার তীব্র অরাজকতার হদিশ মেলে খগেন্দ্রনাথের 'বনরহস্য'র সিদ্ধেশ্বর বাবুর ও সৃষ্টিধরের পুলিশের প্রতি মনোভাবে ও তাদের কথাবার্তায়। বুদ্ধদেব গুহর 'টাঁড়বাঘোয়া'তে পাই টিকায়েতদের সাধারণ গরীব গ্রামবাসীদের উপর প্রতিপত্তি ও অবিশ্বাস্য অত্যাচার, শোষণের ইঙ্গিত। বুদ্ধদেব গুহর পরবর্তীকালে লেখা অন্যান্য শিকার বা অরণ্যকেন্দ্রিক সাহিত্যগুলিতেও (ঋজুদার কাহিনিগুলি কিংবা 'অজগরের দেশে' ইত্যাদিতে) স্বাধীন ভারতের নানা জটিল সমাজ বাস্তবতা, সরকারি আইনের বিভিন্ন ফাঁকফোকর, নানা দুর্নীতি ও অরণ্যলগ্ন গ্রামীণ গরিব মানুষদের প্রকৃত অবস্থা বারেবারে উঠে এসেছে।

সংস্কার-কুসংস্কার-বিশ্বাস-আশ্চর্য অলৌকিক অভিজ্ঞতা

'টাঁড়বারো বড়ো জাগ্রত দেবতা। তিনি না থাকলে শিকারিরা চামড়া আর শিঙের লোভে বুনো মহিষের বংশ নির্বংশ করে ছেড়ে দিত।'[২৮]—বিভূতিভূষণের *আরণ্যক* উপন্যাসে ধনঝারি পাহাড়ের অনার্য রাজা দোবরু পান্নার মুখে এরকমই শুনেছিলেন বহিরাগত সত্যচরণ; বুনো মহিষের রক্ষক অরণ্যদেবতা টাঁড়বারোর কাহিনি সত্যচরণকে গণুমাহাতো ও রাজপুত দশরথ ঝাণ্ডাওয়ালাও বলেছিল। শুধু 'আরণ্যকে'র দ্বারভাঙ্গার অরণ্যলগ্ন অনার্য মানুষগুলিই নন, সমগ্র ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের অরণ্যচারী উপজাতি গোষ্ঠীগুলির বা অরণ্য সংলগ্ন গ্রামের অধিবাসীদের লোকায়ত বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন টাঁড়বারোর মতোই নানা অরণ্যদেবতা বা বনদেবীরা। কোথাও তিনি 'অরণ্যানী', কোথাও বা 'অরণ্যচণ্ডী'; দ্বারভাঙ্গায় 'টাঁড়বারো', মুঙ্গেরে 'ভানুমতি', বিহারে 'বনরাজা', মধ্যভারতে 'বাঘদেও', গোয়া কঙ্কণে 'বনদেবতা', মহিশূর-কর্ণাটকে 'কুমবাপ্পা', উত্তরবঙ্গে 'ভাণ্ডারণী' কিংবা সুন্দরবনে 'বনবিবি'; বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেও অরণ্যলগ্ন মানুষের লোকায়ত বিশ্বাসে এই অরণ্য দেবদেবীদের ভূমিকা প্রায় একই। তাঁরা অরণ্যের গাছপালা, পশুপাখির রক্ষাকর্তা/কর্ত্রী; ঠিক তেমনি জীবন জীবিকার জন্য মানুষের অরণ্যে প্রবেশ, বনলগ্ন গ্রামগুলিতে নিরাপদে বসবাস, হিংস্র জন্তুর থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রেও একান্ত ভরসা এই দেবদেবীরাই। সভ্য জগতের কাছে এই সব আঞ্চলিক দেবদেবীরা অনেকটাই অপরিচিত কিংবা অনেক সময়ই নিতান্তই মূল্যহীন নিছক প্রস্তরখণ্ড বা কোনও বড়ো গাছ ইত্যাদি। কিন্তু অরণ্যপ্রদেশবাসী সমাজগুলির এই দেবদেবী বা তাদের প্রতিভূতে অগাধ বিশ্বাস; যুগপৎ ভক্তি ও ভয়। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ছোটোদের শিকার কাহিনিগুলিতেও বারবার উঠে এসেছে ঐ সব অঞ্চলের

মানুষের অরণ্য ও অরণ্যের পশুপাখি গাছপালা নিয়ে নানা লোকায়ত ধারণা, সংস্কার-কুসংস্কার, বিভিন্ন লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাস, আশ্চর্য অদ্ভুত ঘটনা, লোককথা-কিংবদন্তি-লোকাচার ইত্যাদি।

গল্পের পর গল্পে দেখা যায়, ভারতের যে কোনও প্রান্তেরই অরণ্যলগ্ন মানুষদের বিশ্বাসে একটা কোথাও অদ্ভুত সাযুজ্য রয়েছে। তারা বিশ্বাস করে বাঘ, চিতা এই ভয়ঙ্কর পশুগুলিও আসলে অরণ্যদেবতা বা বনদেবীর বাহন; তাঁদের আশীর্বাদপুষ্ট। ফলে এই পশুগুলির প্রতি তাদের মনে একই সঙ্গে শ্রদ্ধা ও ভয় ক্রিয়াশীল হয়; সহজে তারা এদের ক্ষতি করে না। ভারতের কোনো কোনো অরণ্যচারী উপজাতিদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ প্রজাতির পশুপাখিকে হত্যা নিষিদ্ধ (ট্যাবু) রূপেও বিবেচিত হয়। রাজপুতানার বাঘেলারা বাঘ শিকার কিংবা হাঁসদা সাঁওতালরা হাঁস মারা নিষিদ্ধ মানে; উত্তর ভারতের থকের লোকেরা প্রাণিহত্যা 'মহাপাপ' বলে মনে করে (জিম করবেটের 'থকের মানুষখেকো'); বিহার-ঝাড়খণ্ডের পালামৌ অঞ্চলের হিন্দু গ্রামবাসীরা তাদের ক্ষেতখামার ফসলের প্রভূত ক্ষতি করলেও ঘোড়ফরাস (নীলগাই) ও বানর-হনুমান মারে না; বহিরাগত শিক্ষিতরা যতই তাদের বোঝাক নীলগাই আসলে হরিণ তবুও তারা 'গো হত্যা'র পাপের ভয়ে নীলগাই হত্যা করে না (বুদ্ধদেব গুহর 'টাঁড়বাঘোয়া'); ভারতের প্রায় সর্বত্রই হাতিকে দেবতা জ্ঞানে অত্যন্ত সম্মান করা হয় ('নীলগিরির বিজ্ঞ প্রভু', 'গারো পাহাড়ের দামাল'); হিন্দুরা বৃদ্ধ গরুকেও শিকারের টোপ রূপে ব্যবহারের জন্য সহজে বিক্রি করতে চায় না ('স্যাণ্ডারসন সাহেবের শিকার কাহিনি'); সুন্দরবনের স্থানীয় শিকারিরা শুধু গর্ভবতী হরিণই নয় যে কোনও মায়া-হরিণ (মেয়ে হরিণ) মারাই বনবিবির নিষেধ বলে মানে, শুধু পুরুষ শিঙেল হরিণ শিকারে আগ্রহী হয় (শিবশঙ্কর মিত্রের 'সুন্দরবন', 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার')। এরকম আরও অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেখানে সমস্ত ভারতেই ছড়িয়ে থাকা অরণ্যলগ্ন মানুষদের মধ্যে অরণ্যের পশুপাখিদের নিয়ে নানা ট্যাবু, সংস্কার-কুসংস্কারের হদিশ মেলে। কোনও পশুপাখি বা গাছপালা সাধারণের চেয়ে ব্যতিক্রমী হলে তা সহজেই মানুষের মনে অলৌকিকত্বের আসন পাকা করে নেয়। সুন্দরবনের লোনা জলে অশ্বত্থ গাছ জন্মান বিরল হওয়ায়, বক্-খালের বিশাল অশ্বত্থ গাছটি সহজেই বনবিবির থানের মর্যাদালাভ করে। দূর-দূরান্ত থেকে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মানুষ এসে তার ঝুরি ও ডালে ইট বেঁধে বনদেবীর নামে মানত করে ('সুন্দরবনের গল্প')। বুদ্ধদেব গুহর 'টাঁড়বাঘোয়া' (*সন্দেশ*)-তে বাঘটির নাম 'টাঁড়বাঘোয়া' ও 'পিলাবাবা'। পালামৌ অঞ্চলে বা বিহারের জঙ্গলের বাঘ সচরাচর

পাটকিলে রঙের হয়; সেখানে পালামৌর লাপরার জঙ্গলের বাঘটি হলুদ রঙের ও বিশাল দাড়ি গোঁফওয়ালা বলে গ্রামবাসীরা তাকে 'পিলাবাবা' ডাকত। টিকায়েতের গুলিতে জখম হবার আগে পর্যন্ত দীর্ঘ সাত আট বছর বাঘটি ওই অঞ্চলে ঘোরাফেরা করত, কখনও কারও কোনও ক্ষতি এমনকি গ্রামের গরু মোষও মারেনি। বাঘ সাধারণত ফাঁকা জায়গায় দিনের বেলা বের হয় না। কিন্তু পিলাবাবা পলাশবনার ছোটোবড়ো সবার চোখের সামনে দিয়ে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ (টাঁড়) অতিক্রম করে সকাল সন্ধ্যের আলোতে যাতায়াত করত; তাই বাঘটিকে তারা আদর করে 'টাঁড়বাঘোয়া'ও ডাকত। লাপরার জঙ্গলের বনের রাজা 'টাঁড়বাঘোয়ার' মতোই শিবশঙ্কর মিত্র 'সুন্দরবনে'তে শোনান, হরিণ মালঞ্চের কথা। সুন্দরবনের আবাদের মানুষের কাছে প্রায়ই দেখতে পাওয়া বনের হরিণ খুবই সাধারণ প্রাণী। তাই বাঘের সৌন্দর্যে, শৌর্যে বীর্যে তারা মুগ্ধ হলেও, হরিণে সচরাচর হয় না। কিন্তু এই নিতান্ত নিরীহ, চপলচঞ্চল ভয়বিহ্বল প্রাণীটিও কখনো-সখনো তাদের মোহমুগ্ধ করে তোলে। অস্বাভাবিক দীর্ঘ শিঙওয়ালা সাদা ডোরা একটি হরিণ বাদা ও আবাদে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বেপরোয়া আনাগোনা করত। সদা সজাগ হওয়ায় শিকারের ফাঁদে কিছুতেই না পড়ায় বা ঢাল সড়কি বন্দুককেও বারেবারে ফাঁকি দেবার অদ্ভুত পারদর্শিতার জন্য মালঞ্চ নদীর এপারের গ্রামবাসীরা ওপারের বনচারী ওই হরিণটিকে ডাকত 'মালঞ্চ'; তার রূপে ও ঔদ্ধত্যে মুগ্ধ হত; অনুভব করত তার প্রতি অসীম মমতাও। নিজেরা তাকে আর মারার চেষ্টা করত না, বাইরের শিকারিদেরও মারতে দিত না। অবশ্য মারতে বাধা দেওয়া না দেওয়া একই কথা, কারণ গ্রামবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস বনবিবির আশীর্বাদধন্য 'মালঞ্চ'কে কেউ মারতেই পারবে না। ঠিক অনুরূপে কুলদারঞ্জন রায়ের 'পেটুক বাঘ' গল্পের গরুখাবার যম হলেও নিরীহ ভালোমানুষ প্রকাণ্ড চেহারার জোয়ান বাঘ 'ডন' কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ভানুমতীর বাঘ' গল্পের জামালপুরের জঙ্গলের চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে বহু শিকারিকে বহুবার নাকাল করা ভয়ানক চতুর মানুষখেকো কেঁদো বাঘ—ঐ ঐ অঞ্চলের গ্রামবাসীদের বিশ্বাসে বনদেবতা কুমবাপ্পা বা বনদেবী ভানুমতীর প্রিয় বাহন; তাদের রক্ষকও স্বয়ং বনদেবতা বা দেবী। সঙ্কর্ষণ রায়ের 'বন্যরা বনে'তে ফরেস্ট অফিসার রমেন ভড় শুনিয়েছিলেন আসামের কাজিরাঙায় ১৯২২ সাল নাগাদ 'সাদা বাঘ'কে মেরেছিল যে শিকারি, তার বন্যায় ডুবে মৃত্যু হলে সেখানকার লোকেদের কীভাবে সুদৃঢ় ধারণা হয় প্রকৃতিদেবী রুষ্ট হয়েই শাস্তি দিয়েছেন। প্রায় একই চিত্র দেখা যায় ভারতের ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন সময়েও। রেওয়ার মহারাজা সাদা বাঘ মোহনকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ধরলে মধ্যপ্রদেশের সিধি ও রেওয়ার লোকেরা প্রচণ্ড ক্ষেপে ওঠে; কুসংস্কারবশত

প্রাকৃতিক ভয়াবহ দুর্যোগের আশঙ্কায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়; এমনকি, যে বৈজনাথ 'মোহন'কে ধরে খাঁচায় পোরে তাকেও তারা সবাই একঘরে করে দেয়; পোঁড়িয়ার মুখিয়ার মেয়ের সঙ্গে বৈজনাথের বিয়েও বাতিল করা হয়।

অভাব-অনটন, শত সহস্র প্রতিকূলতার সঙ্গে প্রাত্যহিক লড়াই চালিয়েও অরণ্যলগ্ন মানুষরা বন্য হিংস্র জীবজন্তুর সঙ্গে সহাবস্থানে অভ্যস্ত হয়— যা বহিরাগত সভ্য জগতের কাছে হয়তো বিস্ময়কর। কিন্তু সমস্যা ঘনীভূত হয়ে ওঠে যখন হিংস্র বনের জন্তু কোনও কারণে লোকালয়ে হানা দিয়ে গবাদি পশুপাখি থেকে মানুষ ধরে নিয়ে যেতে থাকে বা হত্যা করে। বাঘ, চিতা মানুষখেকো হয়ে উঠলে কিংবা হাতি খুনে গুণ্ডা হয়ে উঠলে সমস্যা ক্রমশ মারাত্মক আকার ধারণ করে। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারতের অরণ্যলগ্ন গ্রামের মানুষরা অরণ্যদেবদেবীরা কূপিত হবার ভয়ে নিজেরা ওই মানুষখেকো বা মানুষঘাতীকে শিকার করতে চায় না। এমনকি কখনো-কখনো বহিরাগত শিকারিদেরও মানুষখেকো বা খুনের সঠিক খোঁজখবর দিতে নারাজ হয়। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে অরণ্য দেবদেবীর আশীর্বাদপুষ্ট জানোয়ারটিকে মারা সম্পূর্ণই অসম্ভব। বনদেবতা বা বনদেবী না চাইলে যত বড়ো ওস্তাদ, সুদক্ষ শিকারিই হোক না কেন, হাজার শিকার কৌশল প্রয়োগ করলেও শিকারে সফলতা লাভ কখনোই সম্ভব নয়। অনেক সময়ই দেখা যায়, তারা বিশ্বাস করে— বাইরের শিকারিরা এসে ঘাঁটাচ্ছে বলেই মানুষখেকোর উপদ্রব উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি পেয়েছে ও শিকারিরা বন্দুক নিয়ে গ্রামে উপস্থিত থাকার জন্যই তাদের অরণ্য দেবদেবীর পূজার সুফল মিলছে না। ফলে আগত শিকারিদের উপর সেক্ষেত্রে তারা বিশেষ সন্তুষ্ট হয় না (প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ভানুমতীর বাঘ')। আর ঝানু শিকারিও বারবার ব্যর্থ হলে গ্রামবাসীদের লোকায়ত বিশ্বাস যেমন আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে, তেমনি শিকারির উপরও অনেক সময় ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। আবার অন্যদিকে বনের হিংস্র জন্তুটি যদি মানুষখেকো না হয়ে বা মানুষের তেমন কোনও বড়োসড়ো ক্ষতি না করে শুধুমাত্র কখনো-সখনো তাদের গবাদি দুএকটা পশু পাখি নিয়ে যায় তাহলেও ভারতের অরণ্যপ্রদেশের অধিবাসীদের অনেক সময় বনের জন্তুটির শিকারির হাতে মৃত্যুতে যথেষ্ট বিষণ্ণ, ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হতে দেখা যায় ('পেটুক বাঘ ডন')।

রহস্যময় অরণ্যের নানা অজানা বিপদ ও অরণ্যের ভয়ানক জন্তুর ভয় থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে ভারতের অরণ্যলগ্ন মানুষ যেমন অরণ্যদেবদেবীর আশ্রয় কল্পনা করে, তেমনি দেবদেবীর ঠিক বিপরীত দিকে তাদের কল্পনা ও অন্ধবিশ্বাসে আছে নানা অপদেবতা, দুষ্ট আত্মা, প্রেতাত্মা, শয়তান, জিন, মায়াবিনী, দানো, রাক্ষস ইত্যাদি।

মানুষখেকোর দৌরাত্মে জর্জরিত সন্ত্রস্ত মানুষ অনেক সময় ভাবে, ধূর্ত ভয়ঙ্কর মানুষখেকোটি আসলে কোনও বন্য জন্তু নয়; তা প্রকৃত পক্ষে বুনো জানোয়ারের ছদ্মবেশে কোনও অপদেবদেবী বা শয়তান-দুরাত্মা বা জিন-দানো। সেক্ষেত্রেও তার শিকারে তারা নিজেরা সাহসী হয় না। আগন্তুক শিকারিকে এরূপ মানুষখেকোর সঠিক অবস্থানের খোঁজখবর দিলে বা টোপের জন্য গবাদি পশু সরবরাহ করলে— তাদের ধারণা, হয়তো মানুষখেকোকে ভর করা অপদেবদেবী বা দুষ্ট আত্মার রোষে পড়তে হবে; কিংবা মানুষখেকোর প্রেতাত্মা প্রতিশোধ নেবে। ফলে কোনো কোনো খুনিয়া বা মানুষখেকোর বিস্তীর্ণ জনপদের দীর্ঘকালের ত্রাস হয়ে ওঠার ঘটনাও বিচিত্র নয়। বিশ শতকের প্রথম দশকে চম্পাবতের মানুষখেকো চার বছর ধরে অথবা দুয়ের দশকে রুদ্রপ্রয়াগের শতাধিক হত্যালীলা চালানো আদমখেকো চিতা সুদীর্ঘ আট বছর ধরে কুমায়ুন-গাড়োয়াল অঞ্চলে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা সম্পন্ন মূর্তিমান বিভীষিকা রূপে সন্ত্রাস চালাতে সক্ষম হয়। তবে অনেক সময়ই, মানুষখেকোর অত্যাচার থেকে মুক্ত হতে গ্রামবাসীরা নিজেরা সাহসী না হলেও বহিরাগত শিকারি যদি নামজাদা ওস্তাদ শিকারি হন এবং বিশেষত ভিন্নধর্মী হন, তাহলে শিকারির মানুষখেকোকে মারায় তাদের তেমন আপত্তি থাকে না। ঘাতক হিংস্র প্রাণীটি থেকে পরিত্রাণের আশায় বিপন্ন গ্রামবাসীরা বহিরাগত শিকারির শরণাপন্ন হয়। সমর সরকারের 'বাঘে মহিষে' (*রংমশাল*, ১৩৪৭) গল্পে বাবাদা পাহাড়ের জুজুয়ারী নদীর আশেপাশের গ্রামবাসীরা উৎপাতকারী মানুষখেকো বাঘটি থেকে রক্ষা পেতে গ্রামের বাইরের লোক দক্ষ শিকারি চান্নাপ্পা ও আবদুল্লার শরণ নেয়। বাঘটি এক ফকিরের কুটিরের পাশে আস্তানা গাড়ায়, তারা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে ফকিরই বাঘের রূপ ধারণ করেছেন। তাদের ভয় ও অন্ধবিশ্বাস মনের গভীরে এতটাই জাঁকিয়ে বসেছিল যে চান্নাপ্পারা বাঘের গর্তে ঢুকে বাঘটি শিকারে সক্ষম হবার পরও স্থানীয় গ্রামবাসীরা গর্তের মধ্যে যেতে কিছুতেই সাহস করে না। মৃত জন্তুটিকে বের করে গ্রামে টেনে নিয়ে যেতে হয় শিকারিদের নিজেদের লোক দিয়েই। এরপর অবশ্য মৃত মানুষখেকো বাঘটিকে চাক্ষুষ দেখে তার অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ায় গ্রামবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়; দিনটি স্মরণীয় রাখতে স্কুল ছুটি ঘোষিত হয়; আয়োজিত হয় বেশ বড়ো ভোজ। গ্রামের মেয়েরা লৌকিক আচার অনুযায়ী বাঘটিকে প্রচুর গালিগালাজ করে। লোকায়ত বিশ্বাস মতে বিপদমুক্তির মাদুলি রূপে ব্যবহারের জন্য বাঘের নখ, দাঁত সংগৃহীত হয়। বাত ইত্যাদি রোগের লোকায়ত চিকিৎসার ওষুধ তৈরির জন্য গ্রামীণ ডাক্তার বাঘের চর্বি সংগ্রহ করেন।

মানুষখেকো বাঘ বা ঘাতক হিংস্র জন্তুকে অতিলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রেতাত্মা, পিশাচ, রাক্ষস, অপদেবদেবী, দৈত্য-দানো ভাবার লোকায়ত কুসংস্কার ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের অরণ্যপ্রদেশবাসীদের মধ্যেই শুধুমাত্র নয়, বহির্ভারতে বিশেষত ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, দক্ষিণ বা উত্তরপূর্ব চীন, তিব্বত, নেপাল, ভুটানের জঙ্গললগ্ন মানুষদের মধ্যেও যে বর্তমান—তার প্রমাণ মেলে 'ফাঁদ পাতিয়া বাঘ ধরা', 'তিব্বতের আতঙ্ক', 'বাঘ রাক্ষস' ইত্যাদি ছোটোদের শিকার আখ্যানগুলিতে। শৈলেন্দ্রনাথ সিংহের 'ফাঁদ পাতিয়া বাঘ ধরা' গল্পে মালয়-বাসীদের বিশ্বাস 'ভূতের পাহাড়' পার হলেই বাঘে খাবে, নয় নিজে বাঘে রূপান্তরিত হবে; এমনকি নাম উচ্চারণেও ঘটবে বিপদ। এই কুসংস্কার ভীতি কাটিয়ে স্থানীয় পার্বত্য-শিকারিদের সহায়তা লাভের জন্য শিকারি চার্লস মেয়ার পুরস্কারের লোভ দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভরসা দিতে ফন্দি করে বলতে থাকেন তিনি ভূতের ভালো মন্ত্রতন্ত্র জানেন।

সুন্দরবনে বাঘের ডাক বহু শোনা গেলেও শিকারের বাঘকে চোখে দেখা খুবই মুশকিল। তাই শিকারিরা অনেক সময় সাহায্য নেন স্থানীয় ফকির বা বাউলিয়াদের যাদের পেশা হাঁড়িতে বাঘের ডাক নকল করে কিংবা কখনও শুধুমাত্র নাকি মন্তরের জোরেই শিকারির সামনে বাঘ হাজির করে দেওয়া। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঘের মন্তর' (*মৌচাক*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬) গল্পে ঘুণ শিকারি, বিখ্যাত শিকার-লিখিয়ে আধুনিক যুক্তিবাদী নিধিরাম সার্বভৌম মন্তর-তন্তর 'সব বাজে, ভুয়ো' বললেও, শুনিয়েছেন সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে হঠাৎ সাক্ষাৎ পাওয়া এরকম এক ফকিরকে নিয়ে তাঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা। বাঘ এনে দিলে গুরুজি শ্যামাচরণবাবু দশ টাকা বখশিস দেবেন বলায় ফকির বনে দলের পুরোভাগে মনে মনে মন্তর আওড়াতে আওড়াতে চলে। হঠাৎ ফকিরকে বাঘে নেয়; শ্যামাচরণবাবু বড়ো শিকারি, বাঘের ধরন-ধারণ তাক-বাক অনেক কিছু জানলেও কিছুই করতে পারেন না। তিনিও আসলে বাঘের মন্তরকে বিশ্বাস না করে 'বোগাস' ভাবায় দলের প্রথমেই নিরস্ত্র ফকিরকে নিয়মবিরুদ্ধভাবে যেতে দেন; এখন তিনি স্বীকার করেন, লোকটি সত্যিই গুণী। মন্তরের জোরে বাঘ আকর্ষণ করেছিল ঠিকই কিন্তু বাঘের হাত থেকে বাঁচার মন্তর শেখেনি। তাঁরই অসতর্কতায় গরিব মানুষটির বাঘের হাতে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে।

অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার বলে মানুষের বাঘে রূপান্তরিত হবার কুসংস্কারটিকে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণির মানুষ—ভণ্ড সাধু, ফকির, ওঝা, বাউলিয়ারা—কীভাবে সরল, চাষাভূষো গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে তৎপর হয় তার নজির

শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকার কয়েকটি শিকার-আখ্যানে তুলে ধরা হয়েছে। এধরনের একটি চমৎকার কাহিনি—রহস্য রোমাঞ্চে ভরপুর সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'সন্ন্যাসী বাঘ'। সম্ভবত এটি 'দক্ষিণ ভারতের জিম করবেট' রূপে খ্যাত শিকারি Kenneth Anderson-এর 'The Swami of Valaithothu' অবলম্বনে রচিত। নীলগিরির পাদদেশের গ্রামে হিমালয় থেকে আসা তীর্থযাত্রী এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামে এক বিশাল বাঘের উৎপাতও আমদানি হয়। পাশের জঙ্গলে অনেক বাঘ থাকলেও, এর পূর্বে কখনও তারা লোকালয়ে ঢোকেনি। কিন্তু এখন বাঘ গ্রামে ঢুকে গরু-মহিষ বা গোরক্ষায় ছুটে আসা রাখাল থেকে আস্তে আস্তে গাঁয়ের লোকেদেরও মারতে থাকে। ফলে ত্রস্ত, বিপন্ন গ্রামবাসীরা 'বাঘ-দুশমন'কে তুকতাক করে অন্যদিকে প্রেরণ করার জন্য সাধুবাবার চরণে কেঁদে পড়ে। সাধুবাবা সাফ ঘোষণা করেন—এ বাঘ তারই বাঘ; যেখানে যাবেন বাঘও সেখানেই যায়। তিনি বাঘকে রুখবেন, অন্তত মানুষের ঘাড় মটকাতে সংযত করবেন কিন্তু তার জন্য নিয়মিত সিধে, ভালো চাল ইত্যাদির সঙ্গে ওই গ্রামে মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রামবাসীদের চাঁদা তুলে মাসে একশো টাকা দিতে হবে। নাহলে 'ভগবানের কর্মে খরচ করায় অরাজিদের উচিত আক্কেল দিতেই তো বাঘের সৃষ্টি দুনিয়ায়।'[২৯] গরিব গ্রামবাসীরা কোনও মতেই একশো টাকা দিতে না পারায় বাঘের তাণ্ডব ক্রমশ আরও বাড়ে। 'সন্নিসী মন্তরের জোরে বাঘ লেলিয়ে টাকা আদায় করে'[৩০]— প্রাথমিক পর্যায়ের এই গুজবটি ক্রমশ পল্লবিত হতে হতে গ্রামবাসীদের দৃঢ় অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হয়—'সন্নিসীই বাঘ, বাঘই সন্নিসী'[৩১]। কলা বাগিচার চাষা বাঘকে গুলি চালানোর পর আহত বাঘের গর্জনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মানুষেরও আর্তনাদ শোনে; চতুষ্পদী ও দ্বিপদী দুটি প্রাণীকে দুদিকে ছুটে পালাতেও যেন দেখে। চাষার বেটা পরদিন সিধে দিতে গিয়ে লুকিয়ে দেখে আসে সাধুবাবার কাঁধে ক্ষত। সাধুবাবার ব্যাঘ্রলীলায় ব্যাঘাত সৃষ্টি ও সাধুর রক্তপাত ঘটানোয় মহাপাতকরূপে কত যুগ নরকাগ্নিতে পুড়তে হবে ভেবে চাষা আতঙ্কে ব্যাকুল দিশেহারা হয়ে ওঠে। অন্যদিকে বনতাড়ুয়া ইরিলা বুড়ো সাহেব-শিকারিকে নানা প্রমাণ ও অনুমান সহযোগে সাধুবাবার লীলাচ্ছলে বাঘ বেশ ধারণের কথা শুনিয়ে ফেলে নিশ্চিতভাবে ধরে নেয় 'তার নিজের জীবন যাবেই'। কেননা সাধুবাবার বা সন্ন্যাসী-বাঘের রক্ষক অপদেবতার কান পাতা আছে সারা জঙ্গলে। ঘটনা দুটি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় সন্ন্যাসী-বাঘের অন্ধবিশ্বাসটি স্থানীয়দের মধ্যে কতটা সুদৃঢ় ছিল। আর এই অন্ধবিশ্বাস ও ভয়কে আরও বদ্ধমূল করে তুলতে সচেষ্ট হন স্বয়ং সন্ন্যাসীই। বাঘের উপস্থিতির নিকটেই নিজের অবস্থানকে সুচতুরভাবে জানান দিয়ে গ্রামবাসীদের ছলনার আশ্রয়ে ভয়

দেখাতে দেখাতে ধূর্ত পাষণ্ড মিথ্যুক সাধুবাবা এতটাই বেপরোয়া দুঃসাহসী হয়ে ওঠেন, যে শিক্ষিত সাহেব শিকারির সঙ্গে কথাবার্তাতেও 'সন্ন্যাসী-বাঘের' জনরবের সমর্থনেই নিজের বাঘ রূপ ধারণের কথা জোরালো ভাবে জাহির করতে থাকেন। এ ব্যাপারে নাক গলালে সাহেব শিকারির শিকার লীলার সমাপ্তি ঘটারও হুমকি দিয়ে সাহেব শিকারিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানান। বাঘ ও সন্ন্যাসী যে অভিন্ন তা রাতে হাতে কলমে দেখানোর সুযোগ পেতেই, বাঘের ডাকের ঠিক পরমুহূর্তেই কাছেই কোথাও থাকা সন্ন্যাসীও তোলেন অট্টহাসির গররা। সাহেব শিকারি হঠাৎই এক অদ্ভুত কাণ্ড করেন—তিনিও হুবহু বাঘের ডাক ডেকে ওঠেন। আর তাতেই কীভাবে বাঘ-সন্ন্যাসীর রহস্য উন্মোচিত হয় তা লেখক টানটান উত্তেজনা ও রোমাঞ্চে ভরপুরভাবে বর্ণনা করেছেন। একটা বাঘকে এতদিন ধরে ফাঁকি দিয়ে এলেও দুঃসাহসী সাধুবাবা ভেবে বসেন এবার দুটো বাঘ আছে। ফলে গভীর আতঙ্কে নিজ প্রাণ বাঁচাতে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে সাধুবাবা নিজের কুঁড়ের দিকে ছুটে পালাতে যান। পেছনে বাঘও তাড়া করে। তাড়া করা মানুষখেকোকে সাহেব-শিকারি চারটি গুলিতে খতম করার আগের মুহূর্তেই বাঘ সাধুবাবার পিঠে ও কাঁধে থাবা বসিয়ে দেয়। 'বুদ্ধিদীপ্ত' 'রসিক' সর্বোপরি বাঘের গায়ে গায়ে ছায়ার মতো ঘুরেও বাঘকে দীর্ঘদিন ফাঁকি দিতে সক্ষম অর্থাৎ নিঃসন্দেহেই 'চরম দুঃসাহসী' হওয়া সত্ত্বেও লোভের বশে সন্ন্যাসী সরল সাদাসিধে গ্রামবাসীদের 'ব্যাঘ্র-মানবে'র কুসংস্কারের সুযোগে নিজের আখের গোছাতে চেয়েছিলেন। যে বাঘ দিয়ে ধূর্ত মিথ্যুক সন্ন্যাসী পাষণ্ডের মতো হতদরিদ্র গ্রামবাসীদের প্রতারিত করছিলেন, নির্মম পরিহাসরূপে সেই বাঘের হাতেই তার মৃত্যু ঘটেছে। বাঘের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন প্রমাণের জন্য সাধুবাবা বেপরোয়া হয়ে উঠতেও কসুর করেননি, শেষে সেই বাঘের সঙ্গেই প্রায় একসঙ্গে সাধুবাবার মৃত্যু হয়েছে। অন্তিম মুহূর্তেও সাধুবাবা অবশ্য তার ঔদ্ধত্য ও কুটিল মানসিকতা ত্যাগ করেননি; সাহেব শিকারিকে বাঘের হাতে মরার অভিশাপ দিয়ে মরেছেন। সিধেসাদা কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীদের বোকা বানানো থেকে 'সাদা চামড়ার ঔপনিবেশিক প্রভু' ইংরেজ জাঁদরেল শিকারিকেও কথাবার্তার টক্করে হাসিমুখে খোলাখুলি সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জ জানাতে অকুতোভয় সাধুবাবা নিঃসন্দেহেই একটি আশ্চর্য চরিত্রায়ণ। রাতের অন্ধকারে গভীর বনে বাঘের অপেক্ষা, সঙ্গী বনতাড়ুয়া ইরিলা বুড়োর মুখে সন্ন্যাসী বাঘের অতিপ্রাকৃত কার্যকলাপের বিবরণ, ভয় আতঙ্কে বিহ্বল ইরিলা বুড়োর একটানা ভৌতিক আবোলতাবোল কথাবার্তা, খুব নিকটেই বাঘের গর্জন, শিকারি দুজনকে বেষ্টন করে বাঘের চক্রাকারে ঘোরা, বাঘের শম্বর শিকারের তীক্ষ্ণ গগনভেদী

ভয়ার্ত শব্দ—সব কিছু মিলেমিশে শিক্ষিত যুক্তিবাদী সাহেব শিকারিকেও ক্ষণিকের জন্য জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনার ভিত টলিয়ে দিয়ে ভাবতে বাধ্য করে—'অলৌকিক অনৈসর্গিক কোনো ব্যাপার তখনো বিশ্বাস ছিল না তাঁর—আজ যেন —আজ যেন—'[৩২]। বেচারি ইরিলা বুড়োকে ধমকে উঠে 'নিজেকেই সাহস দেবার জন্য' সাহেব শিকারির নিজেকেই শোনাতে হয়—'যেটা ডেকে উঠল, সে—বাঘটা নেহাতই সাধারণ বাঘ, রক্তমাংস দিয়ে গড়া দেহ তার। ...ওটা অপদেবতাও নয়, শয়তানও নয়, বাঘের বেশধারী স্বামীজিও নয়।'[৩৩] সাধুবাবা নিজ মুখে জনরবকে স্পষ্টাস্পষ্টিই পুরো সমর্থন করায় শিকারি-সাহেব 'বজ্রাহতবৎ নিস্পন্দ' হয়ে ভাবেন—'তবে কি এই কথাই বিশ্বাস করতে হবে? এই অসম্ভব অবিশ্বাস্য কথা।'[৩৪] সামান্য গুজব কীভাবে বদলাতে বদলাতে বিশাল আকার ধারণ করে বিস্তীর্ণ জনপদের মানুষের মনে সুদৃঢ় অন্ধবিশ্বাস হয়ে ওঠে—লেখক অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে তা খুদে পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। ভণ্ড প্রতারক ধূর্ত সাধুবাবা ও শিক্ষিত কুসংস্কারমুক্ত সাহেব শিকারি উভয়েরই মানসিক টানাপোড়েন, জটিল দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বেপরোয়া দুঃসাহস চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে 'সন্ন্যাসী বাঘ' গল্পে।

বিস্তীর্ণ জনপদের দীর্ঘদিনের মূর্তিমান ত্রাস প্রাণঘাতক বন্য জন্তুটি বিভিন্ন শিকার কৌশল বারেবারে ব্যর্থ করতে থাকলে, জনমানসে তার সম্পর্কে অনায়াসেই সংযুক্ত হয় অতিপ্রাকৃত কল্পনা। জনসাধারণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে থাকে ঐ অতিলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ভয়ঙ্কর প্রাণীটিকে মারা সম্পূর্ণই অসম্ভব। এখন ঐ আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক ক্ষমতাযুক্ত 'শিকার-অসম্ভব' ভয়ানক জন্তুটিকে যে অসমসাহসী শিকারি মারতে সক্ষম হন, খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই সফল-শিকারিও হয়ে ওঠেন 'অলৌকিক ক্ষমতাশীল কোনও মহাত্মা', 'বিপন্নের পরিত্রাতা বীরনায়ক' বা 'অবতার'। আমাদের আলোচ্য ছোটোদের শিকার গল্পগুলিতেও প্রায়ই দেখা যায়, শিকার শেষে প্রত্যাবর্তনকারী বীর শিকারিকে হতদরিদ্র গ্রামবাসীরা ফুল, গরম দুধ বা গ্রাম্য খাবার সহ আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানায়। ঐ শিকারি ও তার অলৌকিক শিকার কাহিনি অবশ্য সেখানেই শেষ হয় না; তার কথা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কৃতজ্ঞ মানুষের মুখে মুখে বয়ে চলতে থাকে। তাকে নিয়ে রচিত হয় অজস্র লোককথা, লোকগান, জনশ্রুতি বা কিংবদন্তি। বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকার শিকার-লিখিয়েরাও ওই লোককথা বা কিংবদন্তির বীর-নায়কদের অসাধারণ দুঃসাহসিক শিকার কাহিনি শুনিয়ে খুদে পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করতে বারে বারে আকৃষ্ট হয়েছেন।

শিকারি নিঃসন্দেহেই সাধারণ আমজনতার চেয়ে খানিক স্বতন্ত্র— ভয়ডরহীন,

বেপরোয়া, জীবন উদাসীন, দুঃসাহসী বীর; কিন্তু তবুও রক্তমাংসেরই মানুষ। তাই শুধু অরণ্যপ্রদেশবাসী মানুষরাই নানা সংস্কার কুসংস্কারে বিশ্বাসী হয় না; দেশি বিদেশি শিকারিদের মধ্যেও রয়েছে নানা সংস্কার। প্রতিপক্ষ যেখানে রহস্যময় প্রকৃতি বা অজানা বিপৎসংকুল অরণ্য ও অরণ্যের হিংস্র ভয়াল প্রাণী, সেখানে শিকারি দক্ষ ও তার বিভিন্ন শিকার কৌশল সুনিপুণ হওয়া সত্ত্বেও জীবনমরণের ঝুঁকিপূর্ণ শিকার-খেলায় নির্বিঘ্নে সফলতা লাভ করা— অভিজ্ঞ বহু শিকারির মতেই অনেকটা 'কিসমৎ' বা 'দৈব নির্ধারিত'। ভারতের বিখ্যাত শিকারি জিম করবেট 'কান্দার মানুষখেকো'তে অকপটে জানিয়ে ছিলেন,

> আমাদের মধ্যে যে সব কুসংস্কার আছে তাতে আমাদের শত অবিশ্বাস থাকলেও নিজের ব্যক্তিগত সংস্কারগুলো আমরা কখনো উড়িয়ে দিতে পারি না, তা বন্ধুবান্ধবেরা যতই হাসিঠাট্টা করুক না কেন। জানি না আর সকলের চেয়ে শিকারিদের মধ্যেই কুসংস্কারটা একটু বেশি কিনা। তবে এটুকু বলতে পারি, শিকারিরা তাদের সংস্কারগুলোকে খুব মেনে চলেন।[৩৫]

জিমের মধ্যে কেমন একটা 'দৃঢ় বিশ্বাস' বা সংস্কার ছিল—বাঘ শিকার অভিযানের প্রথমে একটা সাপ মারতে না পারলে শত চেষ্টা করলেও শিকারে কিছুতেই সফল হবেন না। অনুরূপে দেখা যায়, কোনো কোনো শিকারি বড়ো জন্তু শিকারে গেলে গুনে গুনে ঠিক পাঁচটা কার্তুজই সঙ্গে নিতেন, কখনও তার বেশি বা কম নয়। কেউ বা শীতের মরসুমের শিকার কখনও শুরু করতেন না 'মহাশের মাছ' না মেরে। শিকারিদের উক্ত সংস্কারগুলোর সঙ্গে কোনও কার্যকারণ সম্পর্ক নেই; তবু শিকারিরা তাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত সংস্কারগুলো মানতেন; এগুলোতে মনে জোর পেতেন। তবে সমর সরকারের 'বাঘে মহিষে' গল্পে (*রংমশাল*, ১৩৪৭) চান্নাপ্পা ও আবদুল্লাকে শিকার যাত্রাকালে যেসব শুভ-অশুভ লক্ষণ মানতে দেখা যায় তার অবশ্য কিছু কারণ ছিল। কাক ও ময়ূর শিকারিদের পক্ষে শুভ; কারণ—'বাঘ দেখা গেলেই ময়ূর ডেকে উঠে সবাইকে সতর্ক করে দেয় আর কাকগুলো সবাই এক সঙ্গে চীৎকার করে ব্যাঘ্ররাজের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করে।'[৩৬] ঠিক যেমন সুন্দরবনের বেশির ভাগ গল্পেই লক্ষণীয় শিকারিরা বানরকে 'শুভ বন্ধু' ভাবে। সেক্ষেত্রেও বানরদের চিৎকার, হাবভাব দেখে অভিজ্ঞ শিকারি সহজেই বাঘের আগমনবার্তা বা অবস্থান জানতে পেরে আগাম সতর্ক হবার সুযোগ পান। অনেক সময় সুন্দরবনের বানরের অদ্ভুত আচরণকে অনুসরণ করে বাঘে নিয়ে যাওয়া মানুষের লাশেরও সন্ধান মেলে। কাক, শকুন, ম্যাগপাই পাখি সাধারণত শিকারিদের কাছে শুভ বলে বিবেচিত হয়, গভীর বনের আকাশে তাদের উড়ন্ত বা চিৎকার করতে দেখলে

বোঝা যায় কাছাকাছি বাঘ, চিতা বা কোনও হিংস্র জন্তুর শিকার করা ভুক্তাবশিষ্ট আছে। তাই তাদের গতিবিধি অনুসরণ করে শিকারি শিকারের সন্ধান পান। সুন্দরবনকেন্দ্রিক ছোটোদের শিকার আখ্যানগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় 'বনবিবির নামে' স্থানীয়-শিকারি ও বাউলিয়ারা নানা সংস্কার মানে— 'মাল'-এ অর্থাৎ সুন্দরবনের বনচত্বরে নামলে কথা বলা ও ছোটা বনবিবির কড়া নিষেধ, কাউকে বাঘে ধরলে বনবিবির আদেশে সাহায্যে এগিয়ে যেতেই হবে, বন্দুকে দুই ঘোড়া তুলে বাঘের পেছনে চললে বনবিবির রোষে পড়তে হয় (আসলে হঠাৎ বাঘ দেখে ভয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হলে ঘোড়াতোলা বন্দুকের চোট হয়ে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা), শিকারে গিয়ে বিড়ি ফুঁকতে থাকলে বনবিবির রোষে শিকার ব্যর্থ হবেই (বিড়ির কড়া গন্ধে আসলে বন্যপ্রাণী সতর্ক হয়ে সরে যায়), অকারণে মায়াহরিণ বা বাঘের বাচ্চা মারলে কিংবা সুন্দরবনের মাঝে মাঝে থাকা ভাঙা পরিত্যক্ত কেল্লার গুপ্তধনে লোভ করলে বা বনে গিয়ে স্বার্থপর একলাষেঁড়েমি করলে অথবা নদী ধারের 'বাঘে মানুষ নেবার সাবধানী নিশানা'কে অপমান করলে বনবিবি অবধারিতভাবে সমুচিত কঠোর শাস্তি দেন-ই-দেন। এগুলি শুধু ব্যক্তিগত সংস্কার নয়, আবাদের মানুষের সমষ্টিগত চেতনার মধ্যেও সুন্দরবনের শিকারের এসব অলিখিত নানা নিয়মকানুন সংস্কাররূপে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। তবে সব সংস্কারের পেছনেই যে কোনও গূঢ় কার্যকারণ থাকে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। আবাদের মানুষ সন্ধ্যে হলেই বা বনে গেলে সচরাচর বাঘের নাম উচ্চারণ করে না। বাঘের বিপদ এড়াতে তারা বাঘকে বড়ো মিঞা, দক্ষিণরায়, কাবলিওয়ালা, বড়ো শেয়াল, বড়ো হরিণ, বড়ো ভোঁদড় ইত্যাদি নামে বলে। জিম করবেটের মতো মানুষখেকোর শিকার যাত্রার সূচনায় সাপ না মারলেও, সুন্দরবনের বাউলে ও স্থানীয় শিকারিরাও বিশ্বাস করে যাত্রাপথে সাপ অতিক্রম করলে সেদিনের শিকার অভিযান শুভ (সুন্দরবনের দক্ষিণরায়, *শিশুসাথী*)। পূর্বোক্ত 'বাঘে মহিষে' গল্পে বাঘে ও মহিষের লড়াই বাঁধাবার জন্য ছাড়া ভেড়াটির মৃতদেহাবশেষ শেয়ালদের সদ্ব্যবহার করতে দেখে, শেয়াল তাড়াতে গিয়ে চান্নাপ্পা, আবদুল্লা গুলি চালালে একটি কাক ও একটি শকুন মারা যায়। কাকেরা বাঘের আগমন বার্তা জানায় বলে কাক মারা শিকারির পক্ষে ভালো লক্ষণ নয়; কিন্তু আবদুল্লা মরা কাকটিকে একটি গাছের শাখায় বেঁধে তবেই ক্ষান্ত হয়। আবদুল্লার এরূপ সংস্কারের কোনও কারণ তার বন্ধু শিকারি চান্নাপ্পাও বুঝতে পারে না।

অনেক সময় সুদক্ষ শিকারির শিক্ষিত যুক্তিবাদী মনেও অরণ্যবাসী মানুষের সংস্কার-কুসংস্কারের প্রতিফলন পড়তে দেখা যায়। বিচিত্র শব্দ, গন্ধযুক্ত অরণ্যের চিরকুহকে

মোড়া রহস্যঘন বিপদসঙ্কুল পরিবেশ, দিনে যেখানে আলো আঁধারি রাতে প্রগাঢ় নিঃসীম অন্ধকার বিরাজিত, যেখানকার প্রকৃতি কোনও সুনির্দিষ্ট নিয়মশৃঙ্খলে বাঁধা নয়, পরমুহূর্তে ঠিক কী ঘটতে চলেছে সম্পূর্ণই অজানা, যেকোনও সময়ে শিকারিরই হিংস্র জন্তুর শিকারে পরিণত হবার প্রবল সম্ভাবনা— এরকম পরিস্থিতিতে শহুরে শিক্ষিত কুসংস্কারমুক্ত শিকারির মনকেও নানা বিশ্বাস-অন্ধবিশ্বাস গ্রাস করা বিচিত্র নয়। শিকারির নিজস্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও অনেক সময় অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত সম্পর্কে তার শিক্ষিত যুক্তিনিষ্ঠ ধ্যানধারণাকে তছনছ করে দেয়। দাবিধুরার মন্দিরের যে বাঘটিকে পুরোহিতের মতে মারা কারও পক্ষেই অসম্ভব, সেই বাঘটিকে ও তার বেপরোয়া কার্যকলাপ খুব কাছ থেকে বেশ কয়েকবার দেখার ও গুলি করার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও জিম করবেট তাকে কোনও বারই শিকারে সফল হননি। 'মন্দিরের বাঘ' স্মৃতিচারণায় ঘটনাটি তার শিকার জীবনের অভিজ্ঞতায় আশ্চর্যতম সংযোজনরূপে চিহ্নিত করে জিমের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—মন্দিরের বাঘটির শিকারে তার বা শিকারিদের বারংবার ব্যর্থতার কোনও কারণ ব্যাখ্যা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সুদক্ষ শিকারিও যখন বারংবার শিকারে ব্যর্থ হতে থাকেন, তখন মানুষের শিকার কৌশলকে ফাঁকি দিতে সক্ষম অত্যন্ত ধূর্ত সদাসতর্ক বন্য প্রাণীটি সম্পর্কে জনমানসে প্রচলিত অলৌকিক অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসকেই অনুমোদন করে কি শিকারিও তার শিকার ব্যর্থতা বা পরাজয়ের গ্লানিকে খানিক লাঘব করতে চান? অবশ্য শিকারে সফলতা লাভের পরও বা শিকার অভিযানে গিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ নানা আশ্চর্য অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা যুক্তিবাদী শিক্ষিত নাগরিক শিকারিদেরও কলমে বারেবারে স্থান পেতে দেখা যায়। ভারতের আরেক বিখ্যাত শিকারি কেনেথ অ্যান্ডারসনও তার প্রত্যক্ষ অলৌকিক অভিজ্ঞতাগুলিকে নেহাৎই আজগুবি কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে পারেননি; যদিও এসব ব্যাপারের কার্যকারণ ব্যাখ্যায় জিমের মতোই তাঁরও কোনও ব্যক্তিগত জবাব জানা নেই। বিশ শতকের বাংলা ছোটোদের শিকার লিখিয়েরাও শিকার-সাহিত্য সংরূপটির সঙ্গে অলৌকিক বা ভৌতিক অতিপ্রাকৃত কিংবা রহস্যময় নানা বিষয়ের মিশ্রণ ঘটিয়ে ভয়ের শিহরণ জাগানো টানটান উত্তেজনাপূর্ণ রহস্য রোমাঞ্চকর শিকার কাহিনি শিশু-কিশোর পাঠকদের উপহার দিতে যথেষ্ট আগ্রহী হয়েছেন।

শিকার-সাহিত্যবর্গটির সঙ্গে অতিপ্রাকৃত বা ভৌতিক সাহিত্যবর্গের সুচারু মিশ্রণে 'শয়তান' নামে একটি ভারি আশ্চর্য গল্প শিশু-কিশোর পত্রিকায় লিখেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। মানুষখেকো সম্পর্কে বহুল প্রচলিত অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের উল্লেখ করেই গল্পটির সূচনা। হাজারিবাগ অঞ্চলে উপদ্রবকারী এক মানুষখেকো বাঘ বারেবারে

দেশি বিলাতি বহু শিকারির গুলি হজম করে দিব্যি বেঁচেবর্তে থাকায় স্থানীয় লোকের বিশ্বাস সেটি বাঘের আকারে হিংস্র অপদেবতা 'শয়তান'; লাঙ্গুলহীনতাই তার অলৌকিকতার মস্ত প্রমাণ। সরকারি কাজে আগত কথক সুরেন কিন্তু ভালোভাবেই জানে ও মানে শয়তানের নানা গল্প নেহাৎই গুজব, মিথ্যে কল্পকাহিনি—'আধুনিক যুগে নিতান্ত মূর্খ ভিন্ন আর কেউ এ-সব গল্প বিশ্বাস করবে না।'[৩৭] শয়তান আসলে সাধারণ বাঘই; তবে মানুষ খেতে খেতে ভারী চালাক, তাই দক্ষ শিকারিরাও তার নিধনে ব্যর্থ। সুরেনের ধারণা যে সঠিক অচিরেই তার প্রমাণও মেলে। বন্ধু হরিশ, কুকুর টাইগার ও দুজন কুলিসহ এক সন্ধ্যায় হরিণ শিকার করে ফেরার পথে কথক অপ্রত্যাশিতভাবেই হঠাৎ জঙ্গলে ঘুমন্ত অবস্থায় লেজহীন বাঘ 'শয়তানের' সাক্ষাৎ পায়। দেখামাত্রই দু-বন্ধু একসঙ্গে গুলি চালায়— 'শয়তান লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেই আবার পড়ে গেল— আর নড়ল না!'[৩৮] ভয়ঙ্কর বিভীষিকা শয়তানকে এত সহজে খতম করে শিকারিদ্বয়ই শুধু নয় কুলিরাও খুব খুশি; আশেপাশের গাঁয়ের লোক দলে দলে এসে শয়তানের মৃতদেহের উপরে কিল চড় লাথি বৃষ্টি করে মনের ঝাল মেটাল। বিস্ময়কর নানা মৌখিক গল্পকথার কেন্দ্রীয় চরিত্র 'শয়তানে'র বাস্তবে শিকার বেশ নির্বিঘ্নে ও খানিক সাদামাটা ভাবেই সম্পন্ন হল। তবে শয়তানকে ঘিরে সুরেনদের অভিজ্ঞতার এখানেই সমাপ্তি ঘটেনি। ফেরার পথে প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে সুরেনদের আশ্রয় নিতে হল এক পুরনো ভাঙা বাংলোয় যা বর্তমানে বন্যপশুদের আস্তানা হয়তো। সঙ্গী কুলিরা বখশিসের লোভ অগ্রাহ্য করে পালাল। কারণ শয়তানের মৃতদেহের সঙ্গে রাত্রিবাসে তারা নারাজ এবং ঐ বাংলোর পূর্বতন সাহেব নাকি খুন হন। বাঘেও ভয় না পাওয়া অত্যন্ত সাহসী কুকুর হওয়া সত্ত্বেও টাইগার পরিত্যক্ত পোড়ো বাংলোটায় যেন কোনও 'অদৃশ্য বিভীষিকা'র সন্ধান পেয়ে ভয়ে অস্থির হয়ে কাঁদতে লাগল। রাত যত বাড়তে লাগল দেওয়ালে ছায়া, কাছেই বাঘের ক্রমাগত গর্জন, বাইরের দালানে দ্রুত পদশব্দ ইত্যাদি মিলেমিশে এক ভৌতিক আবহ সুরেনের মধ্যে সৃষ্টি করল চরম অস্বস্তি :

> খালি মনে হয়, আমার চারিপাশ দিয়ে আজ সেই সব পা চলে বেড়াচ্ছে, যে সব পা চললে কোনো শব্দ হয় না! আমার চারিপাশে সব অদৃশ্য চোখ! আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তারা আমাদের দেখতে পাচ্ছে! কী অসোয়াস্তি![৩৯]

সুরেন পড়ো বাংলো ত্যাগ করে যেতে চাইলেও বন্ধু হরিশের যুক্তি কুলিদের বাজে কথাতেই সুরেনের এরকম ভাবের উদয় হচ্ছে, অবোধ জন্তু টাইগার মিছিমিছি ভয় পেয়েছে বলে কি মানুষ হয়েও সুরেন ভয় পাবে। সত্যিই অতিপ্রাকৃত নাকি গা ছমছমে

পরিবেশে ভয়গ্রস্ত মনের নেহাৎই ভ্রান্তি—এই বিতর্কটিও গল্পকার সুচারুভাবে বুনে দিয়েছেন দু-বন্ধুর কথোপকথনে। রাত বারোটা বাজতেই দু-বন্ধুর চোখের সামনে দ্রুত ঘটে চলে একগুচ্ছ অদ্ভুত ঘটনা। বাঘের দীর্ঘ করুণ অস্বাভাবিক চিৎকারের পরই জানলা দিয়ে কালো কুচকুচে এক বাদুড় ঘরে ঢুকে চক্রাকারে ঘুরে গোত্তা খেয়ে শয়তানের মৃতদেহের উপর পড়ে 'মূর্তিমান অভিশাপের' মতো স্থির হয়; দরজার চৌকাঠে বিশ্রী চিৎকাররত এক কালো কুৎসিত বিড়াল দেখা দেয়; টাইগার হঠাৎই ভয়ানক আর্তনাদ করে সুরেনের পায়ের কাছে মারা যায়; আর এরপরই ঘটে সবচেয়ে বিস্ময়কর অবিশ্বাস্য ঘটনাটি— গুলিতে মৃত, যাকে গ্রামবাসীরা প্রচুর কিলচড় মারে, কুলিরা দীর্ঘপথ কাঁধে করে বয়ে আনে, মরে এতক্ষণ একেবারে কাঠ হয়ে থাকা সেই 'শয়তান' চার পায়ে ভর দিয়ে সোজা দাঁড়ায়; গোলার মতো দাউদাউ জ্বলন্ত চোখ দিয়ে সুরেনদের যেন ভস্ম করতে করতে, বাইরে আবার ডেকে ওঠা বাঘের ডাকে ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যায়। বাদুড়, কালো বিড়ালকেও আর দেখা যায় না। স্বহস্তের গুলিতে মৃত শয়তানকে এভাবে পুনরায় জীবন্ত দর্শনের আকস্মিক বিস্ময়ে, ভয়ে সুরেন চিৎকার করে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। শয়তানের ঠিক কী হল? তাকে কি আবার হাজারিবাগ অঞ্চলে উপদ্রব করতে দেখা গেল?— জানার উপায় নেই; কারণ কথক সুরেন গল্পের প্রথমে শয়তানের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতায় জোরালো ভাবে তার অবিশ্বাস জানান দিলেও গল্পশেষে পুনর্জীবিত শয়তানের সঙ্গে— পুনরায় সাক্ষাতের ভয়ে সেই সপ্তাহেই দ্রুত বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যায়। যুক্তিবাদী হরিশ বিজ্ঞানসম্মত একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা চালায়— হয়তো শয়তান তাদের বন্দুকের গুলিতে মরেনি, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল মাত্র। 'তা হতেও পারে, না হতেও পারে'— এক অমীমাংসিত অজানা রহস্যে গল্পটি শেষ হয়ে যায়। আর কথকের এই অত্যাশ্চর্য শিকার অভিজ্ঞতাকে পাঠকের বিশ্বাস করা বা না করা যে সম্পূর্ণভাবেই পাঠকেরই নিজস্ব ইচ্ছাধীন তা তো শয়তানের আখ্যান শুরুর পূর্বেই কথক জানিয়ে দিয়েছিল। পোড়োবাংলোয় সে রাত্রে সত্যিই কী ঘটেছিল সেই রহস্যময় অদ্ভুত ঘটনাকে পাঠক বিশ্বাস করুক বা না করুক কিংবা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলতায় পড়ুক, গল্পকার অতিপ্রাকৃত বা ভৌতিক আবহ যেভাবে রচনা করেছেন এবং কথক সুরেনের মারফত অতিপ্রাকৃত অস্তিত্বের বোধকে ফুটিয়ে তুলেছেন তা নিঃসন্দেহেই পাঠক মনেও গা ছমছমে ভয়মিশ্রিত এক অদ্ভুত অস্বস্তির অভিঘাত আনে। শিকার আখ্যানটিতে অতিপ্রাকৃত উপাদানের ব্যবহার করে হেমেন্দ্রকুমার রায় শিকার কাহিনিটিকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছেন। শিকার অভিযানে গিয়ে শিকারির অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করা,

বিশেষত বনবাংলো বা জঙ্গলে পরিত্যক্ত হানাবাড়িতে রাত্রিবাসকালে ভৌতিক বা অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতালাভের ঘটনা (motif), বাংলা ছোটোদের শিকার লিখিয়েদের কলমে বেশ ঘনঘনই লিপিবদ্ধ হতে দেখা যায়।

তবে বিশ শতকের আমাদের নির্বাচিত শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলির অন্যতম লক্ষ্য ছিল, ছোটোদের কুসংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানমনস্ক নির্ভীক গড়ে তোলা। ফলে বাংলা শিকার-সাহিত্যগুলিতে অরণ্যলগ্ন মানুষদের এমনকি শিক্ষিত যুক্তিবাদী শিকারিদেরও নানা সংস্কার, বিশ্বাসের কথা, অরণ্যপ্রদেশবাসীদের বিভিন্ন লোকাচার-লোককথা-কিংবদন্তি-জনশ্রুতি-লোকচিকিৎসা বা ভেষজ ওষুধ, চিরকুহকে ঢাকা অরণ্যে ঘটা নানা আশ্চর্য অদ্ভুত ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে ছোটোদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিচিত করলেও, সাহিত্যিকরা কখনোই চাননি ভাবী প্রজন্ম কুসংস্কারগ্রস্ত, অন্ধবিশ্বাস আচ্ছন্ন হয়ে উঠুক। সব গল্পে না হলেও অনেক গল্পেই দেখা যায়, তাঁরা সচেতনভাবেই আশ্চর্য ঘটনা, লোকায়ত বিশ্বাস, সংস্কারের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। সমর সরকারের 'বাঘ ধরা' গল্পে (*রংমশাল*, ভাদ্র ১৩৪৭) টপ্পু কাম্বেতে দুপুরবেলা হঠাৎ বাঘ পড়ায় পালানো সবার মধ্যে সবচেয়ে শেষে ফিরে আসা কম্পমান ভীতসন্ত্রস্ত লোকটির কাছে চান্নাপ্পা ও আবদুল্লা এক অদ্ভুত খবর পান— জঙ্গলের মধ্যে লাঠি নিয়ে একটি লোক হাঁটু গেড়ে বসে ও তার সামনে দণ্ডায়মান এক বাঘ। লোকটির দেখানো পথে তাড়াতাড়ি বনে ঢুকে শিকারিরাও সত্যিই ঐ অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখেন। শিকারিদের দেখে বাঘটি গর্জন করে লাফ দিলে আবদুল্লা ও চান্নাপ্পা উভয়ের গুলিতে সে মারা পড়ে। লোকটার কাছে শিকারিরা এগিয়ে যাবার পরই ঐ আশ্চর্য দৃশ্যের রহস্যোন্মোচিত হয়। শিকারিরা দেখেন লোকটির দেহে আসলে প্রাণ নেই। বোঝা যায়, বাঘের ভয়েই লোকটি 'গুলি করার জন্য হাঁটু গাড়া অবস্থায়' হার্টফেল করেছে। তবে তার শরীর একটুও নড়চড় হয়নি। আর সম্ভবত লোকটির একদৃষ্টি চাহনিতে বাঘকেও দূরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। হেমেন্দ্রকুমার রায় 'বাঘের চোখ' (*মৌচাক*, কার্তিক ১৩৬২) গল্পে কুঠিয়াল সাহেবের পূর্ণিয়ার ছোটো জঙ্গলে বাঘ শিকারের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা প্রথমে বর্ণনা করে, গল্পের অন্তে ঐ অদ্ভুত ঘটনার রহস্য ফাঁস করেছেন। বাঘ শিকারের জন্য কৃত্রিম কাঁটাঝাড়ে অপেক্ষাকালে সাহেব হঠাৎ দেখেন মড়ির কাছে বাঘের বদলে এক প্রকাণ্ড বানর। সাহেবের মনে অমঙ্গলের ইঙ্গিতে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভূত হয়। কারণ বানর সাধারণত বাঘের শত্রু। অথচ বানরটি বাঘের মড়ির কাছে বেপরোয়া ভাবে আসে ও ঝোপে সাহেব শিকারিকে খুব সহজেই আবিষ্কার করে চিৎকার করে পালায়। কৃত্রিম কাঁটাঝোপ

নিরাপদ নয় বুঝে সাহেব জঙ্গলে দ্রুত আত্মগোপন করায় বাঘের আক্রমণ থেকে কোনও মতে বাঁচেন। কেননা বাঘও সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মড়ির দিকে না গিয়ে সাজানো কাঁটা ঝোপেই লাফিয়ে পড়ে। শিকারিকে সেখানে না পেয়ে বাঘ দস্তুর মতো হতভম্ব হয়। সাহেব বাঘটিকে একগুলিতে শিকার করলে ঘটে এক বিস্ময়কর ঘটনা। পূর্বের বানরটি ভগ্নস্বরে আর্তনাদ করে দাঁত মুখ খিঁচে তেড়ে আসে। সাহেব তাকেও গুলি করলে, মরণোদ্যত বানরটি প্রাণপণ এগিয়ে বাঘের মৃতদেহের উপর লম্ববান হয়। স্বাভাবিকের চেয়ে কিঞ্চিৎ অদ্ভুত ঘটনা কীভাবে জনমানসে অতিপ্রাকৃতত্ব লাভ করে যায় তারও আভাস ধরা আছে গল্পটিতে। বাঘের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ বানরের মৃতদেহ দেখে বিস্মিত সকলকে সাঁওতাল বুড়ো শিকারি জানায় বানরটি আসলে বাঘে মারা মানুষের আত্মা। কারণ সাঁওতালি বিশ্বাসানুসারে 'মানুষখেকো বাঘের পিঠে বসে নিহত মানুষের প্রেতাত্মা তাকে চালনা করে বলেই সে শিকারিদের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়।'[৪০] বোঝাই যাচ্ছে ধারণাটি নেহাৎই ভ্রান্ত। আসল রহস্য বোঝা যায় 'মৃত বাঘের চামড়া ও মাথা সংরক্ষণের দোকানে'র প্রেরিত খবরে—'জীবন্ত অবস্থায় বাঘটা ছিল অন্ধ!'[৪১] এ থেকে আন্দাজ করা যায়, অসম্ভব হলেও বনের বাঘের সঙ্গে বানরের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কাঁটাঝোপে শত্রু শিকারির অস্তিত্ব বানরই ঠারেঠোরে বাঘকে জানায়। তবে অন্ধ বাঘ কীভাবে বানরের ভাষা বুঝল সেটা বেশ বিস্ময়কর। প্রকৃতির অদ্ভুত রহস্যযোগে অন্ধ বাঘ ও বানরের আশ্চর্য বন্ধুত্বের এই ঘটনাটি প্রবোধকুমার সান্যালও 'শিকারের সন্ধানে' (*মৌচাক,* ১৩৪২) গল্পে অনুগল্পরূপে উল্লেখ করেছেন। সেখানে বাঘ ও বানরের ষড়যন্ত্রে পাঁচ-ছয় জন নামজাদা শিকারি প্রাণ হারাবার পর এক সাহেব তাদের উভয়কে শিকারে সমর্থ হন।

এরকমই এক অত্যন্ত বিস্ময়কর কিম্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'বনবাসী অভিশাপ' (সম্ভবত *মৌচাকে* প্রকাশিত) গল্পের বাঙালি কথক কিভু অরণ্যে গরিলা শিকারের কালে। মহাযুদ্ধকালে কেরানিরূপে আফ্রিকা গিয়ে তিনি গভীর অরণ্যে গরিলা শিকারে যান। সেখানে তাঁবুর ভেতরে প্রতি রাতে অন্ধকারে অনুভব করতে থাকেন এক অজানা বিপদের উপস্থিতি। কিন্তু টর্চের আলোয় সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে না; শুধু তাঁবুর ভেতর থাকে বিশ্রী দুর্গন্ধ। আর পরদিন দেখা যেতে থাকে হয় বিস্কুট নয় চিনি ভর্তি এয়ারটাইট টিন চুরি গেছে; কথক প্রথমে কোনও লোভী কুলির কীর্তি ভাবলেও সর্দার মুরু নিশ্চিত করে তা নয়। রাত জেগেও চোর কিছুতেই ধরা পড়ে না। হেমেন্দ্রকুমার অসামান্য দক্ষতায় ধীরে ধীরে রহস্যকে ঘন থেকে ঘনতর

করে তুলেছেন। একরাতে বৃষ্টি হওয়ায় কাদায় পায়ের স্পষ্ট ছাপ রেখে যায় অদৃশ্য চোরের অস্তিত্বের প্রমাণ। মুরু চুপিচুপি ভীত স্বরে জানায় 'এ মেয়েমানুষের পায়ের ছাপ'।[৪২] লোকালয় থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরত্বে হিংস্র বুনো জন্তু বিশেষত 'মূর্তিমান মৃত্যু' হাজার হাজার গরিলাতে ভরা ভয়ঙ্কর এই গহন অরণ্যে দিনের আলোতেই যেখানে সাহসী পুরুষরাও প্রবেশ করে মূর্ছা যায়, সেখানে রাতের বেলা একাকিনী ভ্রমণ ও সুনিপুণ চৌর্যবৃত্তিতে সক্ষম 'কে সেই সাহসিনী নারী? তবে কি ভূত পেতনী।'[৪৩] স্তম্ভিত কথক বহু ভেবেও বনের অজানা রহস্যের কিনারা করে উঠতে পারেন না। এক রাতে মুরু ছায়ামূর্তিটিকে দেখতে পেলেও তা জন্তু না মানুষ বুঝতে পারে না। পরের রাতে আসে সেই চরম মুহূর্ত—তাঁবুর ভেতর শিয়রে দণ্ডায়মান বিভীষিকার মুখখানা কথক টর্চের আলোয় একঝলক দেখেন—'দপদপ করছে দুটো অগ্নিভরা বুভুক্ষু দৃষ্টি, ঝকমক করছে অনেকগুলো হিংস্র দন্ত, লটপট করছে রাশীকৃত কুণ্ডলী পাকানো সাপের মতো কেশমালা!'[৪৪] হতভাগ্য মুরুর গলা কামড়ে ধরা সেই প্রেতনীর মতো কালো বীভৎস মূর্তিকে কথক রিভলভার ছুঁড়তেই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ চিৎকারে মূর্তিটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই 'গভীর অরণ্যের ভিতর থেকে আর একটা বিচিত্র ভয়াবহ রোমাঞ্চকর কোলাহল জেগে উঠল— যেন বিরাট অরণ্যের ভয়ংকর বিপুল আত্মা প্রচণ্ড হিংসার নেশায় অধীর হয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে— এগিয়ে আর এগিয়ে আর এগিয়ে আসছে!'[৪৫] স্তম্ভিত কিংকর্তব্যবিমূঢ় কথকের পেছন থেকে সেই কালো মূর্তি হঠাৎই তীব্র বেগে সেই জীবন্ত অন্ধকারের দিকে ছুটে যায়। যাতনা বিকৃত মুরুর মারফৎই এই কিম্ভুত রহস্যের কিনারা হয়; উঠে আসে এক হৃদয়বিদারক কাহিনি। ঐ ছায়ামূর্তি আসলে গরিলাদের মেয়ে নুমা, যাকে কাফ্রি গ্রাম থেকে দেড় বছর বয়সে গরিলারা চুরি করে; তারপর দীর্ঘ ষোলো বছর কেউ তাকে কখনও দেখেনি। আজ বোঝা গেল গরিলাদের সঙ্গে থেকে নুমাও গরিলাদের মেয়েতেই পরিণত। 'পোষা মেয়ে' নুমার আর্তনাদে গরিলারা বনের গাছপালা ভেঙে পৃথিবী কাঁপিয়ে এগিয়ে আসছিল, তাকে ফিরে পেতেই গরিলারা বনে ফিরে যাচ্ছে। শিকার গল্পগুলিতে আশ্চর্য বা অলৌকিক রহস্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভ ও শেষে সেই রহস্যের উদ্‌ঘাটন— এই সাহিত্য কৌশলটির ব্যবহার তরুণ পাঠকদের কাছেও কিছু বাড়তি প্রাপ্তিযোগ নিয়ে আসে। শিকারের টানটান উত্তেজনার সঙ্গে আশ্চর্য/অলৌকিক ঘটনাটির রহস্য পাঠকের রোমাঞ্চ ভয় শিহরণকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়; আবার রহস্য উন্মোচনের পর তার বিজ্ঞানসম্মত কার্যকারণ খুদে পাঠকদের অনাবিল আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বৃদ্ধিও ঘটায়। শিকার কাহিনির সঙ্গে

যুক্ত হয় রহস্য রোমাঞ্চ গল্পের আমেজ। কখনো বা বাংলা ছোটোদের শিকার লিখিয়েরা চমৎকার সাহিত্য কৌশলে অলৌকিক বিশ্বাস ও অবিশ্বাস বা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধ উভয়কেই পাশাপাশি তুলে ধরে নবীন প্রজন্মের পাঠকদেরই নিজস্ব যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বিচারের স্বাধীনতা দেন (হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'শয়তান')। শিকার কাহিনির সঙ্গে অলৌকিক রহস্যের মিশেলে কতরকম বিচিত্র বিষয় নিয়ে সেকালের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে আশ্চর্য সব গল্প রচিত হয়েছে, আজ দেখলে বেশ অবাকই হতে হয়।

সভ্য জগতের খোঁজখবর থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন বিপৎসংকুল আরণ্যক পরিবেশে যেখানে অভাবী মানুষগুলোকে প্রতিনিয়ত অরণ্যের ভয়ঙ্কর প্রতিকূলতা ও হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গে সংগ্রাম করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়, সেখানে ভয় বিপদ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে পরিত্রাতারূপে অরণ্যদেবদেবীর কল্পনা, বাউলে-ওঝা-ফকিরদের মন্ত্রতন্ত্রপূত মাটি, শেকড় বা রুমালে বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যান্তর থাকে না। একই সঙ্গে ঠিক বিপরীতে অপদেবতা-দৈত্য-দানো-জিন-মায়াবিনী-প্রেতাত্মা ইত্যাদি অতিপ্রাকৃত শক্তি বা অপদেবদেবীরাও আতঙ্ক-বিহ্বল লোকায়ত বিশ্বাসে সহজেই স্থান দখল করে। মানুষখেকোর বা খুনিয়ার দ্বারা আপনজনের মৃত্যুতে কেউ কেউ প্রতিশোধস্পৃহায় জ্বলে উঠলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসহায় মানুষ তাকে 'অমোঘ নিয়তি' বা 'ভবিতব্য' বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়। কৃত কোনও অপরাধের ফলে অরণ্যদেবদেবীর কঠোর শাস্তি নেমে এসেছে কিংবা অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে মানুষ নেহাৎই নিরুপায়— এধরনের ধ্যানধারণা প্রিয়জনের শোককে বা কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতিকে ভুলে অরণ্যবাসী মানুষের অরণ্যের হিংস্র ঘাতক জানোয়ারের সঙ্গে পুনরায় সহাবস্থানে টিকে থাকাটাকেই হয়তো খানিক সহজ স্বাভাবিক করে তোলে। অনেক সময় অরণ্যচারীদের অনেক সংস্কার, বিশ্বাসের পেছনে গূঢ় কারণও যুক্ত থাকে। সভ্য জগতের কাছে অবিশ্বাস্য হলেও অরণ্যলগ্ন মানুষদের কখনো-কখনো দেখা যায় অরণ্যের হিংস্র বন্য প্রাণীকেই স্বয়ং বনের দেবতা বা রাজা বলে মেনে, তাদের রক্ষায় প্রাণপণে সচেষ্ট হতে। সঙ্কর্ষণ রায়ের 'বন্যরা বনে'তে চিলখার জঙ্গলের জোড়াবাঘের দিকে শিকারিরা নজর দিলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা ক্ষেপে যেত; কারণ বাঘ দুটোর জন্যই গ্রামে চোর ডাকাত চিতা ভালুক বুনো শুয়োরের উপদ্রব না থাকায়, তারা নিশ্চিত ও নিরাপদ বোধ করত। 'টোটেম' রূপে বিভিন্ন পশুপাখির প্রতি অরণ্য উপজাতিগুলির শ্রদ্ধা কিংবা 'ট্যাবু' হিসেবে কোনো কোনো জীবজন্তুকে হত্যা না করা, কোনো কোনো বৃক্ষ বা গাছপালাকে না কাটা—এগুলির মাধ্যমে অরণ্যবাসী মানুষ আধুনিক সংরক্ষণ বা বাস্তুতন্ত্র সংক্রান্ত বিদ্যায়তনিক পাঠ বা নামিদামি ডিগ্রি ছাড়াই যুগ যুগ ধরে

পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত অরণ্য অভিজ্ঞতা থেকে নিজেদের মতো করে, পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তার স্বার্থেই হয়তো অরণ্য ও অরণ্যের সম্পদ-গাছপালা-পশুপাখিকে রক্ষার চেষ্টা করে এসেছে। বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকার শিকার-সাহিত্যের রচনাকাররা অরণ্যচারীদের লোকায়ত সংস্কার-কুসংস্কার, বিশ্বাস-অবিশ্বাসগুলোতে অবশ্যই আচ্ছন্ন না হয়ে নবীন প্রজন্মকে নিজেদের যুক্তিবুদ্ধি অনুযায়ী তা বিচার করে দেখায় উৎসাহিত করেছেন; কিন্তু প্রান্তিক অরণ্যচারী সংস্কারগ্রস্ত এইসব অসহায়, হতদরিদ্র মানুষগুলোকে নাগরিক শিক্ষিত উন্নাসিকতার দৃষ্টিতে নেহাৎই 'মূর্খ', 'বুনো', 'বোকা', 'অশিক্ষিত জংলি' রূপে না দেখে তাদের প্রতি দরদ, সহানুভূতিও তরুণ পাঠকদের মনে চারিয়ে দিতে চেয়েছেন।

বন্ধুত্বের নানা মাত্রা

উৎসবে, ব্যসনে (বিপদে), দুর্ভিক্ষে, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে যিনি সহায় হন তিনিই প্রকৃত বন্ধু—একথা বহুকাল ধরেই প্রচলিত। আর *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রানুযায়ী* অন্যতম ব্যসন (অনুরাগ বা আসক্তি) তো 'মৃগয়া'/'শিকার'। ফলে বিপৎসংকুল শিকারে যে প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচয় জানা যাবে তাতে আর বিচিত্র কি! বাংলা ছোটোদের শিকার কাহিনিগুলিতে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলির মতোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে উঠে আসে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। শিকার অভিযানে শিকারিদের একই সঙ্গে জঙ্গলের দুর্গম পথ চলা, শিকার অনুসন্ধান, শিকারের জন্য ধৈর্যময় অপেক্ষা, শিকারের মোকাবিলা করতে হয়; প্রতি পদে পদে থাকে মরণঘন বিপদের ঝুঁকি; ফলে সহযাত্রী শিকারিদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, বোঝাপড়া, বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়ে ওঠে আরও ঘন, আরও নিবিড়।

সমর সরকারের 'বাঘে মহিষে', 'বাঘ ধরা' গল্পগুলিতে (*রংমশাল*, ১৩৪৭) দক্ষিণ ভারতীয় বিখ্যাত শিকারি অনদারায় চান্নাপ্পার শিকারের সাথি ছিল আবদুল্লা। তিনি যখন কলেজে ছাত্রাবস্থাতেও প্রথম বাঘ শিকার করেন, তখনও আবদুল্লাই ছিল সঙ্গী। নিজে বিখ্যাত শিকারি হলেও চান্নাপ্পা বন্ধু-আবদুল্লার শিকারের খ্যাতি, যথেষ্ট শিকার অভিজ্ঞতা, প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রশিকারি স্যাণ্ডারসন সাহেবের সাহচর্যে লব্ধ নানা শিক্ষা, তার দুর্জয় সাহস, অতিদ্রুত উদ্যোগ নেবার দক্ষতা, নিশান নৈপুণ্যের বারংবার অকপটে প্রশংসা করেছেন। বাবাদা পাহাড়ের কাছের গ্রামের ত্রাস মানুষখেকোর গর্তে ঢুকে বাঘটিকে বর্শা-রাইফেল-পিস্তল সহযোগে শিকার করা কিংবা টপ্পু কাম্বের জঙ্গলের মাঝে ক্রুদ্ধ, লাফিয়ে আসা বাঘটিকে সহজে শিকার করা— সম্ভব হয়েছে চান্নাপ্পা ও আবদুল্লা দুই বন্ধুর যৌথ প্রয়াস ও শিকার দক্ষতায়। আবার আবদুল্লার উদ্যোগেই চান্নাপ্পা বাঘে

মহিষের ভয়ানক যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ হন; মৃত বাঘের উপর দণ্ডায়মান এক পদশূন্য রক্তাক্ত মহিষটির সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে একই সঙ্গে গর্জে ওঠে দুই শিকারি বন্ধুর রাইফেল। বোঝা যায়, চান্নাপ্পা ও আবদুল্লা শুধু শিকারি বন্ধুই নয়, তারা শিকারে যেমন সমদক্ষ তেমনি শিকার সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনাতেও অনেকটা সমদর্শী, সমমনস্ক। সে যুগে ভারতীয় সমাজে জাতি ধর্ম বর্ণের ভেদাভেদের তীব্র অস্তিত্ব বর্তমান থাকলেও, শিকার কাহিনিগুলিতে শিকারিদের মধ্যে রয়েছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বন্ধুত্বের সুনিবিড় সম্পর্ক। জঙ্গলের রাজত্বে শিকারির আসল পরিচয় তার সাহস, বীরত্ব, শিকার নৈপুণ্য, নিশান দক্ষতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সহযাত্রী শিকারি বা অনুচরদের সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণ সুসম্পর্কে। সেখানে হিন্দু-মুসলমান, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের বিভেদ খাটে না। সমর সরকারের (বাস্তবের) 'চান্নাপ্পা ও আবদুল্লা'র মতোই সুদক্ষ শিকারি বন্ধুদ্বয়ের আরেকটি অভিন্নহৃদয় জোড়ি আমরা পাই পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব গুহর কলমে 'বাঙালি কথক ও টেড' ('টাঁড়বাঘোয়া', *সন্দেশ*)।

উনিশ শতকে সাদা ইউরোপীয় শিকারিদের অনেকেরই দেশীয় কালা আদমিদের মধ্যেকার স্থানীয় শিকারি বা গ্রামীণ আদিবাসী শিকারিদের প্রতি ছিল অদ্ভুত অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্যের মনোভাব। স্থানীয় শিকারিদের সাহচর্যে তাদের অরণ্য অভিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে শিকার সফলতা লাভ করলেও সাহেব-শিকারিরা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব তো বহুদূর, তাদেরকে তাদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি বা প্রাপ্য সম্মানটুকুও দিতেন না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। দেশীয় মহারাজা, নবাব শিকারি বা শিক্ষিত ভদ্রলোক শখের শিকারিদেরকেও ইউরোপীয় শিকারিদের নিজেদের চেয়ে 'কাপুরুষ', 'ভীরু' প্রতিপন্ন করার প্রবণতা ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ এই বৈষম্য ধারণায় অনেকটা বদল ঘটে। সাহেব শিকারিদের বিশেষত বংশগতভাবে ইউরোপীয় কিন্তু ভারতে জন্মানো কিংবা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সাহেব শিকারিদের লেখালেখিতে দেশীয়/স্থানীয় শিকারিদের শিকার দক্ষতা ও অরণ্যজ্ঞানের প্রশংসাও উঠে আসতে থাকে। মহারাজা-নবাবদের আয়োজিত জমকালো শিকার অভিযানে অংশগ্রহণ কিংবা ভারতীয় শিক্ষিত ভদ্রলোক শখের শিকারিদের সঙ্গে শিকার সঙ্গী হয়ে ক্রমশ পরস্পরের মধ্যেকার ভেদাভেদও খানিক কমতে থাকে; সহজ সুন্দর বন্ধুত্বের সম্পর্কও ক্রমশ গড়ে উঠতে দেখা যায়। ভারতীয় ও বিদেশি শিকারির বন্ধুত্বের চিত্র শুধু বুদ্ধদেব গুহর 'টাঁড়বাঘোয়া'তেই নয়, এই সময়কার আরও বেশ কয়েকটি বাংলা শিকার গল্পেই পাওয়া যায়। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হাজারীবাগের জঙ্গলে' উপন্যাসের বড়কাগাঁওয়ের জঙ্গলে শিকারে আসা তিন বন্ধুর—একজন বাঙালি ধীরেনবাবু, একজন সাহেব মিঃ

ব্রেকার ও আরেকজন কোন্ দেশি বলা কঠিন সম্ভবত অসমিয়া মিঃ ফরেস্টার। দেশ ও প্রদেশের ভিন্নতা এই তিন সুদক্ষ শিকারির বন্ধুত্বে কোনও বাধাই হয়নি। একই সঙ্গে তাদের তাঁবুতে খাওয়া, শোয়া, গল্প, পরস্পরকে নিজেদের শিকার অভিজ্ঞতা শোনানো; একই সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে বাঘ শিকারের উদ্দেশ্যে অরণ্যপথে অদৃশ্য হওয়া। ধরণীধর সেনের 'হিমালয়ে ভাল্লুক শিকার' (*রংমশাল*, ১৩৪৪)-এ কাশ্মীরের পুঞ্চ অভিযাত্রী বিদেশি নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা দলটির সদস্য বাঙালি সেন ও স্কচ ছেলে টম প্যাটারসনের মধ্যেও গড়ে ওঠে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভারতীয় শিক্ষিত শহুরে ভদ্রলোক শখের শিকারি ইউরোপীয় শিকারির সঙ্গে যতটা বন্ধুত্ব, অন্তরঙ্গতা, সমপ্রাণতা বোধ করেন, স্থানীয় গ্রামীণ শিকারিদের সঙ্গে ততটা নয়।

'হিমালয়ে ভাল্লুক শিকার' কাহিনির সেন ও টমের মতোই বাংলা শিকার কাহিনিগুলিতে অনেক সময়ই শিকারে অসম দক্ষ বন্ধুজোড়ের সাক্ষাৎ মেলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সঙ্কর্ষণ রায়ের 'বন্যরা বনে'র কথক ও সুদক্ষ ওস্তাদ শিকারি গোপীন। উভয়েই চিরিমিরির জঙ্গলে কয়লার স্তর সন্ধানকারী দলে কর্মরত। গ্রামবাসীদের উপদ্রবকারী চিতা বা মানুষখেকো বাঘের থেকে রক্ষা করতে গোপীনের শিকার অভিযানগুলিতে কথক তার শিকার সঙ্গী মাত্র। কথকের ভূমিকা গোপীনের শিকার-সহায়ক রূপেও ঠিক নয়, এজন্য আছে গাইড দৌলত। কথক এখানে মূলত শিকারের দ্রষ্টা। সেই সঙ্গে কথক বন্ধু গোপীনদার কাছে শিকার সম্পর্কে তার জানা-অজানা, গুরুত্বপূর্ণ থেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিভিন্ন বিষয়ে নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করেছেন; আর অভিজ্ঞ শিকারি গোপীনদা মানুষখেকো বাঘ বা চিতাবাঘের স্বভাব, চিতা ও চিতাবাঘের মধ্যেকার পার্থক্য, মানুষখেকোর শিকার পদ্ধতি ইত্যাদি খুঁটিনাটি ডিটেলিং সহ যেভাবে বুঝিয়ে বলেছেন তাতে শুধু কথকেরই নানা সংশয় জিজ্ঞাসার নিরসন ঘটেনি, তা 'বন্যরা বনে'র খুদে-পাঠকদেরও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধিতে নিঃসন্দেহেই সহায়ক। এছাড়াও দু-বন্ধুর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন শিকার বনাম সংরক্ষণ বিতর্কটিও সুচারুভাবে ধরা আছে কাহিনিটির পরতে পরতে।

আজকে অবাক লাগলেও সেকালের অনেক প্রসিদ্ধ শিকারিরই শিকারে হাতেখড়ি দেখা যায় নেহাৎই কিশোর (১২-১৩ বছর বয়সে) বা সদ্য তরুণ বয়সে। ফলে বাংলা ছোটোদের শিকার কাহিনিতে নায়ক বা শিকারি স্বয়ং যদি হয় কিশোর বা সদ্য তরুণ, তাহলে তার দুঃসাহসিক শিকার অ্যাডভেঞ্চারে শরিক বা সাগরেদ হয় অবশ্যম্ভাবীভাবে সমমনস্ক বন্ধু বা বন্ধুরাই। রাজপরিবারগুলিতে শিকার অনেকসময় অপ্রাপ্তবয়স থেকেই জীবন ও শিক্ষার অঙ্গরূপে বিবেচিত হলেও বাঙালি বিশেষত মধ্যবিত্ত

বাঙালি পরিবারের কিশোর বা সদ্য যুবার বিপদের ঝুঁকিপূর্ণ শিকার অ্যাডভেঞ্চারে অংশগ্রহণে অভিভাবকদের অনুমতি বা সঙ্গলাভ সচরাচর অত্যন্ত বিরল। খগেন্দ্রনাথের 'আফ্রিকার জঙ্গলে'তে (*শিশুসাথী*) ডার্বানবাসী ভারতীয় বণিকপুত্রত্রয় যখন ভয়ানক গরিলা শিকারের সংকল্প নেয়, তখন কিন্তু তারা তিন বন্ধু মিলেই গোপনে যাত্রার সব আয়োজন করে একদিন বাড়িতে না জানিয়ে সংগোপনে গরিলার সন্ধানে রওনা দেয়। এর অনেক পরে বুদ্ধদেব গুহ রচিত 'টাঁড়বাঘোয়া'র প্রকাশকালেও (সম্ভবত ছয়ের দশক) এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি; কলেজ পড়ুয়া সদ্যতরুণের শিকারের একমাত্র সাগরেদ তার বন্ধু; সাহেবপুত্র টেড গ্রামবাসীদের অনুরোধে মানুষখেকো বাঘ মারার জন্য টেলিগ্রাম করে বাবার পারমিশন নিতে চাইলেও, তার বাঙালি বন্ধু কথক বাধা দেয়। কারণ সেক্ষেত্রে 'কাম ব্যাক্ ইমিডিয়েটেলি'র আর্জেন্ট রিটার্ন-টেলিগ্রাম আসার সম্ভাবনা। টেড যদিও জানে তার মেম মা বেঁচে থাকলে টেলিগ্রাম আসত 'বাঘের চামড়া না নিয়ে ফিরলে তোমারই পিঠের চামড়া তুলব', বাবাও উৎসাহ দিতেন কিন্তু এখন বাবা একমাত্র সন্তানের জন্য বড্ড নরম হয়ে গেছেন। তাই টেডেরও শেষ সিদ্ধান্ত তার বাঙালি বন্ধুরই অনুরূপ 'বাবা মা-র পারমিশান নিয়ে কে আর কবে এরকম মহৎ কর্ম করেছে?'[৪৬]

শিকারে হিংস্র জন্তুর মোকাবিলা করার চূড়ান্ত মুহূর্তে অনেক সময় দেখা যায়, বন্ধু বিপদগ্রস্ত হলে তাকে বাঁচাতে অন্য বন্ধু বা বন্ধুরা নিজের জীবন বিপন্ন করেও ঝাঁপিয়ে পড়ে। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আফ্রিকার জঙ্গলে'তে প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গরিলাটি শিকার করে শোভনলাল। দ্বিতীয় গরিলাটি শিকারের কৃতিত্ব অর্জনের জন্য বীরেন্দ্র তাই, পুনরায় শিকারে উদ্যত শোভনলালকে বাধা দেয়। কিন্তু চরমমুহূর্তে সে যখন বন্দুকে ট্রিগার টিপে, তখন আগুন ধরে না; নিরুপায় বীরেন্দ্র আক্রমণোদ্যত গরিলার বুকে বন্দুক ছুঁড়ে মেরেও তাকে থামাতে পারে না। সেই সংকটময় পরিস্থিতিতে রতন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গরিলাটিকে গুলি করতে সফল হলে বীরেন্দ্র সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসে। বেশ কয়েকটি গরিলা শিকারের পর গাইড মঙ্গরু সহ সবাই যখন খাদ্যের অভাবের জন্য ও যেকোনও মুহূর্তে নরখাদক নিগ্রোদের কবলে পড়ার ভয়ে ফিরে যেতে চায়, শোভনলাল কিন্তু গরিলা শিকারের শখ না মেটায় আরও দুদিন থাকতে চায়। বন্ধুর ইচ্ছেকে সম্মান দিয়ে অন্যরা পরের দিনটা থাকবে ঠিক করে। কিন্তু পরদিন সকালে কাউকে কিছু না জানিয়ে শোভনলাল একাকি জঙ্গলের গভীরে গরিলার সন্ধানে চলে যায়। শোভনলালকে না দেখে তার বন্ধুরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে ওঠে। শিয়রে আরেক বিপদ 'রাক্ষুসে নরখাদক নিগ্রোরা' প্রায় এসে পড়েছে জেনেও কিন্তু দুই বন্ধু শোভনলালকে

ফেলে চলে যেতে পারে না। বিপদকে মাথায় নিয়েও তারা আগে শোভনলালের সন্ধানে চলে; আহত রক্তাক্ত শোভনলালকে খুঁজে পেয়ে কোনও দোষারোপ না করে জড়িয়ে ধরে। অবশ্য দোষারোপ, অভিমান বা ক্ষোভ প্রকাশের সময়ও থাকেনি; অতি নিকটেই নরখাদক নিগ্রোদের চিৎকার শোনা যায়। আহত শোভনলালকে সেখানেই ফেলে রেখে নিজেরা বাঁচতে তারা কিন্তু পালায় না। শোভনলালকে কাঁধে তুলে নিয়ে দু-বন্ধু গাইড মঙ্গরুর পরামর্শে হুইলো নদীর দিকে ছুটতে থাকে। উপন্যাসটির এখানেই সমাপ্তি ঘটায়, শোভনলাল ও তার বন্ধুদের শেষপর্যন্ত কী হয়েছিল আমাদের জানা নেই। কিন্তু শিকার অভিযান বা বুনো জন্তুর মোকাবিলা করার প্রতি মুহূর্তে থাকে এমন ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা যে এক বন্ধুর হটকারি সিদ্ধান্ত, একগুঁয়ে জেদ বা সামান্যতমও ভুল পদক্ষেপ তার নিজের সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গী বন্ধুদেরও বিপদে এমনকি মৃত্যুমুখেও ফেলতে পারে। আমাদের মনে পড়তে পারে শিবশঙ্কর মিত্রের 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার' (১৯৫৫ খ্রি.)-এর দুই বন্ধু সদ্য-সাবালক আর্জান ও মাদারের কথা। সুন্দরবনে দুজনে হরিণ শিকারে গিয়ে আর্জান গাছের নিচে হঠাৎ এসে পড়া বাঘের বাচ্চাকে মাদার কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুলি করে মেরে ফেলে। কোনও প্রাণীর আগমনের শব্দ শুনেই তড়িঘড়ি গুলি চালাতে মাদার যেমন পূর্বে আর্জানকে বারণ করেছিল, তেমনি শিকারের পরই আর্জান গাছ থেকে নামতে উদ্যত হলে মাদার ইঙ্গিতে বাধা দেয়। ফলে ছুটে আসা বাঘিনির সন্তান হারানোর আক্রোশ থেকে সে মুহূর্তে তারা রক্ষা পায়। কিন্তু শীতের রাত বাড়তেই বনের কনকনে ঠান্ডায় মাদার অবস, চেতনাহীন হয়ে গাছ থেকে মাটিতে পড়ে যায়। বাচ্চার হত্যাকারীদের জন্য অপেক্ষারত ক্ষিপ্ত উন্মত্ত ক্রুদ্ধ বাঘিনি নিমেষে মাদারের দেহ টুকরোটুকরো করে দেয়। বাউলিয়া বা বাঘুড়ের ছেলে মাদার তুলনায় অনেক বেশি সতর্ক, সাবধানী হওয়া সত্ত্বেও নতুন শিকারি আর্জানের হটকারিতার জন্য বাঘিনির প্রতিহিংসার বলি হয়। চোখের সামনেই নিকট আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু মাদারের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটলেও নিরুপায় আর্জানের কিছুই করার থাকে না। বন্ধুর মৃত্যুতে আর্জান অসহ্য বেদনায় গুমরে গুমরে মরতে থাকে। ক্রমে আর্জান নিজেই যখন সব ঘটনা খুলে বলে ফেলে, মাদারের বাবা কলিম বাউলে বাদ দিয়ে গ্রামবাসীরা সবাই এমনকি আর্জানের নিজের মা, বউও তাকে মাফ করে না। অবশ্য বনের সঙ্গে যেখানে আবাদের নিয়ত সংগ্রামে আবাদে এমন কোনও সংসার নেই যাদের একজন না একজনের বনে প্রাণ গেছে, সেখানে সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে সবার মতো আর্জানও বন্ধু মাদারের মর্মন্তুদ ঘটনা ভুলে যায়—'যেমন করে শহরের মানুষ ভুলে যায় কলেরার মৃত্যুকে।'[৪৭] তবে

শিকারে এক বন্ধুর ভুল পদক্ষেপে—অপর বন্ধুদেরও বিপদে পড়া এবং সবাই মিলে একত্রে বিপদ থেকে উদ্ধারের আপ্রাণ চেষ্টা করার গল্প অনেক সময়ই উঠে এলেও, মাদারের মতো করুণ বিয়োগান্তক পরিণতি আমাদের নির্বাচিত বাংলা শিশু-কিশোর পত্রিকার শিকার কাহিনিগুলিতে বিশেষ নজরে পড়েনি।

হিংস্র জন্তু থেকে প্রাণ বাঁচাতে বন্ধুদের নিজেদের মধ্যেও রক্তাক্ত প্রতিযোগিতা ও 'যোগ্যতম'দেরই একমাত্র আত্মরক্ষায় সমর্থ হতে পারার একটি অদ্ভুত ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল 'নেকড়ের গল্পে' (*সখা-মুকুল-সন্দেশ-প্রদীপ-প্রবাসী* ইত্যাদি পত্রপত্রিকা থেকে সঙ্কলিত শিকার সঙ্কলন যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'বনে জঙ্গলে')। সাইবেরিয় প্রান্তর দিয়ে প্রত্যাবর্তনরত এগারোজন সশস্ত্র তুর্কি অশ্বারোহী সেনা পিছু নেওয়া নেকড়ের দল থেকে বাঁচতে প্রথমে বন্দি পাঁচজন রুশিয়কে একে একে নেকড়ের মুখে ফেলে দেয়। ভূপতিত ব্যক্তি ও তার অশ্বকে নেকড়ের দল ছিন্নভিন্ন করে উদরস্থ করার অবকাশে তারা নিজেরা কিছুটা করে পথ অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু তাতেও নেকড়ে দল পিছু না ছাড়লে, এবার প্রাণের দায়ে তারা নিজেদের বন্ধু সহযোদ্ধাদেরও পারস্পরিক অকস্মাৎ আক্রমণ করে ফেলে দিতে থাকে। হিংস্র নেকড়ের মুখে এভাবে নিজেদেরই বন্ধু পাশের অশ্বারোহী সহযোদ্ধাদের চারজনের প্রাণ তারা নিজেরাই বলি দেবার পর, বাকি কজন সাত মাইল দূরের এক পরিত্যক্ত কুটিরে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়। এ ধরনের চরম নিষ্ঠুর গল্প বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে সম্ভবত স্থান পায়নি। সেখানে একের পর এক শিকার গল্পে— তা সত্য কাহিনি হোক বা কল্পকাহিনি—এক বন্ধুর বিপদে আরেক বন্ধু বা বন্ধুদের মরণের ঝুঁকি নিয়েও হিংস্র জন্তুর বা বিপদের মোকাবিলা করার অর্থাৎ প্রকৃত বন্ধুত্বের দৃষ্টান্তই বারে বারে ঘুরে ফিরে তুলে ধরা হয়েছে। খগেন্দ্রনাথের 'আসামের জঙ্গলে' (*শিশুসাথী*) উপন্যাসটিতেও নৃমুণ্ড শিকারিদের কবল থেকে পালানোর সময় মহাদেব খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে অমর প্রকৃত বন্ধুর মতোই তাকে ত্যাগ করেনি। প্রায় মাসব্যাপী অনাহারে, অর্ধাশনে, অনিদ্রায় অমরের নিজের শরীরও প্রায় শক্তিহীন হয়ে পড়ে, তবুও নিজের সমস্ত নিরাশা-ভয়-দুশ্চিন্তাকে চেপে রেখে সে অসুস্থ মহাদেবকে ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে চলে; মহাদেব জ্ঞান হারালে মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে শুশ্রূষার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়।

'শোভনলাল-বীরেন্দ্র-রতন' কিংবা 'অমর-মহাদেব'—এরা অবশ্য পূর্ব থেকে বন্ধু; একই সাথে শিকার বা দেশভ্রমণ অ্যাডভেঞ্চারে আসে; বিপদের মোকাবিলাও করে একই সঙ্গে জোটবদ্ধভাবে। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, শিকার বা কোনও অভিযানে

এসে জঙ্গলের পথ বেঁধে দিয়েছে যে 'বন্ধনহীন বন্ধুত্বের গ্রন্থি', সেই বন্ধুত্বের বন্ধনেই যেন তারা এক বন্ধু আরেক বন্ধুর বিপদের মুহূর্তে তাকে ত্যাগ করে যায় না। নব পরিচিত নতুন বন্ধুটি কোনও কারণে বিপন্ন হলে, নিজের শত কষ্ট সত্ত্বেও, প্রতি পদক্ষেপে বিপদের সম্ভাবনা থাকলেও অন্যজন বাড়িয়ে দেয় আন্তরিক সাহায্যের, নিরলস সেবা-শুশ্রূষার হাত। নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়েও বন্ধুকে রক্ষা করতে চায়। এরূপ বন্ধুত্বের একটি অসামান্য নজির পাই, খগেন্দ্রনাথ মিত্রেরই 'জঙ্গলের জালে' উপন্যাসে। প্লেন দুর্ঘটনায় পড়া পর্তুগীজ মি. ডিসুজা পেরুর জঙ্গলের নৃশংস বুনোদের বন্দিদশা থেকে পালিয়ে আরেক হতভাগ্য স্পেনীয় রিভেরার সঙ্গ পান। পায়ে হেটে দেশভ্রমণে বেরোনো রিভেরারা বুনোদের হাতে পড়ে; দুই বন্ধু মারা পড়লেও রিভেরা কোনও ক্রমে পালান। দাবানল কালে চলশক্তিহীন, শ্বাসকষ্টে অজ্ঞান ডিসুজাকে রিভেরা কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা চালান; তৃষ্ণায় বুক ফেটে গেলেও তিনি ডিসুজার দেহ নামিয়ে রেখে জলের সন্ধানে যান না। নিজের পূর্বের বন্ধুদের রিভেরা বাঁচাতে পারেননি, নতুন পাওয়া বন্ধুকে বাঁচাতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা চালান। চেতনাপ্রাপ্তি পর্যন্ত ডিসুজার হাত ধরে পাশে বসে থাকেন; রিভেরা বন্দুক দিয়েই মাছ, বনমুরগী, পায়রা শিকার করে দুজনে ভাগ করে খান। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে রিভেরা যখন প্রবল জ্বরে জ্ঞান হারান ডিসুজাও প্রতিদানে বন্ধুকৃত্যের দায়িত্ব পালনে পিছুপা হন না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন হলেও তিনি রিভেরার অচেতন দেহটা পিঠে তুলে নেন। বুনোদের দেখে নিজে পালানোর বদলে চেতনাশূন্য রিভেরাকে রক্ষা করতে বন্দুক তুলে অপেক্ষা করতে থাকেন। বহুকষ্টের পর ডিসুজা শেষপর্যন্ত তার সন্ধানে আসা ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হতে পারলেও, রিভেরা কিন্তু বাঁচেন না। রিভেরার শেষ ইচ্ছাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ডিসুজারা দুই ভাই তাকে বনের খালেই কবর দেন; একরাশ ফুল ছড়িয়ে দিয়ে ডিসুজা নমস্কার জানান—'বিদায়—বন্ধু বিদায়।' উপন্যাসের অন্তে জঙ্গলের জাল থেকে শেষপর্যন্ত মুক্ত ডিসুজা যখন ভাইয়ের প্লেনে আকাশে ওঠেন, তখন পাহাড় বনপ্রান্তরের সঙ্গে এই বন জঙ্গলেই হঠাৎ পাওয়া তার 'অকৃত্রিম বন্ধু' রিভেরার উদ্দেশেও যেভাবে বিদায় সম্ভাষণ জানান তার আর্তি পাঠকের হৃদয়কেও নিঃসন্দেহেই স্পর্শ করে; অনুরণন জাগিয়ে তোলে।

সাবালক বাংলা শিকার-সাহিত্যগুলিতে বিশেষত রাজা-জমিদার-অভিজাত শ্রেণির রচিত শিকার স্মৃতিকথাগুলিতে অনেক সময় শিকারকে কেন্দ্র করে সম্ভ্রান্ত বংশগুলির পারস্পরিক ঈর্ষা, বিদ্বেষ, বংশানুক্রমিক ক্ষমতার লড়াই, শিকারসঙ্গীদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ব্যঙ্গ, দোষারোপ ইত্যাদিও প্রকাশ পেয়েছে।[৪৮] তবে নাবালক

শিকার-সাহিত্যগুলিতে সাধারণত এধরনের চিত্র অবর্তমান। শিকার অভিযাত্রীদের মধ্যে কখনো-কখনো শিকারে ব্যক্তিগত অধিক কৃতিত্ব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেলেও (খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আফ্রিকার জঙ্গলে'র শোভনলাল), শেষপর্যন্ত পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সহযোগিতা-ভালোবাসাই অধিক প্রাধান্য পেয়েছে।

বিশ শতকে বাঙালি ছেলে ছোকরার সাধে-আহ্লাদে, বিদ্যাচর্চা-খেলায়, হাসি-বেদনায়, বিপ্লবে-সংগ্রামে, আড্ডা-মজলিসে, গুলবাজি-চালিয়াতিতে, বেপরোয়া দুঃসাহসে-নিষিদ্ধ/গোপন কাজকর্মে, সফলতা-ব্যর্থতায় সর্বদা সহচর হত তার বন্ধু বা বন্ধুর দল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এসময়ের বাঙালি সাহিত্যিকদের কলমে কিশোর বা নব্যযুবাদের দুঃসাহসিক লোমহর্ষক শিকার অভিযান বা জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলিতে এই বন্ধুত্বের নানা রকমফের, প্রকৃত বন্ধুর স্বরূপ বা প্রবৃত্তি বারবার অঙ্কিত হয়েছে।

বন্ধুত্বের মধ্যে বয়সের কোনও নির্দিষ্ট সীমা নেই ঠিকই, কিন্তু শৈশবের শেষ থেকে পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক হবার পূর্ব পর্যন্ত বয়সীদের কাছে 'বন্ধুত্ব' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। কৈশোর বয়সে ভালো ও স্থায়ী বন্ধুত্ব পরবর্তী জীবনে ব্যক্তিকে ও সমাজকে ভালোর দিকে নিয়ে যায়। ফলে কিশোর-কিশোরীর মানসিক উন্নয়নের জন্যও বাঙালি সাহিত্যিকরা সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের সামনে যথার্থ বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে সচেষ্ট হন।

এছাড়া, বন্ধুত্বের সম্পর্ক বারবার তুলে ধরার পেছনে রয়েছে কালগত কারণও। বিশ শতকে বিশেষত দুই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, বাংলার দুর্ভিক্ষ, ৪৬-৪৭-এর রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা-দেশভাগ-উদ্বাস্তু সমস্যা, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির অল্পকালের মধ্যেই স্বপ্নভঙ্গ, দেশজোড়া খাদ্য ও বস্ত্র সংকট, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ইত্যাদি নানা কারণে মানুষ মানুষের প্রতি আস্থা হারাচ্ছে। চারিদিকে শুধু হিংসা, স্বার্থপরতা, কৃপণতা, ঘৃণারই জয়গান; মানবিক মূল্যবোধ অবক্ষয়িত। সেই অস্থির, ধ্বস্ত সময়ে মানুষের পরস্পরকে প্রীতির বাঁধনে বাঁধতে, পরস্পরের প্রতি আস্থা ফেরাতে পারে 'বন্ধুত্ব'। 'বন্ধুত্ব' সম্পর্কটি পারিবারিক পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব, পতিপত্নীত্ব, সন্তানত্ব সম্পর্কগুলির থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র; এই সম্বন্ধটি কোনো সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য নির্দিষ্ট নয়; 'স্বেচ্ছা নির্বাচিত বন্ধনহীন গ্রন্থি'। তবুও বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর এই 'বাঁধনছাড়া বাঁধনে'র সম্পর্কটিই পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী মধুর বন্ধন; যার সঙ্গে ওতপ্রোতযুক্ত ভালোবাসা, স্নেহ, মৈত্রী, সখ্য, সৌহার্দ্যের সম্পর্ক; জড়িত পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সমবেদনা, বিশ্বাস, প্রতিশ্রুতি, আস্থা। রক্তের সম্পর্ক না হয়েও বন্ধুত্বই গড়ে

তুলতে পারে আত্মার সঙ্গে আত্মার বন্ধন। ফলে হিংসার দীর্ঘ করাল ছায়া থেকে বাইরে আসতে, স্বার্থপরতাকে ত্যাগ করে মনুষ্যত্ববোধকে ভিতর থেকে জাগিয়ে তুলতে একান্তই জরুরি হয়ে ওঠে 'বন্ধু হওয়ার সাধনা'।

আর শিকার বা অ্যাডভেঞ্চারে হিংস্র বন্য জানোয়ারের মোকাবিলায় কিংবা প্রতিকূল অবস্থায়, মরণঘন বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে বন্ধুত্বের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যায়; চেনা যায় আসল বন্ধুকে। তাই বাঙালি সাহিত্যিকরা বাংলা শিকার বা জঙ্গল-অ্যাডভেঞ্চারগুলির মাধ্যমে বন্ধুত্বের নজিরগুলি তুলে ধরে কিশোর-কিশোরীদের যথার্থ বন্ধুত্বের পাঠ দিতে চান। কারণ প্রকৃত বন্ধুত্বই শেখাতে পারে আত্মকেন্দ্রিক 'আমি'কে হারিয়ে 'আমরায়' নত হতে; অন্যের সুখে সুখী হতে, দুঃখে পাশে দাঁড়াতে, বিপদে সাহায্যের হাত বাড়াতে।

শখের শিকারির আত্মসমালোচনা

অমরচন্দ্র মিত্র বাঁকুড়ার কৃষ্ণনগর গ্রামের সেট্‌লমেন্ট অফিসার থাকাকালীন গাঁয়ের ফসলের রক্ষাকর্তা হতে হতেও কীভাবে 'মোষ মারা হাকিম' রূপে খ্যাত হলেন—তারই মজাদার কীর্তিকাহিনি 'মহিষমর্দন'। তিনি স্বয়ং তা লিপিবদ্ধ করেছেন *রামধনু* পত্রিকার (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২) পাতায়। শিকারের বাতিক থাকায় কথক গ্রামের আশে পাশে মাঝে মাঝে বন্দুক নিয়ে শিকার করতেন। ফলে ডিংলা (কুমড়ো), বেগুন ক্ষেতে রাতে বনবরার (বুনো শুয়োরের) উৎপাতের একটা ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় দফাদার চৌকিদার সহ এসে তাঁর কাছে শিকারের অনুরোধ জানায়। যথারীতি তিনি শিকারও সম্পন্ন করেন সুষ্ঠুভাবেই। শীতের রাতে খড়ের পালুই-এর উপর থেকে আধো জ্যোৎস্নার আলোছায়ায় ক্ষেতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসা কালো কালো পশুমূর্তি দুটিকে তিনি গুলি চালান। গুলি খেয়ে একটি তৎক্ষণাৎই মরে; আরেকটি আর্তনাদ করে পালায়। শিকার সফল হলেও অকুস্থানে গিয়ে দেখা যায় তিনি বরা ভেবে যাদের মেরেছেন তারা আসলে কাড়া বা মহিষের বাচ্চা। এরপর আছে আরও চমক। দফাদার মৃত কাড়াটি দেখে আর্তনাদ করে ওঠে 'সর্বনাশ হইচে; এ যে আমার কাড়া। আমার এক জোড়া কাড়া রে!'[৪৯] পালানো আহত কাড়াটি স্থানীয় পশুচিকিৎসকের চেষ্টায় শেষপর্যন্ত বাঁচে কিন্তু গুলিতে তার ছিন্ন নাসিকাটি কথকের শিকার কীর্তির পরিচয় বহন করতে থাকে।

'*রামধনু*'র খুদে পাঠকদের মিত্রজা হাসি-মজার ঢঙেই তাঁর শিকার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ 'কলিযুগের মহিষমর্দন উপাখ্যান'টি শুনিয়েছেন। কিন্তু 'মহিষমর্দন' কি নিছকই মজায় ভরা শিকারের গল্প? লেখক তাঁর লেখার মধ্যে নিজেই এমন কিছু ইঙ্গিত

ছড়িয়ে রেখে যান যে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায় গল্পটিতে ধরা রয়েছে তৎকালীন বাঙালি শখের বাবু-শিকারিদের সমালোচনাও—

- ‘শিকারের বাতিক’ থাকায় কথক গ্রামের আশেপাশে বন্দুক নিয়ে ঘুরতেন, নিরীহ ‘হাঁস, হড়েল, শরাল’ মারতেন। মাঝে মাঝে ‘দুএকটা বনবরা’ও শিকার করেন। কিন্তু তাঁর হাবভাব আদব কায়দা যেন পাকা বড় শিকারির।
- রাতে বনবরার অত্যাচার থেকে গ্রামের চাষীদের ক্ষেতের সব্জি রক্ষার একটা ব্যবস্থার জন্য দফাদার সকালে বাংলোয় এসে হুজুরের কাছে আবেদন জানায়; তাতে তিনি ‘সিগারেট দাঁতে চেপে’ এমনভাবে ‘স্বীকার আছি’ বলেন যে তাঁর কথা গ্রাম্য দফাদার ঠিকমত বুঝতে পারে না; সঙ্গের চৌকিদারের পরিচয় দিয়ে পুনরায় শিকারের জন্য কাতর আর্জি জানাতে থাকে।
- কথক শিকারের দায়িত্ব নিলে, দুপুর রাতে দফাদার তাকে শিকারে যাবার জন্য ডেকে নেবে কথা হয়। তা সত্ত্বেও তিনি ঘুমিয়ে পড়েন; কারণ শীতের রাত। রাত বারোটায় দফাদার লোকজন সহ ডাকাডাকি করে তাঁকে জাগায়।
- কথক ক্ষেতের একদিকে কাটা খড়ের পালুই-এর উপরে বসেন; আর দফাদার ও তার সঙ্গীরা থাকে নিচে মাটিতেই কিছু উত্তরে আখের খেতে। শিকার কার্য সমাধার পর তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। এক মস্ত সাহেব শিকারির মাচান থেকে নেমে মৃত বাঘের কাছে আসতেই বাঘেরও অন্তিম শক্তিতে সাহেবের স্কন্ধ মর্দন করার কাহিনিটি স্মরণ করে তিনি সাবধান হন। তবে সাবধানতাটা যতটা নিজ স্বার্থে ততটা অন্যদের জন্য হয়তো নয়। একটু অপেক্ষা করে নিজে নিচে নামার আগে দফাদারকে ডাকেন। তারা এলে তবেই পালুই থেকে নামেন ও অকুস্থানে যান।
- বনবরা ভেবে আলোছায়ায় কথক মহিষের বাচ্চা শিকার করেছেন দেখে, দফাদার তার পোষা কাড়ার শোকে হায় হায় করলেও দফাদার বা গ্রামের লোকেরা কেউই তাঁকে কোনও দোষারোপ—করেনি। বরং দফাদারের সর্বনাশে গ্রামবাসীরা যথেষ্ট উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। গ্রাম্য জীবনের পারস্পরিক হিংসা স্বার্থপরতার কুটিল চেহারাটি এখানে উঠে এসেছে। সবাই বলে ‘ঠিক হইয়াছে। রাতে নিজের কাড়া ছাড়িয়া দিয়া ফসল খাওয়ায় আর বলে বরায় খাইয়াছে। ধর্মে সহিবে কেন?’[৫০] দফাদার যদি নিজেই নিজের কাড়া ছেড়ে দিয়ে ফসল খাইয়ে বরায় ফসল খাচ্ছে বলে রটায় বা তার নিজের কাড়া দুটিরই এই কীর্তি সে যদি জানত তাহলে সব জেনে বুঝেও সে শিকারের আর্জি জানিয়ে কথককে শিকারে নিয়ে এসেছিল কেন? আর শিকারের রাত্রে কাড়া দুটি বেঁধে রাখেনি কেন? এ ধরনের প্রশ্ন অবশ্য গ্রামবাসীদের

মাথায় আসেনি, এমনকি কথকেরও নয়। তিনিও গ্রামের লোকেদের মতো ‘ধর্মের কল, পাপের শাস্তি, সবই বুঝলেন’।[৫১] শুধু পাপের শাস্তি তাঁর হাত দিয়ে হয়েছে বুঝেও বিমর্ষ হয়ে রইলেন।

- দফাদার বোঁচা মহিষ বাচ্চাটি নিয়ে হায় হায় করতে করতে চলল। ‘মহিষমর্দন বীর’ কথকও তার অনুগামী হলেন, পেছনে চলল উল্লসিত জনতার মিছিল।

গল্পে ভুল শিকারের জন্য কথককে সামান্য ‘বিমর্ষ’ দেখা যায়, কিন্তু ব্যর্থ শিকারের জন্য তিনি কি সম্পূর্ণই শোচনা শূন্য ছিলেন? ‘মহিষমর্দন বীর’ শব্দবন্ধটির মাধ্যমে তিনি যেন নিজের প্রতিই ছুঁড়ে দিয়েছেন তীক্ষ্ণ শাণিত বিদ্রুপ। কেউ তাকে দোষারোপ না করলেও, বরং ‘মোষ মারা হাকিম’ নামে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করলেও, তিনি নিজেই সম্ভবত লজ্জায় ঐ অঞ্চলে আর কখনও শিকারে বের হন না।

বিশ শতকে বাংলায় উত্থান ঘটেছিল এমন এক শ্রেণির শহুরে ভদ্রলোক বাবু শিকারিদের যারা নিছক শখের বশবর্তী হয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অকারণে নিরীহ পশুপাখি শিকার করে আমোদ পেতেন। তাদের অনেকেই যতটা না বড়ো শিকারি ছিলেন, তার চেয়ে তাদের নিজেদের শিকারি রূপে দেখনদারিত্ব বা ফাঁপা বাহাদুরি প্রদর্শন ছিল বহুগুণ বেশি। বাস্তবে তারা দক্ষ, অদক্ষ, সফল, ব্যর্থ, অসম সাহসী বীর কিংবা সামান্যেই ভয়সন্ত্রস্ত যাই হন না কেন, অধিকাংশই ‘মুখে মারি শিকারি’ হিসেবে ছিলেন অসাধারণ নিপুণ; অর্থাৎ চরম বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে ভয়ানক হিংস্র জন্তুর রোমহর্ষক শিকারের গল্পগাছার মাধ্যমে নিজেদের বীরত্বের অতিরঞ্জনে ছিলেন অতীব ওস্তাদ। সেকালে বিদেশি বা দেশি মস্ত বড়ো শিকারির ফটোগ্রাফি মানেই সাধারণত ছিল শিকার করা জন্তুটির গায়ে ভারি বুট জুতো চাপিয়ে বা শিকার করা পশুপাখির স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে, ঠোঁটের কোণে চুরুট বা সিগারেট ঝুলিয়ে জগৎ-নির্লিপ্ত মুখ করে বীরত্ব ও ক্ষমতার বিদ্যুৎ ছেটানো। বাঙালি শখের বাবু-শিকারিরা যেমনই শিকার নিপুণ হন না কেন, হাবভাব প্রদর্শনে এসব ফটোগ্রাফির অনুকরণ করতে ছাড়তেন না। অনেক সময় বন্য জন্তু, পশুপাখির আচরণ, গতিবিধি, স্বভাব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান তো বহুদূর তারা গ্রামবাংলার অতিসাধারণ জীবজন্তু, গাছপালাও ঠিকঠাক চিনতেন না। মেছোবিড়াল জাতীয় প্রাণীকেই বাঘ ভেবে কম্পিত হওয়া কিংবা বাঘ শিকারে গিয়ে জীবনে প্রথম হঠাৎ বনের বাঘ দেখে ভয়ে দাঁতকপাটি লেগে মূর্ছা যাবার ঘটনাও বিরল ছিল না। ‘বিপন্নের পরিত্রাতা মহান শিকারি’ রূপে তারা যশোলাভে তীব্র ইচ্ছুক হলেও প্রকৃতপক্ষে

গরিব বিপন্ন গ্রামবাসীদের প্রতি তাদের দরদের বদলে প্রায়ই থাকত শহুরে নিস্পৃহ উদাসীনতা, উপেক্ষা, ফাঁপা আত্মম্ভরিতা।

'মহিষমর্দন' গল্পটিতে শিকার অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণের তলায় তলায় সংরচিত হয়েছে তৎকালীন বাঙালি এইসব শহুরে শখের বাবু-শিকারিদের সমালোচনাও। এখন এই শহুরে ভদ্রলোক শখের শিকারিদের একজন তো স্বয়ং কথকও। 'মহিষমর্দন' আসলে 'শ্রী অমরচন্দ্র মিত্র, এম-এ, বি. এল'-এর শিকার অভিজ্ঞতাঋদ্ধ আত্মকথনের পাশাপাশি বিবেকতাড়িত এক বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোক শিকারির অকপট জবানবন্দি; সেকালের শিকারের বাতিকগ্রস্ত এক বাঙালি শখের বাবু-শিকারির আত্মসমালোচনাও।

শিকারির মন পরিবর্তন : শিকার সংক্রান্ত জরুরি প্রশ্ন

বন্য জীবজন্তুর মধ্যে মাতৃত্ব-স্নেহ-বাৎসল্য-প্রেম-ভালোবাসার স্ফুরণ দেখে শিকারির মন-পরিবর্তনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। বুনো জানোয়ারের মধ্যে এসব মানবিক গুণের উপস্থিতি কখনো কখনো শিকারির নিষ্ঠুর নির্দয় হৃদয়কেও এতটাই গভীরভাবে নাড়া দেয় যে শিকারিকে নাটকীয়ভাবে তার শিকার জীবনের সমাপ্তি ঘটাতেও দেখা যায়। এমনকি জীবন-নির্লিপ্ত কঠোর-হৃদয় শিকারির পশুপাখির-ঘাতক থেকে পশুপাখির সংরক্ষণে প্রধান উদ্যোগী হয়ে ওঠার আশ্চর্য ঘটনাও বিরল নয়। শিকারির মনবদল বা রূপান্তরের প্রসঙ্গটি বাংলা ছোটোদের শিকার-সাহিত্যে বিষয় বা থিম রূপে বারবার উঠে এসেছে। হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম লেখক প্রেমচন্দের 'বনমানুষের গল্প' (*মৌচাক*, পৌষ ১৩৫৪) শিকার কাহিনিটি এই ধারার একটি অসামান্য নিদর্শন। আফ্রিকায় হাবশিদের গ্রামে বিশাল বড়ো এক বনমানুষের অত্যাচারে দশ জনের মৃত্যুর খবর শুনে শিকারি বনমানুষটিকে মারার জন্য আসেন। সেখানে এসে হঠাৎই কান্নার অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পান। আসলে বনমানুষের সঙ্গিনী মেয়ে বনমানুষটিকে উবাংসি জাতের লোকেরা মেরে ফেলে। তাই বনমানুষটি সারাদিন মৃত সঙ্গিনীর পাশে বসে করুণ ভাবে কাঁদে; আর রাত্রে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে একসময় নিঃশব্দে গ্রামে এসে একজন উবাংসিকে মেরে সঙ্গিনীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়; অন্যজাতের লোকদের কিছু করে না। সেদিন রাতেই শিকারির তাঁবুর মধ্যে পাহারাদারের বন্দুককে একেবারে তোবড়ানো অবস্থায় হাতে নিয়ে বনমানুষটির আবির্ভাব ঘটে। শিকারিকে লক্ষ্য করে 'যেন বিবেচনা করছে তাঁকে মারবে না ছেড়ে দেবে'।[৫২] হঠাৎ ঘুম ভেঙে টর্চের আলোয়

এরূপ ভয়ঙ্কর চেহারা সামনে দেখে শিকারির তো ভয়ে বাকরুদ্ধ অবস্থা, প্রায় হার্টফেলের জোগাড়। এরকম হাড় হিম করা ভয়ানক পরিস্থিতিতে বাইরে কিছু একটা পড়ার আওয়াজ হতেই বনমানুষটি নিমেষে একলাফে একেবারে অদৃশ্য হয়। বনমানুষটিকে মারতে পরদিন জঙ্গল তালাশে গিয়ে দেখা যায় বনমানুষটি একা নেই; সঙ্গিনীর পচতে শুরু করা লাশের উপর দুহাতে বুক চাপড়াচ্ছে। 'যেমন সে তার সঙ্গিনীকে বলছে আর একবার ওঠো, চলো এদেশ ছেড়ে ভিনদেশে চলে যাই আমরা; সেখানকার মানুষ এত নির্দয়, এত নিষ্ঠুর নয়।'[৫৩] কিন্তু সঙ্গিনীর নড়ার কোনও লক্ষণ নেই বলে মহাদুঃখে আবারও বুক চাপড়াতে শুরু করে। এই অত্যন্ত মর্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য দেখে শিকারি তার শিকারের উৎসাহ হারান; মনের অবস্থা বদলে যাওয়ায় বন্দুক ত্যাগ করে দলবল সহ ডেরায় ফিরে যান। বনমানুষের সঙ্গিনীর প্রতি সুগভীর প্রেম-ভালোবাসা দেখে সবাই বিস্ময়াবিষ্ট হয়; স্বীকার করতে বাধ্য হয় সঙ্গিনীকে মেরে উবাংসিরা সত্যিই অন্যায় করেছে। শিকারির এই মন পরিবর্তনেই প্রেমচন্দের গল্প কিন্তু শেষ হয় না। মন পরিবর্তনের অতি চেনা ছককে অতিক্রম করে যায় গল্পটি। হঠাৎ গতরাত থেকে নিখোঁজ পাহারাদারের মৃতদেহটি পাওয়া যেতেই শিকারির আবার দ্রুত মন বদলায়। রাগে ক্ষোভে প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে তিনি প্রাণঘাতী বনমানুষটিকে শাস্তি দিতে চান—'খুনী জানোয়ারকে দয়া দেখানো পাপ। ওকে শেষ করে তবেই আমার শান্তি'।[৫৪] জঙ্গলে শিকারিকে দেখে বনমানুষটি প্রথমে গর্জে উঠলেও পরমুহূর্তে মহাশোকে ডুবন্ত লোকের মতো বুক চাপড়ে কাঁদতে থাকে। কিন্তু এবার আর শিকারি মন পরিবর্তন না করে, বন্দুক চালান। কাঁধ ও বুকে গুলিবিদ্ধ হয়েও বনমানুষটি জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যায়। বনমানুষটি মারা পড়েছে ভাবা হলেও পরদিন ফের কান্নার আওয়াজ শোনা যায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায় সঙ্গিনীকে রক্তাক্ত বুক দেখিয়ে বনমানুষটি কাঁদছে, 'নেশাখোরের চোখের মতো তার দুই চোখে নেশার ঘোর।'[৫৫] মর্মান্তিক অন্তিম দৃশ্য দেখে বনমানুষটিকে গুলিকারী কঠোর শিকারির চোখেও কারুণ্যে জল আসে। বনমানুষটিকে এবার জ্যান্ত ধরবার জন্য শিকারি কাছে গেলে বনমানুষটি তার দিকে তাকিয়ে যেন বলতে চায়—'আর দেরি করছ কেন? আর একটু গুলি চালিয়ে দাও, এ দুঃখের সংসার হতে আমি বিদায় হয়ে যাই।'[৫৬] শিকারি একগুলিতেই বনমানুষটির ভবযন্ত্রণা দূর করেন। কিন্তু বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গেই কেঁপে ওঠে শিকারির অসমসাহসী বুকও। কেননা, সে মুহূর্তে তাঁর মনে হল—'এ আমি খুন করলাম, আমি খুনী।'[৫৭]

গল্পটিতে প্রকট হয়ে ওঠে একটি গভীর সত্য। মানুষই প্রথম স্ত্রী-বনমানুষটিকে হত্যা করে; সঙ্গিনীর হত্যার প্রতিশোধ নিতে বনমানুষটি শুধু হত্যাকারী উবাংসি জাতির লোকদেরই বেছে বেছে মারতে থাকে; শিকারিকে দু-দুবার কাছে পেলেও সে মারেনি, এমনকি আক্রমণও করেনি। শিকারিও অনুরূপে পাহারাদার তথা মানুষ হত্যার প্রতিশোধ নিতে বনমানুষটিকে মারে। কিন্তু হন্তারক 'খুনি' লেবেলটি জুটে শুধুমাত্র বনমানুষটির কপালে; আর খুনির উপযুক্ত শাস্তি তো একমাত্র হত্যাই। তাই শিকারি বনমানুষটিকে খুনি রূপে চিহ্নিত করে স্বনিযুক্ত দণ্ডদাতারূপে তাকে মারতে সচেষ্ট হন। হন্তারক 'খুনি' লেবেলটি যদি বনমানুষটির কপালে জুটতে পারে তাহলে যুক্তিক্রম অনুযায়ী তা শিকারির ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। কারণ উভয়েই তো একই ধরনের অপরাধে অপরাধী। গল্পের শেষে এই গভীর মর্মান্তিক সত্যটিই শিকারির উপলব্ধিতে উন্মোচিত হয়।

বিশ শতকে প্রাণীবিদ্যার চর্চায় পশুদের প্রেম-যৌনতা-সন্তানপালন-স্নেহ-বাৎসল্য-পারস্পরিক সম্পর্ক-ভাষা-স্মৃতি ইত্যাদির উপর পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষানিরীক্ষার গবেষণাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। গরিলা বা বনমানুষের প্রেম-ভালোবাসা স্নেহ-বাৎসল্যের গভীরতা, তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা, সঙ্গী বা দলের কোনও বনমানুষকে হত্যা করলে সাজপোশাক দেখে হত্যাকারীর স্বজাতিদের চিহ্নিত করে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার অদ্ভুত ক্ষমতা—এগুলি নিয়ে বিশ শতকের ছোটোদের বাংলা পত্রপত্রিকায় বিশেষত *রামধনু*, *রংমশাল*-এ বেশ কিছু প্রবন্ধ, খবর, বিদেশি শিকারির রচনার অনুবাদ ইত্যাদি লেখালেখি প্রকাশিত হয়। বনমানুষের প্রেম ও প্রতিশোধ স্পৃহার এই আশ্চর্য ঘটনা বা কাহিনিসূত্রটি তাই মোটামোটি পরিচিত; তবুও কিন্তু প্রেমচন্দ্ এটি নিয়েই ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্য লেখেন 'বনমানুষ কী দর্দনাক কহানী' (*মৌচাক* পত্রিকায় তার গৌরঙ্গপ্রসাদ বসু কর্তৃক অনুবাদ 'বনমানুষের গল্প')। গল্পকার সুনিপুণ দক্ষতায় মূল কাহিনিসূত্রটিতে যোগ করেন অসামান্য কয়েকটি মাত্রা বা ব্যঞ্জনা।

ওস্তাদ বড়ো শিকারি হতে গেলে লক্ষ্যভেদ পারদর্শিতা, পশুপাখি ও অরণ্য সম্পর্কে জ্ঞান, শিকার নৈপুণ্যের পাশাপাশি জীবন-নির্লিপ্ত, আবেগশূন্য বা আবেগ উচ্ছ্বাসকে সংযত করার ক্ষমতাযুক্ত কঠোর হৃদয়, দৃঢ় স্নায়বিক শক্তিযুক্ত হওয়া একান্তই জরুরি। সেদিক থেকে উক্ত গল্পের শিকারি নিশানায় মোটামোটি সুদক্ষ হলেও বারবার তার হৃদি পরিবর্তন হয়ে যায়। রক্তমাংসের সাধারণ মানুষের মতোই তিনি আবেগে আন্দোলিত হন, মানুষ বা ঊনমানুষ উভয়েরই দুঃখকষ্ট দেখলে

উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, বিচলিত হন। গল্পের প্রথমে শিকারি আফ্রিকায় বাঘ (?)[৫৮] শিকারে এসে এক ক্লাবে বিশ্রামরত অবস্থায় দূর গাঁয়ের হাবশীর মুখে তাদের গ্রামের উবাংসিদের উপর মূর্তিমান মৃত্যুদূত বনমানুষটির উপদ্রব শুনে বনমানুষ শিকারে চলে আসেন। আবার গরিলার মর্মান্তিক দুঃখভরা ঘটনা শুনে ও দেখে, স্বচক্ষে বনমানুষটির করুণ অবস্থা চাক্ষুষ করে—করুণায় বারবার দয়ার্দ্র হয়েছেন। বনমানুষকে অন্তিম গুলিটিও তিনি করেন বনমানুষটিকে রক্তাক্ত শোচনীয় যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে। আবার পাহারাদারের মৃত্যুতে রাগে ক্ষোভে প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠে প্রাণঘাতী বনমানুষটিকে শাস্তিস্বরূপ হত্যা করতে চেয়েছেন। পাকা শিকারি হয়েও তার বারবার মনবদল বা তীব্র মানসিক দোলাচলতা ও বনমানুষটির করুণ, বেদনাদায়ক অবস্থা প্রেমচন্দ্ যেভাবে অসাধারণ দক্ষতায় পরিবেশন করেছেন তাতেই ধরা আছে প্রতিভাবান গল্পকারের কৃতিত্ব। বনমানুষটির হাবভাব আচরণ দেখে তার অব্যক্ত কথাগুলি যেভাবে ভাষা দেওয়া হয়েছে তা তো আসলে শিকারির ভাবনা বা আরও বৃহৎ অর্থে বললে গল্পস্রষ্টার অন্তরের কথা। গল্পের সূচনাতে শিকারের জন্য শিকারির আগমন ঘটেছে, শিকার ক্রিয়াটি সংঘটনের মাধ্যমে গল্পটির ঘটেছে সমাপ্তি। সমগ্র গল্পটি বনমানুষটির শিকারকে কেন্দ্র করেই। তবু গল্পটির নামের ইশারা থেকে ও গল্পটির গতির সঙ্গে সঙ্গে পাঠক বুঝে যেতে থাকেন 'বনমানুষের গল্প' শিকারের রোমহর্ষক শিহরণ জাগানো গল্প নয় কেবলমাত্র; বনমানুষটির দুঃখভরা করুণ অবস্থা ও পরিণতিটি হাজির করার সঙ্গে সঙ্গে শিকারির প্রবল মানসিক টানাপোড়েনটি সুচারুভাবে বুনে দিতে দিতে প্রেমচন্দ্ আসলে পাঠক মনে জাগিয়ে তুলতে চান শিকার ও বন্যপ্রাণ সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি জটিল প্রশ্ন। অযথা নির্বিচারে শিকার—যা উবাংসিরা স্ত্রী বনমানুষটির শিকারে হয়তো করে—তাতে যেমন গল্পকারের সমর্থন নেই, তেমনি মানুষঘাতক রূপে চিহ্নিত কোনও বিপজ্জনক প্রাণীর দণ্ড কি একমাত্র হত্যাই—সেই অস্বস্তিকর প্রশ্নটিও তিনি হাজির করেন। বনমানুষ বা বনের যে কোনও জানোয়ার তো স্বাভাবিক ভাবে মানুষঘাতী হয় না, তার এরূপ বিপজ্জনক খুনি হয়ে ওঠার কারণটিও কি বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত নয়? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বন্যপ্রাণীর মানুষঘাতক বা মানুষখেকো হয়ে ওঠার পেছনে থাকে মানুষই—মানুষের লোভ, হটকারি কার্যকলাপ। তাই বুনো জন্তুটি মানুষঘাতক হয়ে উঠে যতটা অপরাধ করে, তাকে মানুষঘাতকে পরিণত হতে বাধ্য করে যারা তারাও কি ঠিক ততটাই অপরাধী, অন্যায়কারী নয়? প্রায় একই কারণে (প্রতিশোধস্পৃহায়) হত্যালীলা সংঘটিত হলেও

হত্যাকারী জানোয়ারের ভাগ্যে জোটে খুনি উপাধি আর খুনি জানোয়ারটিকে হত্যা/খুন করার জন্য শিকারি সাধারণত হয়ে ওঠেন দুর্জয় সাহসী বীর, কখনো বা বিপদের ত্রাতা দেবতুল্য মানব। কেন এই বিভেদ? বিষয়বস্তু ও গঠনে 'বনমানুষের গল্প' শিকার গল্প হলেও, প্রকৃত পক্ষে তা নিছক সোজাসাপ্টা গতানুগতিক শিকারের রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার আখ্যান নয়। গল্পের শিকারির সঙ্গে সঙ্গে পাঠককেও বন্যপ্রাণের অধিকার নিয়ে জরুরি জটিল প্রশ্নগুলির সামনা-সামনি বারবার হাজির করাই প্রেমচন্দের গল্পটির প্রধান লক্ষণ, লক্ষ্যও বটে।

পাহারাদারকে খুন করা বিপজ্জনক বনমানুষটিকে না মারা পর্যন্ত শান্তি পাবেন না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কণ্ঠে জানিয়ে ছিলেন শিকারি। কিন্তু বনমানুষটিকে মারার পর কি তিনি আদৌ শান্তি পেলেন? 'খুনি' বনমানুষটিকে 'শাস্তি' দিতে চেয়েছিলেন শিকারি। বনমানুষটিকে হত্যার মুহূর্তেই কিন্তু তিনি উপলব্ধি করলেন বনমানুষটির মতোই তিনিও খুনি; শিকারির আত্মোপলব্ধির ব্যঞ্জনাতেই গল্পটি ফুরিয়ে যায়। তবে আমরা অনুমান করতে পারি অবোধ প্রাণী বনমানুষটির কৃত মানুষ-হত্যার অপরাধের জন্য সম্ভবত কোনও অপরাধবোধ থাকেনি কিন্তু শিকারিকে হয়তো সারাজীবন বনমানুষটিকে হত্যার অপরাধবোধ স্মৃতিতে তাড়া করে বেড়াবে, হয়তো প্রবল অস্বস্তিতে ফেলবে। শিকারির এই আত্মোপলব্ধিই তো তার চরম শাস্তি। আর এজন্যই প্রেমচন্দের গল্পটি শিকার কাহিনির গণ্ডি অতিক্রম করে নিঃসংশয়েই হয়ে ওঠে একটি সার্থক আধুনিক ছোটোগল্প।

বিপজ্জনক খুনি হয়ে ওঠা বনমানুষটিকে (বা যে কোনও বন্য প্রাণীকে) দণ্ডরূপে হত্যা করা ছাড়া আর কী বা করার থাকে শিকারির, সেকালে? একালেও? শেষে জ্যান্ত ধরতে চাইলেও বনমানুষটিকে গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত প্রচণ্ড যন্ত্রণাময় করুণ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে অন্তিম-গুলিটি করা ছাড়া শিকারির বিকল্পপথ থাকেনি। শিকারির মতো হয়তো নিরুপায় লেখকও। বড়োজোর শিকারিকে তার সদ্যকৃত অপরাধের জন্য আত্মোপলব্ধি করাতে পারেন প্রেমচন্দ্। আর এই আত্মোপলব্ধি থেকেই হয়তো শিকারি তথা মানুষ বন্যপ্রাণের প্রতি নির্বিচারে অন্যায় উৎপীড়ন করা থেকে একদিন বিরত হবে, তাদের প্রতি হয়ে উঠবে দরদী, সহানুভূতিশীল। এভাবেই *মৌচাকের* খুদে পাঠক অর্থাৎ সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতের নবীন প্রজন্মের কাছে বন্যপ্রাণের প্রতি সচেতনতা, সহমর্মিতার বার্তা পৌঁছে দেওয়াই সম্ভবত 'বনমানুষের গল্প' এর গল্পকার ও অনুবাদক দু-জনেরই অন্বিষ্ট।

তথ্যসূত্র

১. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *বনে জঙ্গলে* (কলকাতা: দে'জ, ২০১৬), ১২৯।

২. *রংমশাল*, ২য় বর্ষ, ১৪০।

৩. তদেব, ১৪১।

৪. তদেব, ১৪১-১৪২।

৫. *বনে জঙ্গলে*, ৩১।

৬. তদেব, ৮৫।

৭. তদেব, ১২।

৮. তদেব, ১৪৯।

৯. *মৌচাক*, ১৬শ বর্ষ, ৫৮১।

১০. *রংমশাল*, ৫ম বর্ষ, ৫০০।

১১. *রংমশাল*, ২য় বর্ষ, ৫৬।

১২. তদেব, ৫৬।

১৩. *রামধনু*, ১৩শ বর্ষ, ৭১।

১৪. *রামধনু*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩৪০।

১৫. *সন্দেশ সেরা উপন্যাস সংকলন*, ২৪২।

১৬. তদেব, ২৪৭।

১৭. তদেব, ২৬৫।

১৮. তদেব, ২৬৫।

১৯. *বনে জঙ্গলে*, ১৭০।

২০. তদেব, ১৭৫।

২১. তদেব, ৬৫।

২২. তদেব, ৩২।

২৩. *রংমশাল*, ২য় বর্ষ, ১৭০।

২৪. *বনে জঙ্গলে*, ২০।

২৫. তদেব, ৪৯।

২৬. তদেব, ৫৭।

২৭. তদেব, ৩৯।

২৮. *বিভূতিভূষণ রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ*, ৫ম খণ্ড (কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৩), ৯৭।

২৯. সুধীন্দ্রনাথ রাহা, *পৃথিবীর রোমাঞ্চকর শিকার কাহিনী* (কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৭৭), ১৮১।

৩০. তদেব, ১৮১।

৩১. তদেব, ১৮১।

৩২. তদেব, ১৮৫।

৩৩. তদেব, ১৮৫।

৩৪. তদেব, ১৮৮।

৩৫. জিম করবেট, *কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ* (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৮), ১৫৩।

৩৬. *রংমশাল*, ৫ম বর্ষ, ১৩৮।

৩৭. *হেমেন্দ্রকুমার রচনাবলী* (২৭), ৩৯।

৩৮. তদেব, ৪০।

৩৯. তদেব, ৪২।

৪০. *হেমেন্দ্রকুমার রচনাবলী* (২৮), ৪৯।

৪১. তদেব, ৪৯।

৪২. *হেমেন্দ্রকুমার রচনাবলী* (২৬), ১২০।

৪৩. তদেব, ১২০।

৪৪. তদেব, ১২৩।

৪৫. তদেব, ১২৪।

৪৬. *সন্দেশ সেরা উপন্যাস সংকলন*, ২৪৬।

৪৭. শিবশঙ্কর মিত্র, *সুন্দরবন সমগ্র* (কলকাতা : আনন্দ, ২০১৩), ২৪৪।

৪৮. ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী, *শিকার ও শিকারী* (কলকাতা : শ্রী শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩২); সূর্য্যকান্ত আচার্য, *শিকার-কাহিনী* (কলকাতা : সান্যাল অ্যাণ্ড কোং., ১৩১৩)।

৪৯. *রামধনু*, ২৮শ বর্ষ, ৮৫।

৫০. তদেব, ৮৫।

৫১. তদেব, ৮৫।

৫২. সুপ্রিয় সরকার (সম্পা.), *জয়ন্তী মৌচাক* (কলকাতা : এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লি., ১৩৮৯), ১৫৯।

৫৩. তদেব, ১৫৯।

৫৪. তদেব, ১৬০।

৫৫. তদেব, ১৬০।

৫৬. তদেব, ১৬০।

৫৭. তদেব, ১৬০।

৫৮. আফ্রিকায় বাঘ পাওয়া যায় না। ফলে গল্পটিতে এই ছোট্ট ত্রুটিটি বর্তমান।

সপ্তম অধ্যায়

শিকার-সাহিত্য : বিকল্প বয়ানের সন্ধানে

বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত শিকার-সাহিত্যগুলি একমাত্রিক নয়। শিকারি বা শিকার অভিযাত্রীর শিকার কেন্দ্রিক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাই শিকার-সাহিত্যের মূল ভরকেন্দ্র, কিন্তু তবুও বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলি কেবলমাত্র শিকারির বন্যপ্রাণী বধের নৃশংস আখ্যান নয়, নয় মানুষ ও বন্যপ্রাণের শুধুমাত্র সংঘাত-সংঘর্ষের লোমহর্ষক বৃত্তান্ত। সেগুলিতে ধরা আছে নানা বৈচিত্র্য, বহুমাত্রিক নানা ব্যঞ্জনা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা তথা ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাঙালির শিকার, সংরক্ষণ, অরণ্য, বন্যপ্রাণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতেও এসেছে নানা মোড়বদল। স্বাভাবিক ভাবে তার ছাপ পড়েছে এই শিকার-সাহিত্যগুলিতেও। ধীরে ধীরে বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলিতে উঠে এসেছে নানা বিকল্প বয়ান।

অরণ্য প্রকৃতি, অরণ্যানুভূতি : শিকার-সাহিত্য থেকে অরণ্যকেন্দ্রিক অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্য

প্রথম পর্বের শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার কাহিনিগুলিতে শিকারির শিকার ক্রিয়া বা বন্যপ্রাণীকে মোকাবিলা করার ঘটনাটিই মুখ্যভাবে বর্ণিত হত। শিকার প্রাণীটি যে অঞ্চলের বাসিন্দা (যেমন-রয়েল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবনে, গরিলা আফ্রিকার জঙ্গলে, গ্রীজলি ভালুক আমেরিকায়), সেই স্থানটি কাহিনির পটভূমিরূপে নামমাত্র উল্লিখিত হত, কিন্তু সেই সব অরণ্যের বিশদ বর্ণনা বা শিকারির অরণ্য অভিজ্ঞতার ডিটেলিং সেভাবে উঠে আসত না। প্রমদারঞ্জন রায়ের ‘বনের খবর’ (*সন্দেশ*, ১৩২০-২১) থেকেই এল মোড়বদল। ‘বনের খবর’ শুধু শিকারের গল্প নয়, বনের খবরাখবরই সেখানে মুখ্য অর্থাৎ শিকারের প্রসঙ্গ এলেও কথক তার সঙ্গে অরণ্যের প্রকৃতি, জীবজন্তু, মানুষজন সম্পর্কেও তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলি খুদে পাঠকদের কাছে বর্ণনা করেছেন চমৎকার ভাবে। বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-অ্যাডভেঞ্চারগুলিতে পরবর্তীকালে ‘বনের খবরে’র এই ধারাটির প্রাধান্য দেখা যায়।

বিশ শতকের আমাদের নির্বাচিত শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত শিকার-সাহিত্যগুলিতে শিকারের স্থান-কাল যেমন অনেক বেশি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত, তেমনি শিকারির শিকার ক্রিয়াটির সঙ্গে সঙ্গে তার অরণ্য-অভিজ্ঞতাগুলিরও বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রেও প্রথম দিকের শিকার কাহিনিগুলিতে অরণ্যের ভয়াল

ভয়ঙ্কর, প্রতি পদে পদে বিপৎসংকুল, মারাত্মক বিপজ্জনক রূপটিই প্রাধান্য পায়। সেযুগে অরণ্যগুলি যেমন ছিল বন্যপশুপাখিতে প্রভূত সমৃদ্ধ, তেমনি বহু অরণ্যে তখনও মানুষের পদক্ষেপ পড়েনি। বহিরাগত সভ্যজগতের মানুষের কাছে অরণ্যগুলি ছিল অজানা, অচেনা, ভীতিপ্রদ। শুধু প্রতিকূল বন্য বিপজ্জনক পরিবেশ ও হিংস্র জন্তুজানোয়ারেরেই নয়, অনেক অরণ্যে ডাকাত-লুঠেরা-ঠ্যাঙাড়ে-খুনে-দুষ্কৃতিদেরও যথেষ্ট ভয় ছিল; ভয় ছিল জ্বর ম্যালেরিয়া রোগ জীবাণুর প্রাদুর্ভাবেরও। এছাড়া শিকার কাহিনিগুলিতে হিংস্র বন্যপ্রাণীটির শিকারের রোমাঞ্চ-ভয়মিশ্রিত শিহরণকে আরও তীব্র করে তুলতে, শিকারির নির্ভীকতা-বীরত্ব-দুঃসাহসকে আরও মহিমান্বিত করতে—শিকার পটভূমি অর্থাৎ অরণ্যের শ্বাপদসংকুল, প্রতি মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনাময়, বিপজ্জনক রূপটিতেই বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যিকরা অধিক জোর দেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আফ্রিকার জঙ্গলে' (*শিশুসাথী*) ডার্বানবাসী তিন ভারতীয় বণিকপুত্র গরিলা শিকারের জন্য লোকালয় থেকে বহুদূরের আকাশছোঁয়া পাহাড়ের কোলের খুব নির্জন গভীর, দিনদুপুরেও তরল অন্ধকারাচ্ছন্ন, মানুষের অগম্য অস্বাস্থ্যকর জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। পথে তাদের দিনে-রাতে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। কখনও বন্য পশুপাখিদের আচরণ, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চোখের সামনে দেখেছে; কখনও জল ঝরানো পোকার দলের অদ্ভুত কাণ্ডে বা তেৎসী মাছির উপদ্রবে বলদের ঘুমরোগে বিস্মিত হয়েছে; কখনও অরণ্যবাসী বন্ধুভাবাপন্ন নিগ্রোদের সঙ্গে গড়ে তুলেছে সুসম্পর্ক, আবার দাসব্যবসায়ীর ভীষণ অত্যাচারে ক্ষেপে থাকা নিগ্রো গ্রামবাসীদের হাতে বন্দিও হয়েছে; কিন্তু অরণ্য প্রকৃতির বর্ণনা এসেছে তাদের চলার পথে যেটুকুর উল্লেখ প্রয়োজন সেটুকুই। তারা অরণ্যের বৃষ্টি-বাজপড়া প্রত্যক্ষ করেছে, কষ্টভোগ করেছে অরণ্যের মাঝে ধূ ধূ মরুভূমির :

> সে এক ভয়ানক দৃশ্য। সামনে ধূ ধূ করছে মাঠ-লাল বর্ণ! তার মাঝে কোথাও গাছপালা তো দূরের কথা, একটু ঘাসও নেই। তার ওপরকার আকাশখানাও শুকনো খট্‌খটে—রঙটাও যেন একটু কটা। সেই আকাশে কোনদিন মেঘও ভাসে না, কোন পাখিও ওড়ে না।[১]

প্রকৃতি এখানে রুক্ষ, ছায়াহীন, ভীতিদায়ক; খিদে-তেষ্টায় যেকোনও মুহূর্তে বুঝি সকলে প্রাণ হারায়। ফুটে উঠেছে শিকারিদের প্রবল কৃচ্ছসাধন বা কষ্টসহিষ্ণুতা। আবার প্রকৃতিই কোথাও ইঙ্গিত দিয়ে যায় ভাবী বিপদের। জাম্বেজী নদীর পর মেঘস্পর্শী মিশকালো পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যেতেই তারা হাজির হয় :

> কি গভীর বন! পাঁচ হাত দূরেও দৃষ্টি চলে না। গাছে লতায় পাতায় চাব্‌ড়া বেঁধে আছে। ওপরে আকাশ দেখা যায় না, তলায় সূর্যের আলো পড়ে না। সে যেন চির-রাতের দেশ। তার মধ্যে শিকারীদেরও গা ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল।[২]

পশুপাখির ডাকশূন্য, শুধু ঝিঁঝিঁর একটানা শব্দে মুখর এরকম গা ছমছমে ভয়ানক বনেই তো তারা সামনাসামনি হয় আফ্রিকার ভয়ঙ্কর প্রাণী গরিলার।

শুধু 'আফ্রিকার জঙ্গলে'তেই নয় অরণ্যের এই ভয়াল, ভয়ঙ্কর, অচেনা, অনাঘ্রাত, আদিম, বিপজ্জনক রূপ বারেবারে উঠে এসেছে দেশি-বিদেশি অরণ্যের পটভূমিতে রচিত শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার কাহিনিগুলিতে। গল্পের পর গল্পে উঠে এসেছে—চারিদিকে শ্বাপদসংকুল অরণ্যের কালো, বিদঘুটে, রহস্যময় আঁধারের বর্ণনা; শিকারি বা জঙ্গল অভিযাত্রীদের ভয়ঙ্কর অরণ্যে রাত্রিযাপনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। রাত্রিতে বন্য জীবজন্তু যখন সক্রিয়, আঁধারে চোখ না চলায় মানুষ অনেকটাই অসহায়। অথচ শিকারের উপযুক্ত সময় রাতই। ফলে একাকি শিকারির বা শিকারিদের শিকারের জন্য রাত জেগে নিস্তব্ধ প্রতীক্ষা কিংবা স্বেচ্ছায় জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চারে আসা ব্যক্তিদের বা দৈবদুর্বিপাকে জঙ্গলে এসে পড়া ব্যক্তির উৎকণ্ঠিত অরণ্য রাত্রিযাপনের চিত্র শিকার কাহিনিগুলিতে বারে বারে চিত্রিত হয়েছে। রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে বা আবছা আলো আঁধারি, বাতাসের শব্দ বা নীথর গুমোট পরিবেশ, ঝরাপাতার আওয়াজ, বন্যজন্তুদের আনাগোনা, মাঝে মাঝে বন্যপশু ও রাতজাগা পাখিদের ডাক, সরীসৃপের গাছ দুলিয়ে ওঠানামা, হিংস্রজন্তুর শিকার ধরা বা আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের শব্দ, শিকারির গায়ের গন্ধ বা উপস্থিতি টের পেয়ে এগিয়ে আসা হিংস্র জন্তুর জ্বলন্ত চোখ-উষ্ণ নিঃশ্বাস-গায়ের বিদঘুটে গন্ধ—সব মিলেমিশে অরণ্যের রাত্রিকে করে তোলে দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়, বিপজ্জনক, ভয়ঙ্কর; সামান্যতম ভুল পদক্ষেপও বদলে দিতে পারে শিকার ও শিকারির পারস্পরিক ভূমিকা। শিকারি বা অরণ্য অভিযাত্রীদের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ—ভয়ঙ্কর ঝড়, বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টি (খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আফ্রিকার জঙ্গলে' বা 'হাজারীবাগের জঙ্গলে', *শিশুসাথী*), ভয়াবহ দাবানলের (খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'জঙ্গলের জালে', *শিশুসাথী*) সম্মুখীন হওয়ার কথা যেমন এই শিকার-সাহিত্যগুলিতে প্রায়ই উঠে এসেছে, তেমনি জন্তু জানোয়ার থেকে আত্মরক্ষার্থে লাগানো আগুন বা অসতর্কতায় পড়ে যাওয়া চুরুটের সামান্য আগুন থেকেই শুকনো পাতায় আগুন ছড়িয়ে গিয়ে অরণ্যের ভয়াবহ প্রাণঘাতী রূপের বর্ণনাও বিরল নয় (খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'ছোটনাগপুরের জঙ্গলে একরাত্রি', *রামধনু* ১৩৪৪)।

কিন্তু অরণ্য কি শুধুমাত্রই ভয়াবহ, ভয়ঙ্কর? এর সজীব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও তো বারেবারে মুগ্ধ করেছে শিকারি, জঙ্গল অভিযাত্রী বা পর্যটকদের। বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত শিকার কাহিনিগুলিতেও বিশেষত তিন-চারের দশক থেকে অরণ্যের নৈসর্গিক অনুপম সৌন্দর্য, যাত্রাপথের বিচিত্র ল্যান্ডস্কেপ—বিভিন্ন গাছপালা, ফুলফলের বিশদ বিবরণ প্রাধান্য পেতে দেখা যায়। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আফ্রিকার জঙ্গলে'তে রতন-শোভনলাল-বীরেন্দ্র শিকার ফস্কে গেলে বা ব্যর্থ শিকারের জন্য তীব্র লজ্জা, অপমান বোধ করেছিল, সেখানে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'নকল-শিকারির সংকট' গল্পের বাঙালি কথক অনায়াসে বলতে পারে :

> শিকারের ব্যর্থতা বা খালি হাতে ফেরা তার উৎসাহকে কোনোদিন স্যাঁতসেঁতে করতে পারেনি। কারণ শিকার না পেলেও অফুরন্ত মাত্রায় প্রকৃতির সান্নিধ্যলাভ তার মজুরি পুষিয়ে দেয় যথেষ্ট। পাখিশিকার বা মাছধরা তার কাছে অনেকটাই অজুহাত মাত্র—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভুরি পরিমাণে উপভোগ করার অজুহাত। শহুরে ইষ্টক কারাগার থেকে সাময়িক মুক্তির উপায়। বাঘভালুকের মতো শিকারের পাখিরাও বনবাসী জীব; শহরের ড্রয়িং রুমে বসে তাদের মুলাকাত চলে না, তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে যেতে হয় নির্জন বনভূমি-প্রকৃতির নিজস্ব ভাণ্ডারে। শিকার অর্থাৎ পশুপাখিরা বিমুখ হলেও প্রকৃতি কারুর প্রতি বিমুখ নয়—মহাজন-অভাজন সবাইকেই সে অকৃপণভাবে তার অজস্র সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য বিলিয়ে দেয়। শিকারের রক্ততৃষার বদলে প্রাণে জাগায় রূপের নেশা, মনে কবিত্বের স্ফুরণ। তালেবর শিকারিদের ব্যাঘ্রহত্যার রোমাঞ্চকর কাহিনি পাঠ করার পর তার রচিত পল্লিগাথা (Idyll)-টুকু মিঠে চাটনির মতো লাগতে পারে।[৩]

এই কালপর্বের শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার কাহিনিতে শিকার ক্রিয়া, শিকারের জীবজন্তুর বর্ণনা থাকলেও, ক্রমশ অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে অরণ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিবরণ ও শিকারির অরণ্য-অনুভব, অরণ্যপ্রেমের কথা। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হাজারীবাগের জঙ্গলে'র (*শিশুসাথী*) মি. ফরেস্টারকে দেখি তাঁর ২৫-২৬ বছর বয়সে দরকারি দু-চারটে জিনিস নিয়ে একা একা পাহাড়ে-পর্বতে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছুক হন। কিংবা 'আসামের জঙ্গলে'তে (*শিশুসাথী*) ১৬ ও ১৮ বছরের মহাদেব ও অমর বড়োদিনের ছুটিতে দেশভ্রমণে বেরিয়ে দৈবক্রমে আসাম-ব্রহ্মদেশ সীমান্তের অরণ্যে এসে পড়ে ও কুৎসিত ভীষণ দর্শন এক মানুষ-পিশাচ (হেডহান্টার)কে দেখতে পাবার পরও বলে 'এসে যখন পড়েছি, তখন জায়গাটি ভাল করে দেখে নিয়ে তবে বাড়ি ফিরব—'।[৪] অরণ্যকে

পূর্বের মতো শুধুমাত্র নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার বদলে এই বাঙালি বা ভারতীয় তরুণরা স্বেচ্ছায় অরণ্যের নিবিড় সান্নিধ্য লাভে কেন এত ইচ্ছুক? অরণ্যের পদে পদে নানা ভয়ঙ্কর বিপদাপদ আছে জেনেও শিকারের চেয়েও তাদের অরণ্য সৌন্দর্য উপভোগে কেন এই দুর্বার আকর্ষণ? বিশ শতকের তিন-চারের দশকের থেকে বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিশদ বর্ণনা ও প্রকৃতিকে নিয়ে বাঙালি তরুণ শিকারি বা অরণ্য অভিযাত্রীর আবেগ-উচ্ছ্বাস কেন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে? এগুলি বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই ফিরে তাকাতে হবে সেই সময়ের দিকে, তখনকার আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পালাবদলের দিকেও।

আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসন যত বৃদ্ধি পেয়েছে গোটা বিশ্বব্যাপীই মানুষ তত বেশি করে আশ্রয় খুঁজেছে অরণ্যের আদিমতা, অকৃত্রিম নির্মলতা, সহজাত-স্বাভাবিকতার মধ্যে। আধুনিক নাগরিক জীবনের ইট কাঠ পাথরে নিমজ্জিত ক্লান্ত ধ্বস্ত অবসাদগ্রস্ত মানুষ অরণ্যের সজীব প্রকৃতির কাছে পেতে চাইছে শুশ্রূষার প্রলেপ। রুটিন বাঁধা কৃত্রিম একঘেয়ে জীবন থেকে সাময়িক মুক্তি (শুধু শারীরিক নয়, চেতনার মুক্তিও) পেতে চাইছে কলরবমুখর লোকালয় থেকে দূরে নিভৃত অরণ্যের নির্জনতায়। পশ্চিমি এই রোমান্টিক ভাবনায় জারিত হচ্ছে উপনিবেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিশ্ববাসীর মতো বাঙালিও প্রত্যক্ষ করেছে মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা-দ্বেষ-নৃশংসতার ভয়াবহতা, যার পাশে ভয়াল অরণ্যের হিংস্র জন্তুজানোয়ার নেহাৎই ম্লান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও প্রায় আসন্ন বা শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকেই বাঙালি মধ্যশ্রেণিকে যেতে হচ্ছিল এক চরম সংকটের মধ্য দিয়ে—দেশের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অনিশ্চিত; বিশ্বব্যাপী আধুনিকতার আক্রমণে বাঙালি বিধ্বস্ত; সমাজে-পরিবারে, চারিদিকে চলছে ভাঙন; চাকরি দুর্লভ; গ্রাম জীবন ছেড়ে আসতে হচ্ছে অথচ নাগরিক জীবনের জটিলতা দুর্বিষহ; অনিশ্চিত ভবিষ্যত। সেই সঙ্গে আর শুধু ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে 'পৌরুষময় মরণ ও মারণ সংগ্রামই' নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঙালির দৈনন্দিন কঠোর জীবন সংগ্রামও।[৫] এই রাহুগ্রস্ত, বিধ্বস্ত সময়ে বাঙালির নতুন একটি আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে—অরণ্য। উপনিবেশের শিক্ষিত বাঙালির এই অরণ্য-উচ্ছ্বাস, অরণ্যপ্রেমের অনেকটাই গড়ে উঠেছে ইউরোপীয় রোমান্টিসিজম ও নান্দনিক সৌন্দর্যবোধের দ্বারা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যাত্মচেতনা সমন্বিত ভারতীয় প্রকৃতিচেতনাও।[৬] কখনও মিস্টিক অতীন্দ্রিয়বোধও। বিদেশি অরণ্য-আশ্রিত সাহিত্য, ভারতে আগত ইউরোপীয় পর্যটক-অভিযাত্রী-চিত্রশিল্পী-বিজ্ঞানীদের ভারতের প্রকৃতির

চিত্রময় বর্ণনা, বিবিধ গাছপালা-ফুলফল-পশুপাখি-কীটপতঙ্গের বিবরণ, আঁকা ছবি (বিশেষত ল্যান্ডস্কেপ)গুলিও বাঙালিকে প্রভাবিত করছে। ব্রিটিশ আমলে অরণ্য আইন, ব্যাপক বিনাশ, প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের রদবদল, এবার শুধু অরণ্যচারী গোষ্ঠীগুলিকেই নয় শিক্ষিত নাগরিক সমাজকেও নানা মাত্রায় স্পর্শ করছে। এর মধ্যেই বাঙালিকে অরণ্য-প্রেমে মজাতে আবির্ভূত হচ্ছে অভূতপূর্ব উপন্যাস—বিভূতিভূষণের *আরণ্যক* (১৯৩৯ খ্রি.)। বাঙালির এই অরণ্যমগ্নতা, অরণ্যবিলাসের ঢেউ এসে লাগছে তৎকালীন বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলিতেও। পূর্বে শিকারি-নায়কের বা জঙ্গল-অ্যাডভেঞ্চারকারীদের সমস্ত মনোনিবেশই যেখানে ছিল মূলত বিপৎসংকুল অরণ্য ও শিকারের পশুপাখির প্রতি, সেখানে এখন তারাও হয়ে উঠছে অরণ্য-প্রকৃতির মুগ্ধ 'দর্শক ও উপভোক্তা'।

অরণ্য-প্রকৃতির প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির এই নবোদ্ভূত রোমান্টিক স্বরটিই ধ্বনিত হয়েছে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের পূর্বোক্ত 'নকল-শিকারির সংকট' গল্পের বাঙালি শিকারি-কথকের কণ্ঠে, 'মৃগয়ায় বেরিয়ে আমার কাছে শিকারের পশুপক্ষীই সবচেয়ে দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে না, আমার মানসপটে প্রাধান্য বিস্তার করে রূপে রসে জীবন্ত, বর্ণবিচিত্র পল্লিচিত্র'।[৭] মিহির রায়ের 'শিকার' গল্পের (*রামধনু*, ১৩৪৭) ভদ্রলোক-বাঙালি কথক ঘাটশিলার গিধনীতে 'গেরুয়া রঙের শক্ত মাটি, শালের পর শাল গাছ, গভীর কালো সাঁওতালের মুখ—এছাড়া দেখবার আর ওখানে কিছু নেই' বলেও শেষতক স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন 'উপভোগ করবার অনেক কিছুই আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক দৃশ্য। সুন্দর সে দৃশ্য'।[৮] ঘুমের ভাব সম্পূর্ণ না কাটা শালবন, পাতায় পড়া শিশির বিন্দু—প্রভাতের এই মনোরম প্রকৃতি বন্দুকধারী শিকারিকে মনে করিয়ে দিয়েছে স্রষ্টার কথা, জাগিয়েছে নৈতিক মূল্যবোধ—'এই অনুপম প্রভাতে ভগবানের সৃষ্টি যে কোন প্রাণীকেই হত্যা করতে সহসা বিবেক যেন আমাকে বাধা দিল।'[৯]

পল্লীপ্রকৃতি বা গ্রামবাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঝোপ জঙ্গল বনের সুরম্য প্রকৃতি থেকে অবশ্য গভীর গহন অরণ্যের প্রকৃতি ও পটভূমির বিস্তর ফারাক। অরণ্য প্রকৃতি কোথাও জানা-অজানা গাছপালা ফুলফল শোভিত বর্ণগন্ধময় কমনীয় সৌন্দর্যে ভরপুর, কোথাও সম্পূর্ণ অচেনা, আদিম বর্বর বা রুক্ষ হতশ্রী, ভীতিপ্রদ। অরণ্য প্রকৃতির কোনও সুসংহত, সুনির্দিষ্ট, সুসামঞ্জস্য রূপ নেই; তা অগোছালো, খামখেয়ালি, খাপছাড়া। কোনও নির্দিষ্ট নিয়মনীতির নিয়ন্ত্রণে বা যৌক্তিক শৃঙ্খলার শাসনে তাকে বাঁধা অসম্ভব। এই অরণ্য প্রকৃতি একই সঙ্গে দ্রষ্টার মনে জাগায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও সুখানুভূতি। আবার

অরণ্য মানে তো শুধু নিসর্গ নয়, বন্য প্রাণের উপস্থিতি ছাড়া অরণ্যের আবেদন অসম্পূর্ণ। গ্রামসংলগ্ন ঝোপজঙ্গলে নানারকম পাখি, ছোটোখাটো বুনো জীবজন্তু, চিতাবাঘ, কখনো-সখনো এক-দুটো মানুষখেকো বাঘের আনাগোনা ঘটলেও ঘটতে পারে। কিন্তু সুগভীর অরণ্য তো বন্য প্রাণেরই স্বাভাবিক বাসভূমি। সেখানে মানুষের আগমনই বরং অস্বাভাবিক, অপ্রত্যাশিত। অরণ্যের প্রতিকূল প্রকৃতি বা নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে কোনও মতে রক্ষা পাওয়া গেলেও হিংস্র বন্যপ্রাণীর কবল থেকে নিস্তার পাওয়া বেশ কঠিন। তাই হিংস্র বন্যপ্রাণী অধ্যুষিত অরণ্যে প্রতি পলে থাকে বন্যপ্রাণীর আক্রমণের ভয়। আর এই মরণঘন বিপদের চরম সম্ভাবনা থাকে বলেই অরণ্য-অনুভবটি বয়ে আনে এত রোমাঞ্চকর আনন্দের স্বাদ। ফলে একই সঙ্গে অনুভূত হয় রুদ্ধশ্বাস শিহরণ জাগানো উত্তেজনা, শঙ্কা এবং অরণ্যসৌন্দর্যকে আবিষ্কারের অপার বিস্ময়, তাকে উপভোগের তীব্র আনন্দ। ফলে অরণ্য-অনুভবটি হয়ে ওঠে অবর্ণনীয়, তুলনাহীন; যার দুর্বার টানে শিকারি অভিযাত্রীরা বারবার ছুটে যেতে চায় চিরকুহকে ঢাকা রহস্যময় অরণ্যে; মোহগ্রস্ত হয় অরণ্যপ্রেমে। অরণ্যের প্রতি একই সঙ্গে ভয় ও আনন্দের— পরস্পরবিরোধী অনুভূতির সহাবস্থানটি চমৎকার ভাবে ধরা পড়েছে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘বনরহস্য’তে (*শিশুসাথী*) বাঙালি সিদ্ধেশ্বর বাবু হিমালয়ের তরাই জঙ্গলের যেখানে স্বেচ্ছায় শখের বনবাসী হন, তার বর্ণনায় :

> ...এমন গহন অরণ্যভূমি যে, দিনের বেলাতেও যেখানে মিনিট খানেক দাঁড়ালেই গা ছম্‌ছম্ করে, বুকটা কেমন চেপে ধরে আর সেই সঙ্গে নিজের নিজের হৃদস্পন্দনই নিজের কানে এমন বাজে যে চমকে উঠতে হয়! সেখানে চোখ, কান, নাক ও স্পর্শ এই চারটি ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সজাগ হয়ে ওঠে। কারণ সেখানে তো কোন মানুষ নেই, আছে কেবল বন্য হিংস্র ক্ষুধার্ত প্রাণী, মানুষের সঙ্গে যাদের চির শত্রুতা।[১০]

কিন্তু জনমানবহীন, হিংস্র বন্য প্রাণীতে ভরা অরণ্যের ভয়াল ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক রূপটিই তো একমাত্র নয়; ফলে :

> তবে জায়গাটি যে কেবল মনে ভয় ও কৌতূহল জাগিয়ে তোলে সে কথা বললে ভুলই হবে। এমন স্নিগ্ধ সবুজ, ফুলের এমন রঙ ও গন্ধ, এমন স্তব্ধতার স্থির সাগরের ওপর দিয়ে পাতা ও শাখার মর্মরতার মৃদুধ্বনি মাঝে-মাঝে সজল মেঘের বিস্তার ও শ্যামছায়া, তার বুকে বিজলী চমক ও গুরুগর্জন, বৃষ্টিধারা পতনের এমন অবিরল ছন্দ, দূরে হিমগিরির গুরুগম্ভীর মূর্তি সৌন্দর্যের আনন্দে মনকে এত ভরে তোলে যে, ভাষা হারিয়ে যায়।[১১]

শুধু অরণ্যের নিসর্গই নয়, অরণ্যের প্রাণীজগতের স্বাভাবিক নিয়মের মাঝেও সিদ্ধেশ্বরবাবু কখনও খুঁজে পান আনন্দ, বিস্ময় কখনো বা বেদনার অনুভূতি, অদ্ভুত নির্লিপ্তি। কেউটে সাপ ও ময়ূরের যুদ্ধে গর্বিত আনন্দিত জয়ী ময়ূরটির বন্যচোখে হীরের ছিলিক ও সাপটিকে টুকরো টুকরো করে খাবার দৃশ্য সিদ্ধেশ্বর বাবুকে পারিপার্শ্বিক ভুলিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলে। ফণা তোলা কেউটে ও রণনাচরত ময়ূরের যুদ্ধদৃশ্য ক্যামেরায় তোলার পরও এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে তাঁর মনে হয় ছবি আঁকতে পারলে হয়তো এর কতকটা ধরতে পারতেন। এই অবর্ণনীয় দৃশ্যের রঙের বাহারকে চিত্রার্পিত করার, নান্দনিক সৌন্দর্যকে চোখের সামনে ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষাটি সিদ্ধেশ্বরবাবুর মধ্যে জেগে উঠেছে। বন্যপ্রাণীর পারস্পরিক দ্বন্দ্বযুদ্ধের হুঙ্কার ও শব্দে আকৃষ্ট হয়ে নিজ বিপদকেও উপেক্ষা করে প্রবল কৌতূহলে তিনি তা দেখতে যান ঠিকই কিন্তু ভোরের আলোয় দুই সমযোদ্ধা বাঘ ও শুয়োরের ক্ষতবিক্ষত-রক্তাক্ত-রণক্লান্ত ভয়ঙ্কর দশা দেখে তার আর শেষপর্যন্ত দেখার ইচ্ছে থাকে না। আবার সিদ্ধেশ্বর বাবুর মন কখনো বা একই সঙ্গে আচ্ছন্ন হয়েছে ভয় ও আনন্দে—রাত্রে দোলনে ঘুম ভেঙে তিনি যখন বুঝতে পারেন বাঘ ঘরের মাথায় চলাফেরা করছে, বাঘের উপস্থিতি ও তাঁকে ধরার জন্য বাঘের জালে আঁচড় মারা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মনে ভয় জাগায়। কিন্তু তিনি জানেন আঁচড়ে জাল ছিঁড়লেও লোহার গরাদ ভেঙে বাঘের ঘরে ঢোকা অসম্ভব। বনের বাঘের এত কাছে জীবনে কখনও আসবেন ধারণাও থাকেনি; ফলে গরাদের নিরাপত্তার ভেতর থেকে বাঘটির কার্যকলাপ দেখতে পাওয়া তার মনে বিস্ময় ও আনন্দেরও সঞ্চার করে। অরণ্যের বৃষ্টিতে পাহাড়ি ধারা ও বাঁশের ছিদ্রে বাতাসের শব্দ সিদ্ধেশ্বর বাবুর লেখনীতে হয়ে ওঠে 'বনের কিশোরীরা নূপুর পায়ে নাচতে নাচতে চলেছে আর বনের কিশোররা সেই সঙ্গে বাঁশের বাঁশি বাজাচ্ছে।'[১২] দিনের আলোয় যে অরণ্য প্রকৃতি সিদ্ধেশ্বর বাবুর মধ্যে কবিত্বের স্ফুরণ ঘটায় সেই একই অরণ্যপ্রকৃতি সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে জাগিয়ে তোলে নানা অশুভের চিন্তা, জীবন মরণের চিন্তা, বন্যপ্রাণীর ভয়। নিকটেই বুনো হাতিদের উপস্থিতি বুঝতে পেরে ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ তিথির রাতের দুর্গম স্থানে বুনো হাতিদের নাচের জনশ্রুতিটি সিদ্ধেশ্বরবাবুর উত্তেজনাকে বহুগুণ করে তোলে। হঠাৎ অন্ধকারে বুনো হাতির বৃংহতিতে বুক কেঁপে ওঠায় গুহার মধ্যে সরতে গিয়ে গুলিভরা বন্দুকে পা আটকে সশব্দে গুলি বেরিয়ে যায়; ভয়-শব্দ-পতনের আঘাত, ঘটনার আকস্মিকতা সিদ্ধেশ্বরবাবুকে জড়বৎ করে তোলে। কিন্তু অরণ্যের এমনই জাদু—যে প্রাণের ভয় তাকে দুর্ঘটনায় ফেলে, সেই প্রাণের ভয়ই আবার তাকে সাহস ও শক্তি

দিয়ে তুলেও বসায়। কোনও একটি বিশেষ মুহূর্তে আটকা না পড়ে, এগিয়ে যাবার মন্ত্রই, ধ্বনিত হয় নিত্য পরিবর্তনশীল অরণ্যজগতের মধ্যে। অরণ্যে নির্জনবাস ও অরণ্যের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যকে পুরোমাত্রায় উপভোগের জন্য শিকারি বা অভিযাত্রীর যে বৈশিষ্ট্যগুলির একান্তই প্রয়োজন—নির্ভীকতা, প্রগাঢ় অরণ্য প্রেম, নির্জনবাসের মানসিক জোর, কঠোর কৃচ্ছসাধন ক্ষমতা বা নিত্যনতুন বিলাসের লোভ সংবরণ—সেগুলি সিদ্ধেশ্বর বাবুর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। তবুও অরণ্যের নির্জন একাকিত্বের মধ্যে মনুষ্য-সঙ্গ লাভের জন্য তাঁকে মাঝে মাঝে উন্মুখ হতে দেখা যায়। লোকালয়ে বাসকালে মানুষের সঙ্গ বিশেষ প্রিয় না হলেও এবার তিনি উপলব্ধি করেন 'মানুষের চেয়ে আপন আর কেউ নেই, কিছু নয়'।[১৩] তাঁর লোকালয় ও গহন অরণ্যের যোগসূত্র যে সৃষ্টিধর সে মেয়ের অসুখের জন্য ছুটি নিয়ে চলে গেলে তিনি হঠাৎই নিজেকে 'সত্যই একা', 'বড় নিঃসঙ্গ'বোধ করতে থাকেন। বনকেও এবার তার মনে হতে থাকে 'ভীষণ, গভীর, অতি নির্জন, দারুণ বিপদসঙ্কুল'।[১৪] তবুও এই একটি ভাবনাতেই তিনি নিজেকে আটকে ফেলেননি; তাই একবারও তাঁর মনে হয়নি অরণ্য ছেড়ে লোকালয়ে ফিরে যান। বরং পরদিন ভোরে তিনি এগিয়ে চলেন উত্তর হিমালয়ের অরণ্য পথে।

অরণ্যের অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা অনেক সময়ই মানুষকে চিনিয়ে দেয় নাগরিক জীবনের নানা মেকি কৃত্রিমতাকে। জীব হিংসায় হিংসা বাড়ে বলে সিদ্ধেশ্বরবাবু শিকার করতে চান না; মাছ-মাংসও সম্ভবত খান না। কিন্তু জীব হিংসা না করলেও যে হিংস্রভাব হতেই পারে তা বনের হাতি-গন্ডারের মাধ্যমে তাঁর জানা; সঙ্গে তাঁর এও মনে হয় লোকালয়েও এই রূপটি দেখা যায় অর্থগৃধ্নু কতকগুলি নিরামিষাশী সম্প্রদায়ের মধ্যে। অরণ্যজগতে ঘটে চলা আকস্মিকতার কাছে মানুষের নিয়মনীতি নেহাৎই তুচ্ছ। সিদ্ধেশ্বরবাবুরও শিকার না করার নীতি শেষপর্যন্ত খাটেনি, আত্মরক্ষার্থেই তাকে বাঘ শিকার করতে হয়। অরণ্য যে কীভাবে মানুষের মনকে প্রভাবিত করে তার প্রমাণ মেলে সিদ্ধেশ্বর বাবুর ভুটিয়ার সঙ্গে আচরণে। আশ্রয় দেওয়া সত্ত্বেও চোর, বিশ্বাসঘাতক, পলাতক, সন্দেহভাজন খুনি ভুটিয়াকে বনে পুনরায় দেখে বন্দুক দুটো উদ্ধারের অন্যতম উপায় রূপে সিদ্ধেশ্বরবাবুর মনে চকিতে উদয় হয়—ভুটিয়াকে আড়াল থেকে গুলি করে মারার চিন্তা। সিদ্ধেশ্বর বাবুর মতো মানুষ যাঁর কাউকেই আঘাত দেবার মতো মানসিকতা নয়, তাঁরও ক্ষণেকের জন্য হলেও এরূপ চিন্তা মনে আসে; আসে লোকচক্ষুর অন্তরালে অরণ্যের নিভৃত পটভূমির কারণেই—

বনে খুন করলে কেউ জানতেও পারবে না; ফেরার লোক হওয়ায় আরোই।

আত্মহত্যা করতে পারে, বনের শিকারির গুলিতে বা শত্রুর হাতেও মরতে পারে;
তাঁকে সন্দেহ করছে কে![১৫]

পরবর্তীকালে ভুটিয়াকে কুকরি দিয়ে 'বাহাদুরের ও ভাইয়ের খুনি' আক্রমণোদ্যত নেপালিকে হত্যা করতে সিদ্ধেশ্বরবাবু স্বচক্ষে দেখেন। সমাজের চোখে ভুটিয়াও নেপালির মতোই খুনি, শাস্তিযোগ্য অপরাধী। পরস্পরকে হত্যা করতে চাওয়া দুই যোদ্ধার দ্বৈরথসমরে একজনের নিহত ও অপরজনের আহত হওয়ার ঘটনা অরণ্যের বন্যপ্রাণীজগতে সাধারণ ঘটনা। কিন্তু মানব সমাজে দুজনই আইনের চোখে দোষী। তবু কোন্ অবস্থায় ভুটিয়া এরূপ অপরাধ করেছে জেনে সিদ্ধেশ্বরবাবু মনে করেছেন ভুটিয়াকে শাস্তি দেওয়া ঠিক হবে না। নেপালির মরদেহটা তিনিই একাকি ব্যবস্থা করেন; আহত রক্তাক্ত বেশ ভুটিয়া বাঁচবার আশায় নানা বাধা বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও তিব্বতপথে চীন চলে যেতে চাইলে, তিনি তাকে নিজের কোট-কম্বল-টাকাও দিয়েছেন। বনরহস্যের সন্ধানে এসে সিদ্ধেশ্বর বাবু ভাগ্যচক্রে একটি খুনের রহস্যের সামনাসামনি হন। তার মীমাংসা হলেও, ভুটিয়াকে বাঁচাবার কেন এত ইচ্ছে হয় তাঁর, কেনই বা ভুটিয়া চলে গেলে তিনি মনে বেদনাবোধ করেন—তার রহস্য অবশ্য স্বেচ্ছায় অরণ্যবাসী, সৎ বিবেকী মানুষটির নিজের কাছেও অজ্ঞাত থেকে যায়। শিকার কাহিনিগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় শিকারি বা অরণ্য অভিযাত্রীরা অরণ্যে লুকনো দুর্ধর্ষ ডাকাত, দস্যু, চোর, খুনে দুষ্কৃতির সাক্ষাৎ পান; কিন্তু বিপৎসংকুল অরণ্যের আশ্চর্য প্রকৃতিই যেন তাদেরকে ঐ অপরাধী মানুষগুলিকে সমাজ নির্দিষ্ট দণ্ডনীতির বাইরে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে (জিম করবেটের দস্যু-সুলতানার সাক্ষাৎ), সুস্থ জীবনে ফেরার সুপরামর্শ দানে (কেনেথ অ্যান্ডারসনের দস্যু সেলভারাজের সাক্ষাৎ) বা ক্ষমা করতে উদ্বুদ্ধ করে [সমর সরকারের 'বাঘ-ধরা' গল্পে (*রংমশাল*) শিকারি চান্নাপ্পারা তাঁবুর জিনিসপত্রের স্থানীয় চোরদের খুব সহজেই ক্ষমা করে দেন খাদ্যের জোগান ও শিকার-জন্তুর সন্ধান দেবার শর্তে]।

'বনজঙ্গলে'র সিদ্ধেশ্বর বাবুর অরণ্য অভিজ্ঞতা লাভের আকাঙ্ক্ষার পেছনে অবশ্য রয়েছে তাঁর জ্ঞানস্পৃহা। তাঁর অরণ্যযাপন নিছকই অলস অরণ্য-বিলাস ছিল না। তিনি বনে গিয়েছিলেন 'দেখতে ও জানতে। জানায় কত আনন্দ...আবার জ্ঞানের আনন্দ লাভে ও দানে।'[১৬] কয়েকদিন অরণ্যবাসের ফলে তাঁর মনে হয় সঙ্গে আনা বিদেশি গাছপালা-জীবজন্তুর বইগুলি অসম্পূর্ণ :

তারা যতটা পেরেছে ভারতবর্ষের কথা বাদ দিয়ে আফ্রিকা ব্রেজিল ও চীনদেশের
গাছপালা ও জন্তুজানোয়ারের কথাই তাতে লিখেছে। ভারতবর্ষ যে বিচিত্র দেশ

এখানকার সকল কিছুরই একটা বৈশিষ্ট্য আছে তা তাদের চোখে পড়ে না।[১৭]

বিদেশি এই বইলেখকদের প্রতি ভারতীয়রূপে তাঁর ক্ষোভটি সুস্পষ্ট। ভারতের জীবজন্তু-পোকামাকড়-গাছপালা নিয়ে বই লেখার ইচ্ছেতে তিনি খাতায় তাঁর অরণ্য অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করতে থাকেন।

সিদ্ধেশ্বরবাবুর অরণ্যভাবনায় পশ্চিমি রোমান্টিকতার সঙ্গে সঙ্গে পরতে পরতে জড়িয়ে আছে ভারতীয় ঈশ্বরভাবনা মিশ্রিত প্রকৃতিচেতনা। জোঁকাক্রান্ত হবার পর পথ হারিয়ে ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত সিদ্ধেশ্বরবাবু ফেরার পথ খুঁজতে গাছে উঠে চার ধারে তাকিয়ে দেখেন :

> যেন সবুজের পাথার তরঙ্গের পর তরঙ্গ জমে আছে আর তার একটি উপকূলে উঠেছে হিমালয়। তার অন্যান্য শৃঙ্গগুলি ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, যেন নীল চাঁদোয়া-ঘেরা পূজামন্ডপের এক প্রান্তে পাথরের থালায় বিশ্বনাথের উদ্দেশে একটি শ্বেত, সুন্দর নৈবেদ্য।[১৮]

বিশ্বের প্রকৃতি যেখানে 'বিশ্বের নাথের' উদ্দেশ্যে এরকম সুসজ্জিত, আত্মনিবেদিত, সেই স্বর্গীয় পরিবেশে—সিদ্ধেশ্বর বাবুর কাছে বনের 'স্তব্ধতা'ও হাজির হয় ভিন্ন মাত্রা নিয়ে। কিছুক্ষণ গাছের গোড়ায় বসে বনের স্তব্ধতাকে তিনি উপভোগ করতে থাকেন। 'বিশ্বনাথের আলয়, দেবভূমি হিমালয়' সম্পর্কে প্রচলিত শ্রদ্ধামিশ্রিত ভারতীয় ধারণাটিও কোথাও যেন সূক্ষ্মভাবে সিদ্ধেশ্বরবাবুর অরণ্যলগ্ন হিমালয়ের সৌন্দর্য অনুভবে স্পর্শ করে আছে। পাশ্চাত্য রোমান্টিক প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে ভারতীয় নিজস্ব প্রকৃতিভাবনার সমন্বয় সাধন শুধু সিদ্ধেশ্বর বাবু বা তাঁর স্রষ্টা খগেন্দ্রনাথ মিত্রেই নয়, এই কালপর্বের শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্য বিশেষত জঙ্গল-অ্যাডভেঞ্চার বা অরণ্যাশ্রয়ী কাহিনির রচয়িতাদের অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। অরণ্য নিসর্গের বর্ণনার মাঝে ভারতীয় দেবভাবনা, মহাকাব্য-পুরাণ অনুষঙ্গ, মঙ্গল-অমঙ্গলের বোধ উঠে আসতে থাকে। বাঙালির অরণ্য উপভোগ্যতায় জুড়ে যায় আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক রহস্যময়তাও। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'বনবাসী অভিশাপ' গল্পে এক বাঙালি শখের শিকারির জবানীতে উঠে এসেছে আফ্রিকার কিভু অরণ্যের এক আশ্চর্য রাত্রির কথা :

> অরণ্যের গভীরতা ভিতর থেকে আজও তেমনি জীবন ও মৃত্যুর কোলাহল ভেসে আসছে—কেউ করছে প্রচণ্ড গর্জন, কেউ করছে করুণ আর্তনাদ। গানের পাখিরা এখন গান গেছে ভুলে, মাঝে মাঝে খালি অমঙ্গলের সম্ভাবনা জানিয়ে কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠছে পেচকরা এবং জীবজন্তুর সেইসব শব্দের উপরে আর একটা

ভয়ানক শব্দ সারাক্ষণ জেগে রয়েছে, যা অবর্ণনীয়। হুম-হুম, হুম-হুম—যেন বনবাসী নিশীথিনীর হৃৎপিণ্ডের অশ্রান্ত শব্দ! সেই অরণ্য-শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হচ্ছে কালরাত্রি, তার ক্ষুধিত নিষ্ঠুর আত্মা যেন তালে তালে হুংকার দিয়ে ক্রমাগত বলে যাচ্ছে—'রক্ত কই? রক্ত চাই! রক্ত কই? রক্ত আন! রক্ত কই? রক্ত দে!'—বুনো রাতের এই ভাষা বোঝে বলেই হয়তো প্রতি রাত্রে বনে বনে সিংহ জাগে, চিতা হানা দেয়, অজগর পাকসাট মারে![১৯]

যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে প্রকৃতি হল জড় বা যন্ত্রবৎ। কিন্তু এখানে ফুটে উঠেছে বিপরীত চিত্র—বুনোরাত্রি ও সে রাতের অরণ্যপ্রকৃতি যেন জীবন্ত, ভয়ঙ্কর, রহস্যময়। আর তা যেন আভাস দিয়ে যায় আজ রাতেই ভয়ানক কিছু একটা ঘটবে; শিকারি-কথকের শঙ্কা-উদ্বেগ মিশ্রিত মানসিক অবস্থাটিও যেন প্রকাশ পাচ্ছে অরণ্য প্রকৃতির মধ্যে। কথকের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও রুদ্ধশ্বাস শিহরণসহ দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করতে থাকে সেই চরম মুহূর্তের। আফ্রিকার কিভু অরণ্যে শিকারে এসে বাঙালি কথক শুধুমাত্র শিকারের জন্তুকেই ধ্যানজ্ঞান না করে কদিন ধরে অরণ্যপ্রকৃতির রূপ রস গন্ধকেও মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করেছে; ফলে ইতিমধ্যে কিভু অরণ্যের দিনরাতের নানা সময়ের নানা বিচিত্রমূর্তির সঙ্গে তার ঘটেছে পরিচয়। কখনো রাত্রে তাঁবুর ঘুটঘুটে অন্ধকারে ও বিশ্রী দুর্গন্ধে অজানা বিপদের ভয় কথকের মনে জাগ্রত হলেও তাঁবুর বাইরের চাঁদের আলোয় জীবজন্তু শূন্য ধবধবে খোলা জমি, দূরাগত নদীর শব্দ, নিস্পন্দ অরণ্যপ্রাচীর নিমেষে তার ভয় দূর করেছে; কখনও সন্ধ্যার বৃষ্টিভেজা ঝোড়ো হাওয়া-অরণ্যের কোলাহল-উন্মাদিনী নদীর উচ্ছ্বসিত জলতরঙ্গের আর্তনাদ ও তাঁবুর চারপাশে অশ্রান্ত বৃষ্টির নূপুর ধ্বনি কথকের চোখে এনেছে ঘুম; কখনও বা দুপুরের রোদে চকচকে রূপোর হাঁসুলির মতো বাঁকা নদীর পাশের শ্যামলতার আড়ালে নানা বর্ণের পাখিদের মনে হয়েছে তারা বন্দুকের জন্য নয়; আবার সকালে দেখেছে পূর্ব আকাশের অঙ্গনে সুন্দরী ঊষার প্রাত্যহিক হোরি-খেলা। অরণ্যপ্রকৃতি স্থির, নির্দিষ্ট নয়; তা চির পরিবর্তনশীল নিত্য নতুন রূপের আধার—এই সত্যটিই চমৎকারভাবে উঠে এসেছে শিকারি-কথকের অভিজ্ঞতা সূত্রে। এমনকি ঐ ভয়ঙ্কর রাতেও দ্রুত ঘটে চলা বিস্ময়কর ভীতিপ্রদ ঘটনার মাধ্যমে গভীর অরণ্যের অলৌকিক চুরির রহস্য যখন উন্মোচিত হয়ে গেছে তার ক্ষণিক পরেই পূর্বের ভয়াল ঘটনার কোনও ছাপ ধরা থাকেনি প্রকৃতির বুকে—'স্বপ্নময় চাঁদের আলোয় চারিদিক রূপোলি ছবির মতো অপূর্ব হয়ে উঠেছে; নদীর সমুজ্জ্বল হীরকখচিত জলবীণায় যে গানের আনন্দ বেজে উঠেছে, তার মধ্যে আর এতটুকু ভয় বা বিষাদের

আভাস নেই।’[২০] এজন্যই তো অরণ্য চিরকুহকে ঢাকা, চির পরিবর্তমান, চির রহস্যময়; অরণ্যের সব রহস্য অন্তহীন অভিযানেও সম্পূর্ণ ভেদ করা তাই অসম্ভব; অসম্ভব অরণ্যের মর্মস্থলকে পুরোপুরি ছুঁতে পারা। থাকে শুধু অরণ্যের সঙ্গে কিছু পরিচয়ের সুযোগ। অবশ্য অরণ্যের সেই পরিচয় বা বিচিত্র রূপও সহৃদয় শিকারি বা অরণ্যযাত্রীর মধ্যে জাগায় বিচিত্র অনুভূতি—বিস্ময়, মুগ্ধতা, মাদকতা, ভয়, ভয়হীনতা, সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা, বিষাদ, আনন্দ। কখনও অরণ্যজগৎকে ঘিরেই তার চেতনার মুক্তি ঘটে মহাজাগতিক বিস্তারে :

> এই অন্ধকার, তারা-ফোটা হালকা নীল সিল্ক, শাড়ির মতো উদ্বেল আকাশ যেন উড়তে থাকে চাঁদোয়ার মতো। হাওয়াতে তারারা কাঁপে, মনে হয় মিটমিট করে। দারুণ লাগে তখন তাকিয়ে থাকতে। অন্ধকারের এক দারুণ পুরুষালী মৌনী রূপ আছে।[২১] (বুদ্ধদেব গুহর টাঁড়বাঘোয়া, *সন্দেশ*)

চিররহস্যময় অরণ্যের গন্ধ বর্ণ তাকে পৌঁছে দেয় কখনও বহমান ইতিহাসের কাছে কখনো বা অপার্থিব জগতে :

> এই অরণ্যের জটায় জটায় বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীনের গন্ধ, যেন পৌরাণিক যুগের তপস্বীগণের গঙ্গাযাত্রার গন্ধ, মৃত্যুর পরপারে যেন কোন অজানা জীবনের গন্ধ। ফুলের গন্ধেও সেই কথা, একে আস্বাদ করিনি লোকালয়ের লোকযাত্রায়, এফুল ফোটে না কোনো উদ্যানে, এ ফুল নয় পৃথিবীর।[২২] (প্রবোধকুমার সান্যালের ‘শিকারের সন্ধানে’, *মৌচাক*)

অরণ্যপ্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের হাত ধরে এভাবে শিকারি বা অরণ্যঅভিযাত্রী কখনো-সখনো পৌঁছে যায় অতীন্দ্রিয় অনুভূতির জগতেও।

শিকার ক্রিয়ায় জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কিংবা অরণ্যের প্রকৃতির ঘোরের মধ্যে ব্যক্তিমানুষ অনেক সময় নিজেকে নিজেই সঠিক চিনতে পারে। বহু গল্প, আখ্যানেই দেখা যায় শিকারের মরণঘন পরিস্থিতি বা অরণ্যের কঠিন প্রতিকূলতায় পড়ে মানুষ নিজের বা অপরের প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া হয়ে নিজেরও অজ্ঞাত শক্তি, দক্ষতা বা বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ফেলে। ভয়ঙ্কর প্রতিকূল পরিস্থিতি মানুষের মধ্যে অনেক সময় সাহস-সহযোগিতা-আত্মত্যাগ ইত্যাদি মানবিক সদগুণ বা উচ্চভাবেরও স্ফুরণ ঘটায়। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘আফ্রিকার জঙ্গলে’তে শিকারি বন্ধু তিনজন বা ‘জঙ্গলের জালে’তে সদ্যপরিচিত রিভেরা ও ডিসুজা পরস্পরের দিকে বাড়িয়ে দেয় সহযোগিতার হাত, একজনের বিপদে অন্যজন বা অন্যরা পালিয়ে না গিয়ে ত্যাগস্বীকার করেও অপরজনকে

বাঁচাতে চায়। আবার লোকালয়ে যাঁরা মানুষের সঙ্গ লাভের চেয়ে একা থাকা পছন্দ করে, নির্জন অরণ্যে তারাই মানুষের সঙ্গ লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে (খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'বনরহস্যে'র সিদ্ধেশ্বর বাবু বা 'জঙ্গলের জালে'র প্লেনে একা আকাশে পাখির মতো উড়তে পছন্দ করা মিঃ ডিসুজা)। সঙ্গীহারা হয়ে গেলে সুদক্ষ শিকারি বা বেপরোয়া সাহসী অভিযাত্রীর মধ্যেও নিঃসঙ্গতাবোধ অনেক সময় তীব্র করে তোলে মৃত্যুভয়, জাগায় আক্ষেপ (খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হাজারীবাগের জঙ্গলে'তে দাঁতাল হাতির তাড়ায় ছুটতে ছুটতে শক্তিধরের সাড়া না পেয়ে মিঃ ফরেস্টারের ভাবনা)। অরণ্য অভিযাত্রী বা শিকারিও অনেক সময় অরণ্যের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে বা হিংস্রজন্তুর সম্মুখীন হয়ে কিংবা অরণ্যে পথ হারিয়ে—নিঃসহায় হয়ে পড়ে ব্যাকুল হয়ে ওঠে নিজের দেশ, নিজের বাড়ির জন্য। 'জঙ্গলের জালে'তে দেশে স্কুলমাস্টারি ভালো না লাগায় যে রিভেরা দেশভ্রমণে বেরোয়, অরণ্যের নানা কঠিন ঝড়ঝাপটায় অসহায় হয়ে পড়ে সেই রিভেরাই নিজের দেশের 'চোখ জোড়ানো' প্রকৃতি ও 'সবচেয়ে মিষ্টি, আনন্দদায়ক' নিজের ছোট্ট বাড়িখানির প্রতি তীব্র টান অনুভব করতে থাকে।

অরণ্যের ভাবগম্ভীর রূপ, বিশালতা, নির্জনতা কিংবা চিরচঞ্চল রূপ বা ভয়াল রুদ্র মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে শিকারি বা অরণ্যযাত্রী অনেক সময়ই স্তম্ভিত বা বিহ্বল হয়ে যায়। মানুষের ক্ষুদ্রতা, অসহায়ত্বকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। বনের হিংস্র পশুকে পদানত করে প্রকৃতির উপর নিজের ক্ষমতা, স্পর্ধার পরিচয় দিতে সচেষ্ট ছিল যে শিকারি বহুক্ষেত্রেই ঘটে তার স্পর্ধার অবলুপ্তি। এমনকি হিংস্র পশুকে শিকারে সফল হলেও কখনো-কখনো অদ্ভুত বিষণ্ণতা-বেদনা-গ্লানিবোধ শিকারিকে গ্রাস করে। অনেক সময়ই শিকারি বা অরণ্যযাত্রী অনুভব করে মানুষের ক্ষমতা অরণ্য-প্রকৃতি বা তার স্রষ্টার ক্ষমতার কাছে নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। এ অনুভব মানুষের অহংবোধেরও নিয়ন্ত্রণ ঘটায়। 'হাজারীবাগের জঙ্গলে'তে দক্ষ শিকারি মিঃ ফরেস্টার দাঁতাল হাতির থেকে বাঁচতে ছুটতে ছুটতে পা ফস্কে শত শত ফিট গভীর অন্ধকার খাদে পড়ে যাবার সময়, যখন সারা শরীরে ঝিমঝিমে অনুভূতিতে প্রাণভয়ে চিৎকার করে ওঠেন তখন হঠাৎ তার স্পষ্ট মনে হয়, 'দু'খানি অদৃশ্য হাত আমাকে সদ্য মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঐ গাছের ওপর ফেলে দিল।'[২৩] চরম বিপদের মধ্যে পড়ে বা সঙ্গীন অবস্থায় মানুষ অনেক সময় অরণ্যপ্রকৃতি বা তার স্রষ্টার অঘটনঘটনপটু রূপটি প্রত্যক্ষ করে যার কোনও সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ ব্যাখ্যা অসম্ভব।

বহু ক্ষেত্রেই শিকারি বা অরণ্য অভিযাত্রীর প্রাপ্ত আনন্দের চেয়ে তাঁর যন্ত্রণা,

দুঃখের পরিমাণ বেশি হয়ে ওঠে। এই অরণ্য অভিজ্ঞতা তাদেরকে মুখোমুখি করে দেয় গভীর কোনও সত্যের। 'জঙ্গলের জালে'তে রিভেরা ভেবেছিলেন, পায়ে হেঁটে দেশভ্রমণে যে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে তা থেকে নিজে আনন্দ লাভ ও অনেককে আনন্দ দান করা যাবে। কিন্তু অরণ্যে বুনোদের হাতে দু-সঙ্গীকে হারিয়ে ও অরণ্যের জটিলতায় তিনি যে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাতে শেষপর্যন্ত বুঝতে পারেন, 'পায়ে হেঁটে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ভার অনেক সময়ই বয়ে নিয়ে বাড়ী ফেরা যায় না, মাঝপথেই তা ফেলে যেতে হয়।'[২৪] শুধু অভিজ্ঞতার ভারই নয়, রিভেরাকেও মাঝপথেই থেমে যেতে হয়; বাড়ি ফেরা তাঁর আর হয় না। জ্বরে অচৈতন্য রিভেরার মুখের দিকে তাকিয়ে ডিসুজা তাই বেদনাদীর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন—'এমন সাহসী, ত্যাগী ও বুদ্ধিমান একটি লোক এই বনের ধারে বিনা চিকিৎসায় আজ মরণাপন্ন! এজন্য দায়ী কে? মিঃ রিভেরা নিজে, না ভাগ্য?'[২৫]

শিকার বা অরণ্য অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভূতিতেও কখনো-কখনো উঠে আসে সমাজ জীবনের গভীর গূঢ় জিজ্ঞাসা। বুদ্ধদেব গুহর 'টাঁড়বাঘোয়া'তে সফল শিকার সেরে ফেরার পথে শেষ দুপুরের আলোয় পলাশবনার বস্তি ও আশেপাশের জঙ্গল, রুক্ষ উদাস প্রকৃতির সহাবস্থান দেখতে দেখতে বাঙালি কথকের মনে হয়েছে :

> বন পাহাড়ে ঘেরা এই শান্তির বস্তির পলাশবনার দু'জন রাজা—টিকায়েত ও টাঁড়বাঘোয়া। তাদের রাজত্ব, প্রজাদের চরিত্র ছিল আলাদা; দু'রাজার সত্যিকার কোনও ঝগড়া ছিল না; বরং ছিল চিরদিন পারস্পরিক সমীহ। কিন্তু—ভুল বোঝাবুঝির জন্যেই এই দুপুরে তারা দুজনেই এক মর্মান্তিক ঝগড়ার পরিণতির শিকার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে এক অনামা নদীর ঝর্ণার পাশে শুয়ে রয়েছে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে, বালিতে পাথরে, জলে মাটিতে; রোদে ছায়ায়। একই সঙ্গে।[২৬]

আর টিকায়েত ও টাঁড়বাঘোয়ার মর্মান্তিক পরিণতির এই বিষাদঘন অনুভূতিটি কথককে নিয়ে গেছে অরণ্য জগৎ ছাড়িয়ে সমাজজীবনের বা বৃহৎ জগতের আরও গূঢ় সত্যের দিকে :

> মনে হয় সমস্ত ঝগড়া, যত রকম ঝগড়া হয়, হয়েছে আজ পর্যন্ত এবং হবে মানুষে মানুষে, দেশে দেশে এবং একদিন হয়তো এক গ্রহের সঙ্গে অন্য গ্রহের, সেই সমস্ত ঝগড়ার পিছনেই একটিই মাত্র কারণ থাকে; ভুল বোঝাবুঝি।[২৭]

চিরকালীন দ্বন্দ্বের মধ্যে নিহিত চিরন্তর সত্যটি এখানে প্রতিভাত হয়েছে কথকের অনুভূতিতে; আবার 'টাঁড়বাঘোয়া'র আখ্যানকাল (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে স্বাধীনতার

পূর্ববর্তী কোনও সময়) ও রচনাকাল (৬০ এর দশক)-এর কথা মনে রাখলে বোঝা যায়, তৎকালীন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনার (যুদ্ধ-দাঙ্গা-দেশভাগ ইত্যাদির) ব্যঞ্জনাও সম্ভবত ধরা আছে কথকের সত্যোপলব্ধিটির মধ্যে।

অরণ্য মানেই—'হিংস্র বাঘ-ভালুকের দেশ', 'কাপালিক চোর ডাকাত দুষ্কৃতির আস্তানা', 'জ্বর ম্যালেরিয়া রোগের আঁতুড় ঘর', 'অরণ্য প্রকৃতি পদে পদে জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ বিপজ্জনক'—অরণ্যের নেতিবাচক এই দিকগুলো যা পূর্ববর্তী বাংলা-সাহিত্য এবং শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার সাহিত্যগুলিতেও প্রাধান্য পেত, সেগুলির অস্তিত্ব যে তিন-চারের দশক থেকে প্রকাশিত শিশু-কিশোর শিকার-সাহিত্য বা অরণ্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলিতে নেই এমন নয়। শিকারি বা অরণ্য-অভিযাত্রী নায়ক অরণ্যের এইসব বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে; নানা বিপর্যয়ে তারাও যন্ত্রণাক্লিষ্ট হচ্ছে, অসহায়বোধ করছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই নায়কদের মধ্যে এরপরও অরণ্য-অনীহা দেখা যায় না; ঘটেনা তাদের অরণ্যপ্রেমে বিন্দুমাত্রও ঘাটতি। 'বনরহস্য'তে সিদ্ধেশ্বর বাবু স্বেচ্ছায় বনবাসী হলেও স্বেচ্ছায় বনত্যাগ করতে চাননি। অরণ্যের নির্জনতা ও প্রতিকূলতায় মানসিক টানাপোড়েন দেখা দিলেই তিনি মনকে শান্ত করেছেন বন্যপ্রাণীজগৎ পর্যবেক্ষণের কঠিন কাজটি করতে হলে অসুবিধা ও দুঃখভোগ করতেই হবে ভেবে। মাঝে মাঝে নিজের নির্বুদ্ধিতা, বাতিকের হটকারিতাকে দোষারোপ করেছেন ঠিকই, কিন্তু কখনই এমনকি সৃষ্টিধর চলে যাবার পর বনকে অতি নির্জন, দারুণ বিপৎসংকুল লাগলেও বন ছেড়ে লোকালয়ে ফিরে যাবার কথা একবারও মনে আনেননি। অরণ্যে ডাকাতের আক্রমণ ও ম্যালেরিয়াক্রান্ত হয়ে তাঁকে বাধ্য হয়ে উদ্ধারকর্তা রমেশবাবুর চা বাগানে যেতে হয়। কিন্তু সেখান থেকে স্বগ্রাম বা কোথায় যান তা তার খাতায় না থাকায় রহস্যই থেকে যায়। 'জঙ্গলের জালে'তে হেঁটে দেশভ্রমণে বেরিয়ে নানা বিপর্যয়ের পরও মৃত্যু পথযাত্রী রিভেরার একান্ত ইচ্ছে, 'যদি মরি এই বনেই আমার কবর দেবেন।'[২৮] ডিসুজার বিদায় নমস্কারে আন্দিজ পাহাড়—বনপ্রান্তর ও রিভেরা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। 'আসামের জঙ্গলে'র অমর-মহাদেব সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে ফিরেও মনে করে এ অভিজ্ঞতা অমূল্য। 'হাজারীবাগের জঙ্গলে'র মিঃ ফরেস্টার জীবনে বহুবার জীবন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছেন। হিংস্র বুনো জন্তুর সামনে পড়ে নিজের দোষের জন্য আক্ষেপও করেছেন, শরীরে ধারণ করেছেন ভালুক, চিতার আক্রমণের চিহ্ন; বনে পথ হারিয়ে পুনরায় লোকবসতিতে ফেরার যে কি আনন্দ তাও তার মর্মে মর্মে অনুভূত; তারপরও

কিন্তু অরণ্যের মোহ ও শিকারের নেশা তিনি ত্যাগ করতে পারেননি। হাজারিবাগের জঙ্গলে শিকারি বন্ধুদ্বয়ের সঙ্গে পুনরায় তাকে বাঘ শিকারে অদৃশ্য হতে দেখা যায়।

বিশ শতকের শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার কাহিনিগুলিতে দেশি ও বিদেশি অরণ্যের পটভূমিতে কাহিনি শোনাতে বসে লেখকরা সচেতনভাবে ঐসব অরণ্যের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিও তুলে ধরেছেন। ভারতীয় বিভিন্ন অরণ্যগুলির প্রাদেশিক ব্যবধানটুকু বাদ দিলে মধ্যেকার আত্মীয়তা/নিগূঢ় সংযোগ সূত্রগুলির কথা যেমন কখনও বলেছেন (প্রবোধকুমার সান্যালের 'শিকারের সন্ধানে'), তেমনি কখনো-কখনো দেশিবিদেশি নানা অরণ্যের প্রকৃতি, গাছপালা, পশুপাখির সঙ্গে বাংলাদেশের পরিচিত অরণ্য, পশুপাখিদের তুলনা-প্রতিতুলনাও সচেতনভাবে হাজির করেছেন (খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'বনরহস্য')। বাঙালি শিশু-কিশোর পাঠককে দিতে চেয়েছেন উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের নিবিড় পাঠ। বাংলা শিশু-কিশোর পাঠ্য শিকার বা জঙ্গল কাহিনিগুলিতে পটভূমি রূপে উঠে আসা অরণ্যের নাম, স্থান, কাল অনেক বেশি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত। কিন্তু মজার ব্যাপার, শিকারি বা অরণ্য অভিযাত্রীদের অনুভবে অরণ্যগুলি আর ভূগোল-সুনির্দিষ্ট নয়; তাদের অরণ্য-অনুভব দেশকালের সীমা অতিক্রম করে বিস্তৃতি লাভ করেছে কখনও চেতনার প্রসারে, কখনো বা আত্ম-আবিষ্কারে। শিকার বা জঙ্গল কাহিনির রচয়িতারা ছোটো থেকেই শিশু-কিশোরদের মধ্যে চারিয়ে দিতে চাইছেন অরণ্যপ্রেম; দেশি-বিদেশি শিকারি বা অরণ্যযাত্রীদের অরণ্য-অনুভবগুলির সঙ্গেও পরিচিত করতে চাইছেন। তেমনি তাদের মধ্যে গড়ে তুলতে চাইছেন নান্দনিক বোধও। আমাদের মনে পড়তে পারে বুদ্ধদেব গুহর 'টাঁড়বাঘোয়া'র (*সন্দেশ*) বাঙালি কথক অন্ধকারের 'পুরুষালী মৌনী' রূপ, অন্ধকারের নানা রঙ, ঘনতার কথা বলতে গিয়ে বলেন :

> তোমরা যদি মনের সব জানালাগুলো খুলে দিয়ে, ইন্দ্রিয়ের আন্তরিকতা দিয়ে সেই রূপকে অনুভব করার চেষ্টা করো তাহলে নিশ্চয় তা অনুভব করতে পারবে। এমন সব অন্ধকার রাতেই তো আলোর তাৎপর্য, আলোর আসল চেহারাটা বোঝা যায়। অন্ধকার নইলে, আলো আলোকিত করত কাকে?[২৯]

হিংস্র, নিষ্ঠুর রক্তাক্ত শিকার ক্রীড়ার ভয়মিশ্রিত রুদ্ধশ্বাস টানটান উত্তেজনাপূর্ণ বর্ণনার পাশে অরণ্য প্রকৃতির বর্ণময়, চিত্রবৎ সজীব বর্ণনা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার কাহিনিগুলিতে ভারসাম্য রচনা করে। অরণ্য প্রকৃতি, পশুপাখি গাছপালার বর্ণনা ও শিকারি বা জঙ্গলযাত্রীদের অরণ্যপ্রেম—অরণ্য-অনুভব বিশ শতকের এই শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার কাহিনিগুলিকে 'হনন-হন্যে' শিকারির বীরত্বগাথার ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করিয়ে উত্তরণ ঘটায় বৃহত্তম অরণ্যপাঠের অঙ্গনে।

শিকার কেন্দ্রিক হাসির গল্প বা ছদ্ম-শিকারের গল্প

শিকার মানেই নিষ্ঠুর, হিংস্র, রক্তাক্ত, হত্যা বা প্রতিহত্যার খেলা। তাই আসল শিকারের বদলে, শিকার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ছোটোদের উপযোগী একধরনের হাসি-মজার গল্প বা নকল-শিকারের গল্পও শুনিয়েছেন বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকার লেখকরা। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'বাগানের বাঘ' (*রামধনু*, ১৩৪৬) গল্পে বাঘের গল্প বলার পরে দাদু দুষ্টু, বিচ্ছু নাতিনাতনিদের একটু ভয় দেখাতে বলেছিলেন—খিড়কির বাগানে ঝোপজঙ্গলে রাত্রে বাঘ আসে। তাতেই নাতিনাতনিরদল গোপনীয় অধিবেশনে সে রাতেই বাগানে বাঘ শিকারের পরিকল্পনা নেয়; উদ্যানবাসী প্রেতাত্মাদের হাত থেকে নিস্তার পেতে দোতলার হলঘরের জানালা থেকে নিরাপদে বাঘ শিকারের ব্যবস্থা ধার্য হয়। দু-দিদির মতে, 'মেয়েরা বাঘ শিকার করে না, খালি দেখে'।[৩০] কিন্তু 'কচি বয়সেই নারীজাতির অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা স্পষ্ট হওয়ায়' মঞ্জু প্রতিবাদে সাফ জানায় সেও বাঘশিকার করবেই। ফলে দীপু এয়ারগান, প্যাঁচা গুলতি ও মঞ্জু রাশীকৃত ইটপাথর, ভাঙাবোতল—অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তিনটি জানালায় 'শিকারির পজিশন' নেয়। আরেক জানালায় থাকে নিরস্ত্র দর্শক মুকু, নমু। মনে 'শিকারির ধৈর্য' বাসা বাঁধায় তারা অন্ধকারে চুপচাপ বাঘের প্রতীক্ষা করতে থাকে। হঠাৎ ছায়ার মতো বড়ো মূর্তি এক ঝোপ থেকে অন্য ঝোপে যেতেই শুরু হয় শিকারিদের অস্ত্রবর্ষণ। আর সঙ্গে সঙ্গে ওঠে 'বাপরে, মারে, মরে গেছিরে' আর্তনাদ। মানুষের গলা শুনে ভূতের ভয়ে শিকারিরা বিপর্যস্ত। নমু চম্পট দেয়, মুকুর প্রায় দাঁতকপাটি লাগে, দীপু বন্দুকত্যাগ করে কম্পমান হয়। দাদুর বলা 'কঙ্কাবতী' গল্পের শিকড়ের গুণে মানুষের বাঘের রূপধারণের কথাটা জানা থাকায় ভয়ডরহীন প্যাঁচা ভাবে 'এটা মানুষ-বাঘ'।[৩১] ফলে প্যাঁচা ও মঞ্জু গুলতি ও ইট বৃষ্টি চালিয়ে যায়। শেষে দেখা যায় তারা শিকার করেছে বাঘ নয়, চোর। হতভাগ্য চোর রগে গুলতি লেগে অচেতন। কিন্তু এরূপ চোর শিকারের পুরস্কার রূপে 'বীর নারী-বীর পুরুষে'র অভিনন্দন মেলে না; উল্টে নিজের টাক বাঁচাতে দাদু সর্বনেশে এয়ারগান, গুলতি কেড়ে নেবার নির্দেশ দেন। শিকার বিষয়টিকে ভরকেন্দ্রে রেখে বাঙালি যৌথ পরিবারের ভাইবোনদের মজাদার কীর্তিকলাপকেই হেমেন্দ্র এখানে চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। হাসির গল্প হলেও গল্পটিতে ধরা আছে সেকালের বাঙালি কিশোর-কিশোরীদের শিকার বিষয়টি সম্পর্কে তীব্র কৌতূহল, শিকারের গল্প বিশেষত বাঘ-শিকারের গল্পের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণের কথা; তাদের মনের কোণে লুকিয়ে থাকা 'মস্তবীর শখের শিকারি' হবার সুতীব্র বাসনাটিও। অবশ্য যার পরিণাম হত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয় হাস্যকর

নয় করুণ। দীপুর শখের বাঘ-শিকারি হবার জন্য এয়ারগান কেনার প্রসঙ্গটি আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় বিভূতিভূষণের 'এয়ারগান' গল্পের হাবুলকে, যে কাকার কাছে এয়ারগান পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য আটমাস জোর কদমে পড়ে ফার্স্ট হয়। এয়ারগান পেতেই শুরু হয় বাড়িময় নিশানা প্র্যাকটিস। কখনও সে চড়ুই, পায়রায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে হতাশ হয়; কখনও দেওয়ালে কালীর বাঁধানো ফটোর কাঁচ ভেঙে ভয়ে মুষড়ে পড়ে; কখনও জলের ট্যাঙ্ক, ফুলের টবে গুলির শব্দে আনন্দে আত্মহারা হয়ে মঙ্গোপার্কের মতো শিকারি কি নেপোলিয়ন, নেলসনের মতো ঐতিহাসিক বীর হবার স্বপ্ন দেখে; বড়ো হয়ে আফ্রিকায় অংসখ্য জন্তু জানোয়ার শিকার করে দেখাবে তার শৌর্য বিক্রম; প্রমাণ দেবে বাঙালি ভীরু নয় বীরের জাতি। যদিও নিরীহ হাবুল থেকে জাঁদরেল পাকা শিকারি হবার যাত্রাপথের সূচনাতেই ঘটে বিপর্যয়। হনুমান 'বাঙালি বীরপুরুষ শিকারি' হাবুলের গালে চড় মেরে গুলি-ফুরনো এয়ারগান নিয়ে পাশের গাছে উধাও হয়। ফলে সবার সামনে হাবুলকে দাঁড়াতে হয় নিষ্ঠুর অপমান ও পরাজয় ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে অধোবদনে। শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিকের 'পূজোর শিকার' (*রামধনু*, ১৩৪২) গল্পে নন্দর শিকার প্র্যাকটিসের ফলাফল ছিল হাবুলের চেয়ে আরও ভয়াবহ— কখনও মশারি ফুটো হওয়া, কখনও লোকের ছেলের কান ঘেষে গুলি চলে যাওয়া, কখনো বা ছাগশিশুর মৃত্যু। ফলে বড়ো মামা নন্দর হাতে বন্দুক দেখলেই তাকে ছুটিতেও হোস্টেল ফেরত পাঠানোর ফরমান জারি করেন। তবে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার দৌলতেই ফাঁসির দড়ি থেকে নন্দ কয়েক আঙুলের জন্য বেঁচেও যায়। 'শিকারের মতো শিকার'-এর কৃতিত্ব অর্জনে দুর্ধর্ষ ডাকাত সন্দেহে যাকে সে গুলি ছোঁড়ে সে ছিল নতুন কেনা জুতো পরে হাঁটা প্র্যাকটিসরত রাঁধুনি-পাঁড়েজী। দীপু, নন্দ, মঞ্জু বা হাবুলের শিকারি হবার সুতীব্র বাসনা থেকে বোঝা যায় সেকালে শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-কাহিনি বা রোমাঞ্চকর জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলি তৎকালীন বাঙালি কিশোর-কিশোরীদের কতটা মোহমুগ্ধ করে রেখেছিল, করে তুলেছিল তাদের স্বপ্নবিভোর। স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যেকার ফারাকটিকেও সাহিত্যিকরা তাই হাসির ছলে শিশু-কিশোরদের চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন।

রোমহর্ষক শিকার-কাহিনিগুলির রমরমা ও তাতে বর্ণিত অতিরঞ্জনকে প্রশ্ন করতে শিশু-কিশোর পত্রিকাগুলির পাতাতেই অন্যধরনের মজাদার একগুচ্ছ শিকার কাহিনি লিখছেন শিবরাম চক্রবর্তী। বাজারপ্রসিদ্ধ শিকার কাহিনিগুলির চেনা ছক মেনেই তাঁর শিকার কাহিনিগুলিও বর্ণিত হচ্ছে। যেমন—কোনও বৈঠক বা চারইয়ারি আড্ডায় শিকারিরা তাদের প্রত্যক্ষ শিকার-অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছেন ('আমার ব্যাঘ্রপ্রাপ্তি', *রামধনু*,

১৩৫৭; 'এ্যহস্পর্শ', *রামধনু*, ১৩৫৮); কিংবা ছুটিতে নতুন জীবনের আস্বাদ নিতে আত্মীয়ের আমন্ত্রণে অরণ্যলগ্ন অঞ্চলে গিয়ে শিকার অভিজ্ঞতা লাভের কাহিনি ('আমার ভালুক শিকার', *রামধনু* ১৩৪১); অথবা বাঘের অত্যাচারে জর্জরিত গ্রামবাসীদের অনুরোধে তাদের ত্রাতারূপে একাকি শিকারির দুর্ধর্ষ শিকার অভিযাত্রা ('আমার ভালুক শিকার' গল্পে দাদার ব্যাঘ্র শিকার যাত্রা)। কিন্তু কাহিনির পত্রে ছত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চোরাগোপ্তা নানা ইশারা-ইঙ্গিত থেকে পাঠক ক্রমশ বুঝতে পারে শিবরামীয় শিকার কাহিনিগুলির অভীষ্ট ভিন্ন। আড্ডায় 'ভালুকমারা', 'কূর্মবীর', 'মৎস্য-অবতার' ও 'গন্ডারবাজ' যখন নিজ নিজ শিকারের বীরত্ব কাহিনি সোৎসাহে শুনিয়ে একে অপরকে টেক্কা দিতে ব্যস্ত, 'আমার ব্যাঘ্র-প্রাপ্তি' গল্পের কথক তখন তাদের কথার মাঝেই নানা মজাদার মন্তব্য করে বক্তাদের উত্যক্ত করেন এবং পাঠকমনে তাদের গল্পের 'সত্যতা' নিয়ে সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে থাকেন। তারপর যখন তার নিজের পালা আসে, তিনি 'নাচার' হয়ে 'আত্মকাহিনি' আরম্ভ করেন। যদিও শুরুর আগেই তিনি জানিয়ে দেন— আরশোলার নাম শুনলেই কাশেন, ফরফর করলেই গৃহত্যাগী হন। সেই তিনিই অবশ্য শিকার করেন 'এমন কিছু না, একটা বাঘ'। তার ব্যগ্রতা না থাকলেও বাঘের 'ব্যাঘ্রতাতে'ই তাকে বাঘের খপ্পরে পড়তে হয়—প্রথমেই এই সত্যটি জানিয়ে তিনি শুরু করেন 'বাঘাড়ম্বর'। গৌহাটির পত্রদাতার লেখায় বাঘের উৎপাতের কথা জেনে 'খবর কাগজের কাটতি বাড়াতে' সম্পাদক সরেজমিনে পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনে আসার জন্য কথককে আদেশ দেন। ফলে চাকরি রাখতে কথক 'কাগজ, পেনসিল ও প্রাণ হাতে করে' বাঘের খোঁজে যান। বাঘের অদ্ভুত কীর্তিকলাপ—'পাউডার, স্নো, হারমোনিয়াম, রেডিও, রেকর্ড, সন্দেশ, সন্দেশওয়ালা' সাবাড়ের অদ্ভুত খাদ্যরুচির 'খবর'ও করেন। আর তাতেই ঘটে 'দুর্ঘটনা'— চিড়িয়াখানার কর্তা এরূপ বাঘকে জীবিত ধরতে মোটা পুরস্কার ঘোষণা করে। ফলে বাঘ 'আতঙ্কজনক' হলেও পুরস্কারটা অতি 'লোভজনক' হওয়ায় বড়ো বড়ো বাঘশিকারিরা যেমন উঠে পড়ে লাগে, তেমনি 'লোকবলহীন', 'অর্থবলহীন' কথকও একা 'বুদ্ধিবলে' বাঘটাকে বাগাতে নেমে পড়েন। তাকে কাজও সারতে হবে চটপট, সব শিকারির আগে। ফলে বাঘের হজম শক্তির সঙ্গে রীতিমত অঙ্ক কষে উপযুক্ত পরিমাণ ঘুমের ওষুধ এক আস্ত পাঁঠার পেটে সেঁধিয়ে জঙ্গল-শহরতলির সঙ্গমস্থলে বাঘের জলপানের জন্য রেখে আসেন। ভোর হতেই গিয়ে দেখেন 'বাঘা মক্কেল' ছাগলের কখানি হাড়ের পাশে গভীর নিদ্রামগ্ন। কিন্তু ব্যাঘ্রপ্রাপ্তির গল্প এখানেই শেষ হয় না। সাহস করে বাঘটাকে কথক টানাটানি, আদরটাদর করার পর বাঘ জেগে উঠে কথককে তাড়া করে :

গুড়ি গুড়ি থেকে ক্রমে তুড়ি লাফ বাঘটার।

আর আমি? প্রতি মুহূর্তেই তখন হাতুড়ির ঘা টের পাচ্ছি আমার বুকে।

বাঘটাও আসছে—আমিও ছুটছি বাঁচবার আশায়। ছুটছি প্রাণপণ...।[৩২]

কাহিনির এরূপ টানটান উত্তেজনাময় শ্বাসরোধী মুহূর্তে কথক দম নিতে থেমে গেলেও উদগ্রীব উত্তেজিত শ্রোতা চারজন কথককে 'তারপর? তারপর?'—এর এ্যহপ্রশ্নে থামতে দেয় না। যে কোনও রোমহর্ষক শিকার কাহিনির মতোই কথকও ছুটতে ছুটতে এসে পড়েন ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে—'পিছনে বাঘ, সামনে খাদ'। কি করি ভাবতে ভাবতেই বাঘ ঘাড়ে এসে পড়ে। আর প্রসিদ্ধ শিকার কাহিনিগুলির দস্তুর মেনে কথকও কাহিনির এরূপ রোমহর্ষক তুঙ্গ মুহূর্তে—'ঠিক কী হল?' নির্দিষ্ট করে না জানিয়ে অনিশ্চিতের ব্যঞ্জনার মধ্যে তার গল্পটিতে সমাপ্তি টানতে চান। কিন্তু শ্রোতারা নাছোড়বান্দা। ফলে কথকের দীর্ঘনিঃশ্বাস : 'বাঘটা আমায় গিলে ফেললো খপ্ করে।'[৩৩] আর এই অন্তিম বাক্যটিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তিনি এতক্ষণ যে রোমাঞ্চকর বাঘ শিকারের দীর্ঘ কাহিনিটি শুনিয়েছেন, তা ডাঁহা মিথ্যে বা বানানো। শিকার গল্পের টানটান উত্তেজনাময় রোমাঞ্চের তুঙ্গ মুহূর্তে পৌঁছে বা গল্পের শেষে এধরনের চমকে শুধু কথকের চার শ্রোতাই নয়, 'আমার ব্যাঘ্র-প্রাপ্তি' গল্পের পাঠকও ঠকে যাবার বিস্ময় ও আমোদ অনুভব করে। এই কৌশলটি শিবরাম তার অন্যান্য শিকার-কাহিনিগুলিতেও বারবার সুদক্ষ ভাবে প্রয়োগ করেছেন। 'এ্যহস্পর্শ'তে 'বোগেশ না যোগেশ দাসে'র গহন জঙ্গলে মানুষখেকো উন্মত্ত সিংহের সামনে নিরস্ত্র, অসহায়, একলা হয়েও না ঘাবড়ানোর বীরত্বব্যঞ্জক 'জমাটি' শিকার কাহিনির বিপ্রতীপে কথক শুনিয়েছিলেন এক ভীষণ 'আজগুবি' শিকার-কাহিনি— রমানাথ বিশ্বাসের বইখ্যাত যে আফ্রিকা, সেই আফ্রিকার কাফ্রিদের দেশে একলা এক হাতেই গলা টিপে বাঘ শিকারের গল্প। আফ্রিকায় 'বাঘ' থাকে না শুনে কথক দ্রুত সংশোধন করেন—সুন্দরবনের বাঘকে তিনি তাড়িয়ে বোম্বাই নিয়ে গেলে বাঘ উত্তাল আরব সাগর সাঁতরে আফ্রিকা উপকূলে ওঠে। এতে অবশ্য কথকের বাঘমারার বাহাদুরি খানিক খাটো হয়; কেননা বাঘ তখন জলজ্যান্তর বদলে জোলো আধমরা। যোগেশের 'অতিরঞ্জিত' শিকার কাহিনি ও কথকের 'আরব্য উপন্যাসধর্মী' শিকার কাহিনির 'পাশবিক ঝগড়া'র মাঝে ঘণ্টা শোনায় 'গল্পকারের সত্যি নয়, একদম সত্যিকারের' গল্প। বড়োদিনের ছুটির এক রোববারে সে বাঘের সামনে পড়ে :

বাঘটা প্রথমে আমায় দেখতে পায় নি। পিঠ ফিরিয়ে ছিল। কিন্তু মুখ ঘুরোলেই একেবারে আমরা মুখোমুখি। বুঝে দেখুন কী অবস্থা...কেমন ব্যাপার! তা হলেও,

> আমি একপাও নড়লুম না, ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে—যতক্ষণ না বাঘটা আমায় দেখতে পায়।... তারপর বাঘটা আস্তে আস্তে মুখ ফেরালো। তার ঘাড় ঘোরালো। আড় চোখে দেখতে পেলে আমায়। ঘুরে দাঁড়ালো তারপর। প্রকাণ্ড মাথা তার—আর ঐ...ঐ যা বলেছেন...হাঁড়ির মত একখানা হাঁ। বিশজনের ভাত রাঁধবার মতন হাঁড়ি।[৩৪]

তবু ঘণ্টা গুলি করেনি, ছুটেও পালায়নি; শুধু 'একদৃষ্টে অপলক নেত্রে—তীব্র কটাক্ষে' বাঘের চোখের দিকে তাকায়। অবশ্য ঘন্টা স্বীকার করে সে শিকার করেনি, কেবল চোখাচোখি; বাঘটাকে ত্যাগস্বীকার করতে বাধ্য হয়—না করে উপায় ছিল না। ঘন্টার বাঘের সামনাসামনি হবার ডিটেলিং সহ ধারা-বিবরণে বিস্মিত যোগেশের মতো পাঠকেরও কৌতূহল যখন উস্কে উঠেছে, তখন ঘন্টাই গল্পের বারোটা বাজায় 'মিনিট কয়েক তাকাবার পরই আমি সিংহটাকে দেখতে গেলাম। বাঘটার পাশের খাঁচাতে।'[৩৫] আসলে বাঘটা ছিল জুগার্ডেনের। বড়োদিনের হুজুগে ভিড়ের চোটে বাঘের সঙ্গে চোখাচোখির ত্যাগস্বীকার করতে হয় ঘন্টাকে। ঘন্টার গল্পটিতে হাসির সঙ্গে সুন্দরভাবে মিশে আছে বুদ্ধিদীপ্ত কথার মারপ্যাঁচ, শব্দের খেলাও। শিকারের গল্প প্রসঙ্গে 'এ্যহস্পর্শ' গল্পের সূচনাতেই কথক জানিয়েছিলেন—'গুলি আর গুল্ নিয়ে কারবার শিকারীর। গুলিটা বেরয় বন্দুকের মুখ দিয়ে—যদি সত্যিই সে কখনো শিকারে গিয়ে থাকে। নইলে যা বেরয় তা স্রেফ্ গুল—তার নিজের মুখ দিয়ে।'[৩৬] তবে এই মুখনিঃসৃত গুলটাও যে কতরকম হতে পারে তারই সাক্ষ্য বহন করে যোগেশ, কথক ও ঘন্টার বলা গল্প তিনটি। 'আমার ভালুক শিকার' গল্পে দাদা গ্রামবাসীদের রক্ষার্থে বাঘ শিকারে গিয়ে বন্দুক ছোঁড়ার সময় দেখেন টোটা আনেননি। ফলে শুধু হাতেই বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাঘে-মানুষে লড়াইয়ের তুঙ্গ মুহূর্তে বৌদির কথায় বোঝা যায়, দ্বন্দ্বযুদ্ধটা ঘটে দাদার ঘুমের মধ্যে বা স্বপ্নে। তবে এরূপ যুদ্ধেরও ফলস্বরূপ দাদা খাট থেকে পড়ে অজ্ঞান ও মাথা কেটে আহত হন। শিবরামের গল্পগুলিতে শিকার পদ্ধতিগুলি প্রতিটিই অভিনব। 'আমার ভালুক শিকার' এ ভালুকই বন্দুক কুড়িয়ে নিয়ে পলায়নরত কথককে তাড়া করে। তারপর বন্দুকের গুলিতে নিজেই মারা যায়। বন্দুকের আওয়াজে ছুটন্ত কথক অবশ্য চোখ কান বুজে সটান শুয়ে পড়ে যুদ্ধরীতি মেনে; দুর্গানামও জপে; মৃত্যু আসন্ন ভেবে ছোটোবেলার আম্র-শিকার থেকে সেদিনের ভালুক-শিকার পর্যন্ত সচিত্র জীবনস্মৃতি রচনা ও আত্মীয়স্বজনের মুখও স্মরণ করে নেয়। পরে ভালুক নিজেই নিজে শিকার হয়েছে দেখে বোঝে—প্রথম দিন বৌদির চেঁচামেচি কান্নাকাটিতে ভালুক লজ্জা পেয়ে

পালায়, আজ তার 'কাপুরুষতা'র পরিচয়ে ভালুক এতটা মর্মাহত হয় যে 'আত্মহত্যা' করা ছাড়া উপায় ছিল না। যদিও বন্দুক নিয়ে বাড়ি ফিরে নিজের ভালুক শিকার দক্ষতার সগর্ব ঘোষণা করে—'কেবল দু'টো শট্—ব্যস খতম।'[৩৭] 'পাঁজিতে পাঁচ জনে যাত্রা নিষেধ' বলে দাদা-বৌদি-খুকুর সঙ্গে পুনরায় শিকার করা ভালুকটা দেখতে যাবার সময় আর বন্দুক নেয় না। এরূপ বিরাট শিকারের 'স্মৃতিচিহ্ন'রূপে ভালুকের 'লেজ' দেহচ্যুত করে আহরণ করা হয়। এমনকি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'কেও ভালুক শিকারের খবরটা দাদা পাঠিয়ে দেন, বাহাদুরি বৃদ্ধিতে শিকারির বিশেষণ 'Young' করা হয়। শিকার কাহিনিতে সাধারণত শিকারির পারিবারিক জীবনের বিশেষ উল্লেখ থাকে না। কারণ পারিবারিক পিছুটান না থাকলে শিকারের মতো জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অনায়াসে ঝাঁপিয়ে পড়া সহজ হয়। কিন্তু বাংলা শিকার-কেন্দ্রিক হাসির গল্পগুলিতে হেমেন্দ্রকুমার, বিভূতিভূষণ, শিবরাম প্রমুখরা বাঙালি পরিবারের মধুর চিত্রটি অঙ্কনে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আগ্রহী হয়েছেন। এই গল্পটিতেও ভালুক শিকারের 'পুরস্কার' রূপে দাদাবৌদির মনোমালিন্য দূর হয়ে মিলন ঘটে, এবং বীর শিকারির ভাগ্যে জোটে দাদাবৌদি, খুকুর আদর আপ্যায়ন ও মাছের মুড়োসহ অস্বাভাবিক উচ্চতার ঝোলের বাটির যত্নআত্তি। বাঙালি পারিবারিক মধুর আবহে রচিত শিকার গল্পটিতে হাসি-মস্করার সঙ্গে সঙ্গে ধরা আছে তৎকালীন বাঙালির শিকার বিলাস, শিকারির বীরত্বের অতিকথন, মিথ্যাচার, শিকারিদের নানা সংস্কার, শিকারের ঘটনা নিয়ে খবরের কাগজের উন্মাদনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে শিবরামের বঙ্কিম কটাক্ষ। আর এজন্যই শিবরাম ইচ্ছাকৃতভাবেই গল্পের শুরুতেই রেখে যান একটি ত্রুটি। সুন্দরবনে বাস্তবে 'ভালুক' পাওয়া না গেলেও কথকের ভালুক শিকারের আশ্চর্য কাহিনিটির পটভূমি 'সুন্দরবনের জঙ্গল'। সুন্দরবনের প্রচলিত 'গাছাল বা গাছশিকার' গাছের উপর থেকে শিকারের বদলে শিবরামীয় সংজ্ঞায় হয়ে উঠেছে 'গাছকেই শিকার' বা 'বৃক্ষশিকার'। কথকের গল্পটি *রামধনু*-তে প্রকাশিত হলে কথকের আরেক মামাতো ভাই অমল শিকারে দাদাদের চেয়েও বড়োকীর্তি স্থাপনে তৎপর হয় 'ভালুকের মহাপ্রস্থান' গল্পে (*রামধনু*, ১৩৪১)। শিকারের পারিবারিক ঐতিহ্যকে নিয়ে শিবরাম এখানে মজা করেছেন। পাহাড়দেশে ভালুকের অভাবে অমল সার্কাসের ভালুক মারতেই দীপুর এয়ারগান দখল করে, নিজের ক্যামেরার বিনিময়ে। খাঁচার পাখি শিকারে আরাম নেই বলে সে বেঁটে ভালুকের খাঁচা খুলে দিলে, পাশের খাঁচার দুই মোটা ভালুকদের একজন অকস্মাৎ দৈববাণী করে স্পষ্ট বাংলা ভাষায়—'পালাও পালাও মারাত্মক ভালুক'।[৩৮] চকোলেট সযত্নে ভাগ করে খাওয়ার মতো আদর্শ ন্যায়পরায়ণতা,

বাইসাইকেলের কসরতে অদ্ভুত পারদর্শিতা, খেলার বাহাদুরির জন্য ধেড়ে ভালুকটার ছোটোটাকে পিঠ চাপড়ে সাবাস দেবার কালে অমলকে দেখে বোবা বনে যাওয়া—ঘটনাগুলিতে মোটা ভালুকদের সম্পর্কে যে সন্দেহ ঘন থেকে ঘনতর হচ্ছিল তা একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ভালুকের মুখের বাংলা সাবধানবাণীতে। সার্কাসে বা চিড়িয়াখানায় পশুর মুখোশে মানুষের চাকরির সুপরিচিত কৌতুকটি এখানে ব্যবহৃত হলেও শিবরামের লেখনীর স্পর্শে তা খানিক ভিন্ন স্বাদের। কেননা তাদের 'মোটা-ভালুক'রূপী মানুষ ভাবতে অমল নারাজ—'কোন কোন বাঙালী যেমন দু'পাতা ইংরিজি পড়েই নিজেকে আর বাঙালী জ্ঞান করে না, একেবারে খাস্ ইংরেজ ভেবে বসে ওরও তাই দশা হয়েছে। নিজেও যে উনি একটি 'নাথিং বাট্ ভাল্লুক' তা আর ওঁর খেয়াল নেই।'[৩৯] ফলে মোটা ভালুককে তার জাম্বুবানত্ব মনে করিয়ে দিয়ে অমল তার উচ্চবাচ্য বন্ধ করে, কিন্তু বেঁটে ভালুককে এয়ারগান মেরেও কব্জা করতে পারে না; অভদ্রের মতো ভালুকটা দৌড়ে এসে অকস্মাৎ তাকে দারুণ চপেটাঘাৎ করে। তার তাড়াতেই অমল পাহাড়ের আলেয়ার দিকটাতেই দৌড় দেয়। শেষপর্যন্ত অবশ্য ভালুক থেকে অমল রক্ষা পায় খুবই অদ্ভুত ভাবে। স্যাঁৎসেতে জায়গাটাতে এসে পিছলে পড়ার কিছুক্ষণ পর নিচে মাথা উপরে লেজ করে ভালুক মাটি থেকে উঠে আস্তে আস্তে উড়তে শুরু করে। পেটটা তার চারটে জয়ঢাকের মতো ভয়ানক ফেঁপে উঠেছে যেন রক্ত-মাংসের বেলুন। ক্রমশ উপর দিকে উঠে, দেখতে দেখতে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে একসময় চক্ষের পলকে অনন্ত শূন্যে বেঁটে ভালুক অদৃশ্য হয়। অমলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ এই আজগুবি, উদ্ভট শিকার কাহিনির তার কথক দাদা একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন—হুমড়ি খেয়ে পড়া স্যাঁতসেতে জায়গাটায় প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাদুর্ভাব থাকায়, সে গ্যাস উদরস্থ হয়েই ভালুক বেলুনে পরিণত হয়। লক্ষণীয়, আগেকার দিনে পশুদের অন্ত্র, মূত্রথলি বেলুনরূপে ব্যবহৃত হত, আর সেই কবেই (১৭৩৮খ্রি.) Montgolfier ভাইদের হট এয়ার বেলুনের সফল উড়ান পরীক্ষার্থে আকাশযাত্রী হয় তিনটি পশুপাখিই।[৪০] আর যে সময়ে শিবরাম ভালুকনন্দনের মহাকাশযাত্রার এই গল্পটি লিখছেন সেই ত্রিশের দশক থেকেই গবেষণা ও ফ্লাইটের উচ্চতা রেকর্ডের জন্য গ্যাস ভর্তি 'উচ্চ উচ্চতর বেলুন' (crewed hight altitude ballons) বা 'মহাকাশের কাছাকাছি বেলুন' এর ব্যবহার শুরু হয়।[৪১] সেইসঙ্গে পশুর আকৃতির খেলনা বেলুনগুলিরও (Neil Tillotson এর বেলুন) চল হচ্ছিল এই ত্রিশের দশক থেকেই। তবে শিবরামের 'জয়ঢাক পেটযুক্ত রক্তমাংসের ভালুক-বেলুন' নিঃসন্দেহেই

অভিনব 'আজগুবি' বা 'কল্প-বৈজ্ঞানিক' ভাবনার ফসল। কথক-দাদার নিজস্ব বিশ্বাস অবশ্য অতিরিক্ত পুণ্যাত্মা হওয়াতেই বেঁটে ভালুকবাবাজীর এরূপ সশরীরে স্বর্গারোহণ :

> এভাবে 'মহাপ্রস্থানের পথে' যাবার অ্যাকসিডেন্ট যাদের হয়েছে তাদের মধ্যে একজন মাত্র দুর্ব্বিপাক কাটিয়ে কোনও গতিকে স্বস্থানে ফিরতে পারেন। প্রথম গেছলেন স্বয়ং যুঠিষ্ঠির, দ্বিতীয়—তাঁরই সমভিব্যাহারী জনৈক কুকুরশাবক, তৃতীয় আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল, আর চতুর্থ? চতুর্থ এঁদের কারো চেয়েই কোন অংশে ন্যূন নয়।[৪২]

এ মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, ছোটোদেরকে মজাদার শিকার কাহিনি বলতে বসেও কোনও কিছুই—মহাকাব্য-মহাভারত, সমসময়ে নবোদ্ভূত কল্পবিজ্ঞান কাহিনি, অত্যন্ত জনপ্রিয় ভ্রমণসাহিত্যও—শিবরামের বাঁকা কটাক্ষ, কৌতূকপূর্ণ তির্যক মন্তব্য, কথার খেলা, রসালো টিপ্পনী থেকে বাদ পড়েনি।

শিবরামের শিকার-কাহিনিগুলিতে ছোটোরা যেমন পায় অঢেল হাসি-মজা-আমোদ, তেমনি অপেক্ষাকৃত বড়োরা হাসির সঙ্গে সঙ্গে পায় ভিন্ন বার্তাও। তাঁর শিকার-কাহিনিগুলিতে চোখ বোলালেই বোঝা যায়, বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকার অন্যান্য শিকার কাহিনিগুলি থেকে, এমনকি শিকারকে কেন্দ্র করে রচিত হাসির-গল্পগুলির থেকেও এগুলির কত তফাত। জনপ্রিয় বাজার-মাতানো শিকার কাহিনিগুলির অনেক উপাদান ও চেনা ভঙ্গিকে শিবরাম তাঁর শিকার-কাহিনিগুলিতেও সুচারু ভাবে বুনে দিয়েছেন। এমনকি শিকার কাহিনির মোহমুগ্ধকর আকর্ষণের আসল মন্ত্রগুপ্তি যে টানটান রোমাঞ্চ, রুদ্ধশ্বাস শিহরণ, উত্তেজনা দোদুল্যমান অনিশ্চয়তা সেগুলিও তিনি সুনিপুণভাবে হাজির করেছেন। তবুও কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপস্থাপন কৌশল, ভাষাভঙ্গি, শব্দের কারসাজি, রসালো টিপ্পনী, সরস মন্তব্য, পাণ্ডিত্যপূর্ণ মস্করা, কাহিনি-বিন্যাস, কখনও বা সচেতন ভাবেই কাহিনিতে হাজির করা ছোটো ছোটো অসঙ্গতি বা ত্রুটি, সর্বোপরি উদ্ভট হেঁয়ালিপূর্ণ আশ্চর্য সব শিকার পদ্ধতি থেকে পাঠক অচিরেই বুঝে যায় হাসি-মস্করার মোড়কে তিনি আসলে সমালোচনা করছেন—সমসাময়িক অতিরঞ্জিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্যকাহিনির নামে আসলে লাগামছাড়া কাল্পনিক, আত্মমহিমা প্রচারের আকাঙ্ক্ষায় মিথ্যাসর্বস্ব, জমজমাট জমকালো শিকার-কাহিনিগুলিকে। তাঁর কাহিনিগুলির পরতে পরতে ধরা আছে সমকালীন বাঙালির শিকার-উন্মাদনা নিয়ে উতরোল ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ। তা থেকে অবশ্য তিনি নিজেকেও বাদ দেন নি। তাঁর এই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-সমালোচনা পদ্ধতিটি যদিও রম্য, কৌতুকপূর্ণ ও সরস।

শিবরামের শিকার কাহিনিগুলি বাজার চলতি জনপ্রিয় শিকার কাহিনিগুলির যেন প্যারডি। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (ডমরুর) ও সম্বুদ্ধ বা অমূল্যকুমার দাশগুপ্তের (শিকারি কান্তি চৌধুরীর) উদ্ভট, আজগুবি শিকার কাহিনিগুলি মনে রেখেও বলা যায়, বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে এধরনের আশ্চর্য চমকপ্রদ শিকার-কাহিনির স্রষ্টারূপে শিবরামই 'এক এবং অদ্বিতীয়'।

শিকারকে কেন্দ্র করে ছোটোদের জন্য হাসির গল্প লেখার ধারাটি অবশ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে (বিশেষত শিকার ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে নিষিদ্ধ ঘোষণার পর আরও) জোরালো হয়েছে। অর্ধেন্দু দত্তের 'হাতি খোলার হাতি, রসগোল্লার মতি'তে (*বার্ষিক শিশুসাথী*, ১৩৭৭) উত্তর কাছাড়ের হাতিখোলায় বন্ধুর বাড়ি যাবার সময়ে কথকরা হাতির দলের সম্মুখীন হয়। সুন্দরবনের বেশ কয়েকটি বিরাট রয়েল বেঙ্গল টাইগার শিকারে খ্যাত নিলামবাজারের শিকারি লুখুদা ও আসামের জঙ্গলে হাতিখেদার ছবি তোলায় খ্যাত প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার মানপুরের সত্যেন সেনও কথকদের সঙ্গী ছিল। কথক ও উই সিং-এর সাদামাঠা খাঁটি ভারতীয় পোশাকের পাশে লাখুদা ছিলেন সাহেবি পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত পিঠে রাইফেলধারী—'একেবারে খাঁটি ইংরেজ শিকারির মত'। আর সত্যেনের কাঁধে ছিল ঝুলন্ত ক্যামেরা। কিন্তু হাতির দলকে দেখামাত্রই কালবিলম্ব না করে লাখুদা মনুমেন্টের মতো একটি বড়ো উঁচু গাছের ডগায় তড়বড়িয়ে চেপে বসেন সবার আগে। হাতির দল কথকদের উপস্থিতি বুঝে মটমট করে ডালপালা ভাঙতে থাকলেও দুঁদে শিকারি লাখুদার জোরালো রাইফেলের ট্রিগার থাকে স্তব্ধ; সত্যেনের ক্যামেরার সার্টারও চুপ। গাছের উপর থেকে কুলির হাত থেকে ভয়ে রসগোল্লার হাঁড়ি দুটি পড়ে গেলে হাতির দল মিষ্টির স্বাদ পেয়ে ভীষণ আনন্দ পায়। নিমেষে তারা কাড়াকাড়ি মারামারি করে রসগোল্লা নিঃশেষ করে ফেলে গাছের চারদিকে দাঁড়িয়ে শুঁড় তুলে রসগোল্লা ভিক্ষে করতে থাকে। ইতিমধ্যে হাট ফেরত একদল পাহাড়ি গ্রামবাসী মশাল-টাঙ্গি-বর্শা হাতে এসে পড়লে হাতির দল বনে অদৃশ্য হয়। এবার অবশ্য লাখুদা তার রাইফেলটি বাগিয়ে ধরেন। কথক লাখুদাকে আর রাইফেল চালানোর ঝামেলা না করতে বলায় লাখুদার সপ্রতিভ উত্তর :

> তোরা সঙ্গে থেকেই যত বিপদ বাড়িয়েছিস, নতুবা আজ দু'চারটেকেই কাত করে দিতুম। আমার রাইফেল হেরিংটন সাহেব ও নিলাম বাজারের ঝানু শিকারি খগেন দত্ত মহাশয় পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন।[৪৩]

গল্পটিতে একদিকে জড়িয়ে আছে বাঙালিয়ানার স্বাদ—খাঁটি বাঙালি রসগোল্লাতে মুগ্ধ

হয়েছে বনের ভয়ঙ্কর হাতির দল। অন্যদিকে আবার বাঙালির সাহেব নকলনবিশি ও শিকারি রূপে ফাঁপা দেখনদারিত্বকে করা হয়েছে ব্যঙ্গ।

বাঙালি সাহিত্যিকদের কলমে সবচেয়ে বেশি ব্যঙ্গের শিকার হয়েছে রাজা-নবাব-ভূস্বামীদের রাজকীয় শিকার যাত্রা। শৈলেন কুমার দত্তের 'শিকারে গেলেন গবুচন্দ্র' (*শুকতারা*, ১৩৮৯) গল্পে হাতি-ঘোড়া-লোকলস্কর-টাঙ্গি-বল্লম-কামান-ছাগল টোপ সহযোগে রাজা গবুচন্দ্রের এলাহি শিকার যাত্রা। রাজাকে রাজ্যের মেয়েদের মঙ্গল-বিদায় জানানো, বাজনাবাদ্যি সহ শোভাযাত্রা, তাঁবুতে খানা-পিনা—কোথাও কোনও ত্রুটি নেই। শিকারের আয়োজনের বন্দোবস্তও পাকা। জঙ্গলের বাঘদের তাড়িয়ে লোহার শক্ত জালের মধ্যে আনার ব্যবস্থা হয়েছে। কেননা মন্ত্রী নবুচন্দ্রের মতে :

> না হলে হুজুর কত ঘুরবেন জানোয়ারদের পেছনে পেছনে। জানোয়ারগুলো এমনই মাথামোটা যে হুজুরকে যে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে হয়—সে বুদ্ধিও ওদের নেই।[৪৪]

মাচানে শক্তিশালী নিরাপত্তার ঘেরাটোপে বসে 'বাঘের রক্ত' দেখার জন্য উত্তেজিত মহারাজ শিকারের অপেক্ষা করতে থাকেন। কামান দেগে শিকার করা হবে। অনেক চিন্তাটিন্তা করে মহারাজ ফরমান দিয়েছেন :

> কামানের নল থাকবে আকাশের দিকে। গোলার আওয়াজ আর আগুন দেখেই বাঘ মারা পড়বে। না হলে নিরীহ ছাগলগুলো যে মারা পড়বে। এতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।[৪৫]

হঠাৎ 'ঘোৎ' আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী নবুচন্দ্রের কোমরে বাঁধা দড়ি যার অপর প্রান্ত মহারাজের হাতে তাতে টান পড়ে। ফলে পরিকল্পনামাফিক যথারীতি কামান দাগা হয়। কিন্তু মশাল জ্বেলে বাঘের চিহ্নমাত্রও পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে আলো-আঁধারে কিছু পড়তে দেখে আরেকপ্রস্থ হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। মহারাজ তাড়াতাড়িতে মাচানে উঠতে না পেরে ঢুকে পড়েন ছাগলের খালি খাঁচায়। মন্ত্রী নবুচন্দ্র দড়ি জড়িয়ে মাটিতে পড়ে ভয়ে কেঁদে ওঠে। দেখা যায় ঝোপ নড়ার কারণ আসলে কামানের শব্দে ভীত পলাতক ছাগল চারটে। গল্পের শেষে জানা যায়, ঘোঁৎ শব্দটা ছিল মহারাজের নাক ডাকার। বাঘের জন্য মহারাজ জেগে বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ে সামনে ঝুঁকে পড়তেই দড়িতে টান পড়ে ঐ কাণ্ড। তা শুনে সর্বাঙ্গে ধুলোমাখা মন্ত্রী নবুচন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করে :

> ভাগ্যিস এটা হয়েছিল। না হলে মহারাজার হাত ফসকে বাঘ পালাবে। না, না, এটা আমাদের কানে শোনাও পাপ।[৪৬]

গোটা গল্পটিতেই বাঘ শিকার অভিলাষী মহারাজ ও তার মন্ত্রী চাটুকার মোসাহেবের প্রতি ধরা আছে সরস কৌতুকের আড়ালে সুতীব্র ব্যঙ্গ।

শৈবাল চক্রবর্তীর 'শিকার' (*শুকতারা*, ১৪০২) গল্পটিতে বাঘের দৌরাত্ম থেকে গ্রামকে গ্রাম রক্ষার জন্য চটজলদিপুরের মহারাজ বাঘ শিকারে যেতে ইচ্ছুক। অথচ তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে কর্মচারীদের এক বছর, ছ মাসের মাইনে বাকি। এর উপর শিকারে গেলে হাতি, মাহুতের খরচ আছে। বহু পুরনো তরোয়াল, ঢাল হয়ে আছে অকেজো। সাতপুরুষের জং ধরা বন্দুকের নলে বাসা বেঁধেছে শালিখে। তাও পরদিন সন্ধ্যায় রাজার জেদ বশত শিকারের বন্দোবস্ত হয়। রাজা 'দুরাচার' 'নরাধম' বাঘকে নিকেশের জন্য যে বন্দুক তাক করে ধরে আছেন তাতে যে আদৌ টোটা ভরা নেই তা রাজার অজানা। বাঘ বেধড়ক আওয়াজ করতেই রাজাও উল্টোদিকে তাক করে বন্দুক ছোঁড়েন, বন্দুকের কুঁদোর গুঁতোর ঘা খেয়ে মন্ত্রী হাতি থেকে নিচে পড়ে যান। হাতির পায়ের কাছে হাড্ডিসার এক জন্তুকে চিৎপাত পড়ে থাকতে দেখে রাজার নিজের শিকার সাফল্যে আনন্দের সীমা থাকে না; নিজেই জয়ধ্বনি দেন, 'দি টাইগার ইজ ডেড, লং লিভ দি কিং'। রাজ্যসুদ্ধ সবাইকে রাজবাড়ির ভোজে নেমতন্ন করে বসেন; মন্ত্রীর মুখে রাজকোষের সম্বল মাত্র আটত্রিশ টাকা বত্রিশ পয়সা শুনে অবশ্য 'চটজলদিপুরের রাজা'কে দ্রুত হাস্যমুখে 'চটজলদি-সিদ্ধান্ত' নিতে হয়—শিকার সাফল্যে তারা কজনই না হয় আলুকাবলি খেয়ে ফুর্তি করবেন। মন্ত্রী অবশ্য বাঘ শিকারের জন্য রাজাকে বাহবা দিতে পারেন না। কারণ হাতির পিঠ থেকে পড়ার সময় তাঁর হাতের ভোঁতা বল্লমই জন্তুটার শরীরে বিঁধেছে। সর্বোপরি পড়ে থাকা প্রাণীটি বাঘ নয় ভুঁড়ো শেয়াল। তা আবার প্রাণেও মরেনি, আলো ফোটবার আগেই গভীর জঙ্গলে লম্বা দেবে। রাজা ও তার কর্মচারীদের কাণ্ডকারখানায় সমগ্র গল্পটির পরতে পরতে যেমন জড়িয়ে আছে দেদার মজা, তেমনি আবার উঠে এসেছে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে রাজাদের ক্ষমতালোপের পর তাদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থাও। অতীতের রাজকীয় মেজাজ, আকাঙ্ক্ষা থাকলেও রাজাদের তা পালন করার মতো সামর্থ্য ও প্রতিপত্তি আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাজা ও রাজাদের রাজকীয় শিকার-বিলাস আজ ইতিহাসের পাতাতেই লুপ্ত।

বেশ কিছু গল্পে দেখা যায়, শিকারের রোমাঞ্চ, শিহরণ বা শিকারি হিংস্র প্রাণীটিকে নিয়ে ভয় পুরোদস্তুর বর্তমান। কিন্তু শেষপর্যন্ত হিংস্র জন্তুটির জায়গায় আবিষ্কৃত হয়েছে অন্য কিছু— বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোনও নিরীহ প্রাণী বা চোর। ফলে সৃষ্ট হয়েছে হাস্যরসের। এ ধরনের গল্প যেমন পূর্বে হেমেন্দ্রকুমার রায় (বাগানের বাঘ', *রামধনু*) প্রমুখরা লিখেছেন তেমনি পরবর্তীকালেও শ্যামাপ্রসাদ নাথ ('বাঘ

নয় বাঘ মিঞ্া', *শুকতারা* ১৩৬৯), রণজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ('বাঘ নয় বাঘ ডাঁশা', *শুকতারা* ১৩৮৩), কমল লাহিড়ীদের ('শাল বনের বাঘ', *শুকতারা* ১৩৯৮) কলমেও রচিত হচ্ছে।

ছোটোদের জন্য রচিত শিকারকেন্দ্রিক হাসির গল্পগুলিতে বাঙালি অস্ত্রের বদলে এত বিচিত্র নানা উপায়ে বন্য প্রাণীর মোকাবিলা করেছে যে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। কখনও আক্রমণোদ্যত সাপের মাথায় কড়া নস্যি ঢেলে দেওয়ায় সাপ বারংবার হেঁচে বিষ বেরিয়ে গেলে সাপকে তখন আছড়ে মেরে ফেলা হয়েছে (হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'তাপ্পিদার সাপ শিকার', *আনন্দমেলা,* ১৩৮৬), কখনও হাসির শব্দের ভাইব্রেশনেই ভালুকের হৎপিণ্ড চৌচির হয়ে ভালুক মরেছে (চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্তর 'ভোম্বল মামার শব্দভেদী', *আনন্দমেলা*)। কখনও বা ক্ষুধার্ত ভয়ঙ্কর বাঘের সামনে বন্দুকের ট্রিগার কাজ না করলে রাজ্যপালের সই করা সিলমোহর মারা বন্দুকের লাইসেন্স দেখান মাত্রই নাকি বাঘ জিভ কেটে পালিয়ে যায়। কেননা, বন্দুকের চেয়ে কাগজ শক্তিশালী। আবার কখনও ভয়ের চোটে গাছের উপর থেকে হাত ফস্কে 'কালীসিঙ্গি মহাভারত' বাঘের মাথার উপর পড়ে বাঘকে করে দিয়েছে ফোকলা (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কুট্টিমামার দন্ত কাহিনী', *জয়যাত্রা*)। শিকার বা বন্দুক সম্পর্কিত কোনও জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও ভয়ের চোটে বন্দুকে চোট হয়ে গিয়ে শিকার সফল হয়ে গেলে বাঙালির বীরত্বের আস্ফালনের অবশ্য কোনও শেষ নেই (বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'অমরেশের বাঘ স্বীকার' নাটিকা)! এইসব গল্পগুলি বাঙালির আড্ডায়-মজলিশে মুখেই বাঘ, সিংহ মারার যে গল্পগাছা প্রচলিত ছিল তারই নজির। এই শিকারি দাদা, মামারা বাঙালি 'গুলবাজ', বাত্তেলা দানে ওস্তাদ বা জমাটি গল্প বলায় অত্যন্ত পারদর্শী 'মুখেমারি শিকারি'দের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

শিকার কেন্দ্রিক মিশ্র সাহিত্য সংরূপ

রুদ্ধশ্বাস টানটান উত্তেজনা শিহরণের জন্য শিকার-সাহিত্য সববয়সি শ্রোতা ও পাঠকের কাছেই আকর্ষক। তবে কিশোর বা সদ্যতরুণদের কাছে এর আকর্ষণ নিঃসন্দেহেই সর্বাপেক্ষা বেশি। ফলে শিশু-কিশোরদের মনোরঞ্জনের জন্য তাদের উপযোগী সাহিত্য পরিবেশন করতে গিয়ে লেখকরা যেমন শিকার-সাহিত্য বর্গের একটি স্বতন্ত্র সমৃদ্ধ ধারা গড়ে তোলেন তেমনি অন্যান্য সাহিত্যবর্গগুলিতেও অনেক সময়ই উপকাহিনি বা গল্পাংশ রূপে শিকারের ঘটনাকে হাজির করেন।

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি শিকার সাহিত্যের সঙ্গে অরণ্য, অরণ্যপ্রাণীদের সম্পর্কে প্রচলিত নানা লোকায়ত বিশ্বাস, অতিপ্রাকৃত ঘটনার সুচারু মিশ্রণে কখনো কখনো রচিত হয়েছে উৎকৃষ্ট অলৌকিক বা ভৌতিক-শিকার সাহিত্য (হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'শয়তান', তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুন্দরবনের জঙ্গলে', জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মায়ামৃগ', বাপ্পাদিত্যের 'বাঘ বন্দী' কিংবা নির্বেদ রায়ের 'খগ নিশা', বুদ্ধদেব গুহর 'ল্যাংড়া পাহান', সত্যজিৎ রায়ের 'তারিণীখুড়ো ও ডুমনিগড়ের মানুষখেকো')। মিশ্র সাহিত্য সংরূপ রূপে অলৌকিক বা ভৌতিক-শিকার সাহিত্যই বাঙালি লেখকদের কলমে সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। তবে শুধু ভৌতিক বা অলৌকিক সাহিত্যই নয় শিকার-সাহিত্যবর্গটি অনেকসময়ই অন্যান্য জনপ্রিয় সাহিত্যবর্গের—অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি (হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যকের ধন'-এ 'পিশাচ' রহস্য), কল্পবিজ্ঞান কাহিনি (সুকুমার রায়ের 'হেঁসোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কুহকের দেশে), গোয়েন্দা কাহিনি (সত্যজিৎ রায়ের 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য', 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ') ডাকাতের কাহিনি (হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'সুন্দরবনের মানুষ বাঘ'), রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনি (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'পদ্মার চরে ভয়ঙ্কর') মধ্যে অনায়াসে স্থান করে নিচ্ছে। গড়ে উঠছে মিশ্র-সাহিত্য সংরূপ। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য যে শিকার অভিযাত্রা করা হত তাকে ব্যঙ্গ বা প্যারডি করেই সুকুমার রায় লেখেন 'হেঁসোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি'। তবে হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের বৈজ্ঞানিক অভিযান কাহিনিগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজব জীব আবিষ্কৃত হয়েছে শিকার অভিযানের মাধ্যমেই ('অসম্ভবের দেশে', 'পিঁপড়ে পুরাণ')। বাঘ শিকারের পারিবারিক পৌরুষ ও শিকার-লিখিয়ের খ্যাতির প্রলোভন যে বাঙালির কাছে কতটা মারাত্মক হতে পারে তা সত্যজিৎ তুলে ধরেছেন ফেলুদার 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য'-এ (দেশ, ১৩৮১) জাল-শিকারি ও লেখক মহীতোষ সিংহরায়ের মাধ্যমে। আবার বাঘ শিকারের বদলে বাঘকে বাঁচানোর, বাঘকে স্নেহ যত্নে পোষ মানানোর বিকল্প-বাঙালি পৌরুষকে তিনি চিত্রিত করেছেন 'ছিন্নমস্তার অভিশাপে' (দেশ, ১৩৮৫)। বাঙালি সাহিত্যিকদের কলমে এই মিশ্র সাহিত্য সংরূপগুলিতে 'শিকার' পেয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভিন্ন মাত্রা।

শিকার থেকে সংরক্ষণের দিকে

বিশ শতকের প্রথম পর্বের শিশু-কিশোরপাঠ্য বাংলা শিকার কাহিনিগুলিতে দেখা যায় শিকারিরা বনের পশুপাখিকে দেখামাত্রই তাদের অকারণে, নির্বিচারে যথেচ্ছ হত্যা করছে (খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আফ্রিকার জঙ্গলে')। মৃত প্রাণীদের মাংস, দেহাংশও অনেক সময়ই

শিকারিরা গ্রহণ করছে না; শিকারের সফলতায় নিজেদের শিকার কৃতিত্ব জাহির ও নিজেদের বীরত্বের মহিমা প্রদর্শনই সেখানে ছিল মুখ্য। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় Sportsman শিকারিদের প্রভাবেই ভারতীয় বা বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোক Sportsman শিকারিদের আবির্ভাব। জিম করবেট, কেনেথ অ্যান্ডারসনের মতো মানবিক বিবেকবান শিকারিদের প্রভাবে এবং সর্বোপরি বিশ্বজোড়া বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ সংক্রান্ত পরিবেশবিদ, বিজ্ঞানীদের নানা আলাপ-আলোচনা, কথাবার্তা ইত্যাদির প্রভাবে বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত শিকার কাহিনিগুলিতেও ক্রমে রদবদল দেখা দিচ্ছে। নির্বিচারে উদ্দাম শিকার আমোদের বদলে শিকারিরা মানুষখেকো বা মানুষঘাতী হয়ে ওঠা বন্যজন্তু কিংবা মানুষের শস্য-গবাদি সম্পদ ক্ষতিসাধনকারী জন্তুর শিকারেই এবার কেবলমাত্র বন্দুক তুলে নিচ্ছেন। বন্দে আলী মিয়ার ‘অন্ধকারের আতঙ্ক’, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ‘বাঘের চোখ’, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘ভানুমতীর বাঘ’, স্বপন বুড়োর ‘বাঘ শিকারের কাহিনি’, প্রেমচন্দের ‘বনমানুষের গল্প’, বুদ্ধদেব গুহর ‘টাঁড়বাঘোয়া’ ইত্যাদি অসংখ্য উদাহরণ তুলে ধরা যায়। কখনো-কখনো আত্মরক্ষার স্বার্থে কিংবা অপরকে বাঁচাতে শিকার করতে বাধ্য হচ্ছেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘বনরহস্য’তে সিদ্ধেশ্বর বাবু শিকার করবেন না ঠিক করলেও আত্মরক্ষার্থে বাঘ শিকারে বাধ্য হচ্ছেন। মৃত বাঘটির কমবয়স ও সৌন্দর্য দেখে তার আফসোস, আক্ষেপও হচ্ছে।

হিংস্র বন্যপ্রাণী সম্পর্কে শিকারি ও শিকার লিখিয়েদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও ক্রমশ দেখা দিচ্ছে বদল। বনের ‘শয়তান’, জনপদের ‘ত্রাস’, ‘আতঙ্ক’, ‘ভয়ঙ্কর’, ‘হিংস্র’ বন্য জন্তুজানোয়ারের মধ্যেও তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন অপার সৌন্দর্য। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘বনরহস্য’তে সিদ্ধেশ্বরবাবু আত্মরক্ষার্থে শিকারের বন্দুক সঙ্গে রাখলেও হাতে তুলে নিচ্ছেন ক্যামেরা, তিনি স্বেচ্ছায় বনবাসী হয়েছেন শিকারের জন্য নয়, অরণ্যের পশুপাখি কীটপতঙ্গের অতুলনীয় সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক জীবনকে পর্যবেক্ষণের জন্য। বাংলা বাঘ শিকারের গল্পগুলিতে বাঘের ভয়ঙ্করতা, হিংস্রতা, চতুরতার সঙ্গে সঙ্গে তার ডোরাকাটা সৌন্দর্য, রঙের বাহার, বিশালত্ব, বুদ্ধি ও বীরত্বও ক্রমশ বারে বারে উঠে আসতে দেখা যায়। বন্দে আলী মিয়ার ‘অন্ধকারের আতঙ্ক’তে শোনা যায় কথকের আক্ষেপোক্তি ‘অমন বীর—অমন শক্তিশালী জানোয়ার বন্দুকের মাত্র ক’টা বুলেটের মুখে প্রাণ বিসর্জন দিলে।’ অধিকাংশ গল্পেই ক্রমশ দেখা যাচ্ছে হিংস্র প্রাণীটি মানুষখেকো বা আক্রমণাত্মক বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় তাকে শিকারি মারতে বাধ্য হলেও মারার পর অনুভব করেছেন অসীম বিষণ্ণতা :

যাঁরাই নিজেরা গুলি করে কখনও কোনো জানোয়ার মেরেছেন, সে মানুষখেকো, বাঘই হোক, আর যাইই হোক তাঁরাই জানেন যে, সেই জানোয়ার যখন মারা যায় তখন বড় কষ্ট হয়। মনটা বড়ই খারাপ হয়ে আসে। (বুদ্ধদেব গুহর 'টাঁড়বাঘোয়া', *সন্দেশ*)[৪৭]

এই সময়কার শিকার-সাহিত্যিকরা অনেক সময়ই 'বন্যজন্তু'টিকে 'দোষী' রূপে চিহ্নিত না করে তার 'দোষী' অর্থাৎ মানুষখেকো বা নরঘাতক হয়ে ওঠার পেছনে আসল কারণগুলিও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। খাদ্যের অভাব, বার্ধক্য জনিত কারণ কিংবা অরণ্যে শিকার ধরার কালে বা জন্তুদের পারস্পরিক যুদ্ধকালে প্রাপ্ত আঘাত অথবা মানুষ শিকারির গুলি, তিরের আঘাতের কারণে দুর্বল হয়ে পড়লে বাঘ, চিতা ইত্যাদি হিংস্র মাংসাশী প্রাণীরা লোকালয়ে হানা দিয়ে গবাদি এবং মানুষ শিকার করে। কেননা মানুষ বা গৃহপালিত গবাদি শিকার অনেক সহজ ও তাতে তুলনামূলক সামান্য শক্তির প্রয়োজন হয়। তবে বেশির ভাগ গল্পেই দেখান হয়েছে বন্যপ্রাণীটির বিপজ্জনক মানুষখেকো বা খুনি হয়ে ওঠার কারণ মানুষেরই লোভ, হটকারিতা, ভুল পদক্ষেপ। বুদ্ধদেব গুহর 'টাঁড়বাঘোয়া'তে যে বাঘ কখনও পলাশবনার কারও ক্ষতি করেনি, সেই মানুষখেকো হয়ে ওঠে টিকায়েতের ব্যর্থ শিকারের ফলে। কোটরা হরিণ ভেবে গুলি মারলে তা টাঁড়বাঘোয়ার লেগে যায়। সঙ্কর্ষণ রায়ের 'বন্যরা বনে'তে জোড়া বাঘের বাঘিনীকে বা প্রেমচন্দের 'বনমানুষের গল্পে' বনমানুষটিকে মানুষই নিছক শিকার আমোদে বা অকারণে মেরে ফেললে অপর সঙ্গী (বাঘ বা বনমানুষটি) বিপজ্জনক মানুষঘাতী হয়ে ওঠে।

শিকারি মানুষখেকো সন্দেহে যে বাঘ বা চিতাকে হত্যা করতে বাধ্য হন, অনেক সময় হত্যার পর দেখা যায় বাস্তবে সে আদৌ মানুষখেকো থাকেনি—এই গুরুতর সমস্যাটি উঠে এসেছে বুদ্ধদেব গুহর 'টাঁড়বাঘোয়া'তে। টাঁড়বাঘোয়া ও বাঘিনী উভয়েরই শিকার সমাপ্ত হবার পর টেডের মনে হয়, বাঘিনী যেরূপ সাংঘাতিক চালাক এবং যেভাবে ফিরে যাবার কায়দা দেখিয়ে, অতগুলো গুলির শব্দ শোনার পরও ভরদুপুরে দু-দুজন শিকারিকে এতখানি সে নিঃশব্দে ফলো করে এসেছে তাতে মানুষ অনুসরণ তার নতুন নয়। তাই তার সন্দেহদীর্ণ প্রশ্ন—তাহলে কি টাঁড়বাঘোয়া নয়, সবই এই বাঘিনীর কাজ? কেননা, টিকায়েতের গুলি খাবার পরেও এক বছর টাঁড়বাঘোয়া একজনকেও মারেনি। অথচ বাঘিনী উপস্থিত হতেই মানুষখেকোর উপদ্রব শুরু হয়। সন্দেহ-আতঙ্ক ও ভুল বোঝাবুঝির ফলেই টাঁড়বাঘোয়া বা টাঁড়বাঘোয়ার মতো আদৌ হয়তো সত্যিকারের

মানুষখেকো নয় এমন বাঘকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হয় আজও। 'টাঁড়বাঘোয়া'তে উঠে আসা এই সমস্যাটি আজ একবিংশ শতাব্দীতেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ঠিক এরকমই আর একটি জরুরি প্রশ্ন ধরা পড়েছে প্রেমচন্দের 'বনমানুষের গল্পে'—মানুষের ভুল পদক্ষেপে কোনও বন্যপ্রাণী যদি হিংস্র বিপজ্জনক মানুষঘাতী হয়ে ওঠে তাহলে কি তার একমাত্র শাস্তি মানুষেরই নির্ধারিত মৃত্যুদণ্ড? এই প্রশ্নটি আজ একবিংশ শতাব্দীতেও অমীমাংসিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী কালে আগ্নেয়াস্ত্র-জিপগাড়ি-স্পটলাইট সহজলভ্য হয়ে যাওয়ায় এগুলি সহযোগে বাঙালি শহুরে শখের শিকারিরা শিকারে মেতে ওঠে। স্বাধীন নতুন দেশের খাদ্য ও বাসস্থানের চহিদা পূরণে কৃষি জমি ও বাসযোগ্য জমির সম্প্রসারণ, নানা উন্নয়ন প্রকল্প, বাঁধ নির্মাণ, দেশভাগের ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন—ইত্যাদি নানা কারণে বনজঙ্গল ব্যাপকভাবে কাটা হতে থাকে। ফলে বনজঙ্গল ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বন্যপ্রাণীদেরও নিধন করা হতে থাকে। খাদ্য ও বাসস্থানের অভাবে বন্যপ্রাণীরাও লোকালয়ে হানা দিতে থাকে। ফলে বন্যজন্তু ও মানুষের সংঘাত, সংঘর্ষও বৃদ্ধি পায়। এই সময়কার বাংলা শিশু-কিশোর পত্রিকাগুলিতে পুনরায় শিকার-সাহিত্যের বাড়বাড়ন্ত ঘটে। প্রায় প্রতিটি জনপ্রিয় শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকা, বার্ষিকীর পাতাতেই শিকার-সাহিত্যের পৃথক সুনির্দিষ্ট বিভাগ দেখা যায়। ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য্য, বুদ্ধদেব গুহ, বীরু চট্টোপাধ্যায়, নির্বেদ রায় প্রমুখরা এখানে ছোটোদের রোমাঞ্চ শিহরণ জাগানো রোমহর্ষক শিকার-সাহিত্য নিয়মিত পরিবেশন করছেন। অবশ্য খেয়াল করলে দেখব বাঙালি শখের শিকারিরা যখন আধুনিক নানা আগ্নেয়াস্ত্র-শিকার সরঞ্জাম সহযোগে ভারতীয় অরণ্যগুলির অবশিষ্টাংশের ধ্বংসলীলা ও প্রাণীমেধ যজ্ঞে মেতে ওঠে, ঠিক সেই সময়েই অর্থাৎ বিশ শতকের প্রায় চার থেকে ছয়ের দশকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলির শিকার-সাহিত্য (গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ) ও অরণ্য কাহিনিগুলিতে মাঝেমাঝেই উঠে আসতে দেখা যায় শিকার সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন (সঙ্কর্ষণ রায়, প্রেমচন্দ্, বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখদের লেখা); ক্রমশ প্রাধান্য পেতে থাকে শিকার বিরোধী সংরক্ষণের সুরটি।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের শিকার আইনত নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে সাত-আটের দশক থেকেই বন্যপ্রাণীর শিকারের বদলে বন্যপ্রাণীকে তাদের নিজস্ব বাসভূমিতে স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য অরণ্য-পর্যটন বিশেষত দেশ-বিদেশের অভয়ারণ্যগুলি ভ্রমণ ভিত্তিক সাহিত্য বা সাফারি-সাহিত্যের প্রাচুর্য দেখা যায়। সাহানা ঘোষের 'কাজিরাঙার জঙ্গলে', তাপস গঙ্গোপাধ্যায়ের

'সিমলিপালের জঙ্গলে', নীরদ রায়ের 'কুলিক পক্ষিনিবাস', বিনায়ক মিশ্রের 'কান্‌হার আদিম অরণ্য', আনন্দ সেনের 'করবেট পার্কে কিছুক্ষণ', অভিষেক দাসের 'কেনিয়ার জঙ্গলে', দীপালি চৌধুরির 'আফ্রিকার জঙ্গলে'—এরূপ অসংখ্য উদাহরণ তুলে ধরা যায়। তবে উক্ত পত্রপত্রিকাগুলিতে শিকার-সাহিত্য প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছল এমন নয়। বিশ শতকে নয়ের দশক পর্যন্ত শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে (*শুকতারা, কিশোরী ভারতী, আনন্দমেলা*) শিকার-সাহিত্যের উপস্থিতি নজরে পড়ে। এমনকি শিকার-সাহিত্য ও শিকারি (জিম করবেটকে) নিয়ে বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হতে দেখা যায়। শিকার নিষিদ্ধ হওয়ার বাস্তবতাকে মান্যতা দিতে বর্তমানের বদলে অতীত বা সদ্য অতীতে ঘটা কোনও শিকার ঘটনা (রাজকুমার মৈত্রের 'পাত্থরগড়ের শয়তান', বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঘবন্দী', পরেশ দত্তর 'বাঘের মুখোমুখি') কিংবা বর্তমানের পটভূমিতে হলে সরকারিভাবে ঘোষিত বিপজ্জনক প্রাণীর শিকার (বুদ্ধদেব গুহর ঋজুদার অনেকগুলি কাহিনি) নিয়ে রচিত শিকার-সাহিত্যই অবশ্য এক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে।

এ কালপর্বে বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলির ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন স্বয়ং শিকারি ও সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহর সৃষ্ট বাঙালি বিবেকবান শিকারি ঋজুদা। জঙ্গলে জঙ্গলে কাঠের কারবার করে বেড়ানো ঋজু বোসের প্রথম আত্মপ্রকাশ 'ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে' (১৯৭৩ খ্রি.)। সাত-আট-নয়ের দশক জুড়ে মূলত '*আনন্দমেলা*'য় (এছাড়াও অন্যান্য পত্রিকাতে) বুদ্ধদেব গুহ ঋজুদাকে নিয়ে একের পর এক শিকার-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি লিখেছেন। ঋজুদা কেবলমাত্র বিপজ্জনক হয়ে ওঠা মানুষখেকো বাঘ কিংবা 'রোগ্‌' হাতিকেই বাধ্য হয়ে শিকারে উদ্যত হয়েছেন। ঋজুদার সাগরেদ রূপে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হাজির হয়েছে রুদ্র। সে শুধু সাগরেদই নয়, ঋজুদা সিরিজের বেশির ভাগ কাহিনির কথক সে। সেই সঙ্গে সফল শিকারিও। পরবর্তী ঋজুদার কাহিনিতে জুটে আরও দুই উজ্জ্বল সঙ্গী তিতির ও ভটকাই। অরণ্যের প্রতি সুগভীর প্রেম, রোমান্টিকতা যেমন কাহিনিগুলির পত্রেছত্রে ধরা আছে তেমনি উঠে এসেছে অরণ্যপ্রাণী এমনকি যাকে ঋজুদা বা রুদ্র শিকার করতে বাধ্য হবে তার প্রতিও সুগভীর দরদ, সহানুভূতি। 'অন্য শিকার' (*আনন্দমেলা*, ১৯৮৫ খ্রি.) বুদ্ধদেব গুহর একটি অন্য ধরনের সৃষ্টি। ঋজুদার বলা এই গল্পে শিকারি ও শিকারের মধ্যেকার শ্রদ্ধা-ভালোবাসা - প্রতিযোগিতার সম্পর্কটি চিত্রিত হয়েছে। গল্প শেষে ঋজুদার ব্যঞ্জনাময় উক্তি অবিস্মরণীয় :

> একজন মানুষের মতো মানুষ অথবা একটি বাঘের মতো বাঘকে মেরে ফেলা

যায়, ধ্বংস করা যায়; ছিঁড়ে টুকরো টুকরোও করে দেওয়া যায় সহজেই কিন্তু হারানো যায় না তাদের।[৪৮]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ঋজুদা সিরিজেও এসেছে নানা পরিবর্তন। শিকার নিষিদ্ধ বলেই সম্ভবত বুদ্ধদেব পরবর্তীকালে শিকার কাহিনি লেখায় ততটা আগ্রহী হননি। কিন্তু শিকার কাহিনি লেখার লোকের অভাবের জন্য সম্পাদকদের অনুরোধে তাকে তা লিখতে হয়েছে। পরবর্তীকালে ঋজুদাকে নিয়ে তিনি গোয়েন্দা ও অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিও লিখেছেন। আর 'রুআহা'তে পূর্ব আফ্রিকায় পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত চোরা শিকারি চক্রের বিরুদ্ধে লড়েছে ঋজুদা-রুদ্র ও তিতির।

বর্তমানের প্রেক্ষাপটে শিকারের প্রসঙ্গ নিয়ে ছোটোদের জন্য সাহিত্য রচনা করতে গেলে সাহিত্যিকরা স্বাভাবিক ভাবেই বিষয় রূপে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেছে নিয়েছেন চোরাশিকারিদের হাত থেকে বন্যপ্রাণকে রক্ষার গল্প। সমীর রক্ষিতের 'সাংপো লামার কালো বাঘ' (*আনন্দমেলা*, ১৩৯১) তিনজন কিশোরের প্রচেষ্টায় দার্জিলিং-এর সাংপো লামার কালো বাঘ কলকাতার চোরাশিকারিদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। গণ্ডারের শিং-এর জন্য চোরা শিকার—একটি অন্যতম সমস্যা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাকাবাবু ও চোরাশিকারি' (১৯৯৫)-তে কাকাবাবু ও সন্তু চোরাশিকারি টিকেন্দ্রজিৎ-দের প্রচেষ্টাকে ভেস্তে দিয়েছেন। কাজিরাঙ্গার অভয়ারণ্যে গন্ডার মারা চোরাশিকারিদের সঙ্গে টক্কর দিয়েছে ঋজুদা, রুদ্র এবং ভটকাই 'মোটকা গোগোই'-এ। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের নায়কদের বীরত্ব, দুঃসাহস, পৌরুষের পরিচয় মেলে আর বন্য প্রাণীর শিকারে নয়; উল্টে বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষায়, বন্যপ্রাণীদের চোরা-শিকারি বা অনিষ্টকারীদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই, প্রতিরোধে।

বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে সাতের দশক থেকেই ক্রমশ দেশ-বিদেশের পরিবেশ সংক্রান্ত নানা আন্দোলন, বন্যপ্রাণীদের বিপন্নতা-বিলুপ্তি নিয়ে নানা আলোচনা [অরূপরতন ভট্টাচার্যের 'বাঘেরা যেন হারিয়ে না যায়' *(আনন্দমেলা)*, স্বপন কুমার দাসের 'বিপন্ন গন্ডার' *(আনন্দমেলা)*, শৈল চক্রবর্তীর 'অরণ্য জীব যদি লুপ্ত হয়' *(কিশোর ভারতী)*] যেমন প্রাধান্য পাচ্ছে তেমনি দেশবিদেশে বন্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ও সহাবস্থানের সম্পর্ক নিয়ে নানা খবরাখবর ('সিংহী এলসা', 'সিমলিপালের বাঘিনী খৈরী', 'কেনিয়ার টাগা', 'বন থেকে ডাকটিকিটে') ও নানা স্বাদের গল্প প্রকাশিত হচ্ছে। সুকুমার দে সরকারের 'বন্য' *(আলপনা)* গল্পে সাঁওতাল পরগণার শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য রাইফেলের চোট খাওয়া ভালুকের শুশ্রূষায় রাতের গভীর অরণ্যে ছুটে

যান। সুবোধ ঘোষের 'চিরকিখাটের আশ্চর্য মানুষ' গল্পে উঠে আসে মানুষ ও ভালুকের অন্তরঙ্গ আশ্চর্য বন্ধুত্ব। সঙ্কর্ষণ রায়ের 'বাইসনের বনে' *(কিশোর ভারতী)* গল্পে 'কুরুবা'রা দুর্লভ বুনো গরুকে বনের মধ্যে সংরক্ষিত আগলে রাখে; শত্রু শিকারিদের থেকে বুনো গরুকে বাঁচাতে তাদের বনের হদিশ দেয় না। সুবোধ ঘোষের 'টোরি জঙ্গলের ভক্ত বাঘ' গল্পেও গ্রামবাসীরা চায়নি বাঘটি সাহেবের শিকারে পরিণত হোক। সঙ্কর্ষণ রায়ের 'সহযাত্রী বাঘ' গল্পে মানুষ ও বাঘ পরস্পরের উপকারে এসেছে, প্রাণ বাঁচাতে পরস্পরের সহায়ক হয়েছে। বিশ শতকের প্রথম পর্বের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতে হাতি শিকারের বিশেষ গল্প পাওয়া না গেলেও দ্বিতীয়ার্ধে বেশ কিছু হাতি শিকারের বিশেষত দলছুট মত্ত গুণ্ডা হাতি শিকারের কাহিনি প্রকাশিত হতে দেখা যায় [শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মত্ত মাতঙ্গ', মঞ্জরী লাহিড়ীর 'মেরুর পাগলা হাতি', ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দলমা পাহাড়ের শয়তান', তুষারকান্তি বসুর 'কালো শয়তানের অপমৃত্যু']। কেননা, খাদ্যের সন্ধানে হাতির বন ছেড়ে আসা, শস্য নষ্ট করা, হাতির হানায় মৃত্যু— স্বাধীনোত্তর ভারতের একটি অন্যতম সমস্যা। তবে হাতি সম্পর্কে শিশু-কিশোর মনে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি যাতে না গড়ে ওঠে তাই হাতি ও মানুষের সম্পর্ক নিয়েও অজস্র গল্প একালপর্বে ছোটোদের জন্য রচিত হচ্ছে [সমরেশ বসুর 'বুনো হাতির বন্ধুত্ব', সোমনাথ নন্দীর 'সাথী', এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের 'দলমা পাহাড়ের হাতি', দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঁশপাহাড়ির দাঁতাল হাতি', শিবশঙ্কর মিত্রের 'গজরাজ', জীবন সরকারের 'ওদলা বাড়ির মা', তপন সিংহের 'সফেদ হাতি']। এই বুদ্ধিমান প্রাণীটি যে স্বাভাবিক অবস্থায় সচরাচর ক্ষতি করে না, তাদেরও আছে স্নেহ-ভালোবাসা এমনকি অপরাধ-অনুশোচনার বোধ—এই বার্তাটি গল্পগুলিতে বারেবারে উঠে আসছে। দিলীপ ভট্টাচার্য 'হাতিমারার জঙ্গলে' গল্পটিও ট্রেনে হাতি কাটা পড়ার সমস্যাটি হাজির করেছেন।

আবার বন্যরা যে বনেই সুন্দর, তাদের মানুষ জোর করে ঘরে পুষলে ফলাফল যে অনেক সময়ই ভালো হয় না তাও ছোটোদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে কিছু গল্পে। সঙ্কর্ষণ রায়ের 'অজগরের আদর' কিংবা প্রদোষ দত্তের 'বাঘ পোষা'তে বন্য প্রাণীগুলিকে শেষ পর্যন্ত চিড়িয়াখানার হাতে তুলে দিতে হয়েছে। গৌতম মুখোপাধ্যায়ের 'সীবা'তে ফাদারের পোষা লেপার্ড রক্তের স্বাদ পেয়ে মানুষখেকো হয়ে উঠলে ফাদারও সীবাকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচাতে পারেন না। শিকারির গুলিতে মৃত্যু হয়েছে সীবার। আর গুলিবিদ্ধ সীবার কামড়ে করুণ মৃত্যু ঘটেছে ফাদারের। রামকৃষ্ণ দত্তের 'জঙ্গল ছাড়িয়ে'তে বিজয় পোষার জন্য বাঘ বাচ্চা দুটি ধরে আনলেও বাঘিনী

বাচ্চার মায়ায় এসে উপস্থিত হলে তাকে গুলি করে শিকার না করে বাচ্চা দুটিকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত, বন্যপ্রাণী লোকালয়ে চলে আসার সমস্যা, টাইগার প্রোজেক্টের লোকজনের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ, ঘুমপাড়ানি গুলির সঠিক ব্যবহারের ত্রুটিতে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ইত্যাদি সমস্যাগুলি এবং মানুষের সচেতনতা-সহৃদয়তা ও অরণ্যলগ্ন মানুষদের সহায়তায় যে বন্যপ্রাণীদের সংরক্ষণ করা সম্ভব হতে পারে এই বার্তাটি—বিশ শতকের শেষপর্বের শিকার- সাহিত্যগুলিতে উঠে এসেছে (পরেশ ভট্টাচার্যের 'বাঘিনীর লুকোচুরি' ইত্যাদি)।

তথ্যসূত্র

১. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *বনে জঙ্গলে* (কলকাতা : দে'জ, ২০১৬), ২২।

২. তদেব, ৩১।

৩. গীতা দত্ত (সম্পা.), *হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী (২৭)*, ৫৯।

৪. *বনে জঙ্গলে*, ৯১।

৫. অনুরাধা রায়, *ইতিহাসের হরেক গেরো* (কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০১৯), ২৩৮, ২৪২।

৬. বাঙালির অরণ্যপ্রেম সম্পর্কে বিশদ জানতে দ্রষ্টব্য চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল (সম্পা.), *অরণ্যসমগ্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়* (কলকাতা : গাঙচিল, ২০১৩) বইটির ভূমিকা 'অরণ্য কথা' এবং চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল, *বিভূতিভূষণ স্ববিরোধী সংবেদ* (কলকাতা : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৯) বইটি।

৭. *হেমেন্দ্রকুমার রচনাবলী (২৭)*, ৫৯।

৮. *রামধনু*, ১৩ বর্ষ, ৪৬৯।

৯. তদেব, ৪৬৯।

১০. *বনে জঙ্গলে*, ১৪৬।

১১. তদেব, ১৪৬।

১২. তদেব, ১৫৪।

১৩. তদেব, ১৫১।

১৪. তদেব, ১৭৬।

১৫. তদেব, ১৬৫।

১৬. তদেব, ১৫২।

১৭. তদেব, ১৫৭।

১৮. তদেব, ১৬৩।

১৯. *হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী (২৬)*, ১২৩।

২০. তদেব, ১২৫।

২১. *সন্দেশ সেরা উপন্যাস সংকলন,* ২৬০।

২২. *মৌচাক,* ১৬শ বর্ষ, ৫৮৪।

২৩. *বনে জঙ্গলে,* ৭৫।

২৪. তদেব, ৫২।

২৫. তদেব, ৬০।

২৬. *সন্দেশ সেরা উপন্যাস সংকলন,* ২৭৫।

২৭. তদেব, ২৭৫।

২৮. *বনে জঙ্গলে,* ৬০।

২৯. *সন্দেশ সেরা উপন্যাস সংকলন,* ২৬০।

৩০. *রামধনু,* ১৩শ বর্ষ, ৩৬।

৩১. তদেব, ৩৭।

৩২. *রামধনু,* ২৩শ বর্ষ, ২৩১।

৩৩. তদেব, ২৩১।

৩৪. *রামধনু,* ২৪শ বর্ষ ৪০৮।

৩৫. তদেব, ৪০৯।

৩৬. তদেব, ৪০৫।

৩৭. *রামধনু,* ৭ম বর্ষ, ৩৭২।

৩৮. তদেব, ৫৮৭।

৩৯. তদেব, ৫৮৮।

৪০. ''The History of Balloons'', accessed 2nd Feb, 2022, https://www.balloonhq.com/fag/history.html.

৪১. https://en.wikipedia.org/wiki/High-altitude-balloon. (accessed 2nd Feb, 2022).

৪২. *রামধনু,* ৭ম বর্ষ, ৫৯০।

৪৩. অর্ধেন্দু দত্ত, শিকারের গল্প (দে'জ : কলকাতা, ১৯৮৭), ৬।

৪৪. *শুকতারা,* (কলকাতা : শুকতারা কার্যালয়, ১৩৮৯), ৩৭০।

৪৫. তদেব, ৩৭০।

৪৬. তদেব, ৩৭১।

৪৭. বুদ্ধদেব গুহ, টাঁড়বাঘোয়া, *সন্দেশ* (কলকাতা : সন্দেশ কার্যালয়, ১৯৬১)

৪৮. *আনন্দমেলা* শারদীয়া, (কলকাতা : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১৯৮৫), ১৯০।

উপসংহার

ভারত তথা বাংলায় সুপ্রাচীন কাল থেকেই শিকার প্রচলিত। প্রথমে তা ছিল মূলত খাদ্য ও আত্মরক্ষার্থে। পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয় বিলাস-বিনোদন। ভারত তথা বাংলায় সুপ্রাচীন কাল থেকেই একই সঙ্গে অরণ্য-অরণ্যপ্রাণীর পূজা বা উপাসনা এবং অরণ্যপ্রাণী বধ বা শিকার প্রচলিত। শিকারকে নিয়ে ভারতীয় তথা বাঙালি মানসে একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল ছিল ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের বোধ। শিকারে শরীর-মন বিকাশের কথা জানা থাকলেও শিকারের গুণ ও দোষ উভয়ই ভারতীয় বা বাঙালির ধ্যানধারণায় মান্যতা পেত।

বাঙালি বিশেষত মধ্যবিত্ত বাঙালি শিকারের প্রতি আকৃষ্ট হয় মূলত ঔপনিবেশিক কালেই। শিকার ভারতে সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত থাকলেও তার গুণগত মাত্রায় বড়োসড়ো রদবদল ঘটে ব্রিটিশ আমলে। শিকারের সঙ্গে ঔপনিবেশিক প্রভু ও উপনিবেশবাসী উভয়েরই সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নানা জটিল গূঢ় অভিপ্রায় যুক্ত হয়ে যায়। ফলে শিকার হয়ে ওঠে বহুমাত্রিক সংস্কৃতির অঙ্গ।

ব্রিটিশদের কাছে শিকার অতিপ্রিয় বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে ওঠে ঔপনিবেশিক শাসকের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা ও অতিপৌরুষের প্রকাশক। সেইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের অঙ্গ অর্থাৎ ভারতীয় জনগণকে বন্যপ্রাণীর হাত থেকে ধন ও প্রাণের সুরক্ষা প্রদানের আশ্বাস দিয়ে ভারতে উপনিবেশের ভিতকে সুদৃঢ় করার পন্থা। অন্যদিকে ভারতীয় বা বাঙালি রাজা-জমিদাররা শিকার-পার্টির আয়োজন করে ব্রিটিশ শাসকের প্রতি যেমন তাদের আনুগত্য প্রকাশ করত তেমনি নিজেদের হৃত গৌরব, প্রাচুর্য, বীরত্ব বা রাজকীয় ইগোকে চাঙ্গা করতে চাইত। বিশ শতকে ভারত ও বাংলায় রাজন্য শিকারি ও গ্রামীণ নিম্নবর্গ বা উপজাতির শিকারিদের ছাড়াও উত্থান ঘটে তৃতীয় একদলের—শিক্ষিত ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত ভারতীয় বা বাঙালি শখের শিকারির।

ইংরেজদের শিকারপ্রীতি ও শিকার-সাহিত্যে প্রচারিত দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় বিশেষত শিক্ষিত বাঙালিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সাহিত্য-সাজসজ্জা সংস্কৃতির মতো সাহেবদের শিকার স্পোর্টসটিকেও বাঙালি অনুকরণ করতে চাইত। শিকার তাদের কাছে 'বীরত্ব'-এর সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠল 'ক্ষমতা', 'আভিজাত্য', 'সভ্যতা', 'আধুনিকতা'রও প্রতীক। ফলে বাঙালি যে শুধু শিকারের প্রতি আকৃষ্ট হল এমন নয়, তারা শিকার-সাহিত্য চর্চাতেও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল।

আর জাতীয়তাবাদী কালপর্বে বাঙালির শিকার ও শিকার-সাহিত্য চর্চার সঙ্গে যুক্ত হল জাতীয়তাবাদী অভিপ্রায়। বাঙালির 'মেয়েলি', 'ভীরু', 'কাপুরুষ' কলঙ্কগুলি মোচন করতে এ কালপর্বে যখন বাঙালি তরুণ প্রজন্মের শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষসাধনে বিশেষ জোর পড়ল তখন বাঙালির একাংশ শিকার ও শিকার-সাহিত্য চর্চাতে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠল। কেননা, ইতিমধ্যেই ব্রিটিশদের বদান্যতায় শিকারের সদ্‌গুণগুলি সর্বজনমান্যতা পেয়ে গেছে।

শিকার-সাহিত্যের উদ্দিষ্ট পাঠক মূলত তরুণরাই। তাই তৎকালীন বাংলা শিশু-কিশোর পত্রিকাগুলিও তাদের কিশোর বা সদ্য তরুণ পাঠকদের জন্য শিকার-সাহিত্য পরিবেশনে বিশেষ উৎসাহী হয়। এর পেছনে ইংরেজি Young Adult Magazine -গুলিতে প্রকাশিত শিকার-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলির ও ইংরেজি Public School-এর শরীরচর্চায় গুরুত্বদানের চিন্তাধারাটিরও প্রভাব ছিল। জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে দরকার হয় এমন বাঙালি তরুণ, কিশোরদের যারা দেশের কাজে দ্বিধাহীন ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে সক্ষম, মৃত্যুভয়শূন্য। ফলে শুধু বাঙালি শিকারিরাই নন বিখ্যাত-অখ্যাত বহু সাহিত্যিকই তরুণ প্রজন্মের জন্য উক্ত পত্রপত্রিকাগুলিতে শিকার-সাহিত্য রচনা করছেন। এর মাধ্যমে নবীন প্রজন্মের সামনে তারা বাঙালির পুরুষত্বের প্রতীকী পুনরুদ্ধারে ও দুঃসাহসী বীরনায়কের নজির তুলে ধরতে বারে বারে সচেষ্ট হচ্ছেন। শিকার-সাহিত্যে পাঠক লাভ করে টানটান উত্তেজনা, রোমাঞ্চানুভূতি। আর কৈশোর বা বয়ঃসন্ধির মধ্যেই থাকে রোমাঞ্চপ্রিয়তা, উত্তেজনা, বীরত্ব বা পৌরুষকে প্রমাণের তীব্র বাসনা, অজানা ভয়ঙ্করের মোকাবিলার আকাঙ্ক্ষা ও রোমান্টিক স্বপ্নবিভোরতা। ফলে জাতীয়তাবাদী কালপর্বে শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত শিকার-সাহিত্যগুলি তরুণ পাঠকদের কাছে অচিরেই প্রবল জনপ্রিয়তা লাভ করে। শিকার-সাহিত্যগুলির এই রমরমা বিশ্বযুদ্ধের সময় বাঙালির যৌবনবাদের জোয়ারের কালে, মুক্তিসংগ্রাম বিশেষত চরমপন্থী আন্দোলন কালে ও স্বাধীনতা পরবর্তী নতুন দেশ গঠনের কালেও বর্তমান ছিল।

বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাতে ধরা থাকা জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণাগুলি কখনই একমাত্রিক নয়। তার মধ্যে বর্তমান রয়েছে নানা জটিলতা ও টানাপোড়েন। বাঙালি তরুণদের সামনে বীর নায়কের আদর্শ পুরুষপ্রতিমা তুলে ধরতে বাঙালি অভিজাত রাজা, নিম্নবর্গ ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত—তিন

ধরনের শিকারির নজিরই তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্য বিদেশি বীর শিকারিদেরও হাজির করা হয়েছে। ইংরেজের জাতিবৈরের প্রতিজাতিবৈর ছোটোদের শিকার-সাহিত্যগুলিতে সেভাবে প্রাধান্য পায়নি। তবে কোনও কোনও গল্পে বীরত্ব, পৌরুষের ক্ষেত্রে ইংরেজদের প্রচারিত আত্ম-অপরের বিপরীত ছকটি তুলে ধরা হয়েছে।

শিকার পুরুষালি ক্রিয়া, out door activity ও তার সঙ্গে যুক্ত নিষ্ঠুর রক্তাক্ত হত্যালীলা। ফলে বাংলা শিকার-সাহিত্যগুলিতে সেভাবে মেয়ে-শিকারিদের বীরত্ব ও কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় মেলে না। তবে শিকার নিপুণ দুর্ধর্ষ বীরাঙ্গনা রূপে না পেলেও কোনও কোনও গল্পে মেয়েরা শিকার ও শিকারির বিপ্রতীপে অরণ্য, অরণ্য-প্রাণীদের সুরক্ষার জন্য যেভাবে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও একাকীই ঝাঁপিয়ে পড়ে, অরণ্য প্রাণীদের জন্য প্রকাশ করে হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহ, মমত্ব—সেগুলিও কোনও অংশে কম বীরত্বের নয়। ফলে মেয়েদের মেয়েলি গুণগুলির প্রাধান্য দিয়েই পুরুষসর্বস্ব শিকার-সাহিত্যের সমান্তরাল বা কিছুটা বিপ্রতীপেই গড়ে ওঠে শিকার-বিরোধী শিকার-সাহিত্য ধারা।

বাংলা শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলির বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। স্থল ও জলের অসংখ্য প্রাণীদের শিকার কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে। সবচেয়ে তবে প্রাধান্য পেয়েছে বাঘ শিকার। বাঘ শিকারের কাহিনিগুলিতে বীর শিকারি নায়ক (Hero) থেকে ক্রমশ বিপন্ন জনপদের রক্ষাকর্তা অতি-নায়কের (Super Hero) উত্থানটি নজরে পড়ে। বাংলা গরিলা শিকারের কাহিনিগুলিতে যেমন একদিকে বাঙালির অজানা ভয়ঙ্করের মোকাবিলা করে বীরত্ব-পৌরুষের পরিচয় দানের প্রয়াসটি দেখা যায়, তেমনি উঠে আসে জৈব বিবর্তনের পাঠ। তিমি শিকার কাহিনিগুলিতে বাঙালি লেখকরা ছোটোদের চিনিয়ে দেন এই দানবীয় শিকারলীলার পেছনে থাকা বিশ্বযুদ্ধ, পুঁজি নির্ভর বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-শিল্পের অভিঘাতকে। অস্ট্রেলিয়ার নিরীহ ক্যাঙারু শিকার কাহিনিগুলিতে এক উপনিবেশের বাসিন্দা রূপে আরেক উপনিবেশের শিকার সংস্কৃতির সঙ্গে ছোটোদের পরিচিত করার প্রয়াসটি ধরা পড়ে। বাংলা নৃমুণ্ড শিকার কাহিনিগুলি রচনার পেছনে ক্রিয়াশীল দুই বিশ্বযুদ্ধ কালে নৃশংস নৃমুণ্ড শিকার খেলার পুনরাবির্ভাব। 'অসভ্য' নৃমুণ্ড শিকারিদের চেয়ে 'সুসভ্য' 'সুশিক্ষিত' 'উন্নত' জাতির মানুষরা যে একবিন্দুও কম হিংস্র বা প্রতিহিংসাপরায়ণ, ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর নয় এই গভীর সত্যটি প্রতিভাত হয় বাঙালি লেখকদের কলমে।

শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলির উপাদান ও মুখ্যপ্রবণতাগুলির মাধ্যমে তার রচয়িতারা ভাবী তরুণ প্রজন্মের চৈতন্যকে নতুন করে গড়েপিঠে নিতে চাইছেন। বন্যপশুর পারস্পরিক যুদ্ধ দৃশ্যের মাধ্যমে ছোটোদের রোমাঞ্চকর শিহরণের আস্বাদ দেবার সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের মূল উদ্দেশ্য ছোটোদের জীববিজ্ঞান ও বাস্তুতন্ত্রের নানা পাঠ দান। শিকারির চাকর, স্থানীয় ভৃত্য, শিকার সহায়ক, অরণ্যলগ্ন মানুষদের কথা, তাদের নানা অরণ্যজ্ঞান, লোকায়ত বিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কারের কথা অপরিহার্য ভাবেই এসেছে শিকার-সাহিত্যগুলিতে। এর মাধ্যমে দেশবিদেশের মানুষদের বিশেষত অজানা প্রান্তিক মানুষদের সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষা-জীবন সংগ্রামের সঙ্গে লেখকরা দেশের ভাবী প্রজন্মকে পরিচিত করে তুলতে চাইছেন। শিকার-অ্যাডভেঞ্চারে বিপৎসংকুল পরিস্থিতিতে বন্ধুত্বের নজিরগুলি তুলে ধরে তাঁরা বাঙালি কিশোর-কিশোরীদের আত্মকেন্দ্রিকতা বর্জন করে যথার্থ বন্ধুত্বের পাঠ দিতে চান। শিকারির মানসিক টানাপোড়েন, আত্মসমালোচনা, মন পরিবর্তন—এগুলি যেমন শিকার-সাহিত্যগুলিতে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে তেমনি এগুলির মাধ্যমে হাজির হয়েছে অরণ্য ও অরণ্যপ্রাণ, শিকার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত নানা জরুরি প্রশ্ন; যা তরুণ প্রজন্মকে এইসব ব্যাপারে ভাবতে বাধ্য করবে।

শিশু-কিশোরপাঠ্য এই শিকার-সাহিত্যগুলিতে ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে পশুপাখি গাছপালা সহ অরণ্য প্রকৃতির বর্ণনা ও শিকারি বা জঙ্গল অভিযাত্রীদের বিচিত্র অরণ্যানুভূতি, অরণ্যপ্রেম। ফলে হনন হন্যে শিকারির বীরত্ব গাথার ক্ষুদ্র গণ্ডি পেরিয়ে অনেক সময় এই শিকার-সাহিত্যগুলির উত্তরণ ঘটেছে অরণ্যপাঠের বৃহত্তম আঙিনায়।

ছোটোদের শিকার-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বাঙালি সাহিত্যিকরা শিকারকেন্দ্রিক হাসির গল্প বা ছদ্ম শিকারের গল্প রচনায় বারেবারে আকৃষ্ট হয়েছেন। উদ্দেশ্য ছোটোদের হাসি মজা উপহার দেওয়া, সেইসঙ্গে কখনও বাঙালির বীরত্বের মহিমা প্রচার, সাহেব অনুকরণ কিংবা অতিরঞ্জিত মিথ্যাচারকে ব্যঙ্গ করা। কখনো বা শিকার-সাহিত্যে বুঁদ, দুর্ধর্ষ বীর শিকারি হবার স্বপ্নবিভোর বাঙালি কিশোর-কিশোরীদের স্বপ্ন ও বাস্তবতার মধ্যেকার ফারাকটি চিনিয়ে দেওয়া।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিকার-সাহিত্যগুলিতেও এসেছে সংরূপগত নানা বিবর্তন। তাছাড়াও প্রাধান্য পেয়েছে সংরক্ষণের সুরটি। উঠে এসেছে শিকার ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত নানা জটিল বাস্তব প্রশ্ন, তর্কবিতর্ক যা আজ একবিংশ শতাব্দীতেও অমীমাংসিত।

বর্তমান গবেষণায় বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত

শিকার-সাহিত্যগুলির বিচার-বিশ্লেষণ, আলাপ-আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট যে এই শিকার-সাহিত্যবর্গটির উদ্ভব ও বিকাশ নিঃসন্দেহেই বাঙালির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে সুনিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। ইংরেজদের শিকারপ্রীতি ও শিকার-সাহিত্য চর্চার দেখাদেখি, বিশেষত ইংরেজি Young Adult Magazineগুলিতে প্রকাশিত শিকার-অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলিতেও শিকার-সাহিত্যবর্গটি (সম্ভবত) আবির্ভূত হয়। কিন্তু ক্রমশ তা নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। বাঙালির জাতীয়তাবাদী কালপর্বে এই শিকার-সাহিত্যগুলি হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের অঙ্গ। আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিকার-সাহিত্যগুলিতে এসেছে বিভিন্ন বৈচিত্র্য, বহুমাত্রিক নানা স্বর ও অনিবার্য কিছু রদবদল বা বিবর্তন।

আজ বিশ শতকের শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্য বর্গটি একটি বিলুপ্ত সাহিত্য-বর্গ। তবে বাংলা এই শিকার-সাহিত্যগুলিতে ধরা থাকা টানটান উত্তেজনা, রোমাঞ্চ, দোদুল্যমান অনিশ্চয়তা, 'তারপর? তারপর?'-এর গল্প-আমেজ, রুদ্ধশ্বাস শিহরণ আজও পাঠককে এই শিকার-সাহিত্যগুলির প্রতি আকৃষ্ট করে। শিকার-ক্রিয়াটি ছাড়াও এই শিকার-সাহিত্যগুলিতে থাকা বাড়তি অলংকরণ বা উপাদানগুলি—অরণ্যপ্রকৃতির সুন্দর ও ভয়াল বিপজ্জনক রূপ, অরণ্যজীবজন্তু সম্পর্কে গল্পচ্ছলে বর্ণিত জীববিজ্ঞানের নানা পাঠ, অরণ্যলগ্ন মানুষদের কথা ও তাদের জীবন সংগ্রাম-সংস্কার-অরণ্য অভিজ্ঞান, শিকারির অরণ্য-অনুভূতি ও অরণ্যকেন্দ্রিক নানা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা-আত্মানুসন্ধান—আজকের পাঠকের কাছে কখনো-কখনো হয়ে ওঠে আকর্ষণের আসল অন্যতম কেন্দ্র। এই শিকার-সাহিত্যগুলিতে সেকালের বাংলার পথঘাট-বনজঙ্গল ও বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতিরও পরিচয় মেলে। এই শিকার কাহিনিগুলির কোনো কোনোটির হয়ে উঠেছে উৎকৃষ্ট সাহিত্য; স্পর্শ করেছে শিল্পোত্তীর্ণতার উচ্চশিখরও।

বন্যপ্রাণীর শিকার বিশেষত সেযুগে বাঙালির শুধুমাত্র নিজস্ব শিকার আমোদ চরিতার্থে নির্বিচারে বন্যপ্রাণী নিধনের ঘটনাগুলি আজকের রুচিতে আমাদের বিস্মিত ও ব্যথিত করে তোলে। আজ আমরা জানি পরিবেশ দূষণ, উষ্ণায়ন, জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন ও সর্বোপরি জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া কীভাবে নিঃশব্দে পৃথিবীর ঘাতক হয়ে উঠছে। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অরণ্য ও অরণ্যপ্রাণীদের সংরক্ষণ একান্তই প্রয়োজন। সেসব ব্যাপারে উপযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা বা প্রকল্প গ্রহণ

করতে হলে আমাদের অতীতের বন ও বন্যপ্রাণীদের প্রতি করা অপকীর্তিগুলি সম্বন্ধে যেমন সচেতন হতে হবে তেমনি বন-বন্যপ্রাণী-বনলগ্ন মানুষদের কথাও আরও গভীরভাবে জানতে হবে। এক্ষেত্রে বিশ শতকের এই শিকার-সাহিত্যগুলি আমাদের খানিক সহায়ক হতে পারে।

বর্তমান গবেষণায় অবশ্য আমরা শুধুমাত্র বিশ শতকের শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যগুলিই আলোচনা-বিশ্লেষণ করেছি। এছাড়াও বাংলায় (সাবালকপাঠ্য) বেশ কিছু শিকার-সাহিত্য (বিশেষত শিকারিদের লেখা শিকার-স্মৃতিকথা ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ি, বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখ সাহিত্যিকদের শিকার ও শিকারিদের নিয়ে লেখা গল্প, উপন্যাস) রচিত হয়েছে। সেগুলি নিয়েও আলোচনার সুযোগ ও সম্ভাবনা তাই ভবিষ্যতের জন্য থেকে গেল।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলা তথা ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি বিশেষ কালপর্বে উদ্ভূত ও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এই শিশু-কিশোরপাঠ্য শিকার-সাহিত্যবর্গটির উদ্ভব, তার প্রাচুর্য কেমন ও কেন তা জানতে, তার বিকাশ ও বিবর্তনের ইতিবৃত্তটি বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই উল্টে দেখতে হবে বিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলির দুষ্প্রাপ্য, ধূলিমলিন পাতা। এই কালপর্বের বাঙালির শিকার সম্পর্কে চিন্তাভাবনা, উন্মাদনা, শিকার-সাহিত্যচর্চাকে বোঝার জন্যও উক্ত পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত বিচিত্র স্বাদ গন্ধে ভরপুর শিকার-সাহিত্যগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

চিত্রমালা

(১) লিয়াংবুলু গুহাচিত্রে শিকার দৃশ্য, (২) লাসকাক্স গুহাচিত্রে শিকার দৃশ্য, (৩) ভীমবেটকার গুহাচিত্রে শিকার দৃশ্য, (৪) হরপ্পার সিলমোহরে জোড়া বাঘের সঙ্গে যুদ্ধরত পুরুষ, (৫) হরপ্পার সিলমোহরে পুচ্ছযুক্ত মানুষ ও বাঘের যুদ্ধ, (৬) হরপ্পার সিলমোহরে পশু উপাসনা ও বৃক্ষপূজার নিদর্শন, (৭) বুরজাহোমের প্রস্তরখণ্ডে কুকুর সহযোগে শিকার দৃশ্য।

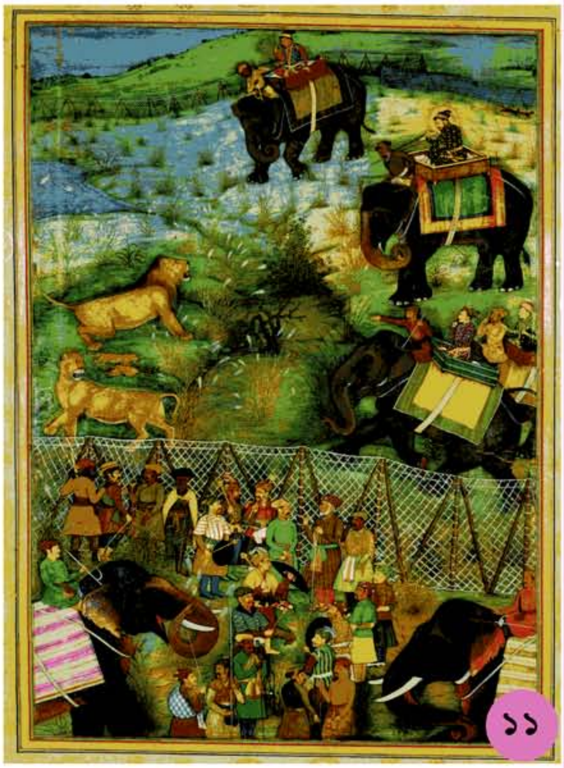

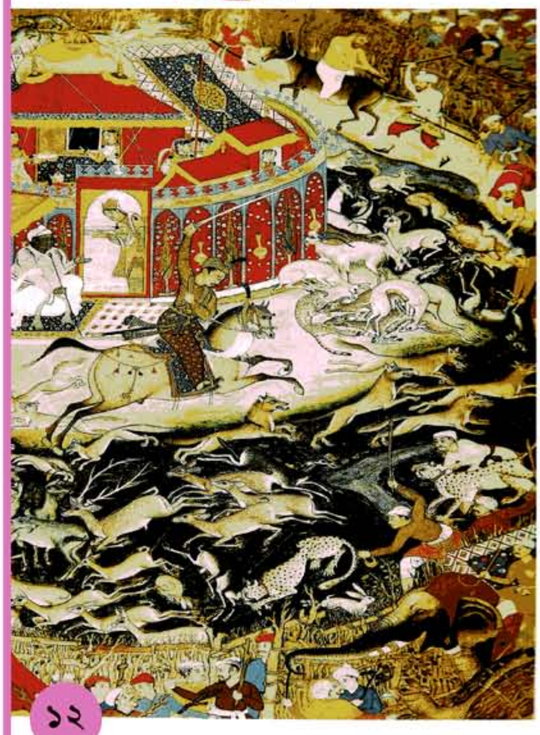

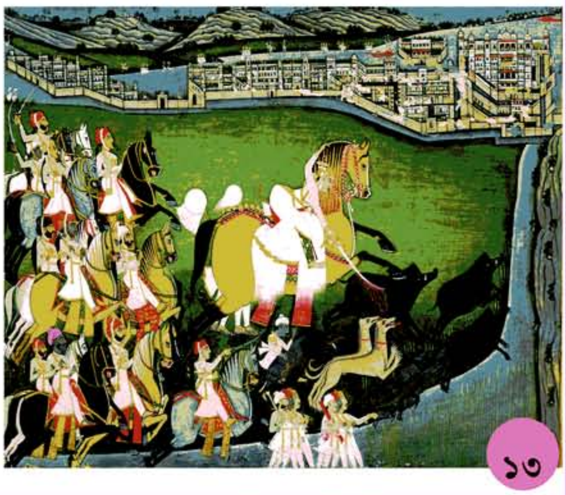

(৮) অশোকের পঞ্চম স্তম্ভ অনুশাসন, (৯) গুপ্ত মুদ্রায় শিকার দৃশ্য, (১০) মোগল পতাকায় সিংহের প্রতিকৃতি, (১১) মোগলদের সিংহ শিকার চিত্র, (১২) মোগলদের তাঁবু-হারেম-হাতি-ঘোড়া-চিতা-সৈন্য-সামন্ত সহযোগে রাজকীয় শিকার, (১৩) রাজস্থানের রাজার শিকার চিত্র।

(১৪) মোগল আমলে **'qamargha'** শিকার পদ্ধতি, (১৫) আকবরের আমলে চিতা ধরার চিত্র, (১৬) আকবরের আমলে প্রশিক্ষিত চিতা দিয়ে শিকার, (১৭) জাহাঙ্গিরের শিকারি পাখি সহ শিকার যাত্রা, (১৮) শাহজাহানের বন্দুক সহযোগে শিকারের চিত্র, (১৯) দারা শিকোহর হরিণ দিয়ে হরিণ ধরা বা শিকার।

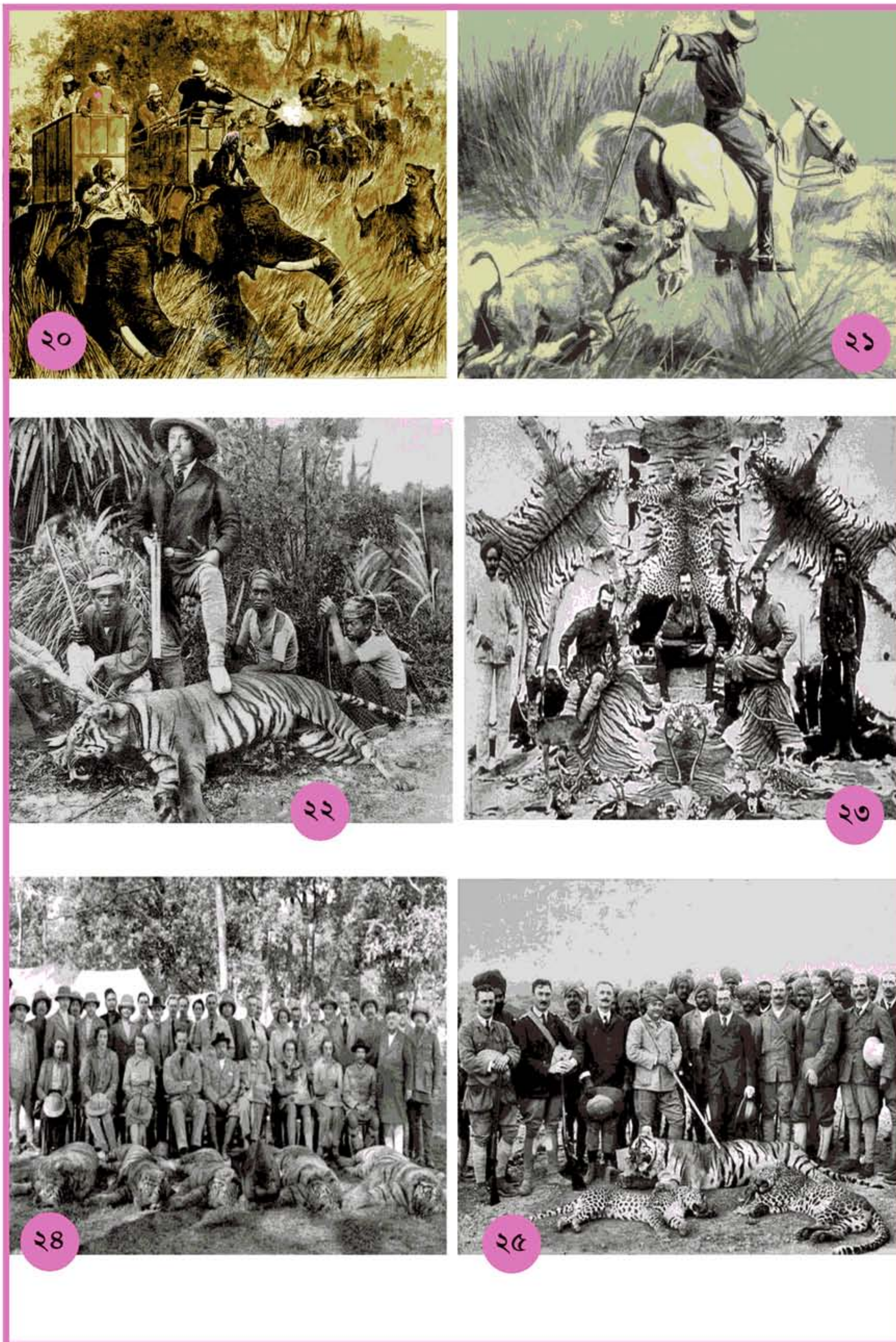

(২০) ব্রিটিশ আমলে শিকার চিত্র, (২১) ব্রিটিশদের **Pig-sticking sport**, (২২) ও (২৩) ব্রিটিশদের কাছে শিকার হয়ে ওঠে শৌর্যবীর্য পুরুষত্বের প্রতীক এবং ঔপনিবেশিক শক্তি ও ক্ষমতার পরিচায়ক, (২৪) ব্রিটিশদের শিকার স্পোর্টস, (২৫) ব্রিটিশ ও ভারতীয় অভিজাত রাজরাজড়ার শিকারের ফটো।

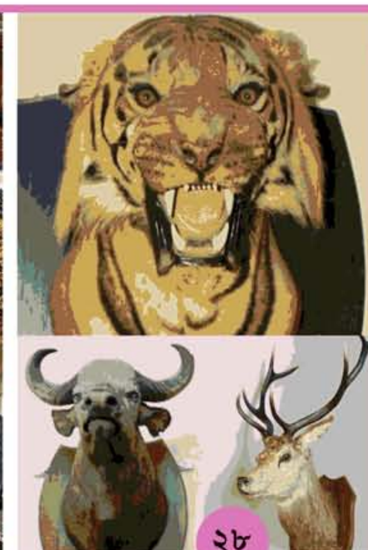

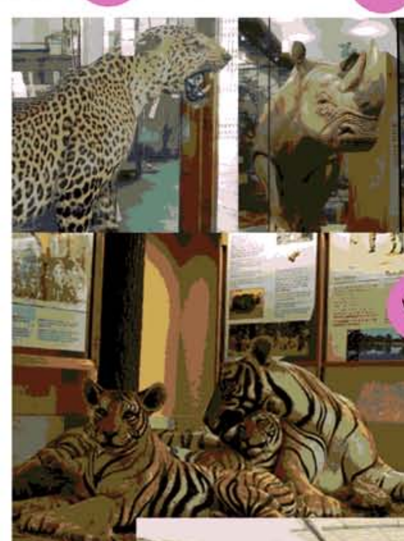

(২৬) ব্রিটিশ আমলে **Trophy Hunting**, (২৭) ব্রিটিশ আমলে শিকারের ট্রফি বা স্মারক চিহ্নগুলি হয়ে উঠছে আভিজাত্যের প্রকাশক, (২৮) **Taxidermy** শিল্পের বিকাশ, (২৯), (৩০) ও (৩১) বিদেশ ও দেশের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে ভারতীয় শিকারের মডেল ও শিকারকৃত বিভিন্ন প্রাণী-প্রজাতিকে প্রদর্শন, (৩২) বিদেশি-দেশি সার্কাসে বন্যপ্রাণীদের খেলা প্রদর্শন।

(৩৩) - (৩৮) বাংলার বিভিন্ন মন্দির গাত্রে অলংকরণ রূপে পোড়ামাটি বা টেরাকোটায় শিকার দৃশ্য,
(৩৯) দরজার কাঠের উপর শিকার দৃশ্যের কারুকার্য।

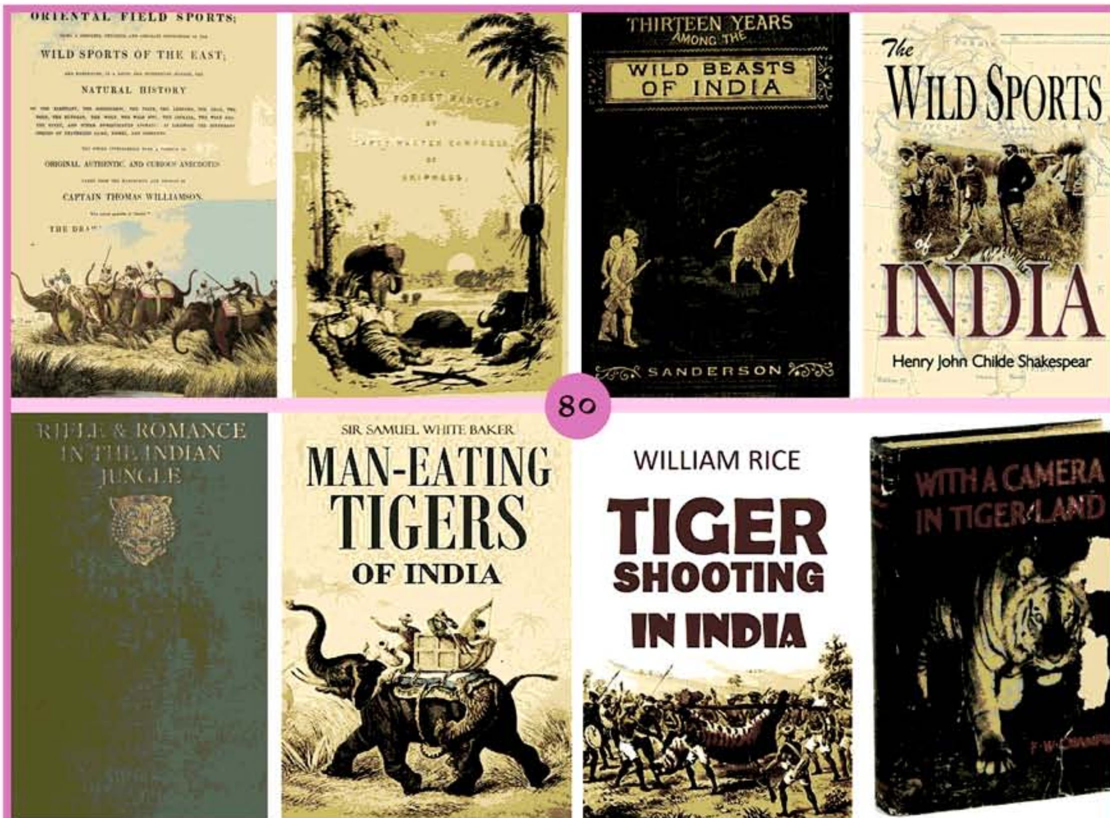

(৪০) উনিশ ও বিশ শতকে প্রকাশিত ভারতীয় উপনিবেশে শিকার অভিজ্ঞতা ভিত্তিক একগুচ্ছ ইংরেজি শিকার-সাহিত্য।

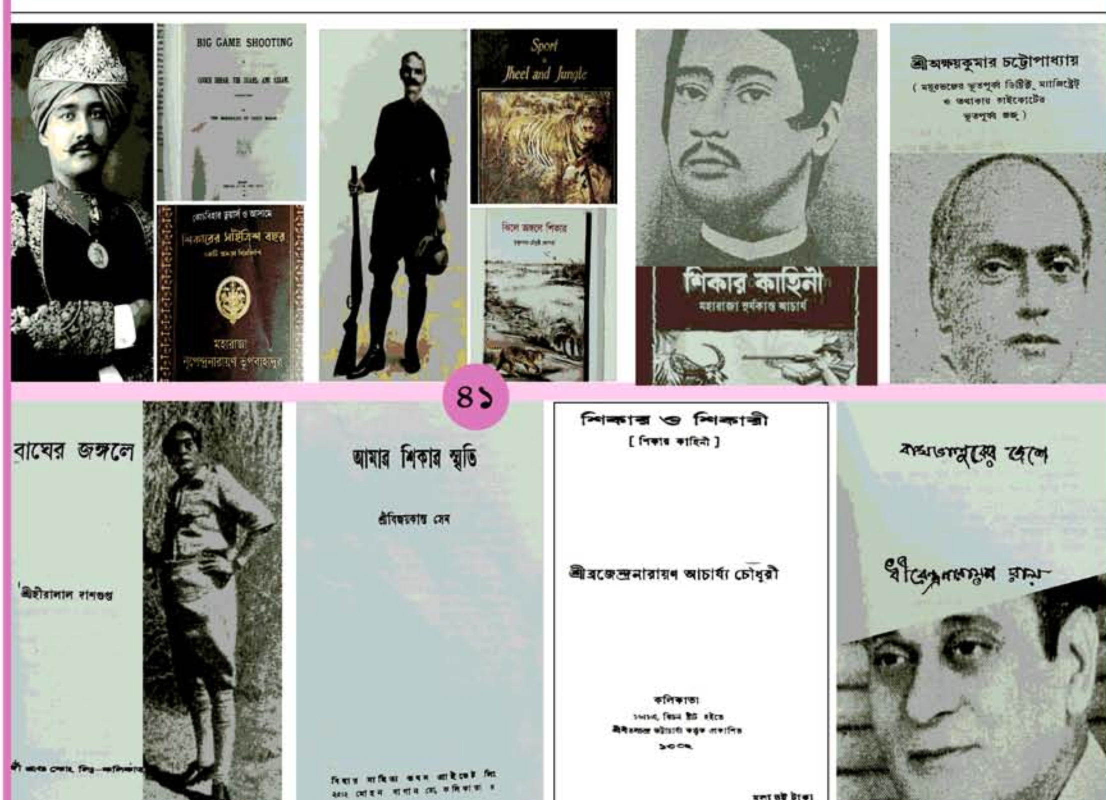

(৪১) বাঙালির শিকার-সাহিত্য চর্চা।

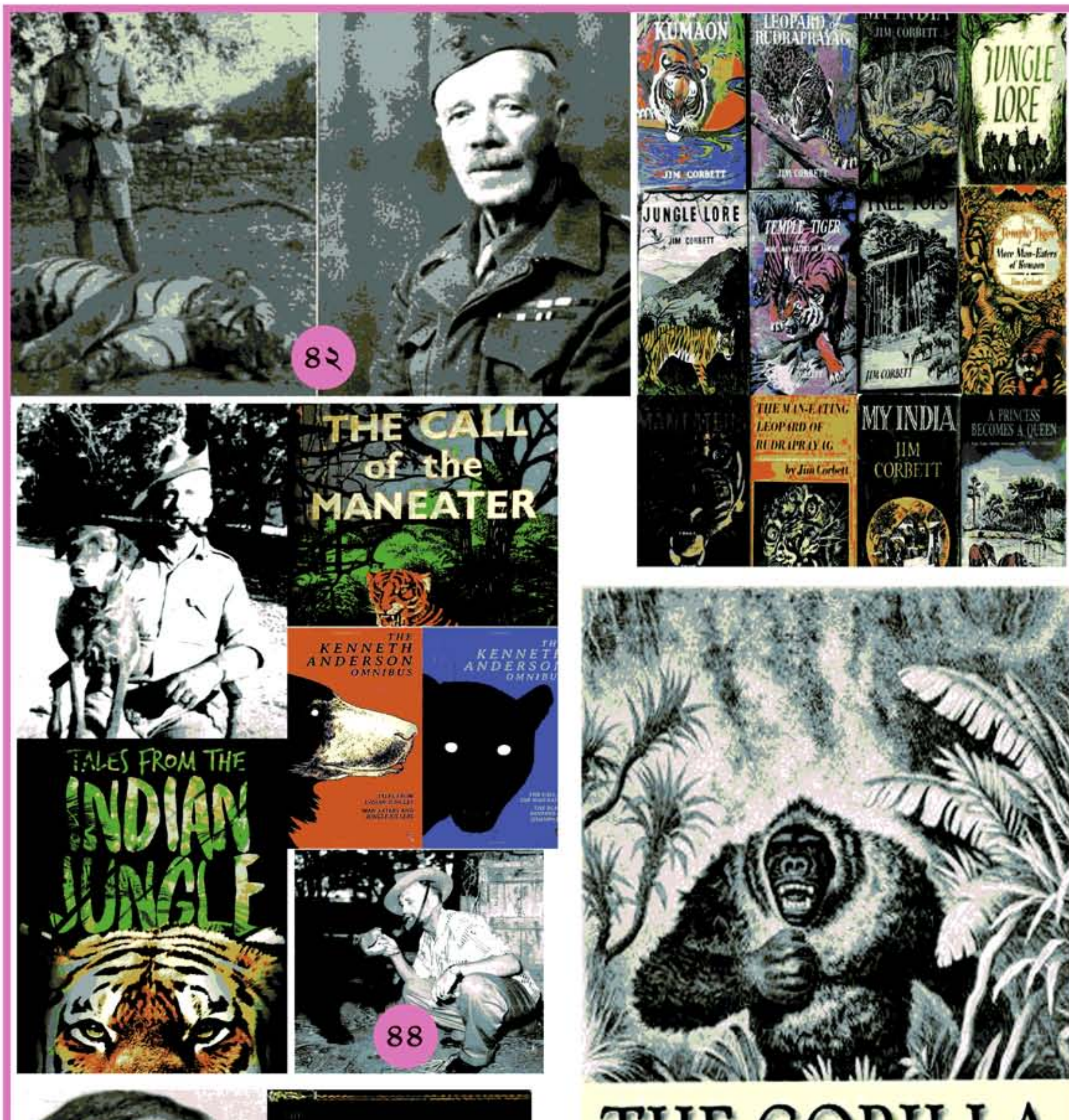

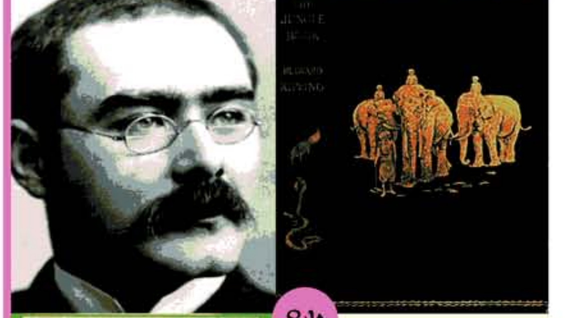

(৪২) বিশ্ববিখ্যাত শিকারি জিম করবেট, (৪৩) করবেট রচিত শিকার-সাহিত্য, (৪৪) কেনেথ অ্যান্ডারসন ও তাঁর রচিত শিকার-সাহিত্য, (৪৫) **Ballantyne**-এর ***The Gorilla Hunters,*** (৪৬) রুডইয়ার্ড কিপলিং ও তাঁর ভারতীয় অরণ্য, অরণ্যের জীবজন্তুদের নিয়ে রচিত সাহিত্য।

সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শিকার চিত্র

৪৭

৪৮

৪৯

৫০

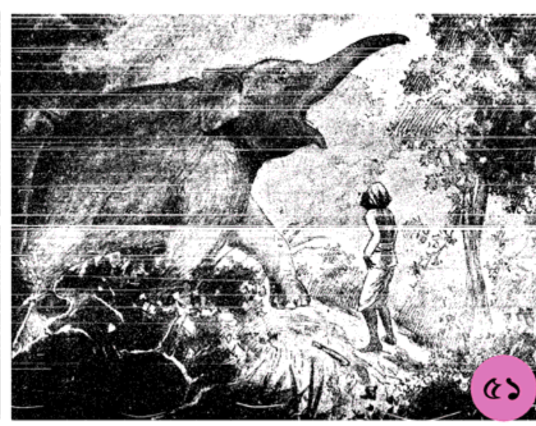
৫১

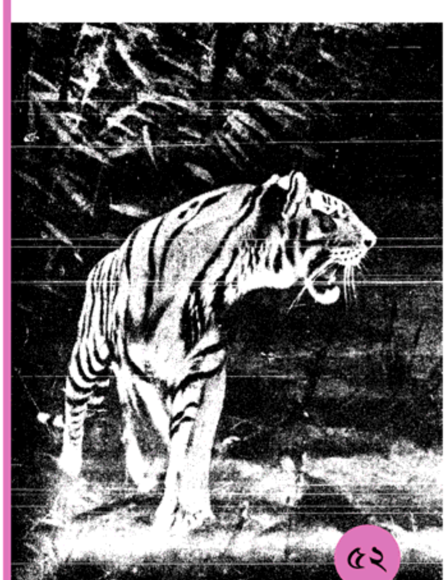
৫২

৫৩

(৪৭) দেশীয় ফাঁদে বাঘ শিকার ('বনের খবর'), (৪৮) নান্দো সর্দারের বাঘ শিকার (ঐ), (৪৯) কথকের ভৃত্যের বাঘের ভয়ে গাছে উঠে গামছায় নিজেকে বেঁধে ফেলা (ঐ), (৫০) কথক ও লুসাই বুড়োর গন্ডারের সাক্ষাৎ (ঐ), (৫১) হাতির সামনে পড়ে লুসাই বুড়োর কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্থির হয়ে পড়া (ঐ), (৫২) ক্ষুধিত বাঘ ('এক পৃষ্ঠা রঙিন ছবি'), (৫৩) ঘোগের হরিণ শিকার (ঐ)।

(৫৪) দুটি ব্যাঘ্র শাবক হাতে শিকারি কিদোরাই (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'বাঘ শিকার', *শিশুসাথী*), (৫৫) ও (৫৬) শচীন্দ্রমোহন সরকারের 'বোর্ডিং-এ বাঘ' (*শিশুসাথী*), (৫৭) শিকারি দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ('বাঘের দেশে', *মৌচাক*), (৫৮) শিকারি ও সুসাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ ও তাঁর ঋজুদা সিরিজ (*আনন্দমেলা*)।

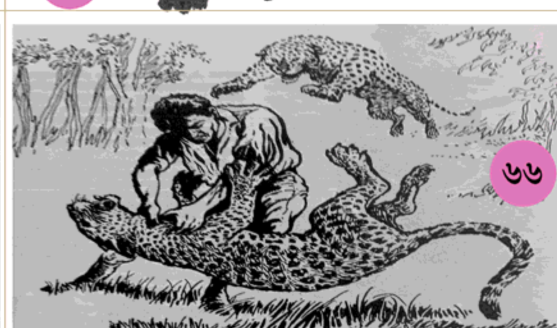

(৫৯) 'বন্যরা বনে', (৬০) 'বাঘের দেশে' (*মৌচাক*), (৬১) 'হিমালয়ে ভাল্লুক শিকার' (*রংমশাল*)[বাঙালির শিকার আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবে শিকার সাফল্যের মধ্যেকার ফারাকটি চিহ্নিত করতেই যেন গল্পের অলঙ্করণ-চিত্রটিও মজাদার ভাবে চিত্রিত হয়েছে।], (৬২) ও (৬৩) 'টাঁড়বাঘোয়া' (*সন্দেশ*) উপন্যাসের সঙ্গে ছবি আঁকেন সত্যজিৎ রায় [ছবিতে শিকারিদের পোশাক-পরিচ্ছদ হাবভাবে আধুনিক শিক্ষিত ভদ্রলোক শখের স্পোর্টসম্যান শিকারির রূপটিই ফুটে উঠেছে], (৬৪) নারায়ণ দেবনাথের অঙ্কিত চিত্র, (৬৫) ও (৬৬) ময়ূখ চৌধুরী অঙ্কিত বন্যপশু ও শিকারের জীবন্ত চিত্র। [শুধু গল্পের ইলাস্ট্রেশন রূপেই নয় ময়ূখ চৌধুরীর রঙ তুলি কলমে 'ঋণশোধ' (*সন্দেশ*, ১৯৬২), 'ফাঁদ', 'পদক্ষেপ' ইত্যাদি শিকারকেন্দ্রিক কমিক্সেরও সৃষ্টি হয়েছে।]

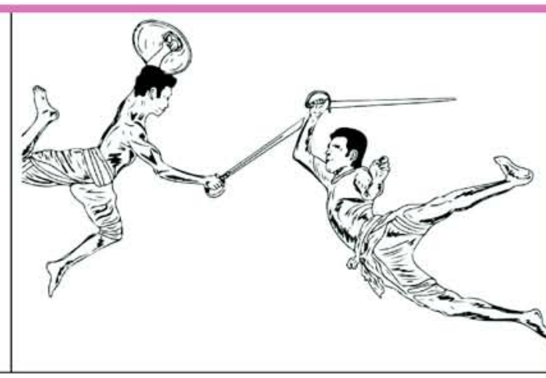

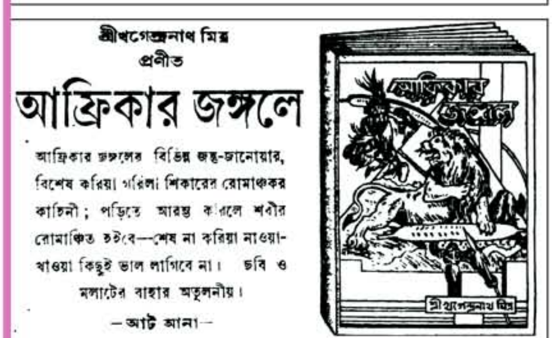

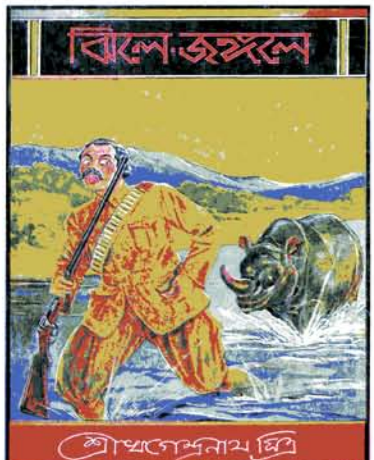

৬৭

(৬৭) জাতীয়তাবাদী কালপর্বে বাঙালির শরীরচর্চায় জোর পড়ায় লাঠি-তরোয়াল খেলা, ব্যায়াম ইত্যাদির সঙ্গে বাঙালির একাংশের কাছে প্রাধান্য পায় শিকার ও (দেশ-বিদেশের পটভূমিতে) শিকার-সাহিত্য চর্চা। শিকারের সাহেবি পোশাকের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও বাঙালি নিজস্ব ধুতি-পাঞ্জাবি পোশাক পরেও শিকার করত।

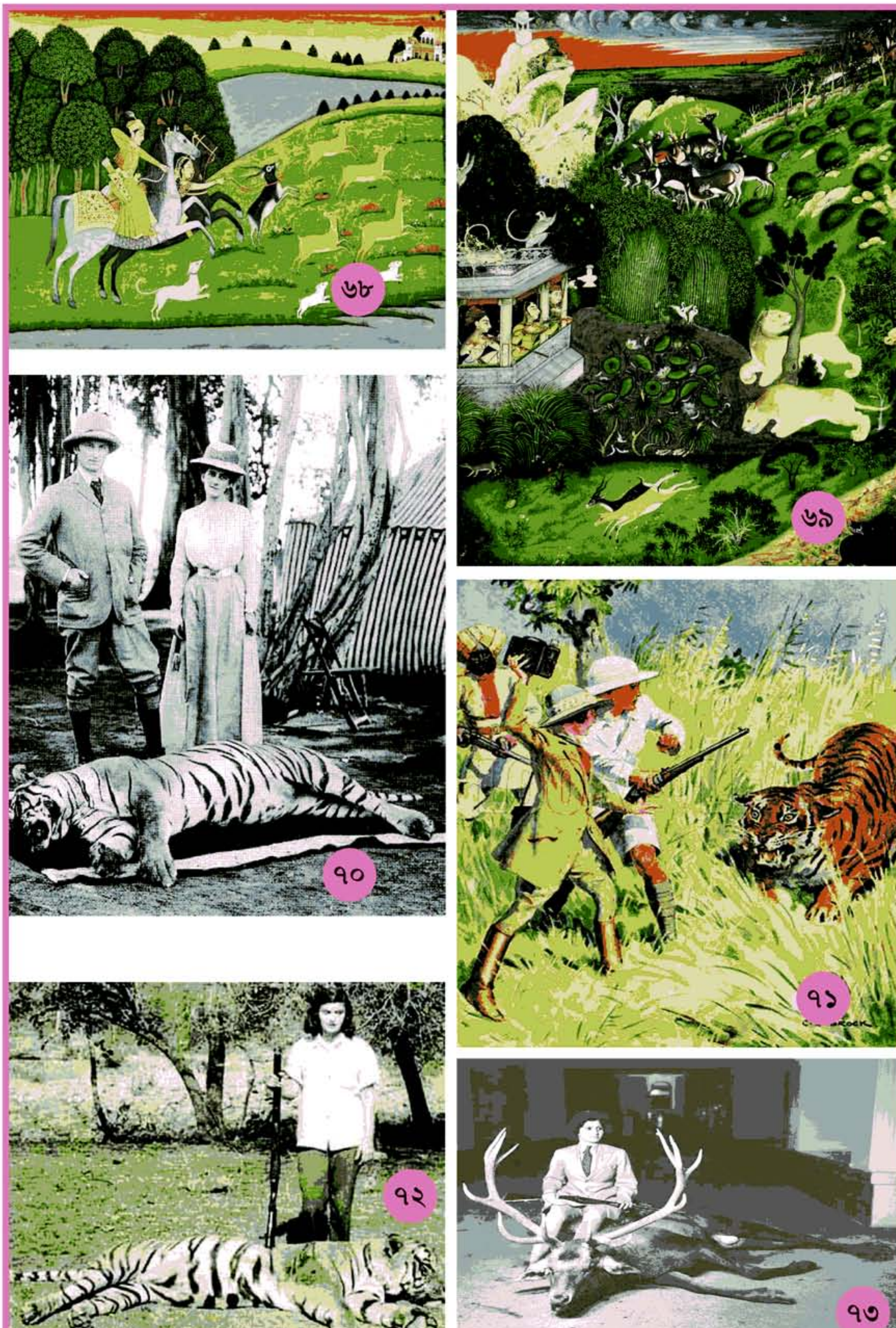

(৬৮) বাজবাহাদুর ও রূপমতির শিকার চিত্র, (৬৯) মোগল আমলে মেয়েদের শিকারে অংশগ্রহণের চিত্র, (৭০) মিসেস কার্জন স্বামীর বাঘ শিকারসঙ্গী বা দর্শক রূপে, (৭১) সাহেব ও মেমের ব্যাঘ্র-শিকার চিত্র, (৭২) মহারানি গায়ত্রী দেবী ব্যাঘ্র-শিকারি রূপে, (৭৩) মহারানি তারা দেবী শিকারি রূপে।

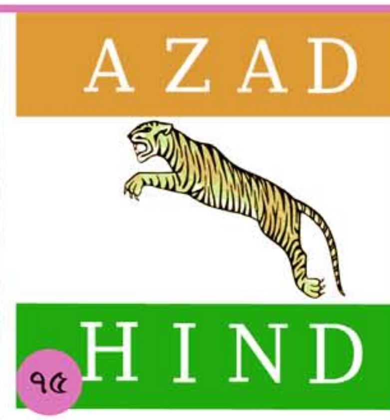

(৭৪) টিপুর বাঘ খেলনা, (৭৫) আজাদ হিন্দ ফৌজের পতাকায় বাঘের ছবি, (৭৬) হাওদা শিকারে শিকারকৃত বাঘকেও হাতিতে বহন করে আনা (*শিশুসাথী*), (৭৭) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মোটর গাড়ি সুলভ হওয়ায় ভারতীয় অভিজাতদের নতুন শিকার-বাহন, (৭৮) বাঘ শিকারের জন্য শিকার কোম্পানীর বিজ্ঞাপন, (৭৯) পঞ্চাশের দশকে ভারতে বাঘ শিকারে আসার বিজ্ঞাপন।

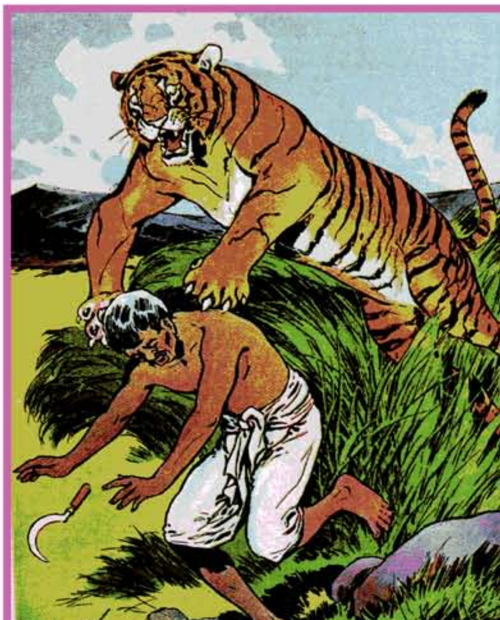

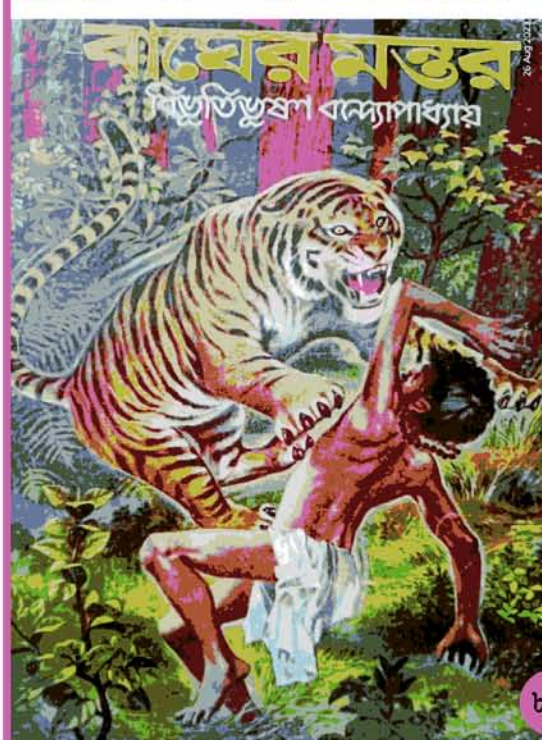

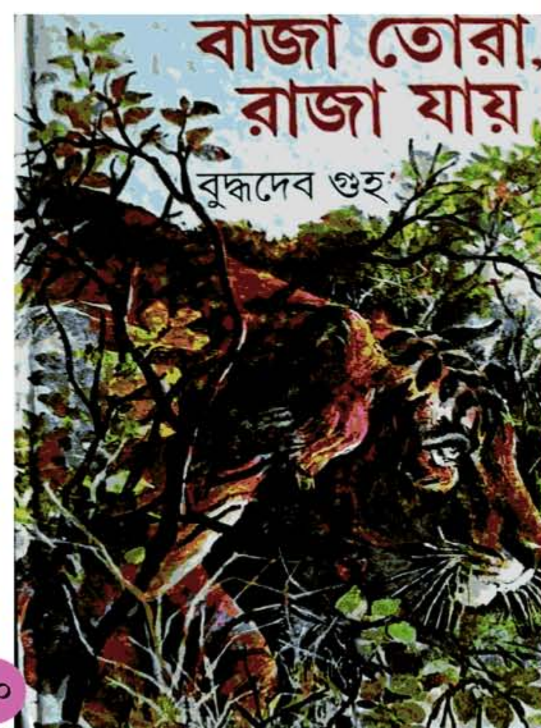

৮০

(৮০) ছোটোদের বাঘ শিকার কাহিনিগুলির অন্যতম আকর্ষণ পাতা জোড়া রঙিন নানা ছবি।

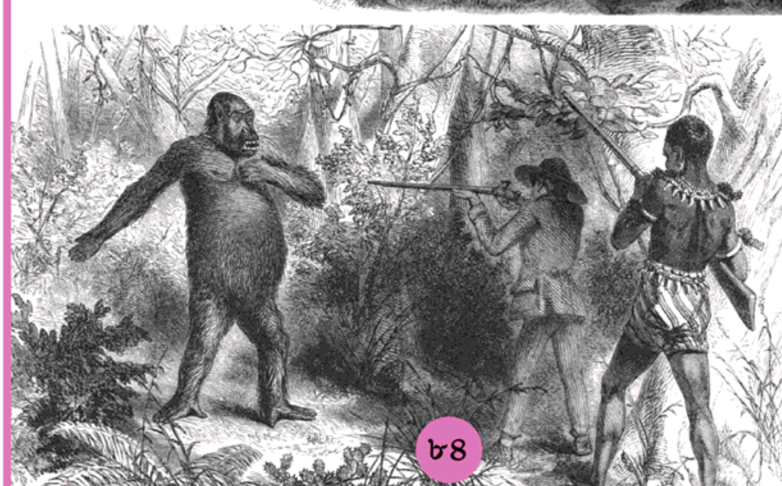

(৮১) - (৮৪) : *রামধনু*, *রংমশাল* ও *শিশুসাথী* ('আফ্রিকার জঙ্গলে') পত্রিকার পাতায় গরিলা শিকার চিত্র।

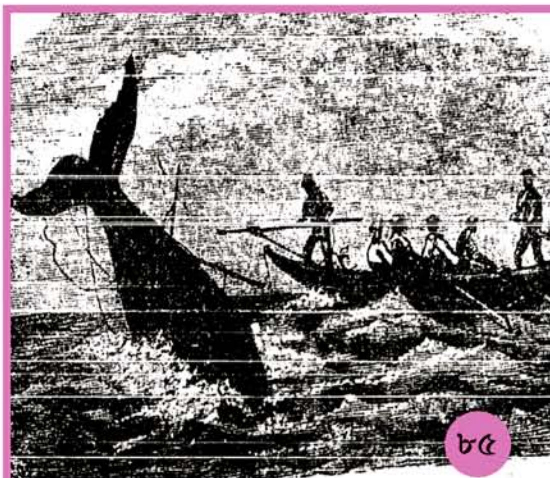

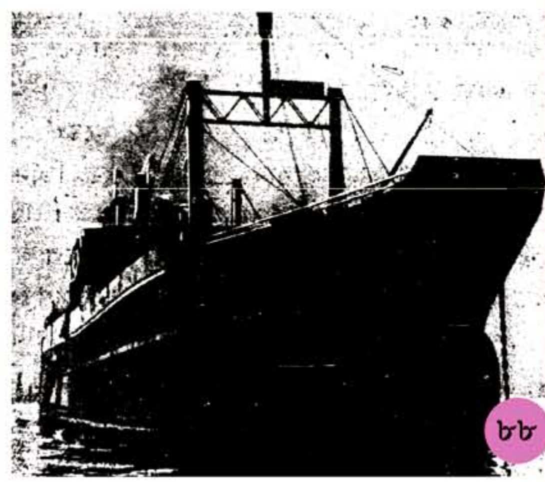

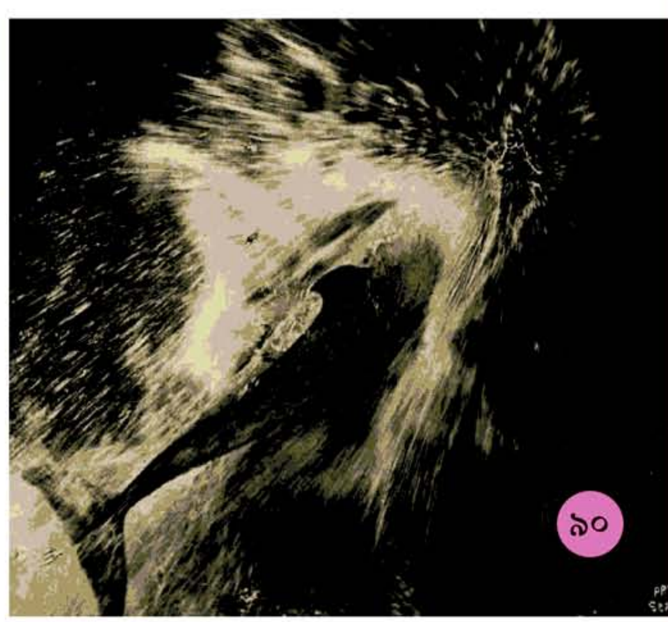

(৮৫) - (৮৬)—*মৌচাক, রামধনু, রংমশাল*-এর পাতায় তিমি শিকারের নানা চিত্র, (৮৭) তিমির পেট থেকে জীবন্ত মানুষ উদ্ধার (*আনন্দমেলা*), (৮৮) অত্যাধুনিক তিমি শিকার ও পরিবহণের জাহাজ (*রামধনু*), (৮৯) বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মানে সীল শিকারে জেলেদের উৎসাহিত করতে বিজ্ঞাপন, (৯০) পোলারস জ্যাক।

৮৬

(৯১) শিকারি কুকুর সহযোগে ক্যাঙারু শিকার এবং ফাঁস দিয়ে জীবন্ত ক্যাঙারু ধরার চিত্র।
রামধনু, *রংমশাল* ইত্যাদি পত্রিকার পাতাতেও হাজির ক্যাঙারু শিকার চিত্র।

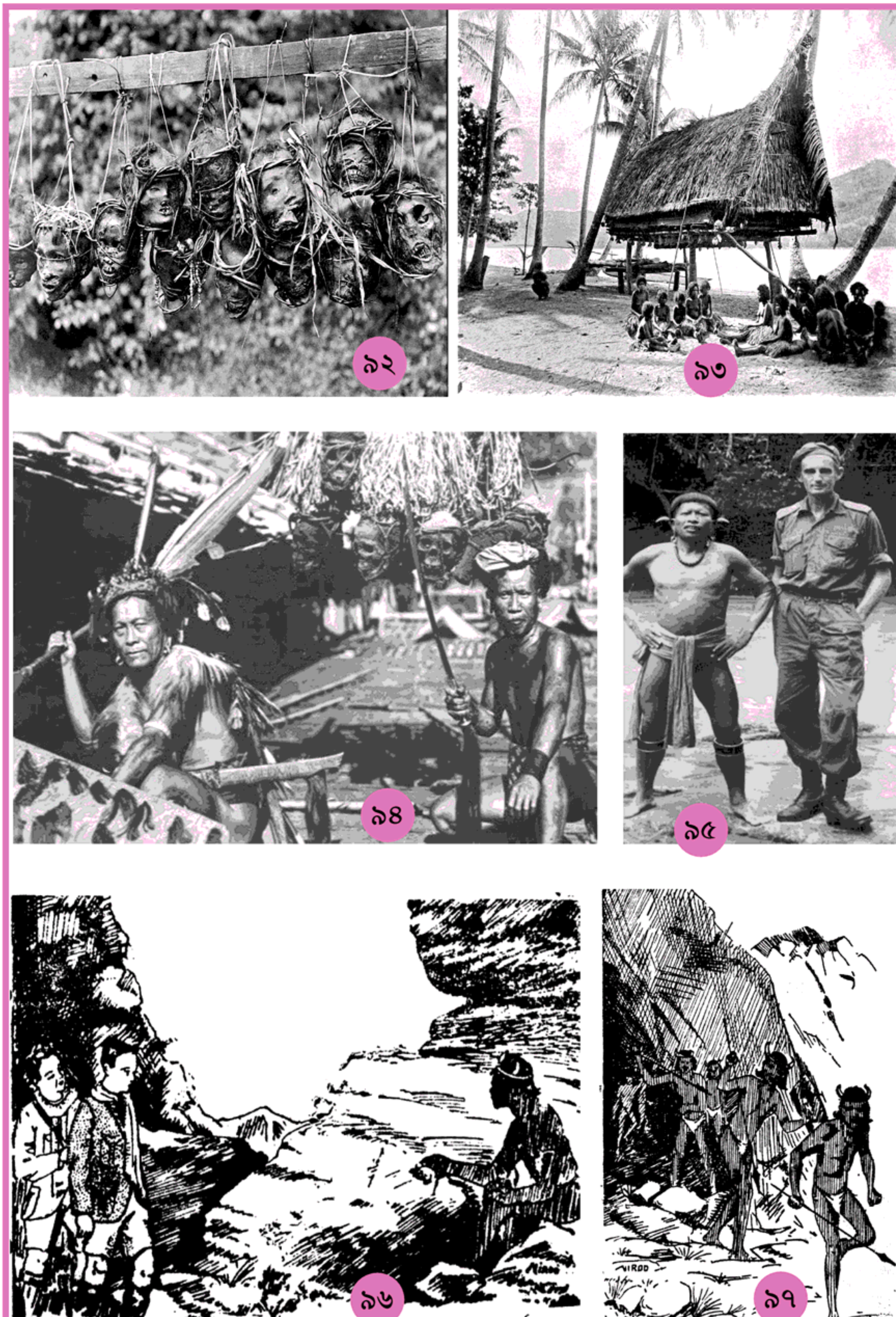

(৯২) ও (৯৩) নৃমুণ্ড শিকারিদের নৃমুণ্ড সংগ্রহশালা, (৯৪) ডায়াক নৃমুণ্ড শিকারিরা, (৯৫) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ডায়াক নৃমুণ্ড শিকারিদের ইউ.এস. বোমারু বিমানের বৈমানিকদের সঙ্গে সখ্য, (৯৬) ও (৯৭) 'আসামের জঙ্গলে' দুই বাঙালি তরুণের নৃমুণ্ড শিকারিদের কবলে পড়া।

(৯৮) *শিশুসাথী*, *রামধনু*, *রংমশাল* ইত্যাদি পত্রিকার পাতায় শিকার কাহিনির সঙ্গে
উপস্থাপিত বন্য পশুদের পারস্পরিক যুদ্ধ দৃশ্য।

(৯৯) দেবীর বাহন বাঘ, (১০০) সুন্দরবনের বনবিবি ও দক্ষিণরায়, (১০১) পীর গাজির বাহন বাঘ, (১০২)-(১০৩) ভারতের অরণ্যলগ্ন মানুষ ও অরণ্যচারী উপজাতির বনের বাঘকেই স্বয়ং দেবতা রূপে মানা, (১০৪) ব্যাঘ্র-মানবের কল্প-চিত্র, (১০৫) স্বয়ং বাঘ বলে পরিচয় দেওয়া ভণ্ড সাধুর বাঘের শিকারে পরিণত হওয়া ('সন্ন্যাসী-বাঘ'), (১০৬) কুমায়ুন-গাড়োয়ালের মানুষের 'অলৌকিক সাদা সাধু' কার্পিট সাহেবের রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো চিতাকে শিকারের স্থলে নির্মিত স্মৃতিসৌধ।

(১০৭) ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের পরও বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় শিকার-সাহিত্য ও শিকার-শিকারি নিয়ে বিশেষ সংখ্যা।

১০৮

(১০৮) শিকার নিয়ে বাঙালির হাসির গল্প ও ব্যঙ্গ-কৌতুক।

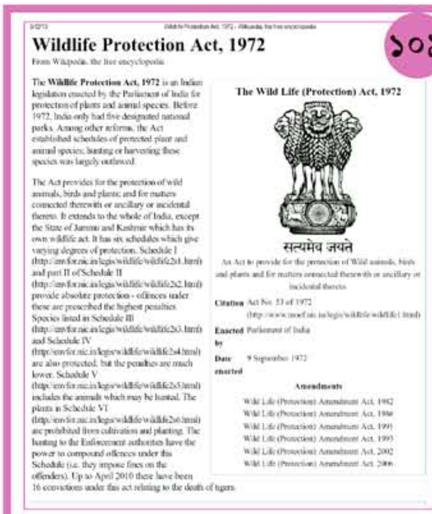

Wildlife Protection Act, 1972

From Wikipedia, the free encyclopedia

The **Wildlife Protection Act, 1972** is an Indian legislation enacted by the Parliament of India for protection of plants and animal species. Before 1972, India only had five designated national parks. Among other reforms, the Act established schedules of protected plant and animal species; hunting or harvesting these species was largely outlawed.

The Act provides for the protection of wild animals, birds and plants; and for matters connected therewith or ancillary or incidental thereto. It extends to the whole of India, except the State of Jammu and Kashmir which has its own wildlife act. It has six schedules which give varying degrees of protection. Schedule I (http://envfor.nic.in/legis/wildlife/wildlife2s1.html) and part II of Schedule II (http://envfor.nic.in/legis/wildlife/wildlife2s2.html) provide absolute protection - offences under these are prescribed the highest penalties. Species listed in Schedule III (http://envfor.nic.in/legis/wildlife/wildlife2s3.html) and Schedule IV (http://envfor.nic.in/legis/wildlife/wildlife2s4.html) are also protected, but the penalties are much lower. Schedule V (http://envfor.nic.in/legis/wildlife/wildlife2s5.html) includes the animals which may be hunted. The plants in Schedule VI (http://envfor.nic.in/legis/wildlife/wildlife2s6.html) are prohibited from cultivation and planting. The hunting to the Enforcement authorities have the power to compound offences under this Schedule (i.e. they impose fines on the offenders). Up to April 2010 there have been 16 convictions under this act relating to the death of tigers.

The Wild Life (Protection) Act, 1972

सत्यमेव जयते

An Act to provide for the protection of Wild animals, birds and plants and for matters connected therewith or ancillary or incidental thereto.

Citation	Act No. 53 of 1972
Enacted by	Parliament of India
Date enacted	9 September 1972

Amendments

Wild Life (Protection) Amendment Act, 1982
Wild Life (Protection) Amendment Act, 1986
Wild Life (Protection) Amendment Act, 1991
Wild Life (Protection) Amendment Act, 1993
Wild Life (Protection) Amendment Act, 2002
Wild Life (Protection) Amendment Act, 2006

১০৯

১১০

১১১

১১২

১১৩

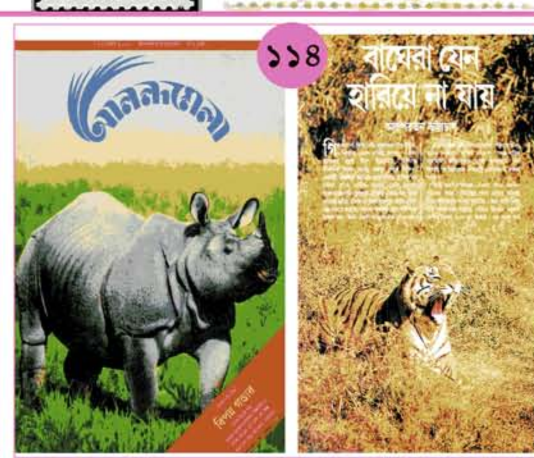

১১৪

(১০৯) ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রণীত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন যা দ্বারা ভারতে শিকার নিষিদ্ধ হয়, (১১০) ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ব্যাঘ্র প্রকল্পের সূচনা, (১১১) দেশবিদেশের পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের নানা খবরাখবর (*আনন্দমেলা*), (১১২) বন্যপ্রাণীদের নিয়ে প্রকাশিত ভারতীয় ডাকটিকট সিরিজ ('স্ট্যাম্প ক্লাব', *আনন্দমেলা*), (১১৩) 'কেরিয়ার গাইড'-এ বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংক্রান্ত নানা পাঠক্রমের হদিশ (*আনন্দমেলা*), (১১৪) আট-নয়ের দশকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীদের নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনী ও বিশেষ সংখ্যা।

১১৫

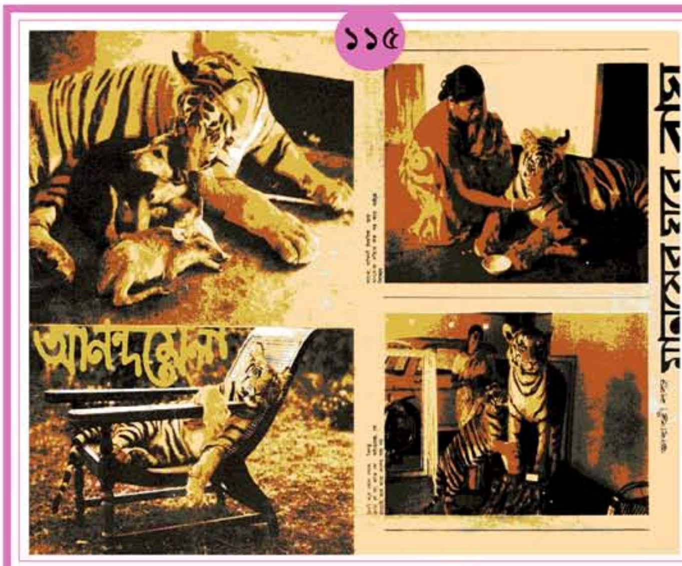

১১৭

১১৬

১১৮

(১১৫) সিমলিপালের পোষা-বাঘিনী খৈরীকে নিয়ে চমকপ্রদ নানা রচনা, (১১৬) মানুষ ও বন্যপ্রাণীর পারস্পরিক ভালোবাসা-শ্রদ্ধা ও তাদের সহাবস্থান নিয়ে রচিত বিভিন্ন গল্প, (১১৭) শিকার-সাহিত্যের বদলে ক্রমশ জঙ্গল-সাফারি ও অরণ্যকেন্দ্রিক অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের প্রাধান্য, (১১৮) বন্যপ্রাণীদের শিকারের বদলে বন্যপ্রাণীদের রক্ষার্থে বাঙালি নায়কের চোরাশিকারিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রোমাঞ্চকর কাহিনি।

পরিশিষ্ট

উনিশ-বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত শিকার-সাহিত্যের (ও অরণ্যকেন্দ্রিক সাহিত্যের) নির্বাচিত তালিকা

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
ফেরো উপদ্বীপে পক্ষিধারণোপায়		দিগ্‌দর্শন, ১৬শ ভাগ	১২২৬ (১৮১৯ খ্রি.)
হাতী ধরা	ভুবনমোহন রায়	সখা, ৭ম ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	১২৯৬ (জুন ১৮৮৯ খ্রি.)
চিতা দ্বারা শিকার (সচিত্র)	ললিতমোহন দাস	সখা, ১১শ ভাগ, ৭ম সংখ্যা	১৩০০ (জুলাই ১৮৯৩ খ্রি.)
উভয় সংকট (সচিত্র)	দীনেন্দ্রকুমার রায়	*মুকুল*, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা	ভাদ্র ১৩০২ (১৮৯৫ খ্রি.)
সিংহ শিকার (সচিত্র)	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	*মুকুল*, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা	আশ্বিন ১৩০২ (১৮৯৫ খ্রি.)
ভালুক শিকার (সচিত্র)	যোগীন্দ্রনাথ সরকার	*মুকুল*, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা	কার্ত্তিক ১৩০২ (১৮৯৫ খ্রি.)
প্যান্থার শিকার (সচিত্র)	শ্যামাচরণ গুপ্ত	*মুকুল*, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা	মাঘ ১৩০২ (১৮৯৬ খ্রি.)
শিকার (সচিত্র)	ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী	*সখা ও সাথী*, ১৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা - ১৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা	মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩০৩ (১৮৯৭ খ্রি.) বৈশাখ, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্ত্তিক ও পৌষ ১৩০৪ (১৮৯৭-৯৮ খ্রি.)
সিংহের ব্যাঘ্র শিকার (সচিত্র গল্প)	দীনেন্দ্রকুমার রায়	*মুকুল*, ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা	অগ্রহায়ণ ১৩০৪ (১৮৯৭ খ্রি.)
ভজন সিং-এর বাঘ মারা (সচিত্র কবিতা)		*মুকুল*, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা	পৌষ ১৩০৪ (১৮৯৭-৯৮ খ্রি.)
সুন্দরবনে শিকার (সচিত্র গল্প)	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	*মুকুল*, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	আশ্বিন ১৩০৬ (১৮৯৯ খ্রি.)
মহেশ সর্দ্দার (সচিত্র)	যোগীন্দ্রনাথ সরকার	*মুকুল*, ৮ম বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩০৯ (১৯০২ খ্রি.)
সিংহের মুখে	সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	*মুকুল*, ১১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা	আষাঢ় ১৩১২ (১৯০৫ খ্রি.)
গণ্ডার শিকার	সুখলতা রায়	*মুকুল*, ১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা	কার্ত্তিক ১৩১৪ (১৯০৭ খ্রি.)
বন্য জন্তু ধরা	সুখলতা রায়	*মুকুল*, ১৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা	পৌষ ১৩১৪ (১৯০৭-০৮ খ্রি.)
আসামে হরিণ শিকার	সুধাংশুমোহন ভট্টাচার্য	*মুকুল*, ১৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	আশ্বিন ১৩২০ (১৯১৩ খ্রি.)
বনের খবর	প্রমদারঞ্জন রায়	*সন্দেশ*, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা; ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা এবং *সন্দেশ*, নবপর্যায় ২য় বর্ষ	শ্রাবণ ১৩২০-আশ্বিন ১৩২১ (১৯১৩-১৪ খ্রি.); আষাঢ় ১৩২৩ (১৯১৬ খ্রি.); এবং আশ্বিন ১৩৩৯-বৈশাখ ১৩৪০ (১৯৩২-৩৩ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
তিমি শিকার	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	*সন্দেশ*, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ (১৯১৪ খ্রি.)
কুমীরের গল্প		*সন্দেশ*, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ (১৯১৪ খ্রি.)
বাঘমার		*সন্দেশ*, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা	শ্রাবণ ১৩২১ (১৯১৪ খ্রি.)
বরাহ শিকার	উপেন্দ্রকিশোর রায়	*সন্দেশ*, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা	শ্রাবণ ১৩২২ (১৯১৫ খ্রি.)
মানুষখেকো নেকড়ে		*সন্দেশ*, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা	ফাল্গুন ১৩২২ (১৯১৬ খ্রি.)
প্রাচীনকালের শিকার (প্রবন্ধ)		*সন্দেশ*, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ (১৯১৭ খ্রি.)
গোখুরা শিকার		*সন্দেশ*, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	আশ্বিন ১৩২৪ (১৯১৭ খ্রি.)
সিংহ শিকার		*সন্দেশ*, ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩২৬ (১৯১৯ খ্রি.)
আয়েনপুরের মানুষখাকী	কুলদারঞ্জন রায়	*সন্দেশ*, ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা	কার্তিক ১৩২৭ (১৯২০ খ্রি.)
পেটুক বাঘ	কুলদারঞ্জন রায়	*সন্দেশ*, ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা	অগ্রহায়ণ ১৩২৭(১৯২০ খ্রি.)
চট্টগ্রামে হাতী ধরা	কুলদারঞ্জন রায়	*সন্দেশ*, ৯ম বর্ষ, ২য়-৬ষ্ঠ সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন ১৩২৮ (১৯২১খ্রি.)
শিকারের গল্প		*সন্দেশ*, ৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা	মাঘ ১৩২৮ (১৯২২ খ্রি.)
শিকারের গল্প		*সন্দেশ*, ৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা	ফাল্গুন ১৩২৮ (১৯২২ খ্রি.)
শিকারের গল্প		*সন্দেশ*, ৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা	চৈত্র ১৩২৮ (১৯২২ খ্রি.)
শিকারের গল্প		*সন্দেশ*, ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	বৈশাখ ১৩২৯ (১৯২২ খ্রি.)
গারো পাহাড়ের গুণ্ডা হাতী	কুলদারঞ্জন রায়	*সন্দেশ*, ১০ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩২৯ (১৯২২ খ্রি.)
আফ্রিকার জঙ্গলে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	*শিশুসাথী*	(১৯২২ খ্রি.)
বাঘের মন্ত্র		*সন্দেশ*, ১১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ (১৯২৩ খ্রি.)
নাগপাশে বাঘ ধরা	কুলদারঞ্জন রায়	*সন্দেশ*, ১১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা	আষাঢ় ১৩৩০ (১৯২৩ খ্রি.)
বাঘে মানুষে	সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য	*শিশুসাথী*, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৩০ (১৯২৩ খ্রি.)
বাঘের গল্প	অনিলকুমার চক্রবর্ত্তী	*শিশুসাথী*, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	আশ্বিন ১৩৩০ (১৯২৩ খ্রি.)
শিকার কাহিনী	সুরেশচন্দ্র ঘোষ	*শিশুসাথী*, ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা	কার্ত্তিক ১৩৩০ (১৯২৩ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
শিকারের গল্প	কুলদারঞ্জন রায়	*সন্দেশ*, ১২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	আশ্বিন ১৩৩১ (১৯২৪ খ্রি.)
জন্তু জীবন্ত ধরা	কুলদারঞ্জন রায়	*সন্দেশ*, ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা -১৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা	চৈত্র ১৩৩১-বৈশাখ ১৩৩২ (১৯২৫ খ্রি.)
জানোয়ারের মুখে	চারুলতা দেবী	*রামধনু*, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ (১৯২৮ খ্রি.)
কইরু কোলের কথা	বিজয়চন্দ্র মজুমদার	*রামধনু*, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৩৫ (১৯২৮ খ্রি.)
বুনো জানোয়ার ধরার কৌশল	ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	*রামধনু*, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা	কার্তিক ১৩৩৬ (১৯২৯ খ্রি.)
ভয়ঙ্কর	প্রেমেন্দ্র মিত্র	*রামধনু*, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা	কার্তিক ১৩৩৬ (১৯২৯ খ্রি.)
কাণা	প্রেমেন্দ্র মিত্র	*রামধনু*, ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা	আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৩৭ (১৯৩০ খ্রি.)
কাঙ্গারু শিকার (সচিত্র প্রবন্ধ)	সুবিনয় রায়	*রামধনু*, ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা	শ্রাবণ ১৩৩৭ (১৯৩০ খ্রি.)
বাঘে মানুষে		*রামধনু*, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	আষাঢ় ১৩৩৯ (১৯৩২ খ্রি.)
বাঘ শিকার	সত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত	*রামধনু*, ৫ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা	শ্রাবণ ১৩৩৯ (১৯৩২ খ্রি.)
সিংহের সঙ্গে একরাত্রি	ননীগোপাল মজুমদার	*রামধনু*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা	শ্রাবণ ১৩৪০ (১৯৩৩ খ্রি.)
আমার ভালুক শিকার	শিবরাম চক্রবর্ত্তী	*রামধনু*, ৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৪১ (১৯৩৪ খ্রি.)
ভালুকের মহাপ্রস্থান	শিবরাম চক্রবর্ত্তী	*রামধনু*, ৭ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা	পৌষ ১৩৪১ (১৯৩৪-৩৫ খ্রি.)
বেবুনের হাতে	রমেন্দ্রনাথ দে	*রামধনু*, ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা	ফাল্গুন ১৩৪১ (১৯৩৫ খ্রি.)
সত্যিকারের বাঘের গল্প	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	*মৌচাক*, ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ (১৯৩৫ খ্রি.)
সিংহের খপ্পরে	রমেন্দ্রনাথ দে	*রামধনু*, ৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ (১৯৩৫ খ্রি.)
লক্ষ্মণ ঝোরা	মণীন্দ্রলাল বসু	*আজব বই* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৪২ (১৯৩৫ খ্রি.)
পূজোর শিকার	শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক	*রামধনু*, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা	কার্ত্তিক ১৩৪২ (১৯৩৫ খ্রি.)
শিকারের সন্ধানে	প্রবোধকুমার সান্যাল	*মৌচাক*, ১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা	চৈত্র ১৩৪২ (১৯৩৬ খ্রি.)
তিমি শিকার	ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	*রামধনু*, ৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা	বৈশাখ ১৩৪৩ (১৯৩৬ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
জংলী আবহাওয়ার পরশ	তরুণ চট্টোপাধ্যায়	*রামধনু*, ৯ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা	আশ্বিন ১৩৪৩ (১৯৩৬ খ্রি.)
বুনো হাতীর কবলে	রমেশ চন্দ্র দাস	*রামধনু*, ৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা	কার্ত্তিক ১৩৪৩ (১৯৩৬ খ্রি.)
তালুকদারের ভালুক ধরা	সুনির্মল বসু	মাস পয়লা, ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	বৈশাখ ১৩৪৪ (১৯৩৭ খ্রি.)
এয়ারগান	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	সোনার কাঠি (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	বৈশাখ ১৩৪৪ (১৯৩৭ খ্রি.)
ছোটনাগপুরের জঙ্গলে একরাত্রি	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	*রামধনু*, ১০ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা	কার্ত্তিক ১৩৪৪ (১৯৩৭ খ্রি.)
শিকার	হেমচন্দ্র বাগচী	*রামধনু*, ১০ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা	অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ (১৯৩৭ খ্রি.)
হাতী ধরা	বিরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	*রামধনু*, ১১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	আষাঢ় ১৩৪৫ (১৯৩৮ খ্রি.)
সুষুপ্ত সিংহের শিকার কাহিনী	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	*রামধনু*, ১১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	আষাঢ় ১৩৪৫ (১৯৩৮ খ্রি.)
বর্ম্মিজদের বাঘ শিকার	সত্য চক্রবর্ত্তী	*রামধনু*, ১১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৪৫ (১৯৩৮ খ্রি.)
বর্ম্মার জঙ্গলে	সত্য চক্রবর্ত্তী	*রামধনু*, ১১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা	আশ্বিন ১৩৪৫ (১৯৩৮ খ্রি.)
জঙ্গল চরিত	চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	*রামধনু*, ১২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ (১৯৩৯ খ্রি.)
সীলসিংহ	ননীগোপাল মজুমদার	*রামধনু*, ১২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	আষাঢ় ১৩৪৬ (১৯৩৯ খ্রি.)
জঙ্গল কাহিনী	চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	*রামধনু*, ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা	শ্রাবণ ১৩৪৬ (১৯৩৯ খ্রি.)
ব্যাঘ্র চরিত	চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	*রামধনু*, ১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৪৬ (১৯৩৯ খ্রি.)
মাছ ধরা	দ্বিজেন্দ্রনাথ গুপ্ত	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৪৬ (১৯৩৯ খ্রি.)
বাঘ-কুমীর	ননীগোপাল মজুমদার	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৪৬ (১৯৩৯ খ্রি.)
বাগানের বাঘ	হেমেন্দ্রকুমার রায়	*রামধনু*, ১৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা	মাঘ ১৩৪৬ (১৯৪০ খ্রি.)
সাপের মুখে	নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	*রামধনু*, ১৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা	চৈত্র ১৩৪৬ (১৯৪০ খ্রি.)
বাঘে মহিষে	সমর সরকার	*রংমশাল*, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা	আষাঢ় ১৩৪৭ (১৯৪০ খ্রি.)
বাঘ ধরা	সমর সরকার	*রংমশাল*, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৪৭ (১৯৪০ খ্রি.)
সিংহ শিকার	সমর সরকার	*রংমশাল*, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	আশ্বিন ১৩৪৭ (১৯৪০ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
শিকার	মিহির রায়	*রামধনু*, ১৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা	আশ্বিন ১৩৪৭ (১৯৪০ খ্রি.)
মানুষখেকো সিংহ	সমর সরকার	*রংমশাল*, ৫ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা	অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ (১৯৪০ খ্রি.)
হাতী ধরা	সমর সরকার	*রংমশাল*, ৫ বর্ষ, ৯ম-১০ম সংখ্যা	পৌষ-মাঘ ১৩৪৭ (১৯৪০-৪১ খ্রি.)
তিমির ব্যাবসা	ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	*রামধনু*, ১৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা	চৈত্র ১৩৪৭ (১৯৪১ খ্রি.)
ক্যাঙ্গারু শিকার কাহিনী	সমর সরকার	*রংমশাল*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা	বৈশাখ ১৩৪৮ (১৯৪১ খ্রি.)
মানুষে মানুষ খায়	শ্রী শামুক	*রংমশাল*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা	বৈশাখ ১৩৪৮ (১৯৪১ খ্রি.)
বাসি খেকো বাঘ	বন্দে আলী মিয়া	*রামধনু*, ১৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮ (১৯৪১ খ্রি.)
অন্ধকারের আতঙ্ক	বন্দে আলী মিয়া	*রামধনু*, ১৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৪৮ (১৯৪১ খ্রি.)
বুনো জানোয়ার ধরা (প্রাণীতত্ত্ব)	ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৪৮ (১৯৪১ খ্রি.)
আফ্রিকার জঙ্গলে	অবনীমোহন ঘোষ	*রামধনু*, ১৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা	মাঘ ১৩৪৮ (১৯৪২ খ্রি.)
আসামে ঘড়িয়াল শিকার	সমরেন্দ্রকুমার দত্ত	*রামধনু*, ১৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা	শ্রাবণ ১৩৪৯ (১৯৪২ খ্রি.)
নৃমুণ্ড শিকারী	শ্রীধর	*রংমশাল*, ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৪৯ (১৯৪২ খ্রি.)
গ্রীজলি ভালুকের কবলে	শান্তা দেবী	*রামধনু*, ১৫শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা	পৌষ ১৩৪৯ (১৯৪২-৪৩ খ্রি.)
বর্শেলের বিড়ম্বনা	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	*রূপরেখা* (দেবসাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৫০ (১৯৪৩ খ্রি.)
আফ্রিকার অন্ধকার জঙ্গলে	ডেভিড লিভিং স্টোন	*রংমশাল*, ৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা	আষাঢ় ১৩৫১ (১৯৪৪ খ্রি.)
শিকারী (কবিতা)	বন্দে আলী মিয়া	*বর্ষমঙ্গল* (দেবসাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	আশ্বিন ১৩৫১ (১৯৪৪ খ্রি.)
বাঘের সাথে তিন দিন	ভাস্কর বসু	*শিশুসাথী*	১৩৫১ (১৯৪৪ খ্রি.)
আসামের ছোট বাঘ	সমরেন্দ্র কুমার দত্ত	*রামধনু*, ১৭ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা	মাঘ ১৩৫১ (১৯৪৫ খ্রি.)
বন্য	সুকুমার দে সরকার	*আলপনা* (দেবসাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৫২ (১৯৪৫ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
শিকার কাহিনী	রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*কল্লরব* (শরৎ সাহিত্য ভবন পূজাবার্ষিকী)	১৩৫২ (১৯৪৫ খ্রি.)
হারাধনবাবুর বাঘ শিকার	সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	*রামধনু*, ১৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ (১৯৪৬ খ্রি.)
শিকার কাহিনী	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	আকাশদীপ (শরৎ সাহিত্য ভবন পূজাবার্ষিকী)	১৩৫৩ (১৯৪৬ খ্রি.)
তিমি ও তিমি শিকার	কুঞ্জবিহারী পাল	*রামধনু*, ১৯ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা	চৈত্র ১৩৫৩ (১৯৪৭ খ্রি.)
মাছের শিকারি	ধীরেন বল	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৫৪ (১৯৪৭ খ্রি.)
দুই শিকারীর কাহিনী	শান্তা দেবী	*রামধনু*, ২০ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা	অগ্রহায়ণ ১৩৫৪ (১৯৪৭ খ্রি.)
বনমানুষের গল্প	প্রেমচন্দ্	*মৌচাক*	পৌষ ১৩৫৪ (১৯৪৭-৪৮ খ্রি.)
রামগড়ের জঙ্গলে	হীরালাল মিত্র	*রামধনু*, ২০ বর্ষ, ১০-১১ সংখ্যা	মাঘ-ফাল্গুন ১৩৫৪ (১৯৪৮ খ্রি.)
বেঁচে গেলো প্রাণ (শিকার)	গন্ধরাজ	*শুকতারা*, ২য় বর্ষ	১৩৫৫-৫৬ (১৯৪৯ খ্রি.)
সাহসী ইংরেজ (শিকার)	পঞ্চানন রায়	*শুকতারা*, ২য় বর্ষ	১৩৫৫-৫৬ (১৯৪৯ খ্রি.)
কিশোর গঞ্জের পাগলা হাতী	ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	*রামধনু*, ২২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা	আষাঢ় ১৩৫৬ (১৯৪৯ খ্রি.)
বাঘের লড়াই	বীর বরুণকুমার	নবারুণ (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৫৬ (১৯৪৯ খ্রি.)
শিকার কাহিনী	রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*মনোরথ* (শরৎ সাহিত্য ভবন পূজাবার্ষিকী)	১৩৫৬ (১৯৪৯ খ্রি.)
আমার ব্যাঘ্রপ্রাপ্তি	শিবরাম চক্রবর্ত্তী	*রামধনু*, ২৩ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৫৭ (১৯৫০ খ্রি.)
শিকারী জীবন	রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*সারথি* (শরৎ সাহিত্য ভবন পূজাবার্ষিকী)	১৩৫৭ (১৯৫০ খ্রি.)
শিকারী জীবন	রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*সুপ্রভাত* (শরৎ সাহিত্য ভবন পূজাবার্ষিকী)	১৩৫৮ (১৯৫১ খ্রি.)
বোর্ডিং-এ বাঘ	শচীন্দ্রমোহন সরকার	*শিশুসাথী*, ৩০ বর্ষ	অগ্রহায়ণ ১৩৫৮ (১৯৫১ খ্রি.)
বাঘ শিকার	মনোরঞ্জন সেন	*শিশুসাথী*, ৩০ বর্ষ	পৌষ ১৩৫৮ (১৯৫১-৫২ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
ত্র্যহস্পর্শ	শিবরাম চক্রবর্ত্তী	*রামধনু*, ২৪ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা	মাঘ ১৩৫৮ (১৯৫২ খ্রি.)
বাঘ বাঘিনীর মুখে (শিকার)	পুলিন বন্দ্যোপাধ্যায়	*শুকতারা*	১৩৫৮-৫৯ (১৯৫২ খ্রি.)
মোগলকাটার জঙ্গলে (শিকার)	পুলিন বন্দ্যোপাধ্যায়	*শুকতারা*	১৩৫৮-৫৯ (১৯৫২ খ্রি.)
আফ্রিকার চিঠি	বিনয়েন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	*রামধনু*, ২৫ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা	শ্রাবণ ১৩৫৯ (১৯৫২ খ্রি.)
মানুষে জানোয়ারে	সুনির্মল বসু	*তপোবন* (শরৎ সাহিত্য ভবন পূজাবার্ষিকী)	১৩৫৯ (১৯৫২ খ্রি.)
শিকার কাহিনী	রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*তপোবন* (শরৎ সাহিত্য ভবন পূজাবার্ষিকী)	১৩৫৯ (১৯৫২ খ্রি.)
বাঘ শিকার	বীর বরুণ কুমার	*বসুধারা* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৬০ (১৯৫৩ খ্রি.)
বন্দুক	রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*অরবিন্দ* (শরৎ সাহিত্য ভবন পূজাবার্ষিকী)	১৩৬১ (১৯৫৪ খ্রি.)
ভয়াবহ দুর্যোগ (অরণ্য গল্প)	যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	*ইন্দ্রধনু* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৬১ (১৯৫৪ খ্রি.)
শিকারী জীবন	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*ইন্দ্রধনু* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৬১ (১৯৫৪ খ্রি.)
আলোকঝারির চিতাবাঘ	বুদ্ধদেব গুহ	*শিশুসাথী*	১৩৬১ (১৯৫৪ খ্রি.)
মহিষমর্দন	অমিয়চন্দ্র মিত্র	*রামধনু*, ২৮ বর্ষ, ২য় সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ (১৯৫৫ খ্রি.)
শিকারী	রেণুকা বন্দ্যোপাধ্যায়	*রামধনু* ২৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা	আষাঢ় ১৩৬২ (১৯৫৫ খ্রি.)
শিকারী জীবন	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*দেবালয়* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৬২ (১৯৫৫ খ্রি.)
শিকারী জীবন (কবিতা)	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*জয়যাত্রা* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৬৩ (১৯৫৬ খ্রি.)
অমরেশের বাঘ শিকার (নাটিকা)	বিধায়ক ভট্টাচার্য্য	*জয়যাত্রা* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৬৩ (১৯৫৬ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
কুট্টিমামার দন্ত কাহিনী (হাসির গল্প)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	*জয়যাত্রা* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৬৩ (১৯৫৬ খ্রি.)
ছেলেবেলায় দেখা বাঘ শিকার	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	*রামধনু*, ২৯ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	আশ্বিন ১৩৬৩ (১৯৫৬ খ্রি.)
ছেলেবেলায় দেখা কুমীর শিকার	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	*রামধনু*, ২৯ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা	কার্ত্তিক ১৩৬৩ (১৯৫৬ খ্রি.)
বিপদের মুখোমুখি (শিকার কাহিনী)	প্রবীর কুমার	*শুকতারা*, ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা	বৈশাখ ১৩৬৪ (১৯৫৭ খ্রি.)
রায় বরুয়ার শিকার কাহিনী (ধারাবাহিক)	ডক্টর হিরণ্ময়	*রামধনু*, ৩০ বর্ষ	১৩৬৪ - ... (১৯৫৭ খ্রি. - ...)
গুলিখোর বাঘ (শিকার কাহিনী)	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*নবপত্রিকা* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৬৪ (১৯৫৭ খ্রি.)
মানুষখেকো বাঘ	স্নেহাংশুকান্ত আচার্য্য	বার্ষিক *শিশুসাথী*	১৩৬৪ (১৯৫৭ খ্রি.)
হাতি শিকার	সুজিৎ বাগচী	*শুকতারা*, ১০ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা	কার্ত্তিক ১৩৬৪ (১৯৫৭ খ্রি.)
একটি সত্যিকারের বাঘের গল্প (শিকার-কাহিনী)	এস. ডি. মুখার্জ্জী	*রামধনু*, ৩০ বর্ষ	চৈত্র ১৩৬৪ (১৯৫৮ খ্রি.)
পড়ো বাড়ীতে বুড়ো বাঘ	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*অপরাজিতা* (দেবসাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৬৫ (১৯৫৮ খ্রি.)
চালাক চিতা	স্নেহাংশুকান্ত আচার্য্য	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৬৫ (১৯৫৮ খ্রি.)
রায় ডাকে বাঘের ডাক (শিকার কাহিনী)	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*দেব দেউলে* (দেবসাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৬৬ (১৯৫৯ খ্রি.)
কুমীরের গল্প শোন (প্রবন্ধ)	ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৬৬ (১৯৫৯ খ্রি.)
একটা বাজে শিকারের কাহিনী	আশা দেবী	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৬৬ (১৯৫৯ খ্রি.)
নরখাদকের কবলে	ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী	*মৌচাক*, ৪০ বর্ষ, ১১ সংখ্যা	ফাল্গুন ১৩৬৬ (১৯৬০ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
শিকার	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	*অপরূপা* (দেবসাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৬৭ (১৯৬০ খ্রি.)
ভালুকের সঙ্গে ভল্টুর লড়াই (শিকার কাহিনী)	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*অপরূপা* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৬৭ (১৯৬০ খ্রি.)
মানুষ বাঘিনীর কাণ্ড (বন্য গল্প)	বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র	*অপরূপা* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৬৭ (১৯৬০ খ্রি.)
জলে ডাঙায়	সুষমা সেন	*শুকতারা*, ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা	পৌষ ১৩৬৭ (১৯৬০-৬১ খ্রি.)
প্রথম শিকার	বিস্ ওয়াস্	*শুকতারা*, ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা	পৌষ ১৩৬৭ (১৯৬০-৬১ খ্রি.)
এক ভাল্লুকের গল্প	রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর	*সন্দেশ*	১৩৬৮
ভালুক ধরা (কবিতা)	প্রভাতমোহন মুখোপাধ্যায়	*মৌচাক*, ৪২ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	আশ্বিন ১৩৬৮ (১৯৬১ খ্রি.)
মাছ মারার মজা	স্বপন বুড়ো	*মৌচাক*, ৪২ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	আশ্বিন ১৩৬৮ (১৯৬১ খ্রি.)
আজগুবিগঞ্জের বাঘ	অজিতকৃষ্ণ বসু	*মৌচাক*, ৪২ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	আশ্বিন ১৩৬৮ (১৯৬১ খ্রি.)
জোড়া বাঘের জোড়া পাওনাদার (শিকার কাহিনী)	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*শারদীয়া* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৬৮ (১৯৬১ খ্রি.)
বক্কেশ্বরের বাঘ শিকার (শিকার নিয়ে হাসির গল্প)	বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র	*শারদীয়া* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৬৮ (১৯৬১ খ্রি.)
বাঘ বাগানো সহজ (নক্সা)	প্রবুদ্ধ	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৬৮ (১৯৬১ খ্রি.)
বাঘের সঙ্গে বাঘা আলাপ (নক্সা)	আশা দেবী	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৬৮ (১৯৬১ খ্রি.)
টাঁড়বাঘোয়া	বুদ্ধদেব গুহ	*সন্দেশ*	১৯৬১ খ্রি.
আফ্রিকার ডায়েরী (ধারাবাহিক)	হীরেন্দ্রকুমার বসু	*শুকতারা*	ফাল্গুন ১৩৬৮-১৩৬৯ (১৯৬২ খ্রি.)
বাঘ নয় বাঘা মিঞা	শ্যামাপ্রসাদ নাথ	*শুকতারা*, ১৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৬৯ (১৯৬২ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
কাটুকিরার রহস্য	নলিনী দাশ	*সন্দেশ*	শ্রাবণ ১৩৬৯ (১৯৬২ খ্রি.)
বাঘ বন	সুকুমার দে সরকার	*সন্দেশ*	আশ্বিন ১৩৬৯ (১৯৬২ খ্রি.)
চিতা নাগেশ্বরী (শিকার)	শক্তিপদ রাজগুরু	*অলকানন্দা* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৬৯ (১৯৬২ খ্রি.)
সুন্দরবন	ননীগোপাল চক্রবর্তী	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৬৯ (১৯৬২ খ্রি.)
অরণ্য অতিথি (জঙ্গলের কাহিনী)	বন্দে আলী মিয়া	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৭০ (১৯৬৩ খ্রি.)
তিমির পেটে জ্যান্ত মানুষ (বাস্তব কাহিনী)	শান্তি ঠাকুর	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৭০ (১৯৬৩ খ্রি.)
বিষি মানুষ নয়, বাঘ (শিকার)	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*শ্যামলী* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৭০ (১৯৬৩ খ্রি.)
যমদুয়ারের ছোকরা বাঘ	বুদ্ধদেব গুহ	*সন্দেশ*	১৩৭০ (১৯৬৩ খ্রি.)
নেপোয় মারে দই (শিকার)	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*উত্তরায়ণ* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৭১ (১৯৬৪ খ্রি.)
ভয়ঙ্কর (শিকার কাহিনী)	বন্দে আলী মিয়া	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৭১ (১৯৬৪ খ্রি.)
সুসঙ্গের বনে-পাহাড়ে দেখা অভিনব জীব	ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ	*শিশুসাথী*	কার্তিক ১৩৭১ (১৯৬৪ খ্রি.)
বাঘের সাথে খালি হাতে (সত্য গল্প)	সাগরশঙ্কর সেনগুপ্ত	*সন্দেশ*	কার্তিক ১৩৭১ (১৯৬৪ খ্রি.)
আমার শিকার কাহিনী (রস রচনা)	শতদল গোস্বামী	*মৌচাক*, ৪৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা	শ্রাবণ ১৩৭২ (১৯৬৫ খ্রি.)
নকল শিকারীর সংকট	হেমেন্দ্রকুমার রায়	*নীহারিকা* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৭২ (১৯৬৫ খ্রি.)
মন্ত্রসিদ্ধ বাঘ (শিকার)	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*নীহারিকা* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৭২ (১৯৬৫ খ্রি.)
শিকার (কার্টুন)	চণ্ডী লাহিড়ী	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৭২ (১৯৬৫ খ্রি.)
শিকারী-শিকার	আভা পাকড়াশী	*মৌচাক*, ৪৬ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা	পৌষ ১৩৭২ (১৯৬৫-৬৬ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
শয়তানের থাবা	চিত্ত ঘোষাল	*শিশুসাথী*, ৪৫ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৭৩ (১৯৬৬ খ্রি.)
শিকারী বগলামামা (গল্প)	রাজকুমার মৈত্র	*অরুণাচল* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৭৩ (১৯৬৬ খ্রি.)
দানবের অপমৃত্যু (শিকার কাহিনী)	ময়ূখ চৌধুরী	*অরুণাচল* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৭৩ (১৯৬৬ খ্রি.)
শিকার চক্র (শিকার কাহিনী)	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*অরুণাচল* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৭৩ (১৯৬৬ খ্রি.)
মহারাজ ও বাঘ	হরিপদ রায়	*শিশুসাথী*, ৪৫ বর্ষ	চৈত্র ১৩৭৩ (১৯৬৭ খ্রি.)
একটি শিকার কাহিনী	শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৭৪ (১৯৬৭ খ্রি.)
সিংহ কবলিত যাত্রী ট্রেন	বীরু চট্টোপাধ্যায়	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৭৪ (১৯৬৭ খ্রি.)
বাঘ নয় বাঘিনী (শিকার কাহিনী)	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*ইন্দ্রনীল* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৭৫ (১৯৬৮ খ্রি.)
এক যে ছিল বাঘিনী	বেদুইন	*কিশোর ভারতী* (শারদীয়া)	১৩৭৫ (১৯৬৮ খ্রি.)
আমার প্রথম শিকার অভিযান	তুষারকান্তি বসু	*কিশোর ভারতী* (শারদীয়া)	১৩৭৫ (১৯৬৮ খ্রি.)
জটুদা শিকার করে	বেদুইন	*কিশোর ভারতী* (শারদীয়া)	১৩৭৬ (১৯৬৯ খ্রি.)
রাজার সঙ্গে শিকার	শৈবাল চক্রবর্তী	*কিশোর ভারতী* (শারদীয়া)	১৩৭৬ (১৯৬৯ খ্রি.)
সুন্দরবনে তিন রাত্রি	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	*কিশোর ভারতী* (শারদীয়া)	১৩৭৬ (১৯৬৯ খ্রি.)
শিকার ও শিকারি (কার্টুন)	কে. সরকার	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৭৬ (১৯৬৯ খ্রি.)
ঝুনকির বাদশা (শিকার কাহিনী)	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*শুকসারী* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৭৬ (১৯৬৯ খ্রি.)
ভৌতিক বাঘ	শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	*কিশোর ভারতী*, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা	পৌষ ১৩৭৬ (১৯৭০ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
সাঁওতালী শিকার উৎসব	ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে	*কিশোর ভারতী*, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	ফাল্গুন ১৩৭৬ (১৯৭০ খ্রি.)
বাঘের পিছু নিয়ে	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	*কিশোর ভারতী* (শারদীয়া)	আশ্বিন ১৩৭৭ (১৯৭০ খ্রি.)
হাতি খোলার হাতি রসগোল্লার মতি	অর্ধেন্দু দত্ত	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৭৭ (১৯৭০ খ্রি.)
মানুষখেকোর অন্তিম অনুরোধ	সৌরেন্দ্রকুমার পাল	*সন্দেশ*	১৩৭৭ (১৯৭০ খ্রি.)
কালো শয়তানের অপমৃত্যু	তুষারকান্তি বসু	*কিশোর ভারতী*, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা	অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ (১৯৭০ খ্রি.)
প্রতিধ্বনির অভিশাপ	নির্বেদ রায়	*কিশোর ভারতী*, ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৭৮ (১৯৭১ খ্রি.)
নরমুণ্ড শিকারীদের কবলে (রোমাঞ্চকর সত্য ঘটনা)	বীরু চট্টোপাধ্যায়	*উদ্বোধন* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৭৮ (১৯৭১ খ্রি.)
লালবাগের বাঘ (শিকার কাহিনী)	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*উদ্বোধন* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৭৮ (১৯৭১ খ্রি.)
আঁধার রাতের পথিক (শিকার কাহিনী)	প্রসাদ রায়	*উদ্বোধন* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৭৮ (১৯৭১ খ্রি.)
ডম্বলদার বাঘ শিকার	কমল লাহিড়ী	*শুকতারা*	১৩৭৮ (১৯৭১ খ্রি.)
সরষে খেতে বাঘ (শিকার)	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*পূরবী* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৭৯ (১৯৭২ খ্রি.)
অরণ্য কাহিনী (শিকার কাহিনী)	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৭৯ (১৯৭২ খ্রি.)
কিরিমিরির চিতাবাঘ (শিকার কাহিনী)	হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৭৯ (১৯৭২ খ্রি.)
শিকারি (কার্টুন)	চণ্ডী লাহিড়ী	*বার্ষিক শিশুসাথী*	১৩৭৯ (১৯৭২ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
হাঁদা ভোঁদার শিকার খেলা		*শুকতারা*	ফাল্গুন ১৩৭৯ (১৯৭৩ খ্রি.)
বিশু বাউলে	শিবশঙ্কর মিত্র	*সন্দেশ*	বৈশাখ ১৩৮০ (১৯৭৩ খ্রি.)
টেংনীর চিতাবাঘ (বনে যারা থাকে)	সঙ্কর্ষণ রায়	*কিশোর ভারতী*, ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ (১৯৭৩ খ্রি.)
প্রতিহিংসা (উপন্যাসোপম বড় সত্যিকার অ্যাডভেঞ্চার)	ময়ূখ চৌধুরী	*কিশোর ভারতী*, ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ (১৯৭৩ খ্রি.)
বাঘ যখন মানুষখেকো (বনে যারা থাকে ৪)	সঙ্কর্ষণ রায়	*কিশোর ভারতী*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা	আশ্বিন ১৩৮০ (১৯৭৩ খ্রি.)
সত্যি শোনা বাঘের গল্প (অরণ্য পুরুষের গল্প)	শিশির মজুমদার	*কিশোর ভারতী*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা	আশ্বিন ১৩৮০ (১৯৭৩ খ্রি.)
দুগ্যো সদ্দার	শিবশঙ্কর মিত্র	*সন্দেশ*	১৩৮০ (১৯৭৩ খ্রি.)
ডুয়ার্সের বাঘের পেছনে (শিকার কাহিনী)	ধীরেন্দ্রনাথ রায়	*তপোবন* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৮০ (১৯৭৩ খ্রি.)
আত্মা ও দুরাত্মা	ময়ূখ চৌধুরী	*শুকতারা*	ফাল্গুন ১৩৮০
দুঁদে শিকারি (কার্টুন)		*শুকতারা*	ফাল্গুন ১৩৮০
বাঘ শিকার	রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী	*সন্দেশ*	বৈশাখ ১৩৮১ (১৯৭৪ খ্রি.)
হে অরণ্য তুমি কি সুন্দর	সৌরেন্দ্রকুমার পাল	*সন্দেশ*	আষাঢ় ১৩৮১ (১৯৭৪ খ্রি.)
নরখাদক গুহামানব	পরমেশ চৌধুরী	*শুকতারা*, ২৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা	আশ্বিন ১৩৮১ (১৯৭৪ খ্রি.)
বড়লাট ও এক বেয়াদপ বাঘ (শিকার কাহিনী)	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	*মণিদীপা* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৮১ (১৯৭৪ খ্রি.)
ভাওয়ালের গড় জঙ্গলে (শিকার কাহিনী)	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	*মণিদীপা* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৮১ (১৯৭৪ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
তিমির পেটে মানুষ (রোমাঞ্চকর সত্য ঘটনা)	বীরু চট্টোপাধ্যায়	*মণিদীপা* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৮১ (১৯৭৪ খ্রি.)
পাত্থরগড়ের শয়তান	রাজকুমার মৈত্র	*শুকতারা*, ২৭বর্ষ, ৯ম সংখ্যা	কার্ত্তিক ১৩৮১ (১৯৭৪ খ্রি.)
অহিংস শিকার	অমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী	*সন্দেশ*	কার্ত্তিক ১৩৮১ (১৯৭৪ খ্রি.)
বাইসনের বনে	সঙ্কর্ষণ রায়	*কিশোর ভারতী*, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা	পৌষ ১৩৮১ (১৯৭৫ খ্রি.)
একটি ভয়ঙ্কর গ্রেপ্তারের কাহিনী	তুষারকান্তি বসু	*সন্দেশ*	চৈত্র ১৩৮১ (১৯৭৫ খ্রি.)
লাওয়ালঙের বাঘ	বুদ্ধদেব গুহ	*আনন্দমেলা*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ (১৯৭৫ খ্রি.)
হাতি দিয়ে হাতি ধরা	অভ্র রায়	*আনন্দমেলা*, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা	আষাঢ় ১৩৮২ (১৯৭৫ খ্রি.)
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গল মহলে	বুদ্ধদেব গুহ	*আনন্দমেলা* (পূজাবার্ষিকী)	১৩৮২ (১৯৭৫ খ্রি.)
ভাইপোর পাল্লায় শিকারী (হাসির)	ধনঞ্জয় বৈরাগী	*বলাকা* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৮২ (১৯৭৫ খ্রি.)
কাড়ুয়া	বুদ্ধদেব গুহ	*আনন্দমেলা*, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৮৩ (১৯৭৬ খ্রি.)
বাঘে মানুষে (সত্য ঘটনা)	শতদল ভট্টাচার্য	*আগমনী* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৮৩ (১৯৭৬ খ্রি.)
মউলির রাত	বুদ্ধদেব গুহ	*আনন্দমেলা* (পূজাবার্ষিকী)	১৩৮৩ (১৯৭৬ খ্রি.)
সুন্দরবনের হটকারিতা	শিবশঙ্কর মিত্র	*আনন্দমেলা* (পূজাবার্ষিকী)	১৩৮৩ (১৯৭৬ খ্রি.)
বাঘ নয় বাঘডাঁশা	রণজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়	*শুকতারা*, ২৯শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা	মাঘ ১৩৮৩ (১৯৭৭ খ্রি.)
শহরে জোড়া বাঘ	গঙ্গেশ বিশ্বাস	*আনন্দমেলা*, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা	শ্রাবণ ১৩৮৪ (১৯৭৭ খ্রি.)
টেনাগড়ে টেনশন	বুদ্ধদেব গুহ	*আনন্দমেলা*, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৮৪ (১৯৭৭ খ্রি.)
হরিণের কান্না	অমরেন্দ্র চক্রবর্তী	*আনন্দমেলা*, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৮৪ (১৯৭৭ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
ঋজুদার সঙ্গে সিমলিপাল	বুদ্ধদেব গুহ	*আনন্দমেলা* (পূজাবার্ষিকী)	১৩৮৪ (১৯৭৭ খ্রি.)
সফেদ হাতি	তপন সিংহ	*শুকতারা*	অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ (১৯৭৭ খ্রি.)
বাঘের খপ্পরে ভগবান	গঙ্গেশ বিশ্বাস	*আনন্দমেলা*, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা	ফাল্গুন ১৩৮৪ (১৯৭৮ খ্রি.)
লাটপঞ্চরের চোর ভালুক	গঙ্গেশ বিশ্বাস	*আনন্দমেলা*, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ (১৯৭৮ খ্রি.)
নাকুমামার ব্যাঘ্রপর্ব	শিশির বিশ্বাস	*শুকতারা*	জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ (১৯৭৮ খ্রি.)
শিকার (ছড়া)	প্রণব মুখোপাধ্যায়	*সন্দেশ*	আষাঢ় ১৩৮৫ (১৯৭৮ খ্রি.)
হাতি বনাম জীপ	অজিত কুমার সেন	*আনন্দমেলা*, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৮৫ (১৯৭৮ খ্রি.)
অজগরের আদর	সঙ্কর্ষণ রায়	*আনন্দমেলা*, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৮৫ (১৯৭৮ খ্রি.)
খুটিমারীর বেয়াড়া বাঘ	রণজিৎ রায়	*সন্দেশ*	১৩৮৫ (১৯৭৮ খ্রি.)
জেঠুমণি অ্যান্ড কোং (জঙ্গলের গল্প)	বুদ্ধদেব গুহ	*আনন্দমেলা* (পূজাবার্ষিকী)	১৩৮৫ (১৯৭৮ খ্রি.)
শিকারে অঘটন (লোমহর্ষক শিকারের উপন্যাস)	তুষারকান্তি বসু	*কিশোর ভারতী* (শারদীয়া)	১৩৮৫ (১৯৭৮ খ্রি.)
সুন্দরবন ভয়ংকর	শতদল ভট্টাচার্য	*চন্দনা* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৮৫ (১৯৭৮ খ্রি.)
বনবিবির বনে (ধারাবাহিক)	বুদ্ধদেব গুহ	*আনন্দমেলা*	পৌষ ১৩৮৫ (১৯৭৮-৭৯ খ্রি.)
হাতি শিকার	অনুরাধা ঘোষ	*আনন্দমেলা*	মাঘ ১৩৮৫ (১৯৭৯ খ্রি.)
সহযাত্রী বাঘ (জঙ্গলের গল্প)	সঙ্কর্ষণ রায়	*আনন্দমেলা*, ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা	ফাল্গুন ১৩৮৫ (১৯৭৯ খ্রি.)
সাধের গাড়োয়াল (জঙ্গলের গল্প)	বুদ্ধদেব গুহ	*আনন্দমেলা* (পূজাবার্ষিকী)	১৩৮৬ (১৯৭৯ খ্রি.)
এক যে ছিল বন (জঙ্গলের গল্প)	শিবশঙ্কর মিত্র	*আনন্দমেলা* (পূজাবার্ষিকী)	১৩৮৬ (১৯৭৯ খ্রি.)
টৌরি জঙ্গলের ভক্ত বাঘ	সুবোধ ঘোষ	*আনন্দমেলা* (পূজাবার্ষিকী)	১৩৮৬ (১৯৭৯ খ্রি.)
বাঘ হজম	অজিত কুমার সেন	*আনন্দমেলা*	কার্তিক ১৩৮৬ (১৯৭৯ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
তাপ্পিদার সাপ শিকার	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	*আনন্দমেলা*, ৫ম বর্ষ, ১৩ সংখ্যা	অগ্রহায়ণ ১৩৮৬ (১৯৭৯ খ্রি.)
তরাইয়ের বুনো হাতি	শান্তি সিংহ	*আনন্দমেলা*	অগ্রহায়ণ ১৩৮৬ (১৯৭৯ খ্রি.)
হাতিরা ঘেরাও করেছিল	নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়		পৌষ ১৩৮৬ (১৯৭৯-৮০ খ্রি.)
সর্বেশ্বরের কুমীর শিকার	গঙ্গেশ বিশ্বাস	*সন্দেশ*	১৩৮৭
গজেন কাকার মাছ ধরা	বিমল কর	*আনন্দমেলা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৮৭ (১৯৮০ খ্রি.)
গুগুনোগুম্বারের দেশে	বুদ্ধদেব গুহ	*আনন্দমেলা* (পূজাবার্ষিকী)	১৩৮৭ (১৯৮০ খ্রি.)
চোরা হাতি কাহিনী (শিকার কাহিনী)	সমরেশ বসু	*প্রভাতী* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৮৭ (১৯৮০ খ্রি.)
শিকার উৎসবে	সোমনাথ চক্রবর্তী	*আনন্দমেলা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা	পৌষ ১৩৮৭ (১৯৮০ খ্রি.)
পদ্মপলাশের বাঘ শিকার	নারায়ণ চক্রবর্তী	*শুকতারা*	জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮ (১৯৮১ খ্রি.)
সুন্দরবনের চড়ায়	নিখিলচন্দ্র সরকার	*আনন্দমেলা*, ৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	আষাঢ় ১৩৮৮ (১৯৮১ খ্রি.)
সুন্দরবনের হারুদা	স্নেহময় সিংহরায়	*আনন্দমেলা*, ৭ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৮৮ (১৯৮১ খ্রি.)
কানাই সর্দার (শিকারের গল্প)	শক্তিপদ রাজগুরু	*দেবায়ন* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৮৮ (১৯৮১ খ্রি.)
নরঘাতক চিতা ও অ্যান্ডারসন সাহেব	মঞ্জিল সেন	*সন্দেশ* (শারদীয়া)	ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮৮ (১৯৮১ খ্রি.)
মাছ ধরা	জীবন ভৌমিক	*আনন্দমেলা*, ৭ম বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা	অগ্রহায়ণ ১৩৮৮ (১৯৮১ খ্রি.)
বাঘ পোষা	প্রদোষ দত্ত	*শুকতারা*, ৩৪ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা	অগ্রহায়ণ ১৩৮৮ (১৯৮১ খ্রি.)
তারিণী খুড়ো ও ডুমনি-গড়ের মানুষখেকো	সত্যজিৎ রায়	*আনন্দমেলা*	পৌষ ১৩৮৮ (১৯৮২ খ্রি.)
হাতি-ধরিয়ে নায়ার	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	*আনন্দমেলা*	পৌষ ১৩৮৮ (১৯৮২ খ্রি.)
বাঁশপাহাড়ির দাঁতাল হাতি	দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়	*আনন্দমেলা*, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯ (১৯৮২ খ্রি.)
শিকারে গেলেন গবুচন্দ্র	শৈলেন কুমার দত্ত	*শুকতারা*	আষাঢ় ১৩৮৯ (১৯৮২ খ্রি.)
রুআহা (ধারাবাহিক)	বুদ্ধদেব গুহ	*আনন্দমেলা*	১৩৮৯ (১৯৮২-৮৩ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
ডিমেংকারি	বুদ্ধদেব গুহ	*আনন্দমেলা* (পূজাবার্ষিকী)	১৩৮৯ (১৯৮২ খ্রি.)
বেদে বাউলে	শিবশঙ্কর মিত্র	*আনন্দমেলা* (পূজাবার্ষিকী)	১৩৮৯ (১৯৮২ খ্রি.)
জঙ্গল লাইনের নানা সাহেব (গল্প)	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়	*বোধন* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৮৯ (১৯৮২ খ্রি.)
বনবাসী বন্ধু (সচিত্র কাহিনী)	ময়ূখ চৌধুরী	*বোধন* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৮৯ (১৯৮২ খ্রি.)
রোমাঞ্চকর অরণ্য রাত্রি (ছমছম অরণ্যের কাহিনী)	তুষারকান্তি বসু	*কিশোর ভারতী*, ১৫ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা	অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ (১৯৮২ খ্রি.)
আফ্রিকার সাপের সন্ধানে	অবনীভূষণ ঘোষ	*কিশোর ভারতী*	অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ (১৯৮২ খ্রি.)
খগনিশা	নির্বেদ রায়	*কিশোর ভারতী*, ১৫ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা	পৌষ ১৩৮৯ (১৯৮৩ খ্রি.)
হাসি মারার হাঁস শিকার (ছড়া)	যাদুকর এ. সি. সরকার	*বিভাবরী* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৯০ (১৯৮৩ খ্রি.)
বাঘে মানুষে লড়াই (রোমাঞ্চকর কাহিনী)	পরেশ ভট্টাচার্য	*বিভাবরী* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৯০ (১৯৮৩ খ্রি.)
পদ্মার চরে ভয়ঙ্কর	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	*বিভাবরী* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৯০ (১৯৮৩ খ্রি.)
ল্যাংড়া পাহান	বুদ্ধদেব গুহ	*আনন্দমেলা*	আশ্বিন ১৩৯০ (১৯৮৩ খ্রি.)
অজিতদার বাঘ শিকার	শৈবাল মিত্র	*আনন্দমেলা*	পৌষ ১৩৯০ (ডিসে. ১৯৮৩ খ্রি.)
ওদলা বাড়ির মা	জীবন সরকার	*আনন্দমেলা*	পৌষ ১৩৯০ (ডিসে. ১৯৮৩ খ্রি.)
কাঞ্চিগুার চিতা (শিকারের গল্প)	ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী	*শুকতারা*	বৈশাখ ১৩৯১ (১৯৮৪ খ্রি.)
সাংপো লামার কালো বাঘ	সমীর রক্ষিত	*আনন্দমেলা*	১৩৯১ (২১ শে মার্চ ১৯৮৪ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
‘গোরু মারা’ ফরেস্ট	অমরনাথ দে	*আনন্দমেলা*	১৩৯১ (৪ এপ্রিল ১৯৮৪ খ্রি.)
বাঘের বাচ্চা	আবদুল জব্বার	*আনন্দমেলা*	১৩৯১ (৪ আগস্ট ১৯৮৪ খ্রি.)
বাঘের মাংস	বুদ্ধদেব গুহ	*আনন্দমেলা* (পূজাবার্ষিকী)	১৩৯১ (১৯৮৪ খ্রি.)
রবিন (শিকার কাহিনী)	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	*আরাধনা* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৯১ (১৯৮৪ খ্রি.)
কিরমিনের আতঙ্ক (শিকার কাহিনী)	পরেশ ভট্টাচার্য	*আরাধনা* (দেব সাহিত্য কুটীর-পূজাবার্ষিকী)	১৩৯১ (১৯৮৪ খ্রি.)
গ্রামের পাশে জঙ্গল	সুরজিৎ দাশগুপ্ত	*আনন্দমেলা*, ১১ বর্ষ, ৮ সংখ্যা	শ্রাবণ ১৩৯২ (১৯৮৫ খ্রি.)
মায়ামৃগ (সত্যকাহিনী)	জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়	*শুকতারা*, ৩৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	শ্রাবণ ১৩৯২ (১৯৮৫ খ্রি.)
মুণ্ডু পাহাড়ের ভয়ংকর (শিকারের গল্প)	সুভাষ চৌধুরী	*শুকতারা*, ৩৮ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৯২
সুন্দরবনের বাঘ (অরণ্যের গল্প)	অর্ধেন্দু দত্ত	*আনন্দমেলা*	১৩৯২ (৪ সেপ্টে., ১৯৮৫ খ্রি.)
বাঘের সন্ধানে (শিকার কাহিনী)	অর্ধেন্দু দত্ত	*আনন্দমেলা*, ১১শ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা	আশ্বিন ১৩৯২ (২ অক্টো., ১৯৮৫ খ্রি.)
অন্য শিকার	বুদ্ধদেব গুহ	*আনন্দমেলা* (পূজাবার্ষিকী)	১৩৯২ (১৯৮৫ খ্রি.)
মুভি ক্যামেরা ও একটি গোঁয়ার গণ্ডার (জঙ্গলের গল্প)	মঞ্জরী লাহিড়ী	*আনন্দমেলা*	অগ্রহায়ণ ১৩৯২ (১৫ই ডিসে., ১৯৮৫ খ্রি.)
মেরুর পাগলা হাতী (জঙ্গলের গল্প)	মঞ্জরী লাহিড়ী	*আনন্দমেলা*	পৌষ ১৩৯২ (১৯৮৫ খ্রি.)
সীবা (শিকারের গল্প)	গৌতম মুখোপাধ্যায়	*শুকতারা*	বৈশাখ ১৩৯৩ (১৯৮৬ খ্রি.)
জিম করবেট বড় শিকারি বড় লেখক বড় মানুষ	চঞ্চল পাল	*আনন্দমেলা*, ১২ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা	আষাঢ় ১৩৯৩ (১৯৮৬ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
মুখে মুখে শোনা যেত একটি নাম : করবেট সাব	বুদ্ধদেব গুহ	*আনন্দমেলা*, ১২ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা	আষাঢ় ১৩৯৩ (১৯৮৬ খ্রি.)
জীও ঔর জীনে দ্যো (শিকারের গল্প)	বুদ্ধদেব গুহ	*শুকতারা* (শারদীয়া)	১৩৯৩ (১৯৮৬ খ্রি.)
চাঁদ পাহাড়ের মানুষ-খেকো (শিকারের গল্প)	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	*শুকতারা* (শারদীয়া)	১৩৯৩ (১৯৮৬ খ্রি.)
হাঙরের মুখ থেকে	ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী	*শুকতারা*	১৩৯৩ (১৯৮৬ খ্রি.)
মত্ত মাতঙ্গ (শিকারের গল্প)	শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়	*শুকতারা*	মাঘ ১৩৯৩ (১৯৮৭ খ্রি.)
এস্কিমোরা কেমন করে তিমি ধরে	জয় সেনগুপ্ত	*আনন্দমেলা*, ১২ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা	চৈত্র ১৩৯৩ (১৯৮৭ খ্রি.)
তরাইয়ের গুণ্ডা হাতি	পরেশ দত্ত	*সন্দেশ* (শারদীয়া)	ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৯৪ (১৯৮৭ খ্রি.)
ঋজুদার সঙ্গে লবঙ্গি বনে	বুদ্ধদেব গুহ	*আনন্দমেলা* (পূজাবার্ষিকী)	১৩৯৫ (১৯৮৮ খ্রি.)
সুন্দরবনের সততা	শিবশঙ্কর মিত্র	*আনন্দমেলা* (পূজাবার্ষিকী)	১৩৯৫ (১৯৮৮ খ্রি.)
কালো বাঘের আতঙ্ক	পরেশ দত্ত	*শুকতারা* (শারদীয়া)	১৩৯৫ (১৯৮৮ খ্রি.)
রেহালের বাঞ্ছা বাঘ (শিকারের গল্প)	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	*শুকতারা*, ৪২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা	ফাল্গুন ১৩৯৫ (১৯৮৯ খ্রি.)
মৃত্যুর মুখ থেকে (সত্য ঘটনা)	বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ	*শুকতারা*, ৪২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা	চৈত্র ১৩৯৫ (১৯৮৯ খ্রি.)
নেতারহাটের ছিঁচকে চিতা	ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়	*শুকতারা*	বৈশাখ ১৩৯৬ (১৯৮৯ খ্রি.)
বাঘের থাবা	পরেশ দত্ত	*শুকতারা*	আশ্বিন ১৩৯৬ (১৯৮৯ খ্রি.)
রাক্ষুসে সিংহ	ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী	*শুকতারা*	ফাল্গুন ১৩৯৬ (১৯৯০ খ্রি.)
অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার (এই দেশ এই বিশ্ব)	লক্ষ্মীন্দ্রকুমার সরকার	*আনন্দমেলা*, ১৬ বর্ষ, ২য় সংখ্যা	বৈশাখ ১৩৯৭ (১৯৯০ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
চিতা বাঘও ভয় পায়	সঙ্কর্ষণ রায়	*আনন্দমেলা*, ১৬ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ (১৯৯০ খ্রি.)
সুন্দরবনের জঙ্গলে	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	*কিশোর ভারতী*	(১৯৯০ খ্রি.)
বাঘের চোখে জল	পরেশ ভট্টাচার্য	*শুকতারা* (শারদীয়া)	১৩৯৭ (১৯৯০ খ্রি.)
কুমীরের শিকার	সঙ্কর্ষণ রায়	*শুকতারা* (শারদীয়া)	১৩৯৭ (১৯৯০ খ্রি.)
জেঠুর বাঘ মারা	কান্তিলাল কোলে	*শুকতারা*, ৪৩ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা	কার্তিক ১৩৯৭ (১৯৯০ খ্রি.)
বাঘের মুখোমুখি (শিকারের গল্প)	পরেশ দত্ত	*শুকতারা*, ৪৩ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা	অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ (১৯৯০ খ্রি.)
জঙ্গল ছাড়িয়ে	রামকৃষ্ণ দত্ত	*শুকতারা*, ৪৩ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা	মাঘ ১৩৯৭ (১৯৯১ খ্রি.)
বাঘে মানুষে	মীরা বালসুব্রমনিয়ন	*সন্দেশ*	মাঘ ১৩৯৭ (১৯৯১ খ্রি.)
বাঘের গুহায়	মঞ্জিল সেন	*সন্দেশ*	মাঘ ১৩৯৭ (১৯৯১ খ্রি.)
নল খাগড়ার বাঘ শিকারী	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	*শুকতারা*, ৪৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা	ফাল্গুন ১৩৯৭ (১৯৯১ খ্রি.)
পাহাড়পানির ভয়ঙ্কর	পরেশ দত্ত	*শুকতারা*, ৪৪ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা	বৈশাখ ১৩৯৮ (১৯৯১ খ্রি.)
ঋজুদার সঙ্গে সুফকর-এ (ধারাবাহিক উপন্যাস)	বুদ্ধদেব গুহ	*আনন্দমেলা*	১৩৯৮ (আগস্ট ১৯৯১ খ্রি.-...)
চিতার কবল থেকে	সুকুমার ভট্টাচার্য	*শুকতারা* (শারদীয়া)	আশ্বিন ১৩৯৮ (১৯৯১ খ্রি.)
বাঘবন্দী (শিকারের গল্প)	বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়	*শুকতারা*	অগ্রহায়ণ ১৩৯৮ (১৯৯১ খ্রি.)
দলমা পাহাড়ের শয়তান (জঙ্গলের গল্প)	ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়	*শুকতারা*	মাঘ ১৩৯৮ (১৯৯২ খ্রি.)
শালবনের বাঘ	কমল লাহিড়ী	*শুকতারা*	ফাল্গুন ১৩৯৮ (১৯৯২ খ্রি.)
শিকারী থেকে সন্ন্যাসী	প্রিয়রঞ্জন মৈত্র	*শুকতারা*	বৈশাখ ১৩৯৯ (১৯৯২ খ্রি.)
জালবন্দী রাজা বাঘ	পরেশ ভট্টাচার্য	*শুকতারা* (শারদীয়া)	আশ্বিন ১৩৯৯ (১৯৯২ খ্রি.)
একদিন সন্ধ্যায় একটি বাঘ	সুকুমার ভট্টাচার্য	*শুকতারা* (শারদীয়া)	১৩৯৯ (১৯৯২ খ্রি.)
বনবিবির দরগা	মঞ্জিল সেন	*শুকতারা* (শারদীয়া)	আশ্বিন ১৪০০ (১৯৯৩ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
গেছো বাঘের কবলে	পরেশ দত্ত	*শুকতারা* (শারদীয়া)	আশ্বিন ১৪০০ (১৯৯৩ খ্রি.)
বাদাবনে বাঘের মুখে	সুখেন্দু দত্ত	*সন্দেশ*	চৈত্র ১৪০০ (১৯৯৩ খ্রি.)
দলমা পাহাড়ের হাতী	এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়	*আনন্দমেলা* (পূজাবার্ষিকী)	১৪০১ (১৯৯৪ খ্রি.)
জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি	সুকুমার ভট্টাচার্য	*শুকতারা* (শারদীয়া)	১৪০১ (১৯৯৪ খ্রি.)
চিতার সঙ্গে হাতাহাতি	পরেশ দত্ত	*শুকতারা* (শারদীয়া)	১৪০১ (১৯৯৪ খ্রি.)
জঙ্গল দেখা হলো না	পরেশ ভট্টাচার্য	*শুকতারা*	পৌষ ১৪০১ (১৯৯৪ খ্রি.)
সিংহের মুখে বারো মিনিট	ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী	*শুকতারা*	ফাল্গুন ১৪০১ (১৯৯৫ খ্রি.)
চিতার মুখোমুখি	পরেশ দত্ত	*শুকতারা*	জ্যৈষ্ঠ ১৪০২ (১৯৯৫ খ্রি.)
মৃত্যুর দাঁত	ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়	*কিশোর ভারতী*	জুলাই (১৯৯৫ খ্রি.)
তিনু কাকার মাছ শিকার	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	*আনন্দমেলা* (পূজাবার্ষিকী)	১৪০২ (১৯৯৫ খ্রি.)
জুবেরের চিঠি বাঁচিয়ে-ছিল একটি প্রাণ	বিনায়ক মিশ্র	*আনন্দমেলা* (পূজাবার্ষিকী)	১৪০২ (১৯৯৫ খ্রি.)
বাঘিনীর লুকোচুরি	পরেশ ভট্টাচার্য	*শুকতারা* (শারদীয়া)	আশ্বিন ১৪০২ (১৯৯৫ খ্রি.)
বাঘে মহিষে (জঙ্গল ও শিকারের গল্প)	সুকুমার ভট্টাচার্য	*শুকতারা* (শারদীয়া)	১৪০২ (১৯৯৫ খ্রি.)
শ্লথ ভালুকের খপ্পরে (জঙ্গল ও শিকারের গল্প)	পরেশ দত্ত	*শুকতারা* (শারদীয়া)	১৪০২ (১৯৯৫ খ্রি.)
ঋজুদার সঙ্গে বক্সার জঙ্গলে	বুদ্ধদেব গুহ	*শুকতারা* (শারদীয়া)	আশ্বিন ১৪০৩ (১৯৯৬ খ্রি.)
মান্ডিখেরার চিতা (শিকার)	পরেশ দত্ত	*শুকতারা* সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ	চৈত্র ১৪০৩ (১৯৯৭ খ্রি.)
বুদ্ধু ও কালো সাপ	সুকুমার ভট্টাচার্য	*শুকতারা* (শারদীয়া)	১৪০৪ (১৯৯৭ খ্রি.)
মধ্যরাতে চিতার আতঙ্ক	পরেশ দত্ত	*শুকতারা* (শারদীয়া)	১৪০৪ (১৯৯৭ খ্রি.)
বাঘের বাবা জুজু (জঙ্গলের গল্প)	আবদুল জব্বার	*শুকতারা*	অগ্রহায়ণ ১৪০৪ (১৯৯৭ খ্রি.)

রচনা	রচনাকার	পত্রপত্রিকা	প্রকাশকাল
বেপরোয়া চিতা (শিকার ও জঙ্গলের গল্প)	পরেশ দত্ত	*শুকতারা* (শারদীয়া)	আশ্বিন ১৪০৫ (১৯৯৮ খ্রি.)
গজপতি (শিকার ও জঙ্গলের গল্প)	সুকুমার ভট্টাচার্য	*শুকতারা* (শারদীয়া)	আশ্বিন ১৪০৫ (১৯৯৮ খ্রি.)
তরাইয়ের নরখাদক (শিকার ও জঙ্গলের গল্প)	মঞ্জিল সেন	*শুকতারা* (শারদীয়া)	আশ্বিন ১৪০৬ (১৯৯৯ খ্রি.)
ভালুকের বিলাপ (শিকার ও জঙ্গলের গল্প)	আবদুল জব্বার	*শুকতারা* (শারদীয়া)	আশ্বিন ১৪০৬ (১৯৯৯ খ্রি.)
সিবিয়া (শিকার ও জঙ্গলের গল্প)	সুকুমার ভট্টাচার্য	*শুকতারা* (শারদীয়া)	আশ্বিন ১৪০৬ (১৯৯৯ খ্রি.)

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা

আকর পত্রপত্রিকা

চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, সম্পা. *আনন্দমেলা.* ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা - ১৩শ বর্ষ. কলিকাতা : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, মে ১৯৭৬-১৯৮৭.

চট্টোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সম্পা. *রংমশাল.* ৯ম বর্ষ. কলিকাতা : রংমশাল কার্যালয়, ১৩৫২ ব.

চট্টোপাধ্যায়, ত্রিদিবকুমার, সম্পা. *কিশোর ভারতী.* ২৭ বর্ষ. কলিকাতা : পত্রভারতী, জুলাই ১৯৯৫.

চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র, সম্পা. *কিশোর ভারতী.* কলিকাতা : পত্রভারতী, ১৯৬৮-১৯৯০.

দাশগুপ্ত, শ্রীমতী, সম্পা. *শিশুসাথী.* কলিকাতা : বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিমিটেড্ (আশুতোষ লাইব্রেরী), ১৯৬৬- ... .

ধর, আশুতোষ, সম্পা. *শিশুসাথী.* কলিকাতা : আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৯২২- ... .

বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র, সম্পা. *শিশুসাথী.* কলিকাতা : আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৯৫৯- ... .

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস, সম্পা. *আনন্দমেলা.* কলিকাতা : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১৯৯১-১৯৯৫.

— . সহকারী সম্পা. *আনন্দমেলা.* কলিকাতা : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১৯৮৮-১৯৯০.

ভট্টাচার্য্য, উপেন্দ্রনাথ, সম্পা. *বার্ষিক শিশুসাথী.* কলিকাতা : বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিমিটেড্ (আশুতোষ লাইব্রেরী), ১৯৪১.

ভট্টাচার্য্য, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ, সম্পা. *রামধনু.* কলিকাতা : রামধনু কার্য্যালয়, ১৯৩৮- ... .

ভট্টাচার্য্য, বিশ্বেশ্বর, সম্পা. *রামধনু.* ১ম বর্ষ-২য় বর্ষ. কলিকতা : রামধনু কার্য্যালয়, ১৯২৭-১৯২৮.

ভট্টাচার্য্য, মনোরঞ্জন, সম্পা. *রামধনু.* কলিকাতা : রামধনু কার্য্যালয়, ১৯২৯-১৯৩৮.

মজুমদার, অরুণকুমার, সম্পা. *শুকতারা.* কলিকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর, ...

মজুমদার, মধুসূদন, সম্পা. *শুকতারা.* কলিকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৪৭- ... .

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, সম্পা. *বার্ষিক শিশুসাথী.* কলিকাতা : আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৯২৬.

মজুমদার, লীলা ও সত্যজিৎ রায়, সম্পা. *সন্দেশ.* কলিকাতা : সন্দেশ কার্যালয়, ১৯৬৩-১৯৭৪.

মজুমদার, লীলা, নলিনী দাস ও সত্যজিৎ রায়, সম্পা. *সন্দেশ.* কলিকাতা : সন্দেশ কার্যালয়, ১৯৭৪-১৯৯৩.

মজুমদার, লীলা ও বিজয়া রায়, সম্পা. *সন্দেশ.* কলিকাতা : সন্দেশ কার্যালয়, ১৯৯৩-১৯৯৮.

মজুমদার, সুবোধচন্দ্র, সম্পা. *শুকতারা.* কলিকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৮২.

মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, সম্পা. *বার্ষিক শিশুসাথী.* কলিকাতা : বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিমিটেড (আশুতোষ লাইব্রেরী), ১৯৩৯.

রায়, উপেন্দ্রকিশোর, সম্পা. *সন্দেশ.* কলিকাতা : মেসার্স ইউ রায় অ্যান্ড সন্স, ১৯১৩-১৫.

রায়, সত্যজিৎ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সম্পা. *সন্দেশ.* কলিকাতা : সন্দেশ কার্যালয়, মে ১৯৬১-১৯৬৩.

রায়, সুকুমার, সম্পা. *সন্দেশ.* কলিকাতা : ইউ রায় অ্যান্ড সন্স, ১৯১৫-১৯২৩.

রায় (চৌধুরী), সুবিনয়, সম্পা. *সন্দেশ.* কলিকাতা : ইউ রায় অ্যান্ড সন্স, ১৯২৩-১৯২৬.

—, সম্পা. *সন্দেশ নবপর্যায়.* কলিকাতা : ..., ১৯৩১-৩৪.

রায়, হেমেন্দ্রকুমার, সম্পা. *অরবিন্দ পূজাবার্ষিকী.* কলিকাতা : শরৎ সাহিত্য ভবন, ১৯৫৪.

—, সম্পা. *আকাশদীপ পূজাবার্ষিকী.* কলিকাতা : শরৎ সাহিত্য ভবন, ১৯৪৬.

—, সম্পা. *কলরব পূজাবার্ষিকী.* কলিকাতা : শরৎ সাহিত্য ভবন, ১৯৪৫.

—, সম্পা. *তপোবন পূজাবার্ষিকী.* কলিকাতা : শরৎ সাহিত্য ভবন, ১৯৫২.

—, সম্পা. *মনোরথ পূজাবার্ষিকী.* কলিকাতা : শরৎ সাহিত্য ভবন, ১৯৪৯.

—, সম্পা. *রংমশাল.* ৫ম- ৭ম বর্ষ. কলিকাতা : রংমশাল কার্যালয়, ১৯৪০-১৯৪২.

—, সম্পা. *সারথি পূজাবার্ষিকী.* কলিকাতা : শরৎ সাহিত্য ভবন, ১৯৫০.

—, সম্পা. *সুপ্রভাত পূজাবার্ষিকী.* কলিকাতা : শরৎ সাহিত্য ভবন, ১৯৫১.

সরকার, অশোককুমার, সম্পা. *আনন্দমেলা.* ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা - ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা. কলিকাতা : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, এপ্রিল ১৯৭৫ - এপ্রিল ১৯৭৬.

সরকার, সুধীরচন্দ্র, সম্পা. *মৌচাক.* কলিকাতা : এম সি সরকার এণ্ড সন্স লি:, ১৯২০- ... .

আকর বই

আচার্য, সূর্য্যকান্ত. *শিকার-কাহিনী.* কলকাতা : সান্যাল অ্যাণ্ড কোং, ১৩১৩ ব.

আচার্য চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রনারায়ণ. *শিকার ও শিকারী.* কলিকাতা : শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৩৩২ ব.

করবেট, জিম. *কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ.* ২য় মুদ্রণ. কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৯.

—. *জিম করবেট অমনিবাস.* জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ. মহাশ্বেতা দেবী, অনু. কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৫৮ ব.

গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ, পুনরুদ্ধার ও সম্পাদনা. *বালক.* কলকাতা : পারুল, ২০০৮.

—, পুনরুদ্ধার ও সম্পাদনা. *সেরা রংমশাল ১৩৪৩-১৩৫৪.* কলকাতা : পত্রভারতী, ২০০৩.

গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বদেব, সম্পা. *বাঙালির দুষ্প্রাপ্য শিকার অভিযান.* কলকাতা : বুকফার্ম, ২০১৬.

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল. *কাকাবাবু আর বাঘের গল্প.* ১ম সংস্করণ. কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০০৯.

—. *কাকাবাবু বনাম চোরাশিকারি.* ১ম সংস্করণ. কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫.

—. *জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ.* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, অক্টোবর ১৯৭৯.

গুহ, বুদ্ধদেব. *ঋজুদা সমগ্র* ১. কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩.

—. *ঋজুদা সমগ্র* ২. কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৪.

—. *ঋজুদা সমগ্র* ৩. কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০.

—. *কিশোর সাহিত্য.* অশোককুমার মিত্র, সম্পা. কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ, ২০১১.

ঘোষ, শ্যামলকৃষ্ণ. *জঙ্গলে জঙ্গলে.* কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭২ ব.

চট্টোপাধ্যায়, অরুণা, সম্পাদন ও পুনর্মুদ্রণ. *সখা, সখা ও সাথী.* ১ম খণ্ড ১ম ও ২য় বর্ষ. কলকাতা : কল্লোল, ২০০২.

চট্টোপাধ্যায়, ত্রিদিবেন্দ্র নারায়ণ. *শিকার.* কলকাতা : অন্তরীপ পাবলিকেশন, ২০২১.

—, নবরূপায়ণ. *দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ.* ৭ম মুদ্রণ. কলকাতা : পত্রভারতী, ২০১৮.

—, নবরূপায়ণ. *দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ.* ৬ষ্ঠ মুদ্রণ. কলকাতা : পত্রভারতী, ২০২৩.

—, নবরূপায়ণ. *দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ.* ৪র্থ মুদ্রণ. কলকাতা : পত্রভারতী, ২০২৩.

চট্টোপাধ্যায়, বীরু. *রোমাঞ্চকর সত্যকাহিনী.* পুনর্মুদ্রণ. কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩.

চৌধুরী, কমল, সম্পা. *জঙ্গলে জঙ্গলে.* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬.

চৌধুরী, ময়ূখ. *ময়ূখ চৌধুরী রচনাসমগ্র.* দেবাশিস সেন ও তুষার মাঝি, সম্পা. ১ম খণ্ড. কলকাতা : লালমাটি প্রকাশন, ২০১২.

চৌধুরী দেবশর্মা, কুমুদনাথ. *ঝিলে জঙ্গলে শিকার.* প্রিয়ম্বদা দেবী, অনু. কলকাতা : পার্চমেন্ট, ২০১৮.

দত্ত, অর্ধেন্দু. *শিকারের গপ্পো.* কলকাতা : দে'জ, ১৯৮৭.

দাশ, অসিতাভ, সম্পা. *শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত মুকুল পত্রিকার সংকলন : সব সেরা মুকুল ১৩০২-১৩০৭ বঙ্গাব্দ.* কলকাতা : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২০১৮.

দাশগুপ্ত, হীরালাল. *বাঘের জঙ্গলে.* কলিকাতা : এ মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লি:, ১৩৫৩.

দে, সুধাংশুশেখর, প্রকাশক. *সন্দেশ সেরা উপন্যাস সংকলন ১৯৬১-২০০০.* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩.

—. *সন্দেশ সেরা গল্প সংকলন ১৯৬১-২০০০.* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩.

দে সরকার, সুকুমার. *ছোটদের অমনিবাস.* কলকাতা : এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ...

নিয়োগী, অখিলবন্ধু (স্বপনবুড়ো). *স্বপনবুড়ো রচনা সমগ্র.* নিমাই গরাই, সম্পা. ১ম খণ্ড. কলকাতা : লালমাটি প্রকাশন, ২০১৭.

বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ. *শিকারের গল্প.* কলিকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৫৭.

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ. *কিশোর সাহিত্য সমগ্র.* ৬ষ্ঠ মুদ্রণ. কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৪২১ ব.

—. *বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র.* তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পা. ২য় খণ্ড. কলকাতা : শুভম্, ২০১১.

—. *বিভূতিভূষণ রচনাবলী.* জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ. ৫ম খণ্ড. কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৩ ব.

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমাংশু. *শিকার.* কলিকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ১৩৬৩ ব.

বসু, বিশ্বনাথ. *গারো হিলের গুণ্ডা হাতি.* কলিকাতা : ময়ূখ বসু, ১৩৬৬ ব.

বসু, স্বপন. প্রাক্কথন ও পুনর্মুদ্রণ. *সত্যপ্রদীপ.* কলকাতা : পারুল, ২০১১.

বসু, হীরেন্দ্রকুমার. *বনে জঙ্গলে.* কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২৪ ব.

বিশ্বাস, গৌরব, সম্পা. বাঙালির শিকার স্মৃতি. কলকাতা : সুপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২৩.

ভদ্র, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ. *বিরূপাক্ষ রচনাসমগ্র.* কলকাতা : লালমাটি প্রকাশন, ২০০৯.

ভূপ বাহাদুর, নৃপেন্দ্রনারায়ণ. *কোচবিহার ডুয়ার্স ও আসামে শিকারের সাঁইত্রিশ বছর.* অনিরুদ্ধ পালিত, অনু. কলকাতা : পার্চমেন্ট, ২০২০.

মজুমদার, অরুণ চন্দ্র, প্রকাশক. *সেরা শুকতারা ১৩৫৪-১৩৭৯.* পুনমুর্দ্রণ. ১ম খণ্ড. কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪.

—. *সেরা শুকতারা* ১৩৮০-১৪০৪. পুনর্মুদ্রণ. ২য় খণ্ড. কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬.

মজুমদার, লীলা. *কাগ নয়.* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮.

মিত্র, অশোককুমার ও সুবিমল মিশ্র, পুনরুদ্ধার ও উপস্থাপনা. *ভুবনমোহন রায় সম্পাদিত সখা ও সাথী.* কলকাতা : শিশু কিশোর আকাদেমি, ২০১৫.

মিত্র, খগেন্দ্রনাথ. *খগেন্দ্রনাথ মিত্র রচনা সমগ্র.* নিমাই গরাই, সম্পা. ১ম খণ্ড. কলকাতা : লালমাটি প্রকাশন, ২০১৭.

—. *বনে জঙ্গলে.* পুনর্মুদ্রণ. কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬.

মিত্র, শিবশঙ্কর. *সুন্দরবন সমগ্র.* ৭ম মুদ্রণ. কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩.

মিশ্র, সুবিমল, ভূমিকা ও পুনর্মুদ্রণ. *ভুবনমোহন রায় সম্পাদিত সাথী.* কলকাতা : পৃথা মিশ্র, ২০১০.

মুখোপাধ্যায়, জগমোহন. *শিকার কাহিনী.* কলকাতা : সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (পলাশী), ১৩৬৭.

রাহা, সুধীন্দ্রনাথ. *পৃথিবীর রোমাঞ্চকর শিকার কাহিনী.* কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৭৭.

রায়, উপেন্দ্রকিশোর. *উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র.* সুনীল জানা, সংকলন ও সম্পাদনা. ৯ম সংস্করণ. কলকাতা : দে'জ, ২০১৮.

রায়, ধীরেন্দ্রনারায়ণ. *বাঘভালুকের দেশে.* কলিকাতা : বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, ১৩৬৯ ব.

রায়, প্রমদারঞ্জন. *বনের খবর.* ৩য় মুদ্রণ. কলকাতা : লালমাটি প্রকাশন, মে ২০১৫.

রায়, প্রসাদরঞ্জন, প্রণব মুখোপাধ্যায়, সুগত রায়, দেবাশিস সেন, সম্পাদক মণ্ডলী. *সন্দেশ সেরা উপন্যাস সংকলন ১৯৬১-২০০০.* কলকাতা : দে'জ পাবলিশার্স, ২০১৫.

রায়, সঙ্কর্ষণ. *বন্যরা বনে.* কলিকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭.

রায়, সত্যজিৎ. *ফেলুদা সমগ্র.* ১৪দশ মুদ্রণ. ১ম খণ্ড. কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২১.

—, সম্পা. *সেরা সন্দেশ ১৩৬৮-১৩৮৭.* ১৫শ মুদ্রণ. কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২০ ব.

রায়, সুকুমার. *সমগ্র শিশুসাহিত্য.* সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু, সম্পা. ১৬শ মুদ্রণ. কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৯ ব.

রায়, হেমেন্দ্রকুমার. হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী. গীতা দত্ত, সম্পা. কলকাতা : এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯৭৪.

রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ. *জঙ্গল.* কলিকাতা : প্রবাসী কার্য্যালয়, ১৯৫৩.

সরকার, যোগীন্দ্রনাথ. *চিরকালের সেরা.* চন্দনা দত্ত, সম্পা. ৪র্থ মুদ্রণ. কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ, ২০১২.

—, সম্পাদিত ও সঙ্কলিত. *বনে-জঙ্গলে.* কলিকাতা : সিটি বুক সোসাইটি, ১৯৩৫.

সরকার, সুপ্রিয়, সম্পা. *জয়ন্তী মৌচাক : সুধীরচন্দ্র সরকার প্রতিষ্ঠিত.* নতুন সংস্করণ. কলকাতা : এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লি., ১৩৮৯.

সাইফুল্লা ও এ টি এম সাহাদাতুল্লা, সংকলন ও সম্পাদনা. *দিগ্‌দর্শন.* কলকাতা : বুকস স্পেস, ২০১২.

সেন, অশোক ও শুভেন্দু দাশমুন্সী. *জীবজন্তুর গল্পসল্প.* কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ, ২০০৫.

সেন, পৃথ্বীরাজ, সম্পা. *শিকার অমনিবাস.* কলিকাতা : অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, ১৩৬৬ ব.

সেন, বিজয়কান্ত. *আমার শিকার স্মৃতি.* কলিকাতা : বিহার সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লি:, ১৯৫৬.

সেনগুপ্ত, পৌলমী, সম্পা. *আনন্দমেলা গল্প সংকলন.* ৩য় মুদ্রণ. কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১.

—, সম্পা. *পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা গল্প সংকলন.* ৪র্থ মুদ্রণ. কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৩.

সহায়ক বই

কাফি, আব্দুল ও ঋকসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পা. *ছায়াশরীর সেকাল একালের ভূতের গল্প.* কলকাতা : তৃতীয় পরিসর, জানুয়ারি ২০১৭.

গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বদেব, সম্পা. *বাঙালির মৎস্যশিকার.* কলকাতা : ৯ ঋকাল বুক্‌স, ফেব্রুয়ারি ২০২২.

গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ. *বার্ষিকীর বারান্দা.* কলকাতা : একুশ শতক, জানুয়ারি ২০১৮.

—. *সাময়িকপত্র প্রসঙ্গে.* কলকাতা : দে'জ, জানুয়ারি ২০১৩.

গুপ্ত, অন্বয় ও শুভাঞ্জন বসু, সম্পা. *বাঘচরিত.* কলকাতা : খসড়া প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০২৩.

গুহ, রামচন্দ্র. *পরিবেশবাদ একটি বৈশ্বিক ইতিহাস* (অনুবাদ নীহাররঞ্জন বাগ ও মুখবন্ধ পরিমল ভট্টাচার্য). কলকাতা : বুকপোস্ট পাবলিকেশন, ডিসেম্বর ২০২২.

ঘোষ, ঈশানচন্দ্র, অনুদিত. *জাতক.* পুনর্মুদ্রণ. ১-৬ খণ্ড. কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৫ ব.

ঘোষ, দীপঙ্কর. *আদিবাসী শিকার সংস্কৃতি.* কলকাতা : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি ২০০৯.

ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ. *বাঙ্গালীর বাহুবল.* কলকাতা : শব্দ প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০১৯.

ঘোষাল, চণ্ডিকা প্রসাদ. *বঙ্গবাসীর শিকারকথা.* কলকাতা : আনন্দ, নভেম্বর ২০২১.

—. *বিভূতিভূষণ : স্ববিরোধী সংবেদ : অপুর ভুবন থেকে অরণ্য জগৎ.* কলকাতা : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৯.

—. *শিকারের ণত্ব-ষত্ব.* কলকাতা : সূত্রধর, বইমেলা ২০১০.

—, সম্পা. *অরণ্য সমগ্র : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়.* কলকাতা : গাঙচিল, ডিসেম্বর ২০১৩.

চক্রবর্তী, অরিন্দম. *দেহ গেহ বন্ধুত্ব ছটি শারীরিক তর্ক.* কলকাতা : অনুষ্টুপ, জুলাই ২০০৮.

চক্রবর্তী, কল্যাণ. *মানুষ ও বাঘ.* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ডিসেম্বর ১৯৮৮.

চক্রবর্তী, দিলীপকুমার. *ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস.* কলকাতা : আনন্দ, সেপ্টেম্বর ২০১৯.

চক্রবর্তী, রণবীর. *ভারত-ইতিহাসের আদিপর্ব (প্রথম খণ্ড) : প্রাচীনতম পর্ব থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দ.* কলকাতা : ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭.

চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ, সম্পা. *মহাকবি কালিদাস প্রণীতম্ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্.* কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৫.

চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ, সম্পা. *নারায়ণ - প্রণীতঃ হিতোপদেশঃ.* কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, অক্টোবর ১৯৯৩.

চক্রবর্তী, সুধীর, সম্পা. *বুদ্ধিজীবীর নোটবই.* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, জুন ২০০৫.

জলিল, এ. এফ. এম. আবদুল. *সুন্দরবনের ইতিহাস.* কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ২০০০.

থাপার, রোমিলা. *ভারতবর্ষের ইতিহাস ১০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ - ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দ.* কলকাতা : ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, জানুয়ারি ১৯৮০.

দত্ত, ইপ্সিতা. *সন্দেশ ও বাংলা শিশুসাহিত্য প্রথম পর্যায়.* কলকাতা : সপ্তর্ষি প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১২.

দাশ, জীবনানন্দ. *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা. দ্বাদশ মুদ্রণ.* কলকাতা : ভারবি, ২০০৭.

দাশ, নির্মল. *চর্যাগীতি পরিক্রমা.* ৩য় সংস্করণ. কলকাতা : দে'জ, জানুয়ারি ২০০৫.

দাস, জয়ন্ত. *বিবর্তন আদি যুদ্ধ আদি প্রেম.* কলকাতা : গাঙচিল, মার্চ ২০২২.

দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, সঙ্কলিত ও সম্পাদিত. *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান.* ১ম ও ২য় ভাগ. কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., ১৯৮৬.

নস্কর, সনৎকুমার, সম্পা. *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী.* ৩য় সংস্করণ. কলকাতা : রত্নাবলী, ডিসেম্বর ২০০৫.

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কমিটি. *সাহিত্যচর্চা বাংলা ক দ্বাদশ শ্রেণি.* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, ২০১৭.

পাল, অমল, সংকলিত. *কিশোরপাঠ্য পত্রিকাপঞ্চক সূচি-সংকলন.* কলকাতা : দে'জ, আগস্ট ২০০৭.

প্রামাণিক, শঙ্করকুমার. *সুন্দরবনের বাঘ বিধবা.* কলকাতা : গাঙচিল, ডিসেম্বর ২০২১.

বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুশ্রী. *প্রাগিতিহাস ভারতবর্ষে পরিযান ও জাতিগোষ্ঠী গঠন.* কলকাতা : গাঙচিল, মার্চ ২০২২.

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র. *আত্মহত্যার অধিকার এবং অন্যান্য সনদ.* কলকাতা : প্রতিভাস, এপ্রিল ২০১২.

বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী. *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য.* কলকাতা : কারিগর, সেপ্টেম্বর ২০১৩.

—. *বাংলা উপন্যাসে ওরা.* কলকাতা : প্যাপিরাস, জানুয়ারি ১৯৯৬.

—. *বাংলা শিশুসাহিত্যের ছোটো মেয়েরা.* কলকাতা : গাঙচিল, আষাঢ় ১৪১৪ ব.

—. *নিবন্ধ নির্ঝর.* কলকাতা : একলব্য, ২০২১.

বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর. *পলাশি থেকে পার্টিশন আধুনিক ভারতের ইতিহাস.* কৃষ্ণেন্দু রায়, অনু. কলকাতা : ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০০৯.

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, অনু. *মনুসংহিতা.* ৬ষ্ঠ মুদ্রণ. কলকাতা : আনন্দ, অক্টোবর ২০১৩.

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ. *বঙ্গীয় শব্দকোষ.* ৭ম মুদ্রণ. ১ম ও ২য় খণ্ড. কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৮.

বসু, অবনীন্দ্রকৃষ্ণ. *বাঙ্গালীর সার্কাস.* হরিপদ ভৌমিক, কথামুখ. কলকাতা : গাঙচিল, জুলাই ২০১৩.

বসু, চারুচন্দ্র ও ললিতমোহন কর, সম্পা. *অশোক অনুশাসন.* কলকাতা : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস মেট্‌কাফ্‌ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩২২ ব.

বসু, প্রদীপ. *পারিবারিক প্রবন্ধ বাঙালি পরিবারের সন্ধর্ভ বিচার.* কলকাতা : গাঙচিল, মার্চ ২০১২.

—. *বাংলা ভাষায় সমাজবিদ্যাচর্চা.* কলকাতা : চর্চাপদ, জুলাই ২০১১.

—. সম্পা. *সাময়িকী (১, ২).* কলকাতা : আনন্দ, ২০০৯.

বসু, স্বপন. *উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র.* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ২০১৮.

বসু, স্বপন ও মুনতাসীর মামুন, সম্পা. *দুই শতকের বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্র.* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ২০০৫.

ভট্টাচার্য, সব্যসাচী. *বাংলায় সন্ধিক্ষণ ইতিহাসের ধারা ১৯২০-১৯৪৭.* কলকাতা : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, প্রথম বাংলা সংস্করণ ২০১৮.

ভাণ্ডারী, অজয়কুমার, অনূদিত ও সম্পাদিত. *বাল্মীকি রামায়ণ.* কলকাতা : গিরিজা, ডিসেম্বর ২০১৪.

মুখোপাধ্যায়, অনির্বাণ, সম্পা. *নিবন্ধ বৈচিত্রের তিন দশক.* কলকাতা : চর্চাপদ, জানুয়ারি ২০১০.

মিত্র, খগেন্দ্রনাথ. *শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য ১৮১৮-১৯৬০.* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, নভেম্বর ১৯৯৯.

মিত্র, সনৎকুমার, সম্পা. *বাঘ ও সংস্কৃতি.* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮০.

মৈত্র, সুবীরকুমার. *সাত দশক : সমকাল ও আনন্দবাজার.* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নভেম্বর ২০১৩.

রায়, অনুরাধা. *ইতিহাসের হরেক গেরো.* কলকাতা : অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৯.

—. সংকলন ও সম্পাদনা . *স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের গান-কবিতা উনিশ শতক.* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০১২.

—. সংকলন ও সম্পাদনা. *স্বাধীনতা সংগ্রামের গান ও কবিতা বিংশ শতাব্দী.* কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৯.

রায়, নীহাররঞ্জন. *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব.* কলকাতা : দে'জ, ফাল্গুন ১৪১২.

রায়, প্রসাদরঞ্জন, সম্পা. *অনন্য অন্য লীলা মজুমদার.* কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০১১.

রায়, বিশ্বজিৎ. *পোড়োজমির কবিতা.* কলকাতা : ঋত প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৯.

—. *প্রোফেসর শঙ্কুর শেষ ডায়েরি.* কলকাতা : লালমাটি, বইমেলা ২০১৩.

—. *সচলতার গান.* কলকাতা : সূত্রধর, ডিসেম্বর ২০১৮.

—, *সংকীর্ণতা বিরোধী বঙ্গসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব.* কলকাতা : আপন পাঠ, ফেব্রুয়ারি ২০২২.

রায়, মোহিত, সম্পা. *পরিবেশ চর্চা : ইতিহাস ও বিবর্তন.* কলকাতা : অনুষ্টুপ, ডিসেম্বর ২০১৫.

—. *বাঘা যতীন হইতে ব্যাঘ্র প্রকল্প.* কলকাতা : আনন্দ, নভেম্বর ২০১৯.

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, সম্পা. *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা.* তৃতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ. কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, অগ্রহায়ণ ১৪১৫.

শ্রীমানী, অর্চ্চনা ও কল্যানী প্রামাণিক, সংকলক. *বাংলা শিশুসাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী.* কলিকাতা : রূপা প্রকাশনী, জুলাই ২০০২.

সরকার, সুমিত. *আধুনিক ভারত : ১৮৮৫-১৯৪৭.* কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৪.

সরকার, সুমিত. *মর্ডান টাইম্‌স : ভারত ১৮৮০-র দশক থেকে ১৯৫০-এর দশক.* আশীষ লাহিড়ী, ভাষান্তর. কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৯.

সিকদার, সুকুমার, অনু. *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র.* ৩য় সংস্করণ. কলকাতা : অনুষ্টুপ, ডিসেম্বর ২০১০.

সিংহ,কালীপ্রসন্ন, অনু. *বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত (প্রথম খণ্ড).* কলকাতা : সাহিত্যতীর্থ, জুন ২০১৪.

সেডেরলফ, গুনেল. *ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন.* কলকাতা : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৮.

সেন, নবেন্দু. *প্রসঙ্গায়নে বাংলা শিশুসাহিত্য.* কলকাতা : সাহিত্যলোক, সেপ্টেম্বর ২০১৮.

সেন, সুকুমার, সম্পা. *কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল.* ৪র্থ মুদ্রণ. নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১.

সেনগুপ্ত, পার্থ. *ছোটোদের মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও তাঁর রামধনু পত্রিকা.* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, বইমেলা ২০১৬.

সেনশর্মা, অর্জুনদেব. *হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ আদি-মধ্যযুগ.* কলকাতা : ভারবি, এপ্রিল ২০১৫.

স্বামী বিবেকানন্দ. *বাণী ও রচনা.* ষষ্ঠ খণ্ড. কলিকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, জানুয়ারি ১৯৬১.

পত্রপত্রিকা

ঘোষাল, চণ্ডিকাপ্রসাদ. ‘‘মিসেস বেইলি-র শিকার-স্মৃতির ভারত’’. *অনুষ্টুপ* ৪৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (২০১৫) : ১০৬-১১৫.

চট্টোপাধ্যায়, প্রমিতি. ‘‘বাংলা অ্যাডভেঞ্চার গল্প—স্বপ্নযাপনের প্রয়াস’’. *পরিকথা* ১৬ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (২০১৪) : ৪২১-৪৩২.

সিন্‌হা, রাজ্যেশ্বর. ‘‘বাঙালির ভ্রমণ, ভ্রমণ কাহিনি এবং তীর্থ ভ্রমণ বিষয়ে একটি প্রস্তাব’’. *অনুষ্টুপ* ৪৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (২০১২) : ২৭৭-৩১০.

ইংরেজি

Books

Cambell, Walter. *The Old Forest Ranger.* London: Arthur Hall, Virtue & Co., 1853.

Chakrabarti, Ranjan. *Climate Calamity and the wild: An Environmental History of the Bengal Delta, C. 1737-1947*. Delhi: Primus Books, 2022.

—, ed. *Critical themes in Environmental History of India*. New Delhi: Sage Publications India Pvt Ltd, 2020.

—, ed. *Situating Environmental History*. 4th ed. New Delhi: Manohar, 2023.

Chatterjee, Partha. *The Nation and its Fragments*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993.

Devee, Sunity. *Bengal Dacoits and Tigers.* Calcutta: Thacker, Spink & Co., 1916.

Devi, Gayatri and Santa Rama Rau, *A Princess Remember. The Memoirs of The Maharani of Jaipur.* Gaziabad: Tarang Paperbacks, Bikash Publishing House, 1982.

Habib, Irfan. *An Atlas of the Mughal Empire.* New Delhi: Oxford University Press, 1982.

Hughes, Julie. *Animal Kingdoms: Hunting the Environment and Power in the Indian Princely States*. New Delhi: Permanent Black, 2013.

Mackenzie, John M. *The Empire of Nature: Hunting, Conservation, and British Imperialism*. Manchester: Manchester University Press, 1988.

Mandala, Vijaya Ramadas. *Shooting a Tiger: Big-Game Hunting and conservation in Colonial India*. New Delhi: Oxford University Press, 2019.

Mitra, Papia, Barun Naha, Rianka Roy and Debayan Basu, eds. Reflections of the Growing Mind Young Adult Literature and Culture. Kolkata: Avenel Press and Department of English Surendranath College for women, 2016.

Rangarajan, Mahesh. *India's Wildlife History*. 6th ed. Delhi: Permanent Black, 2020.

—, ed. *Environmental Issues in India A Reader.* New Delhi: Pearson, 2007.

Rice, William. T*iger Shooting in India.* London: Smith, Elder and Co., 1857.

Samanta, Arabinda, Syed Tanveer Nasreen and Aparajita Dhar, eds. *Life and Culture in Bengal: Colonial and Post-Colonial Experiences.* Kolkata: Progressive Publishers, 2011.

Samanta, Samiparna. *Meat, Mercy, and Morality.* New Delhi: Oxford University Press, 2021.

Shastri, M. M. Haraprasad. translated into english. *Syainika sastram: The Art of Hunting in Ancient India of Raja Rudradeva of Kumaon,* ed. Mohan Chand. Delhi: Eastern Book Linkers.

Sinha, Mrinalini. *Colonial Masculinity: The 'Manly Englishman' and the 'Effeminate Bengali' in the late Nineteenth Century.* Manchester and New York: Manchester University Press, 1995.

Thapar, Valmik, Romila Thapar and Yusuf Ansari. *exotic Aliens: The Lion & The Cheetah in India.* New Delhi: Aleph, 2013.

Periodicals, Magazines

Khrienuo. ‘‘Nagas Role in World War II’’. *Journal of North East India Studies,* Vol. 3 (2) (2013): 57-69.

Sramek, Joseph. ‘ ‘‘Face Him Like a Briton’’: Tiger Hunting, Imperialism, and British Masculinity in Colonial India, 1800-1875'. *Victorian Studies,* Vol. 48, no. 4 (Summer 2006): 659-680.

Electronic Sources & Websites

Chimalgi, Kavya. ‘‘A History of Hunting in the Indian Subcontinent’’, accessed Jan 31, 2022, https://www.thelastwilderness.org.

Gelder, Ken and Rachael Weaver. "Kangaroo hunting in Colonial Australia", accessed Jan 31, 2022, https://pursuit.unimelb.edu.an.

Haas, Randy. "Woman the hunter: Ancient Andean remains Challenge ideas of who spread big game", accessed 2nd Feb, 2022, https: //www.science.org.

Ph.D. Dissertations

Dutta (nee Paul), Solanki. "Romance of the Jungle: The 'Shikar' Tales of India". Department of English, Jadavpur University, 2012.

Mani, Fiona. "Guns and shikaris: The rise of the sahib's hunting ethos and the fall of the subaltern poacher in British India, 1750-1947". West Virginia University, 2012.

Shresth, Swati. "Sahibs and Shikar: Colonial Hunting and Wildlife in British India, 1800-1935". Department of History, Duke University, 2009.

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর—

Rtd Professor
Jadavpur University

Professor
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata-700 032

তারিখ - 22.10.2023

গবেষকের স্বাক্ষর—

Anindita Mandal

তারিখ - 22.10.2023